কাজী নজরুল ইসলাম
রচনাসমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

কাজী নজরুল ইসলাম

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০০২০

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৭৫

প্রচ্ছদ
শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০০২০

মুদ্রাকর
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

নিবেদন

সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শ, সাম্যচেতনা, স্বাধীনতার প্রতি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এক প্রকৃত গণকবি, জনপ্রিয়তার জোয়ারে যিনি ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তথাকথিত নান্দনিক মূল্যায়ন আর পণ্ডিতি সূক্ষ্মবিচারের তুলাদণ্ড।

মাত্র বাইশ-তেইশ বছরের সাহিত্যজীবনে তিনি তিন হাজারেরও বেশি গান, প্রায় আটশো কবিতা, তিনটি উপন্যাস, আঠারো-উনিশটি গল্প, নাটক-নাট্যবিচিত্রা মিলিয়ে গোটা তিরিশ এবং অন্তত একশোটি প্রবন্ধ-অভিভাষণ-আলোচনা-সমালোচনা নিবন্ধ আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন। শব্দের চয়নে-বয়নে চিত্রনির্মাণে, মিলের জটিল প্রয়োগে, স্তবক নির্মাণের কারুকর্মে, আরবি ফারসি শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে এবং পুরাণ-ইতিহাসের অজস্র প্রতীকী ভাষাচিত্রে নজরুল এক অনন্যসাধারণ শিল্পী।

অশান্ত ও প্রশান্ত, এই দুই ভাবধারার বাহক এহেন নজরুলকে শিল্প-সাহিত্যের জগৎ এড়িয়ে যেতে পারে না। সমকালীন যুবমানসে, বিশেষত স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষদের মধ্যে যাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অবিসংবাদিত, সেই নজরুলকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জনপ্রিয়তা কাব্যবিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে, তা শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য।' নজরুল অগণিত সাধারণ মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের পরমপ্রিয় মানুষ। তার কারণ একটাই, নজরুল তাঁর সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের বেশিরভাগ অংশটাই বিদেশি শাসকের শোষণমুক্তির জন্য, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দূর করার জন্য, সামাজিক জীবনের নানাস্তরে অসাম্য দূর করার জন্য যে লড়াই করে গিয়েছেন, তা আজও অসম্পূর্ণ, যদিও অব্যাহত। তাই আজও দুই বাংলার জনসাধারণ সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীকবি নজরুলকে প্রেরণার অফুরন্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য করে।

দুঃখের হলেও সত্য এই বঙ্গে এতদিন নজরুলের সমগ্র রচনাবলি প্রকাশিত হয়নি। সমগ্র রচনাবলি প্রকাশের দীর্ঘকালের আন্তরিক দাবিপূরণের লক্ষ্য নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উপর কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র প্রকাশের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। অসম্পূর্ণ হলেও এখানে কয়েক খণ্ডে রচনাবলি এবং বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ পাওয়া যায়। নজরুলের সাহিত্য ও সংগীত নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চর্চা করছেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নজরুলের রচনা পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও গবেষণা বেশ কিছু হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও তাঁর সমগ্র রচনা ও তার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে এই রাজ্যের পাঠকসমাজ বঞ্চিত রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, নজরুল রচনার প্রকাশকদের এবং লেখক পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের ঐকান্তিক ও উদার সহযোগিতায় এই রচনাসমগ্র প্রকাশের পথ সুগম হয়েছে।

অপরিসীম দারিদ্র, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা, বারেবারে বাসস্থানের পরিবর্তন, অকালে দুরারোগ্য অসুস্থতা ইত্যাকার কারণে নজরুল-রচনার অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে, গ্রন্থস্বত্ব জটিল হয়েছে, প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এই সবকিছুর ফলে নজরুল রচনাসমগ্র নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রকাশের পথে পদে পদে প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশকের হাতে পড়ে তাঁর একই রচনায় অজস্র পাঠভেদ ও পাঠান্তর লক্ষ করে কৌতূহলোদ্দীপক অনেক বিষয় পাওয়া গিয়েছে। এই রচনাসমগ্রের প্রত্যেক খণ্ডের শেষভাগে প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অংশে তার বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে অনুসন্ধানী পাঠক আশা করি উপকৃত হবেন। এই অংশটি প্রস্তুত করার কাজে ড. অরুণকুমার বসুর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নজরুল রচনার একটি নির্ভুল, বিশ্বস্ত ও মান্য পাঠ প্রস্তুত করা বেশ দুরূহ কাজ — একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছি এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে পাঁচটি খণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

এযাবৎ-অজ্ঞাত বহু তথ্য, অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত বেশ কিছু রচনা, নজরুলের প্রায়-অপরিচিত কয়েকটি প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন সময়ের হস্তাক্ষরসংবলিত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার চিত্র এই রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি যথাসম্ভব অনুসৃত হয়েছে, তবে উর্দু, আরবি-ফারসি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে নজরুল-ব্যবহৃত বানানই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মুদ্রণ সৌষ্ঠব ও প্রকাশনার উন্নত মানের কথা মনে রেখে রচনাসমগ্রের দাম যথাসম্ভব সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ও এই বাংলার নজরুল রচনার প্রকাশকমহল, বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তাঁদের সাহায্য দানের জন্য।

সূচিপত্র

কবিতা

গানও গীতি-আলেখ্য

বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড ২১৩—২৫৭

বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে ২১৩ বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে ২১৩ যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই ২১৪ আমি চিরতরে দূরে চলে যাব ২১৪ সবার কথা কইলে কবি ২১৫ ওরে ডেকে দে দে লো ২১৫ নয়নভরা জল গো তোমার ২১৬ আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ ২১৬ আমি আছি বলে দুখ পাও তুমি ২১৬ আর অনুনয় করিবে না কেউ ২১৭ মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে ২১৭ গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে ২১৮ গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায় ২১৮ রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি তোমার অঙ্গে ২১৯ এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা ২১৯ বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে ২১৯ ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে ২২০ নূরজাহান নূরজাহান ২২০ বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি ২২১ সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন ২২১ মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধ বাদ ২২২ আমার ভুবন কান পেতে রয় ২২২ আনো গোলাপ-পানি ২২৩ কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া ২২৩ প্রদীপ নিভায়ে দাও ২২৩ রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি ২২৪ নিশিরাতে রিম ঝিম ঝিম বাদল-নূপুর ২২৪ ভোরে ঝিলের জলে ২২৫ সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে ২২৫ আজও ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে ২২৬ যখন আমার গান ফুরাবে ২২৬ ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া ২২৭ ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে ২২৭ মনে পড়ে আজও সেই নারিকেল কুঞ্জ ২২৭ আমি পুরব দেশের পুরনারী ২২৮ তেমনই চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি ২২৮ নন্দন বন হতে কে গো ২২৯ শাওন রাতে যদি ২২৯ কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা ২৩০ বসন্ত মুখর আজি ২৩০ তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি ২৩০ তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী ২৩১ কেন মেঘের ছায়া আজি ২৩১ বন্ধু আজও মনে যে পড়ে ২৩২ ধর্মের পথে শহিদ যাঁহারা ২৩২ তুমি আমার সকাল বেলার সুর ২৩৩ তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো ২৩৩ মোর গানের কথা যেন আলোকলতা ২৩৩ এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা ২৩৪ কত দূরে তুমি ওগো আঁধারের সাথি ২৩৪ অনেক ছিল বলার যদি ২৩৫ বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে ২৩৫ বন-বিহঙ্গা যাও রে উড়ে ২৩৬ এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে ২৩৬ উজান বাওয়ার গান গো এবার ২৩৭ যবে ভোরের কুন্দ-কলি ২৩৭ মোর স্বপনে যেন বাজিয়েছিলে ২৩৮ আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে ২৩৮ শাওন আসিল ফিরে ২৩৯ বেদিয়া বেদিনি ছুটে আয় আয় ২৩৯ মোর প্রিয়া হবে এসো রানি ২৩৯ ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি ২৪০ নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায় ২৪১ আধো রাতে যদি

দশমহাবিদ্যা ৩২৯—৩৩৭

নন্দলোক হতে আমি এনেছি রে ৩২৯ ভারত শ্মশান হল মা ৩২৯ (মা) ব্রহ্মময়ী জননী মোর ৩৩০ তুমিই দিলে দুঃখ অভাব ৩৩১ (ওরা) আমার কেহ নয় ৩৩১ শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে ৩৩২ কে তোরে কী বলেছে মা ৩৩২ (তুই) কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে ৩৩৩ মা মেয়েতে খেলব পুতুল ৩৩৩ তোমার পূজার ফুল ফুটেছে ৩৩৪ তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা ৩৩৪ (আমার) মা যে গোলাপ সুন্দরী ৩৩৫ শংকর-অঙ্কলীলা-যোগমায়া ৩৩৫ (জয়) বিগলিত করুণা-রূপিণী গঙ্গা ৩৩৬ আয় মা উমা, রাখব এবার ৩৩৬ কী দশা হয়েছে মোদের ৩৩৭

বিজয়া ৩৩৯—৩৪৪

বিজয়োৎসব ফুরাইল মা গো ৩৪১ যাসনে মা ফিরে যাসনে জননী ৩৪১ মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে ৩৪২ (মোরা) মাটির ছেলে, দু-দিন পরে ৩৪৩ এবার নবীন মন্ত্রে হবে ৩৪৪

অনুবাদ

রুবাইয়াত্-ই-ওমর খৈয়াম ৩৪৭—৩৮২

রাতের আঁচল দীর্ণ করে ৩৪৭ আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন ৩৪৭ ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস ৩৪৭ আমার আজের রাতের খোরাক ৩৪৭ প্রভাত হল শরাব দিয়ে ৩৪৭ ওঠো, নাচো! আমরা ৩৪৮ তোমার রাঙা ঠোঁটে ৩৪৮ আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ৩৪৮ শরাব আনো বক্ষে আমার ৩৪৮ আমরা পথিক ধূলির পথের ৩৪৮ ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে ৩৪৮ রহস্য শোন সেই সে লোকের ৩৪৯ সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও ৩৪৯ স্রষ্টা যদি মত নিত মোর ৩৪৯ আত্মা আমার : খুলতে যদি ৩৪৯ সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও ৩৪৯ ব্যথায় শান্তি লাভের তরে ৩৪৯ বুলবুলি এক হালকা পাখায় ৩৫০ রূপ-মাধুরীর মাথায় তোমার ৩৫০ সাকি! আনো আমার হাতে ৩৫০ নীল আকাশের নয়ন ছেপে ৩৫০ করব এতই শিরাজি পান ৩৫০ দেখতে পাবে যেথায় তুমি ৩৫০ নিদ্রা যেতে হবে গোরে ৩৫১ বিদায় নিয়ে আগে ৩৫১ তুমি আমি জন্মিনিকো ৩৫১ প্রথম থেকেই আছে লেখা ৩৫১ ভালো করেই জানি আমি ৩৫১ চলবে নাকো মেকি টাকার ৩৫২ সবকে পারি ফাঁকি দিতে ৩৫২ মৃত্তিকা-নীল হবার আগে ৩৫২ বলতে পার অসার শূন্য ৩৫২ খাজা! তোমার দরবারে ৩৫২ কাল কী হবে কেউ জানে না ৩৫২ প্রেমিকরা সব আমার মতো ৩৫৩ মানব-দেহ — রঙে-রূপে ৩৫৩ তিনভাগ জল এক ভাগ থল ৩৫৩ দোষ দেয় আর ভর্ৎসে সবাই ৩৫৩ মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস ৩৫৩ কারুর প্রাণে দুখ দিয়ো না ৩৫৪ ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন আর শাস্ত্রপাঠ ৩৫৪ অজ্ঞানেরই তিমির-তলের মানুষ ৩৫৪ লয়ে

শরাব-পাত্র হাতে পিই যবে ৩৫৪ 'শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস মদ্যপায়ীর নেই কো ত্রাণ' ৩৫৪ আমার কাছে শোন উপদেশ ৩৫৪ মউজ চলুক! লেখার যা তা লিখল ভাগ্য ৩৫৫ সেই সাথে চাই — সৃষ্টি-খাতায় ৩৫৫ নাস্তিক আর কাফের বলো ৩৫৫ বদখশানী রক্ত-চুনির মতন সুরা চুঁইয়ে আন ৩৫৫ মসজিদে মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায় ৩৫৫ এক হাতে মোর তসবি খোদার ৩৫৬ একমনি ওই মদের জালা গিলব ৩৫৬ বিষাদের ওই সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ৩৫৬ স্বর্গে পাব শরাব-সুধা ৩৫৬ 'রজন শাবান পবিত্র মাস' ৩৫৬ শুক্রবার আজ বলে সবাই পবিত্র ৩৫৬ মসজিদের অযোগ্য আমি ৩৫৭ মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় ৩৫৭ বিধর্মীদের ধর্মপথে ৩৫৭ হৃদয়ে যাদের অমর প্রেমের ৩৫৭ মদ পিয়ো আর ফুর্তি করো ৩৫৭ এক সোরাহি সুরা দিয়ো ৩৫৮ হুরি বলে থাকলে কিছু ৩৫৮ যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে ৩৫৮ দোষ দিয়ো না মদ্যপায়ীর ৩৫৮ খুশি-মাখা পেয়ালাতে ওই ৩৫৮ চৈতি-রাতে খুঁজে নিলাম ৩৫৮ সাকি-হীন ও শরাব-হীনের জীবনে ৩৫৯ মরুর বুকে বসাও মেলা ৩৫৯ শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকি ৩৫৯ নৃত্য-পাগল ঝরনাতীরে সবুজ ঘাসের ঝালর ৩৫৯ আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় ৩৫৯ আর কতদিন সাগরবেলায় ৩৬০ মধুর, গোলাপ-বালার গালে ৩৬০ শীত ঋতু ওই হল গত ৩৬০ 'সরো'র মতন সরল তনু ৩৬০ পল্লবিত তরুলতা কতই আছে ৩৬০ আমার সাথি সাকি জানে মানুষ ৩৬০ আরাম করে ছিলাম শুয়ে ৩৬১ মন কহে, আজ ফুটল যখন ৩৬১ হায়রে, আজি জীর্ণ আমার ৩৬১ আজ আছে তোর হাতের কাছে ৩৬১ হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ৩৬১ অর্থ বিভব যায় উড়ে সব ৩৬২ পান করে যাই মদিরা ৩৬২ ব্যথার দারুণ শরাব পিয়ো ৩৬২ সুরা দ্রবীভূত চুনি, সোরাহি ৩৬২ সুরার সোরাহি এই মানুষ ৩৬২ ব্যর্থ মোদের জীবনঘেরা কুগ্রহ ৩৬২ মদের নেশার গোলাম আমি ৩৬৩ পেতে যে চায় সুন্দরীদের ৩৬৩ শরাব নিয়ে বসো ৩৬৩ ওগো সাকি! তত্ত্বকথা চার ও পাঁচের ৩৬৩ এক নিশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া ৩৬৩ কায়কোবাদের সিংহাসন ৩৬৪ এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় ৩৬৪ ঘরে যদি বসিস গিয়ে ৩৬৪ প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক ৩৬৪ খৈয়াম — যে জ্ঞানের তাঁবু ৩৬৪ সাত-ভাঁজ ওই আকাশ ৩৬৪ খরাব হওয়ার শরাব-খানায় ৩৬৫ এই কুঁজো — যা আমার মতো ৩৬৫ দ্রাক্ষা সাথে ঢলাঢলির ৩৬৫ সাবধান! তুই বসবি যখন ৩৬৫ যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই ৩৬৫ তোমরা — যারা পান কর মদ ৩৬৬ করছে ওরা প্রচার — পাবি স্বর্গে ৩৬৬ এই সে আঁধার প্রহেলিকা ৩৬৬ দোহাই! ঘৃণায় ফিরিয়ো না ৩৬৬ জীবন যখন কণ্ঠাগত ৩৬৬ আয় ব্যয় তোর পরীক্ষা কর ৩৬৬ হঠাৎ সেদিন দেখলাম ৩৬৭ একী আজব করছ সৃষ্টি ৩৬৭ চূর্ণ করে তোমায় আমায় ৩৬৭ এই যে রঙিন পেয়ালাগুলি ৩৬৭ পিয়ালাগুলি তুলে ধরো ৩৬৭ মসজিদ আর নামাজ

রোজার ৩৬৭ মৃত্যু যেদিন নিঠুর পায়ে ৩৬৮ রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ৩৬৮ তিরস্কার আর করবে কত ৩৬৮ মসজিদের ওই পথে ছুটি ৩৬৮ নিত্যদিনে শপথ করি ৩৬৮ আগে যে সব সুখ ছিল ৩৬৯ আমরা শরাব পান করি ৩৬৯ তোমার দয়ার পিয়ালা, প্রভু ৩৬৯ আমায় সৃজন করার দিনে ৩৬৯ দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু ৩৬৯ দয়ার তরেই দয়া যদি ৩৬৯ আড্ডা আমার এই সে গুহা ৩৭০ দেখে দেখে ভণ্ডামি সব ৩৭০ স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ ৩৭০ পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে ৩৭০ হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা ৩৭০ কালকে রাতে ফিরছি যখন ৩৭০ হে শহরের মুফ্‌তি! তুমি ৩৭১ ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ ৩৭১ ধূলি-ম্লান এ উপত্যকায় এলি ৩৭১ সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ ৩৭১ এই মূঢ়দল — স্থূল তাহাদের ৩৭১ মার্কা-মারা রইস যত — ঈষৎ দুখের ৩৭২ দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার ৩৭২ জ্ঞান যদি তোর থাকে কিছু ৩৭২ যার পরে তোর আস্থা গভীর ৩৭২ দাস হয়ো না মাৎসর্যের ৩৭২ যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ৩৭২ সেরেফ খেয়াল-খুশির বশে ৩৭৩ ধীর চিত্তে সহ্য করো ৩৭৩ আকাশ পানে হতাশ আঁখি ৩৭৩ দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ ৩৭৩ নই আর কী হই আমি ৩৭৩ একদা মোর ছিল যখন ৩৭৪ আসিনি তো হেথায় আমি ৩৭৪ ঘেরা-টোপের পর্দাঘেরা ৩৭৪ আমার রোগের এলাজ্‌ কর ৩৭৪ পেয়ালার প্রেম যাচ্‌ঞা কয়ো ৩৭৪ অঙ্গো রক্তমাংসের এই পোশাক ৩৭৪ কইল গোলাপ, মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি ৩৭৫ হৃদয় ছিল পূর্ণ প্রেমে, পেয়েছিলাম তায় ৩৭৫ 'ইয়াসিন', আর 'বরাত' নিয়ে, ৩৭৫ ভূলোক আর দ্যুলোকেরই মন্দ ভালোর ভাবনাতে ৩৭৫ এই নেহারি — নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে ৩৭৫ আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি ৩৭৬ আশমানি হাত হতে যেমন পড়বে ৩৭৬ চাল ভুলিয়ে দেয় রানি মোর ৩৭৬ আশমানে এক বলীবর্দ রয় ৩৭৬ শ্রেষ্ঠ শরাব পান করে নেয় ৩৭৬ রূপ লোপ এর হয় অরূপে ৩৭৭ লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ৩৭৭ তোমার-আমার কি হবে ভাই ৩৭৭ ঘূর্ণমান ওই কুগ্রহ দল ৩৭৭ ফিরনু পথিক সাগরমরু ঘোর বনে ৩৭৭ দুই জনাতেই সইছি সাকি ৩৭৭ স্রষ্টা মোরে করল সৃজন ৩৭৮ দুর্ভাগ্যের বিরক্তি পান করতে ৩৭৮ ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় ৩৭৮ কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস ৩৭৮ জন্মাদিনি ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের ৩৭৮ ভাগ্যদেবী! তোমার যত লীলাখেলায় ৩৭৮ সইতে জুলুম খল নিয়তির চাও ৩৭৯ মোক্ষম বাঁধ বেঁধেছে যে মোদের ৩৭৯ মানুষ খেলার গোলক প্রায় ৩৭৯ খামকা ব্যথার বিষ খাসনে ৩৭৯ সিন্ধু হতে বিচ্ছেদেরই দুঃখে কাঁদে ৩৭৯ আমায় রানি ৩৭৯ তোমার আদরিনি বধূ ছিল ৩৮০ যেমনি পাবি মন দুই মদ ৩৮০ মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে ৩৮০ তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না ৩৮০ বলতে পারো! টক সে কেন আঙুর ৩৮০ খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় ৩৮০ খৈয়াম! তুই

নতুন চাঁদ

প্রথম প্রকাশ
২৩ মার্চ ১৯৪৫

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির তালিকা

নতুন চাঁদ
চির জনমের প্রিয়া
আমার কবিতা তুমি
নিরুক্ত
সে যে আমি
অভেদম্
অভয়-সুন্দর
অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি
কিশোর রবি
কেন জাগাইলি তোরা ?
দুর্বার যৌবন
আর কত দিন ?
ওঠ রে চাষী
মোবারকবাদ
কৃষকের ঈদ
শিখা
আজাদ

নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আশমানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার'[১] করে গেরেফতার
করিব, তৃষিত বক্ষে মোর ওই চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে!
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশির পায়রা উড়াব গো
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়- আশমানে,
মত্ত হইব আনন্দের রসপানে।
বদলাবে তকদির[২] আমার,
ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেব, বাঁধব তায়
আল্লাহ্ নামের রজ্জুতে দিল্-কোঠায়।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা[৩] ডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আশমান দোল খাবে জয়-গানে
এক আল্লার জয়-গানে,
মহামিলনের জয়-গানে
'শান্তি' 'শান্তি' জয়-গানে!

একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বন্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।
এক আকাশের তলে রব এক সঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে

১ রোজা-দিনান্তে আহার। ২ অদৃষ্ট, ভাগ্য। ৩ আজান প্রদানকারী।

মিলিযা চলিব তাঁর পথে দলে দলে।
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহংকার,
প্রলয-পযোধি এক নাযে হইব পার।
একেব লীলা এ, দু-জন নাই
তাঁহারই সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি — সর্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি নাকো, নিজেরে তাই নাহি চিনি
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
প্রলয়ের রূপ ধরে যবে
তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
থাকে না হিন্দু-মুসলমানের আস্ফালন!
এককে মানিলে রহে না দুই,
এসো সবে সেই এককে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব কিছুর সব জাতির।
আসিছে তাহারই চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা — তাহারা নয়,
আসিছে — যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আশমানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
তাহারা বুদ্ধি-বন্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তারা,
অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু, ভয় দেখায়,
যারা আগে চলে, পিছে তাদের টানিতে চায়!
প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
দুই কূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান নৌজোয়ান!
মহাবন্যার তরঙ্গসম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান নৌজোয়ান!
জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ

এদেরই বক্ষে ; ভাঙিবে বাঁধ
জরায় জীর্ণ মড়া ঘাটের বিলাসীদের
মানিবে না এরা হট্টগোল মণ্ডুকের !
সত্য বলিতে নিত্য ভয়
যুক্তি-গর্তে লুকায়ে রয়
ইহারা তাদের দলের নয় — নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান !
ভীরু ইঁদুরের কিচি-মিচি
শোনে নাকো এরা মিছামিছি,
এরা শুধু বলে, 'চল্ আগে নৌজোয়ান !'
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চলেই ভীরু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে !
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ।

জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন-বেগ দুরন্ত
মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত।
নাই ইহাদের অবিশ্বাস
যা আনে জগতে সর্বনাশ।
প্রতি নিশ্বাসে এরা কহে — 'মোরা অমর !'
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর।
হাতের লাট্টু এদের প্রাণ
গুলতির গুলি এদের প্রাণ
বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিকে,
এদের বুদ্ধি চিকমিকায় না ঘেরা চিকে !
তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি-দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,
পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয় —
'মোরা আলো দেব, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয় !'
পাহাড়ে চড়িয়া নীচে পড়ে — নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
অজগর খোঁজে গহ্বরে — নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর — নৌজোয়ান !
বাহন তাহার তুফান ঝড় — নৌজোয়ান !
শির পেতে বলে — 'বজ্র আয় !'
দৈত্য-চর্ম-পাদুকা পায়,

অগ্নি-গিরিরে ধরে নাড়ায় — নৌজোয়ান!
দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায়
ভূকম্পের ঘর কোথায় —
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
বিলাস এদের দারিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,
দেখেনিকো জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ,
শুনিলেও কাঁপে বলি-যূপের ছাগের বৎ!
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ!
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!

এদেরেই পথ দেখাতে ওই
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে! ভীরুরা যাসনে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ!
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ওই পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্বতে।
বিলাসীরা থাকো চুপ করে,
রূপ দেখে খেয়ো টুপ করে
যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান!
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয় — 'জীবন দান
জীবন দান, নৌজোয়ান!'
জীবনে না করে নিষ্ঠীবন,
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান!
তাহাদের পথে এসো না কেউ ভীরু, আল্লার না-ফরমান।
ওরা দুর্জয় ভয়-হারা
ওদের ভ্রান্ত কয় কারা?
এই মর্ত্যের ভোগের গর্তে যারা মরে?
অমৃত আনিতে যায় — তারে অনাদর করে?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান
তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
নববধূ সম শয্যাতে —
নৌজোয়ান!
নৌজোয়ান!

চির-জনমের প্রিয়া

আরও কতদিন বাকি?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি!
অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজও আকাশে রয়েছে জাগি।
চির-জনমের প্রিয়া মোর!   চেয়ে দেখো নীলাকাশে
ভ্রমরের মতো ঝাঁক বেঁধে কোটি গ্রহ-তারা ছুটে আসে
তোমার শ্রীমুখ-কমলের পানে! ওরা যে ভুলিতে নারে
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে!
বারে বারে মোর জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, প্রিয়া।
নেভেনি আমার নয়ন, তোমারে দেখিবার আশা নিয়া।
আমি মরিয়াছি, মরেনি নয়ন; দেখো প্রিয়তমা চাহি
তব নাম লয়ে ওরা কাঁদে আজও — ওদের নিদ্রা নাহি।
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়হারা পাখি!
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখি-জল,
তাই আজও তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল!
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনোদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন!
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সংগীতে, সুরে বহিত অমৃত-নদী!

*   *   *

ফুল কেন এত ভালো লাগে তব, কারণ জান কি তার?
ওরা যে আমার কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রুহার!
যত লোকে আমি তোমার বিরহে ফেলেছি অশ্রুজল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু — ছুঁইতে চাহে তব পদতল!
অশ্রুতে মোর গভীর গোপন অভিমান ছিল হায়,
তাই অভিমানে তোমারে ছুঁইয়া ফুল শুকাইয়া যায়!
ঝরা ফুল লয়ে বক্ষে জড়ায়ে ধরেছ কি কোনোদিন?
এত সুন্দর, তবু কেন ফুল এমন ব্যথা-মলিন?
তব মুখ পানে চেয়ে থাকে ফুল মোর অশ্রুর মতো;
তোমারে হেরিয়া উহাদের গত জনমের স্মৃতি যত
জেগে ওঠে প্রাণে! তাই অভিমানে ঝরে সে সন্ধ্যাবেলা,
ভুলিতে পারে না, যুগে যুগে তুমি হানিয়াছ যত হেলা!

* * *

পূর্ণিমা চাঁদ দেখেছ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ!
ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন এঁকেছে, জান, কার অনুরাগ?
কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ-আশা জমে জমে
চাঁদ হযে হায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহাব্যোমে!
কলঙ্ক হযে বুকে দোলে তার তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জ্যোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়া!
কোন সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন শেষে, প্রিয়া,
বেদনা-সাগরে চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া!
পলাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে! নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হায় আমার বক্ষ হতে!
তুমি চলে গেলে, বুকে রয়ে গেল তব অঙ্গের ছাপ,
শূন্য বক্ষে শূন্যে ঘুরি গো, চাঁদ নই অভিশাপ!

* * *

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণিতে আসি ফিরে,
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা যমুনা তীরে!
চিনি যবে হায় গোধূলিবেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে,
বাঁশি না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে!
তুমি চলে যাও ভবনের বধূ, আমি যাই বনপথে,
মোর জীবনের মরা ফুল তুলে দিই মরণের রথে!

* * *

শ্রাবণ-নিশীথে ঝড়ের কাঁদন শুনেছ কি কোনোদিন?
কার অশান্ত অসহ রোদন আজিও শ্রান্তিহীন
দিগ্‌দিগন্তে দস্যুর মতো হানা দিয়ে ফেরে হায়!
ভবনে ভবনে কার বুক থেকে কাহারে ছিনিতে চায়? —
এমনই সেদিন উঠেছিল ঝড় মহাপ্রলয়ের বেশে
যেদিন আমারে পথে ফেলে গেলে চলিয়া নিরুদ্দেশে!
প্রবল হস্তে নাড়া দিয়া আমি অসীম শূন্য নভে
কৃষ্ণ মেঘের ঢেউ তুলেছিনু; গর্জিয়া ভীম রবে
বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিনু! যেখানে যে ছিল সুখে
যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল — সেথা বজ্র হেনেছি বুকে!
ঝড়ের বাতাসে আমার নিশাসে নড়িল না মহাকাল,
মোর ধূমায়িত অশ্রু-বাষ্প রচিল জলদ-জাল।
অঝোর ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
ফুরাইল আয়ু, থির হল বায়ু, সাড়া দিলে নাকো তুমি!
আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজও বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে

অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্ঝার পাখা মেলে!
তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
নইলে ভুলিয়া ভয় — ছুটে যেতে মরণের অভিসারে!

* * *

শান্ত হইনু প্রলয়ের ঝড়, মলয়-সমীর-রূপে
যেখানে দেখেছি ফুল সেইখানে ছুটে গেছি চুপে চুপে।
পৃথিবীতে যত ফুটিয়াছে ফুল সকল ফুলের মুখে
তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি — না পেয়ে উগ্র দুখে
ঝরায়েছি ফুল ধরার ধুলায়! ঝরা ফুল-রেণু মেখে
উদাসীন হাওয়া ফিরিয়াছি পথে তব প্রিয় নাম ডেকে!
সদ্য-স্নাতা এল কুন্তল শুকাইতে যবে তুমি
সেই এলোকেশ বক্ষে জড়ায়ে গোপনে যেতাম চুমি!
তোমার কেশের সুরভি লইয়া দিয়াছি ফুলের বুকে
আঁচল ছুঁইয়া মূর্ছিত হয়ে পড়েছি পরম সুখে!
তোমার মুখের মদির সুরভি পিইয়া নেশায় মাতি
মহুয়া বকুল বনে কাটায়েছি চৈতি চাঁদিনি রাতি।
তব হাত দুটি লতায়ে রহিত পুষ্পিতা লতা সম
কত সাধ যেত যদি গো জড়াত ও লতা কণ্ঠে মম!
তব কঙ্কণ চুড়ি লয়ে আমি খেলেছি, দেখনি তুমি,
চলিতে মাথার কাঁটা পড়ে যেত, আমি তুলিতাম চুমি!
চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল! —
সে সব অতীত জনমের কথা — আজ মনে হয় ভুল!

* * *

আজ মুখপানে চেয়ে দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে,
আজও বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে!
ডাগর নয়নে আজও পড়ে সেই সাগর জলের ছায়া,
তনুর অণুতে অণুতে আজিও সেই অপরূপ মায়া!
আজও মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরন জাগে,
আমার হৃদয়ে কোটি শতদল ফুটে ওঠে অনুরাগে
আজও যবে চাও, আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কানাকানি করে চাঁদে ও তারাতে — 'জানি গো তোমারে জানি!'
রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে — 'প্রিয়া, চিনি, চিনি'!
একদিন ছিলে প্রেমের গোলোকে মোর প্রেম-গরবিনি।
ছিল একদিন — আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে
নিবেদিত নীল পদ্মের মতো ভাসিতে প্রেমের স্রোতে!
ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে,
আমি পুষ্প-বিহীন শূন্যবৃন্ত কাঁটা লয়ে দিন কাটে!

* * *

মনে করো, যেন সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা।
তুমি রয়ে গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা!
সেই নদীজলে পড়ে গেলে তুমি ফুলের মতন ঝরে,
কেঁদে বলেছিলে যাবার বেলায় — 'মনে কি পড়িবে মোরে,
জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি?'
আমি বলেছিনু, 'উত্তর দেবে আর জনমের কবি!'
সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হয়ে,
ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আয়ু লয়ে!
ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছুটে
হংস-দূতীর মতো মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চুপুটে!
হারায়ে গিয়াছে শূন্যে তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অন্ধকার!
ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে —
'যাহারে খুঁজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জান সে কোথায় রহে?'
তারা মরে, ফুল ঝরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলে না
আমার সুরের পালক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলে না!
আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো! ব্যথার সাগর-তলে —
দেখেছি কি কত না-বলা কথার মুক্তা মানিক জ্বলে?
তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তারা মুক্তি লভিতে চায়
গত জনমের অস্থি আমার নিদারুণ বেদনায়
মুক্তা হয়েছে; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে গানে
চরণে দলিয়া ফেলে দিয়ো পথে যদি তা বেদনা হানে।
মনে করো, দুঃস্বপ্নের মতো আমি এসেছিনু রাতে
বহুবার গেছ ভুলিয়া এবারও ভুলিয়া যাইয়ো প্রাতে
কহিলাম যত কথা প্রিয়তমা মনে কোরো সব মায়া,
সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া!
মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্রদগ্ধ আকাশতল!

আমার কবিতা তুমি

প্রিয়া-রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি!
জুড়াল গো তার শত জনমের রৌদ্রদগ্ধ-কায়া—

এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া!
চেয়ে দেখো প্রিয়া, তোমার পরশ পেয়ে
গোলাপ দ্রাক্ষাকুঞ্জে মরুর বক্ষ গিয়াছে ছেয়ে!

গভীর নিশীথে, হে মোর মানসী, আমার কল্পলোকে
কবিতার রূপে চুপে চুপে তুমি বিরহ-করুণ চোখে
চাহিয়া থাকিতে মোর মুখ পানে ; আসিয়া হিয়ার মাঝে
বলিতে যেন গো — 'হে মোর বিরহী, কোথায় বেদনা বাজে?'
আমি ভাবিতাম, আকাশের চাঁদ বুকে বুঝি এল নেমে
মোর বেদনায় বুকে বুক রাখি কাঁদিতে গভীর প্রেমে!
তব চাঁদ-মুখপানে চেয়ে আজ চমকিয়া উঠি আমি,
আমি চিনিয়াছি, সে চাঁদ এসেছে প্রিয়া-রূপ ধরে নামি!

যত রস-ধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে
তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে।
তাই আজ তব যে অঙ্গে যবে আমার নয়ন পড়ে,
থির হয়ে যায় দৃষ্টি সেথাই, আঁখি-পাতা নাহি নড়ে!
তোমার তনুর অণু-পরমাণু চির-চেনা মোর, রানি!
তুমি চেন নাকো ওরা চেনে বলে, 'বন্ধু তোমারে জানি!'
অনন্ত শ্রীকান্তি লাবণি রূপ পড়ে ঝরে ঝরে
তোমার অঙ্গ বাহি, প্রিয়তমা, বিশ্ব ভুবন-পরে!
মন্ত্র-মুগ্ধ সাপের মতন তোমার অঙ্গ পানে
তাই চেয়ে থাকি অপলক-আঁখি, লজ্জারে নাহি মানে!

তুমি যবে চল, যবে কথা বল, মুখ পানে চাও হেসে
মূর্তি ধরিয়া ওঠে যেন সেথা আমার ছন্দ ভেসে।
মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দুরন্ত গতি!
আমার রুদ্র নৃত্যে জেগেছে কঙ্কালে নব প্রাণ,
ছন্দিতা ওগো, আমি জানি, তাহা তব অঙ্গের দান!
নাচ যবে তুমি আমার বক্ষে, রুধির নাচিয়া ওঠে
সেই নাচ মোর কবিতায় গানে ছন্দ হইয়া ফোটে।
মনে পড়ে যবে তোমার ডাগর সজল-কাজল আঁখি,
সে চোখের চাওয়া আমার গানের সুর দিয়ে বেঁধে রাখি।
প্রেম-ঢলঢল তোমার বিরহ-ছলছল মুখ হেরি
ভাবের ইন্দ্রধনু ওঠে মোর সপ্ত আকাশ ঘেরি।
আমার লেখার রেখায় রেখায় ইন্দ্রধনুর মায়া,

উহারা জানে না, এই রং তব তনুর প্রতিচ্ছায়া!
আমার লেখায় কী যেন গভীর রহস্য খোঁজে সবে
ভাবে, এ কবির প্রিয়তমা বুঝি আকাশ-কুসুম হবে!
উহারা জানে না, তুমি অসহায় কাঁদ পৃথিবীর পথে,
উহারা জানে না রহস্যময়ী তুমি মোর লেখা হতে।

আমিই ধরিতে পারি না তোমারে, উহারা ধরিতে চায়,
সাগরের স্মৃতি খুঁজে ফেরে ওরা মরুভূর বালুকায়!
তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রং লাগে।
জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব যৌবন-নেশা
এই পৃথিবীরে মনে হয় যেন, শিরাজি আঙুর-পেশা!
সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি!
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,
মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোনখানে!

হে প্রিয়া, তোমার চির-সুন্দর রূপ বারে বারে মোরে
অসুন্দরের পথ হতে টানি আনিয়াছে হাত ধরে।
ভিড় করে যবে ঘিরিত আমারে অসুন্দরের দল,
সহসা ঊর্ধ্বে ফুটিয়া উঠিত তব মুখ-শতদল।
মনে হত, যেন তুমি অনন্ত শ্বেত শতদল-মাঝে,
মোর প্রতীক্ষা করিতেছ প্রিয়া চির-বিরহিণী সাজে।
সেই মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি পৃথিবীর দেশে দেশে,
শ্রান্ত স্বপনে হৃদয়ে-গগনে ও মুখ উঠিত ভেসে!
যেই ধরিয়াছি মনে হত হায়, অমনই ভাঙিত ঘুম,
স্মৃতি রেখে যেত আমার আকাশে তব রূপ-কুঙ্কুম!
দেখি নাই, তবু কহিতাম গানে 'সাড়া দাও, সাড়া দাও,
যারা আসে পথে, তারা তুমি নহ, ওদের সরায়ে নাও!'
ভেবেছিনু, বুঝি পৃথিবীতে আর তব দেখা মিলিল না,

তুমি থাক বুঝি সুদূর গগনে হয়ে কবি-কল্পনা।
সহসা একদা প্রভাতে যখন পাখিরা ছেড়েছে নীড়,
হারানো প্রিয়ারে খুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়,
আমি পৃথিবীতে খুঁজিতেছিনু গো আমার প্রিয়ারে গানে,
থমকি দাঁড়ানু, চমকি উঠিনু কাহার বীণার তানে!
বেণু আর বীণা এক সাথে বাজে কাহার কণ্ঠ-তটে,
কার ছবি যেন কাঁদিয়া উঠিল লুকানো হৃদয়-পটে।
হেরিনু আকাশে তরুণ সূর্য থির হয়ে যেন আছে,
কে যেন কী কথা কয়ে গেল হেসে আমার কানের কাছে।
আমার বুকের জমাট তুষার-সাগর সহসা গলে
আছাড়িয়া যেন পড়িতে চাহিল তোমার চরণ-তলে।
ওগো মেঘ-মায়া, বুঝিয়াছিলে কি তুমি?
দারুণ তৃষায় তব পানে ছিল চেয়ে কোনো মরুভূমি?
তুমি চলে গেলে ছায়ার মতন, আমি ভাবিলাম মায়া,
কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণিতে ধরি কায়া!

ভেবেছিনু, আর জীবনে হবে না দেখা —
সহসা শ্রাবণ-মেঘ এল যেন হইয়া ব্রজের কেকা!
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু,
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাধার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে মগ্ন আছিনু, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।
চির-চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি
ইঙ্গিতে যেন কহিলে, 'বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি!'
আমি ডাকিলাম, 'এসো এসো তবে কাছে!'
কাঁদিয়া কহিলে, 'হেরো গ্রহ তারা এখনও জাগিয়া আছে,
উহারা নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সেদিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি।
কেবল দুজন করিব কূজন, রহিবে না কোনো ভয়,
মোদের ভুবনে রহিবে কেবল প্রেম আর প্রেমময়!'

'আমি কী করিব?' কহিলাম আঁখি-নীরে
কহিলে 'কাঁদিবে মোর নাম লয়ে বিরহ-যমুনাতীরে!
যমুনা শুকায়ে গিয়াছে প্রেমের গোকুলে এ ধরাতলে,
আবার সৃজন করো সে যমুনা তোমার অশ্রুজলে।
তোমার আমার কাঁদন গলিয়া হইবে যমুনা জল
সেই যমুনায় সিনান করিতে আসিবে গোপিনীদল,

ওরা প্রেম পাবে, পাইবে শান্তি, পাবে তৃষ্ণার মধু,
তোমারে দিলাম চির-উপবাস, পরম বিরহ, বঁধু!'
'এ কী অভিশাপ দিলে তুমি' বলে যেমনই উঠি গো কাঁদি,
হেরি কাঁদিতেছ পাগলিনি মোর হাত দুটি বুকে বাঁধি!
আজ মোর গানে কবিতায়, সুরে তুমি ছাড়া নাই কেউ,
সেই অভিশাপ যমুনায় বুঝি তুলেছে বিপুল ঢেউ!
সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,
জানে না পৃথিবী, কোন নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি!
বড়ো জ্বালা বুকে, বলো বলো প্রিয়া — না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজও জেগে আছে!
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বুঝে তোমার খেলা,
দূরে থাক বলে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা —
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি,
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিয়ো — 'এই তো আমি!'

নিরুক্ত

আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা।
কেবলই আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায়? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে?
হেরো গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
        বলো বলো প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে?
সে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে!
যে কথা কারেও বলনি জীবনে আমারেও নাহি বল,
যে কথার ভারে অসহ ব্যথায় টলিতেছ টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুক্ত বাণী —
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন শুভক্ষণে, রানি?
        না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ তারা আড়ি পেতে আছে জাগি!
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয়!
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন লজ্জায় কোন শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা?
                তুমি না কহিলে কথা

মনে হয়, তুমি পুষ্পবিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা!
সে কথা কহিতে পার না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরন জাগে।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে কথা কাঁদিয়া ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রু-নীরে!
হে আমার চির-লজ্জিত বধূ, হেরো গো বাসরঘরে
প্রতীক্ষারত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে।
হাত ধরে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
অভিমানে কভু চলে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি।
তোমার বুকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুহু-কেকা,
অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবে না দেখা?
আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায়।
হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে আসে,
ঘুম আসে না গো, বসে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে।
বুঝি বলিতে পার না লাজে
মোর ভালোবাসা ভালো লাগে নাকো বেদনার মতো বাজে!

কহো সেই কথা কহো,
কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ?
আমি জানি মোর নিয়তির লেখা, — তবু সেই কথা বলো
'ভিখারি, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হল!'

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারি দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
উৎপাত-সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায়!
কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ-যমুনাতীরে।
— রাগ করিয়ো না, হয়তো চিনিতে পারনি এ ভিখারিরে!
কী চেয়েছিনু, হয়তো বুঝিতে পারনিকো তুমি হায়,
তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছিনু পায়!
আমি বলেছিনু, 'আমারে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
তুমি তা জান না, কত কাল আছি ভিক্ষা-পাত্র ধরে!'
আমি বলেছিনু, 'ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেব প্রিয়া!
তোমার চরণে দেখেছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
কত কাঁটা কত ধূলি ও পঙ্ক পৃথিবীর পথ ভরা
তাই শিবসম, হে শক্তি মম, তব পথে পড়ে থাকি,
তাই সাধ যায় গঙ্গার মতো জটায় লুকায়ে রাখি!'

চির-পবিত্রা অমৃতময়ী, বলো কোন অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি যাও শ্মশানের পানে?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতী চেন নাকো আপনারে,
কহিলে না কথা, নামায়ে আমার প্রেম-যমুনার পারে।
আমি যা জানি না, তুমি তাহা জান ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো!
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্রের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব।
রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নওলকিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ!
হে নিরুক্তা, সেদিন হয়তো শূন্য পরম ব্যোমে
শুনাতে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম?
এই বিরহের প্রলয়ের পারে
কোন অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি — 'প্রিয়তম!'

সে যে আমি

ওগো দুরন্ত সুন্দর মোর! কার পরে রাগ করি
তারার মুক্তা-মালিকা ছিঁড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি?
কারে তুমি ভালোবাস প্রিয়তম? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক-লেখা?
কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠ রাগে?
প্রভাত-সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি লাগে।
কাহার বিরহ-জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?

বনে উপবনে কুঞ্জে ফোটাও চামেলি চম্পা হেনা,
ওগো সুন্দর, ফুল ফুটাইয়া মালা কেন গাঁথিলে না?
শ্রাবণ-গগনে মেঘরূপে ওঠে তব রোদনের ঢেউ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ক্ষীণ হল তনু, ভালোবাসিল না কেউ?
ওগো অভিমানী! বলো, কেন কোন নির্দয় অভিমানে
সৃষ্টিতে দিয়া জীবন, আবার টানিছ মৃত্যু-টানে?
গড়িয়া নিমেষে ভেঙে ফেল রূপ, যেন ভালো নাহি লাগে

রূপের এ খেলা। কোন অপরূপা স্মৃতিতে তোমার জাগে।
তাহারই লাগিয়া জাগিয়া রয়েছ উদাসীন দিবাযামী,
সে কি আমি? সে কি আমি?
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে বসালে ভূতের মেলা,
ভূত নিয়ে এ কী অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা?
মাধবীলতার কাঁকন পরায়ে সহকার-তরুশাখে
রুদ্র ঝড়ের রূপে এসে তুমি কেন ছিঁড়ে ফেল তাকে?
তোমার প্রেমের রাখি কে নিল না, কে সেই গরবিনি?
আজও সৃষ্টির পিত্রালয়ে কি কাঁদে সেই বিরহিণী?
তাই কি যেখানে মিলন, সেখানে নিত্য বিরহ আনো?
আপন প্রিয়ারে পেলে না বলিয়া সবার প্রিয়ারে টানো?
কার কামানার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞ্চলকামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?

কাহারে ভুলাতে ঝর অনন্ত পরম-শ্রীর রূপে,
তোমারই গুণের কথা কি ভ্রমর ফুলে কয় চুপে চুপে?
মুহু মুহু উহু উহু করে ওঠ কুহুর কণ্ঠস্বরে
তোমারই কাছে কি শিখিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া রব করে?
পদ্মপাতার থালায় তোমার নিবেদিত ফুলগুলি
ঝরে ঝরে পড়ে অশ্রুসায়রে, কেহ লইল না তুলি!
যাহার লাগিয়া ফুলের বক্ষে সঞ্চিত কর মধু,
সকলে সে মধু লইল, নিল না তোমারই মালিনী বধূ?
যে অপরূপারে খোঁজ অনন্তকাল রূপে রূপে নামি —
সে কি আমি? সে কি আমি?

সংহারে খোঁজ, সৃষ্টিতে খোঁজ, খোঁজ নিত্য স্থিতিতে,
যাহারে খুঁজিছ পরম বিরহে, খুঁজিছ পরম প্রীতিতে,
যে অপরূপা পূর্ণা হইয়া আজিও এল না বাহিরে
পাইয়া যাহারে বলিছ, এ নয়, হেথা নয় সে তো নাহি রে।
সেই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা তব চির-সঙ্গিনী বালিকা
অনন্ত প্রেমরূপে অনন্ত ভুবনে গাঁথিছে মালিকা।
ভীরু সে কিশোরী তব অন্তরে অন্তরতম কোণে
হারাবার ভয়ে তোমারে, লুকায়ে রহে সদা নিরজনে।
সকলেরে দেখ, আপনারে শুধু দেখ না পরম উদাসীন,
দেখিলে, দেখিতে যেখানে তুমি, সেইখানে সে যে আছে লীন!
যত কাঁদে, তত বুকে বাঁধে তোমারেই অন্তর্যামী!
সে কি আমি? সে কি আমি?

ওগো প্রিয়তম! যত ধরি আমি দু-হাতে তোমারে জড়ায়ে
আমারে খুঁজিতে আমারেই তত সৃষ্টিতে দাও ছড়ায়ে।
আমারে যতই প্রকাশিতে চাহ বাহিরে ভুবনে আনিয়া,
তত লুকাইতে চাহি ; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া।
হে মোর পরম মনোহর! তব প্রিয়া বলে দিতে পরিচয়,
ক্ষমা করো, যদি অপূর্ণা এই বালিকার মনে জাগে ভয়!
আমার কলহ মান-অভিমান তোমার সহিত গোপনে,
জাগ্রত দিনে আজও লাজ লাগে, তাই মিলি আমি স্বপনে।
ওগো ও পরম নিলাজ, পরম নিরাবরণ, হে চঞ্চল,
আমারে ধরিতে, টানিয়া চলেছ সৃষ্টিতে মোর অঞ্চল।
আমারে কাঁদাতে সকলের সাথে দেখাও মিলন-অভিনয়,
বাহিরে এনো না, কাঁদিব বক্ষে, রেখো এ মিনতি প্রেমময়।
যদি ভালো তুমি বাস অপরেরে, হে পর-পুরুষ সুন্দর,
আমি আছি, আমি রব চিরকাল জুড়িয়া তোমার অন্তর।
আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে-মরতে।
কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
দুই হয়ে তব রটে অপযশ, একাকী তো বেশ ছিলে হে।
তব সুন্দর-ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে—
কেন আসক্ত হলে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে?
রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুকে জাগে,
এত রূপ রসে ঝরিয়া পড়িছ বলো কার অনুরাগে?
খেলা-শেষে মহাপ্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি
জানাবে পরম-পতি আমারে কি —
আমি, প্রিয়, সে যে আমি!

অভেদম্

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ!
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলই রচিছে মায়া!
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কীরূপে সতত রত অনন্ত কাজে।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা

বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল-সন্ধ্যা বেলা।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে 'পরম-আমি'রে শত বন্ধনে বাঁধি।
মোরে 'আমি' ভেবে তারে স্বামী বলি দিবাযামী নামি উঠি,
কভু দেখি — আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।

একাকী হইয়া একা-একা খেলি, চুপ করে বসে থাকি।
ভালো নাহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়িরে কাছে ডাকি!
সৃষ্টির ঘুড়ি উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায়ে পড়েছে কখন পায়ের কাছে।
বীজ রূপে রই — নিজ রূপ কই? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায়ে পড়েছি — এ কী!
শাখাপ্রশাখায় পল্লবে-ফুলে ফলে-মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে!
কত সে বিহগ-বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,
উর্ধ্বে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড়।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্ত রূপ ধরি
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি।

চিব-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
হেরি কত শত ছন্দপতন অপূর্ণতা বিরাজে।
চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল।
মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়,
আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি-লয়,
একটি পলক আঁধারে হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি,
মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততটুকু হয় দেরি!
মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরকভোগ,
অমৃতে সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্ম-যোগ!
মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী ও পুত্র আদি,
কেবলই মিলন লাগে নাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি।

কেবল শান্তি শ্রান্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি পরে টানি শত কর্মের ঘানি।
রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
যারে 'তুমি' বল, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি।
সংসারে আসি সং সেজে আমি — শত প্রিয়জন লয়ে,

আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।
যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
অমৃত-মধু মদ হয়ে উঠে তৃষ্ণার পিয়ালায়!
বন্ধু! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণরূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে!
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার — এই তিন রূপই যাঁর লীলা,
সেই সাগরের আমি যে ঊর্মি, বিরহিণী ঊর্মিলা!

দুখ শোক ব্যাধি নিজে লই সাধি, — কখনও অত্যাচারী
অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই — পুন দেবতা সাজিয়া মারি!
বিদ্বেষ নাই, আসক্তিহীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে
অসাম্য করি সৃজন — আবার সংহার করি ওকে।
খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়া
শ্রী ও সামঞ্জস্যবিহীন এ কী কুৎসিত ছায়া!
সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনই বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি — নাই সেথা ভেদ নাই।
নাই সেথা যশ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা-হিংসা, সেখানে কেবল পরম সাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, 'অভেদম্' তার নাম।

অভয়-সুন্দর

কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণিতে —
হে পরম সুন্দরের পূজারি! হবে তাহা বিনাশিতে।
তব প্রোজ্জ্বল প্রাণের বহ্নিশিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য-শক্তি লয়ে আসে বারে বারে।
যৌবনের এ ধর্ম বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা।
যৌবনের সে ধর্ম হারায়ে বিধর্মী তরুণেরা —
হেরিতেছি আজ ভারতে — রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা।

যুগে যুগে জরাগ্রস্ত যযাতি তারই পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজপথে

হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌব-শক্তি-রথে।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্তবিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে — আমি আঁখিজলে ভাসি।
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলে না হায় তারে
শিবের স্কন্ধে শব চড়াইয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে।

এই কি তরুণ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা?
ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর কাছে কি শক্তি মানিবে হার?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার?
ঐরাবতেরে চালায মাহুত শুধু বুদ্ধির ছলে —
হে তরুণ, তুমি জান কি হস্তী-মূর্খ কাহারে বলে?
অপরিমাণ শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তিহীন —
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ুক্ষীণ।

পেয়ে ভগবদ্-শক্তি যাহারা চিনিতে পারে না তারে
তাহাদের গতি চিরদিন ওই তমসার কারাগারে।
কোন লোভে, কোন মোহে তোমাদের এই নিম্নগ গতি?
চাকুবির মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ্-জ্যোতি?
সংসারে আজও প্রবেশ করনি, তবু সংসার-মায়া
গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া।
শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা!
চেন কি — সূর্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা?

চাকুরি করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ?
তাই হইয়াছে নুড়ো-মুখ যত বুড়োর তলপিবাহ?
চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল?
অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল!
হউক সে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট কি মন্ত্রী কমিশনার —
স্বর্ণের গলাবন্ধ পরুক — সারমেয় নাম তার!
দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে —
যৌবন শুধু খোলস তাহার — ভিতরে জরারে বহে।

নাকের বদলে নরুন-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই —
আজাদ-মুক্ত-স্বাধীনচিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারি, সুবিধা-শিকারি নহে যে যুবা
তারই জয়গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।
তাহারই চরণধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি

শক্তিসাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পাণি।
মহা-ভিক্ষু তাহাদেরই লাগি তপস্যা করি আজও
তাহাদেরই লাগি হাঁকি নিশিদিন — 'বাজো রে শিঙ্গা বাজো!'

সমাধির গিরিগহ্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি —
তাহাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহি!
মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে —
'মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি' বলে চাহি তার মুখে।
জ্যোতি আছে, হায় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে —
কবরে 'সবর'[১] করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে!
কারে চাই আমি কী যে চাই হায় বুঝে না উহারা কেহ।
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ।

কোথা গৃহহারা, স্নেহহারা ওরে ছন্নছাড়ার দল —
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল।
পিছনে চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা তো আসে না জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি!
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্যদৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ — আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে —
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার — তাহার ভরসা মিছে!

আমি যদি মরি সমুখ-সমরে — তবু যারা টলিবে না —
যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে — সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো — অরুণ সূর্য দেখিব গোরে!
প্রতীক্ষারত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।
ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে — সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন — হাঁকিব সেদিন — 'সময় হয়েছে, চল!'

আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে —
সেই সে অগ্রপথিকের দল এসো এসো পথতলে!
সেদিন মৌন সমাধিমগ্ন ইসরাফিলের বাঁশি
বাজিয়া উঠিবে — টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী!

---

১ ধৈর্য।

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

চরণারবিন্দে লহো অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।
হে কবিসম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হইনি আজও করুণাবঞ্চিত!
সঞ্চিত যে আছে আজও স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি!
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতুসম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস!
দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নিদগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা!
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাঋষি,
তোমারই বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু!
আগুনের ফুলকি হল ফাগুনের ফুল,
অগ্নি-বীণা হল ব্রজকিশোরের বেণু।
শিব-শিরে শশিলেখা হল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।

বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল, কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাব না তাহার,
মৃৎভাণ্ড মাপিবে কি সাগরের জল?
যতদিন রবে রবি, রবে সৌরলোক,
হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মিলেখা
দিব্যজ্যোতিঃপুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল!
ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন,

ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর
ঝংকারিবে যতদিন বৃষ্টিধারাসম
ততদিন মধুচ্ছন্দা করি, ছন্দ তব
লীলায়িত হবে মধুমতী-স্রোত সম।
বিহগের কণ্ঠে গীতি রবে যতদিন,
যতদিন রবে সুর দখিনা পবনে,
হিল্লোলিত সিন্ধুজলে ঝরনা-তটিনীতে,
বহিবে বিরহী-বুকে রোদন-প্রবাহ —
ততদিন তব গান তব সুর কবি
মর্ম্মরিবে মরমির মরমে মরমে!
মৌনা যদি কোনোদিন হয় বীণাপাণি
তব বীণা কবি কভু হবে না নীরব।
যেমন ছড়ান রশ্মি সূর্য-নারায়ণ
সেই রশ্মি রূপ নেয় শত শত রঙে
পল্লবে ও ফুলে ফলে জলে স্থলে ব্যোমে,
তেমনই দেখেছি আমি বিমুগ্ধ নয়নে
অপরূপ রাগ-রেখা তোমার লেখায়, —
মুরছিত হইয়াছে আবেশে এ তনু।

দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস!
মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
কত সে উদার কত নির্ম্মল মধুর
কত প্রিয়-ঘন প্রেমরসসিক্ত তনু
কত সে সুন্দর হতে পারে সর্ব্বরূপে
তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি!
যখনই কবিতা তব পড়িয়াছি আমি
তার আস্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন।
তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির-রূপ-রসবিলাসীরে!
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও শুনি সে চির-কিশোর

তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর!

শুনি আজও কত শত পাথরের ঢেলা
তোমারে নিষ্ঠুর বলে, বলে — প্রেম নাই।
মেঘের হুংকার শুধু শুনিল তাহারা,
দেখিল না রসধারা, দেখিল বিদ্যুৎ!
এ বিশ্বে অনন্ত রস ঝরে অনুক্ষণ
কত জন পাইয়াছে সে রসের স্বাদ?
সেই রসে তরুলতা হয় ফুলময়,
পাথরের নুড়ি বলে, পৃথিবী নীরস।

হে প্রেম-সুন্দর মম, আমি নাহি জানি
কে কত পেয়েছে তব প্রেম-রসধারা।
আমি জানি, তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে, দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ।
মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন,
'তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হলে পুচ্ছ-কেতু?'
হাসিয়া কহিলে পরে, 'এই যশ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সাধ্য নেশার মতন।
এ মজা না পেলে মন ম্যাজম্যাজ করে
মধুর ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?'

যে বহ্নিতরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হল চন্দ্র-জ্যোতি।
মনে হল তুমি সেই নওলকিশোর
ঐশ্বর্য কাড়িয়া যিনি দেন শুধু রস।
যাঁহার বেণুর সুরে আঁখির পলকে
প্রেমে বিগলিত হয় স্বর্ণ-বৃন্দাবন!

হে রসশেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নব জন্মকথা!
আনন্দসুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নিগিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে

ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা!
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি!
দ্রষ্টা তুমি দেখিতেছ আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণঘনরূপে!
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে!

আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি!
প্রস্ফুটিত সে কমল তব জন্মদিনে
সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহো কৃপা করি
জানি না জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন লোকে!
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল!

কিশোর রবি

হে চিরকিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন রসলোক হতে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে?
কোন সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে।
কত যে কথায় কাহিনিতে গানে সুরে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুন্দরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চিরকিশোর সে প্রেমময়।
নিত্য কিশোর আত্মার তুমি অন্ধ বিবর হতে
হে অভয়দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর পথে।

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তারাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা
ওগো ও পরম কিশোরের সখা, জানি তুমি দিতে পার
নিত্য অভয়, অনন্ত শ্রী, দিব্য শক্তি আরও।
কোথা সে কৃপণ বিধাতার মধু-রসভাণ্ডার আছে

তুমি জান তাহা, তাহার গোপন চাবি আছে তব কাছে।
ওগো ও পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে দিয়ে যাও হেথা সবই।
যারা জড়, যারা নুড়ির মতন নিত্য রসপ্রবাহে
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে।
এই ক্ষুধাতুর, উপবাসী চির-নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য-ভীতির গুহা হতে আনো আনন্দ-নন্দনে।
ঊর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান
নিম্নের যারা, তাদের এবার করো গো পরিত্রাণ।
মরে আছে যারা তারা আজ তব অমৃত নাহি পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে এদের ঘুম যেন টুটে যায়।
শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষাণ বজ্র তোমার করে।

ওগো ও পরম রুদ্র কিশোর! তোমার যাবার আগে
নির্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহ্নিরাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে! অসুরের ভীতি যেন চলে যায়।
ওগো সংহার-সুন্দর, পরো প্রলয়-নূপুর পায়!
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝরে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া করো দয়া করো বলি বারে বারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক, হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমারে নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে, জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈত্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন,
খেলুক সর্ব-অভাবমুক্ত হয়ে ব্রজে নিশিদিন।
হউক শান্তিনিকেতন এই অশান্তিময় ধরা,
চিরতরে দূর হোক তব বরে নিরাশা-ক্লৈব্য-জরা।

কেন জাগাইলি তোরা

কেন ডাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা?
এখনও অরুণ হয়নি উদয়, তিমিররাত্রি ঘোরা!
কেন জাগাইলি তোরা?
যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিনু ঘুমাইয়া
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া —
দিগদিগন্তে প্রসারিয়া শাখা? বাঁধেনি সেথায় নীড়,
প্রাণ-চঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড়?
যেখানে ছিল রে যত বন্ধন যত বাধা ভয় ভীতি
সেখানে তোদেরে লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি।
ভাঙিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি —
সেই জড়ত্ব-ভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি —
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি, — আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙিবি তাহারে সে কোন শুভক্ষণে॥

মহা সমাধির দিকহারা লোকে জানি না কোথায় ছিনু
আমারে খুঁজিতে সহসা সে কোন শক্তিরে পরশিনু —
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ —
যে শক্তি লভি এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ —
তারই মাঝে কেন ঢাক-ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম? চাঁদ যে এখনও ওঠেনি নীল আকাশে।
ওরে তোরা থাম! শক্তি কাহারও নহে রে ইচ্ছাধীন —
রাত না পোহাতে চিৎকার করি আনিবি কি তোরা দিন?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা — তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক-ঢোল নিয়ে নেচে?

সূর্য-উদয় দেখেছিস কেউ — শান্ত প্রভাত বেলা?
উদার নীরব উদয় তাহার — নাই মাতামাতি খেলা;
তত শান্ত সে — যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
তত সে পরম মৌনী যত সে পেয়েছে পরম অভয়!
দিকহারা ওই আকাশের পানে দেখ দেখ তোরা চেয়ে,
কেমন শান্ত ধ্রুব হয়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে।
ওই আকাশের প্রসাদে যে তোরা পাস বৃষ্টির জল
ওই আকাশেই ওঠে ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্মল।
ওই আকাশেই ঝড় ওঠে — তবু শান্ত সে চিরদিন —

ওই আকাশের বুক চিরে আসে — বজ্র
ওই আকাশেই তকবির[১] ওঠে — মহা আজানের ধ্বনি
ওই আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনি।
জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল!
তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতি,
পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি।
'মাহে রমজান'[২] এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর',[৩]
নামিবে তাঁহার রহমত[৪] এই ধূলির ধরার পর।
এই উপবাসী আত্মা — এই যে উপবাসী জনগণ,
চিরকাল রোজা রাখিবে না — আসে শুভ 'এফতার'[৫] ক্ষণ!

আমি দেখিয়াছি — আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ, —
ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে কাঁদ।
আমি নয় ওরে আমি নয় — 'তিনি' যদি চান ওরে তবে
সূর্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে।

দুর্বার যৌবন

ওরে অশান্ত দুর্বার যৌবন!
পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ?
ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে
উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে।
ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,
গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে!
ওরে দুরন্ত! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল?
দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল?
ওরে নির্ভীক! ভিখ-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে —
আঁধার নিঙাড়ি আলো আনিত যে — সে রহিল বাঁধা নীড়ে!
যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল হাওয়া,
যাহাদের প্রাণ শক্তিবিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া
তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রুখে?
মরুর সিংহ মার খায় সার্কাসি পিঞ্জরে ঢুকে।

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,

১ আল্লার মহিমা ঘোষণা। ২ রমজান মাস। ৩ সম্মানিত রাত্রি। ৪ করুণা, আশীর্বাদ। ৫ রোজা দিনান্তে আহার।

যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয়।
কাঠ না পুড়ায়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন অজ্ঞান?
বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ!
তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে
রণজয়ী হবে দম্ভবিহীন বৈদান্তিকী ছলে!
প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খরস্রোতা নদী
ভেঙেছে দু-কূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি।
জলধির মহা-তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদীস্রোতে,
সে কি দেখে, তার স্রোতে কে ডুবিল, কে মারিল তার পথে?
মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তিপ্রবাহ ধায়
আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায়।
জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম তার
দেখে না তাহার প্রাণতরঙ্গে ডুবিল তরণি কার।
বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা বলে সিন্ধু-ঢেউ
শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে — শুনিয়াছ কভু কেউ।
ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে বলে?
ঘর পোড়ে বলে প্রবল বহ্নিশিখা উঠিবে না জ্বলে?
অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবি যৌবন,
ভাঙা চাল দেখে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ?
যৌবন কেনা-বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিক্তিতে?
মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাক্টের চুক্তিতে?
তবু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবে না বৈশাখী!
ভীরু মেষ-শিশু ভয় পায় বলে রবে না ঈগল পাখি?

জ্ঞান ও শান্তি সংযম — বহু উর্ধ্বের কথা দাদা,
কহে নির্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা!
যে মহাশান্তি উদার-মুক্ত আকাশের তলে রহে,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারই কথা কহে।
অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিয়ো তায়;
ওঠে তরঙ্গ অতি প্রবল যে বিরাট সাগরজলে
সেই উদ্‌বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে?
ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি?
সংযমী বলে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি।

জাগো দুর্মদ যৌবন! এসো, তুফান যেমন আসে,

সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
বুক ফুলাইয়া দুখেরে জড়াও, হাসো প্রাণখোলা হাসি,
স্বাধীনতা পরে হবে — আগে গাও 'তাজা ব-তাজা'র বাঁশি।
বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা!
খোলো অর্গল পাষাণের, খুশি বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড়ো অকারণে, ওঠো দূর গিরিচূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে!
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বন্ধ সংস্কার
মরিচা ধরিয়া পড়ে আছ সব আলির জুলফিকার[১]!
জাগো উন্মদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাই-বা স্বাধীন হল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।

আর কতদিন?

আমার দিলের নিদ-মহলায় আর কতদিন, সাকি,
শারাব পিয়ায়ে, জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম আসিবে নাকি?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে,
গ্রহতারা মোর সেহেলিরা[২] নিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদের চেরাগ[৩] ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশনাই'[৪]।
শিরাজি পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আন্দেশা[৫]।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিনি, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফিরখানা ভুলায়ে আনিলে কোন এই মঞ্জিলে?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তসবির[৬],
'তসবি'তে[৭] জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর!
'তশবিহি'[৮] রূপ এই যদি তাঁর, 'তনজিহি'[৯] কীবা হয়,

১ তরবারি। ২ সহচরী। ৩ প্রদীপ। ৪ প্রেম, প্রণয়। ৫ শঙ্কা, সন্দেহ। ৬ অঙ্কিত চিত্র।
৭ জপমালা। ৮ চিত্রিত রূপ। ৯ আসল, প্রকৃত।

নামে যাঁর এত মধুর ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক-রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতি দুলে উঠে কুতুহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিঝঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হতে যেন লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি জুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।

শিস দেয় দধিয়াল বুলবুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী।
নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রুজলে,
তসবির তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে!
সাকি গো! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
'আল-ওদুদের'[১] পিয়ালার দৌর[২] চলুক বিরাম-হীন।
গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
চালাও শিরাজি, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী[৩] হতে
দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর[৪]-ধারী?
আমারই মতো কি ওরই ডাকে মুসা হল মরু-পথচারী?
উহারই পরম রূপ দেখে ইশা হল না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ ওরই লাগি কি চির-ভিখারি?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতি যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকি, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের[৫] কওসর[৬] বলে আমারে জহর দিলি?

জান সাকি, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক'[৭] বলিল, না, জানি না তো আমি, 'আব'[৮] বুঝি তাহা জানে,
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোনখানে?
আমার বুকের তসবির দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল।
আগুন হয়তো তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ-আবরণ ছিঁড়ে।
হেরিনু সূর্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আশমানে ছুটে,
সহসা বঁধুর তসবির হেরে আমার বক্ষ-পুটে।
বলিল, কোথায় দেখেছ ইহারে, হইয়াছে পরিচয়?

১ আল্লাহ্‌র গুণাবলি। ২ পরিক্রমা। ৩ আত্মবিস্মৃতি। ৪ তুর বা সিনাই পর্বতের নাম ৫। জলধারা।
৬ অমৃত। ৭ মাটি। ৮ জল।

ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হল মোর ক্ষয়।
যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিল না এই জ্বালা।
ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুকে জ্বলে হয়ে তেজোমালা।

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশাস ফেলি
খুঁজিতেছে কারে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি।
মোর বুকে দেখে তসবির এল ছুটিযা ঝড়ের বেগে,
বলে — অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরই লেগে।
খুঁজিযা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তসবির-শিশা?
হাসিয়া উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী?
বাণীর সাগর কত অনন্ত হল যেন কানাকানি!
'নাহি জানি নাহি জানি' বলে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন!...
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কে যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

'ও কি জৈতুনি রওগন[১], ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরজনে?'
শুধানু তাহারে; নিষ্ঠুর মোর দিল নাকো উত্তর?
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাঁপিতেছে থরথর!...

জোহরা-সেতারা[২] উঠেছে কি পুবে? জেগে উঠেছে কি পাখি?
সুরাব সুরাহি ভেঙে ফেলো সাকি, আর নিশি নাই বাকি।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোররাক[৩]
ওই শোনো পুব-তোরণে তাহার রঙিন নীরব ডাক!

ওঠ রে চাষি

চাষি রে! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি কই?
তোর খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,

১ জলপাই-তেল। ২ শুকতারা। ৩ পক্ষীরাজ।

তোর মাঠের ধানে সোনা রং-এর বান যেন যায় বয়ে,
সে পাট ওঠে কোন লাটে ?
সে ধান ওঠে কোন হাটে ?
উঠানে তোর শূন্য মরাই মরার মতন পড়ে —
স্বামীহারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে।
তোর গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুন লঙ্কা মাগে ?
তোর তরকারিতেও সরকারি কোন ট্যাক্স বুঝি বসে !
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষুজলের রসে ?
তোর গাইগুলোকে নিঙড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই ?
তোর দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন — হায়, তাও নাই !

তোর ছোটো খোকার জুড়িয়েছে জ্বর ঘুমিয়ে গোরস্তানে,
সে দিদির আঁচল ধরে বুঝি গোরের পানে টানে।
বিকার-ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোটো ভায়ে,
দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে।
কবর দিয়ে সবর[১] করে লাঙল নিয়ে কাঁধে,
মাঠের কাদাপথে যেতে আব্বা তাহার কাঁদে।
চারদিকে তার মাঠ-ভরা ধান আকাশ-ভরা খুশি,
লাল হয়েছে দিগন্ত আজ চাষার রক্ত শুষি !
মাঠে মাঠে ধান থই থই, পণ্যে ভরা হাট,
ঘাটে ঘাটে নৌকা-বোঝাই তারই মাঠের পাট।

কে খায় এই মাঠের ফসল, কোন সে পঙ্গপাল ?
আনন্দের এই হাটে কেন তাহার হাড়ির হাল ?
কেন তাহার ঘরের খোকা গোরের বুকে যায় ?
গোঠে গোঠে চরে ধেনু, দুধ নাহি সে পায় !
ওরে চাষা ! বাঁচার আশা গেছে অনেক আগে
গোরের পাশের ঘরে কাঁদা আজও ভালো লাগে ?
জাগে না কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর ?
চোখ বুজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর ?
বাঁশের লাঠি পাঁচনি তোর, তাও কি হাতে নাই ?
না থাক তোর দেহে রক্ত, হাড় কটা তোর চাই।
তোর হাঁড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
তোর রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত —

---

১ সহ্য।

তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তোদেরই এই হাড়
তোর পাঁজরার ওই হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার।
তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজি দেন মেঘ,
তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে,
আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে?
তেমনি আকাশ ফর্সা আছে, ভরসা শুধু নাই,
তেমনি খোদার রহম[১] ঝরে, আমরা নাহি পাই।
হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল!

মোবারকবাদ

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এসো গুল-মজলিশে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব — তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত—
সাজাইতে ওই মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মতো।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিয়ো, বেহেশ্‌ত এনো দুনিয়ার মহফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিকো বিশ্বাস,
ইমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানি নিশ্বাস!
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনও বৃহতের অনুরাগ!

শহিদি-দর্জা[২] চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামি, জাবর কেটেছি গোলামখানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা করো ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছোঁয়া জীবনে না লাগে।
গোলামির চেয়ে শহিদি-দর্জা অনেক ঊর্ধ্বে জেনো;
চাপরাশির ওই তকমার চেয়ে তলোয়ারে বড়ো মেনো!
আল্লার কাছে কখনও চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিয়ো না নিচু!
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না, বলো,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল!
আল্লারে বলো, 'দুনিয়ায় যারা বড়ো, তার মতো করো,

১ করুণা। ২ শহিদের মর্যাদা।

কাহাকেও হাত ধরিতে দিয়ো না, তুমি শুধু হাত ধরো।
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে কোরো না কারেও ভয়
দেখিবে — অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ংকর সে নয়!
আল্লারে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো!
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লারে ধরে থেকো!

খোদাব বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুলবুল!
গোলামের ফুলদানিতে যদি এ মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয়!
যে ছেলেমেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদমুক্ত রহে,
তাহাদেরই শুধু এক আল্লার বান্দা ও বাঁদি কহে!
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ!
শুধু আরশের আতরদানিতে যাহাদের হয় ঠাঁই,
তোমাদের এই মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই!

সেই মুকুলেরা এসো মহফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাংলায় তোমরা আনিয়ো মুক্তির আরফাত[১]।

কৃষকের ঈদ

বেলাল[২]! বেলাল! হেলাল[৩] উঠেছে পশ্চিম আশমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গোরস্তানে!
হেরো ঈদগাহে[৪] চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গোরুর পাল?
রোজা এফতার[৫] করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়,
বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায়!
থালা ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে হেরো চলিয়াছে ঈদগাহে,
তির-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড়?
আশমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে

১ মক্কার বারো মাইল পূর্বে বিশাল ময়দান। ২। ইসলামের প্রথম আজান প্রদানকারী। ৩ নতুন চাঁদ। ৪ ঈদের নামাজ পড়ার ময়দান। ৫ রোজা-দিনান্তে আহার।

এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর-পুটে।
কৃষকের ঈদ! ঈদগাহে চলে জানাজা[১] পড়িতে তার,
যত তকবির[২] শোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার!
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশেপাশে।
কোথায় ইমাম? কোন সে খোৎবা[৩] পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারিদিকে তব মুর্দার লাশ, তারই মাঝে চোখে বিঁধে
জরির পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা?
নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনও দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বলো বুকে।
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি?
ফল বহিয়াছ, পাওনিকো রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝরনায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি!

আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান?
শক্তি পেল না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান!
ইমান! ইমান! বলো রাতদিন, ইমান কি এত সোজা?
ইমানদার[৪] হইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা?
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ইমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আশমান!
আল্লার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিকো আল্লারে।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে?
নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে?
মধু দেবে সে কি মানুষ, যাহার মধু নাই মৌচাকে?

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তিহীন
হয়েছে ইমাম, তাহারই খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন!
দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাকিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুন ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আশমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,

১ মৃতের সদ্গতির জন্য পঠিত নামাজ। ২ 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি। ৩ নামাজের আগে বা পরে ইমাম প্রদত্ত ভাষণ। ৪ ধর্মবিশ্বাসী।

ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনও হবে না বাসি!
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে?
রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে।

শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূমপুঞ্জ বিদারণ করি
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শর্বরী?
কোথা সে অনাগত সাগ্নিক পুরোধা
নির্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদমন্ত্র দানিবে আহুতি,
নব নব প্রাণের সমিধ কে জোগাবে সেথা?

হায় রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার!
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদগব
দেখায়ে গলিত-মাংস চাকুরির মোহ
যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে।
যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতে জনগণপতি!

যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়! — রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু-হাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?

যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধ-প্রাণ জরা?
নহিলে এ সিন্ধবাদ কেমন করিয়া
ফিরিতেছে যৌবনের স্কন্ধে চড়ি আজও

অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভুত
অতীত কি বর্তমানে এখনও শাসিবে?
এই ভূতগ্রস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু, পাইবে স্বরাজ!

রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি!
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে দুর্মদ দুর্বার
সে আজি অতীত পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলই পিছনে চলে, নেতার আদেশে।
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা!

তোমাদেরই মাঝে আছে নেতা তোমাদের,
তোমাদেরই বুকে জাগে নিত্য ভগবান,
ভয়হীন, দ্বিধাহীন, মৃত্যুহীন তিনি!
তোমারে আধার করি সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহো আঁখি খুলি
আপনার মাঝে দেখো আপন স্বরূপ!

অতীতের দাসত্ব ভোলো! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা।
তোমাদেরই মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
ঊর্ধ্ব হতে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি,
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ।

তোমাদের প্রাণের এ অনির্বাণ-শিখা
যৌবনের হোমকুণ্ড-পাশে বৃদ্ধ বসি,
আগুন পোহাবে, বন্ধু, এ দৃশ্য দেখিতে
যেন নাহি বাঁচি আর। সমাধি হইতে
আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে!

আজাদ

কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে 'আরিফ'[১], কোথা সে ইমাম[২], কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সে তৌহিদ[৩]-সুধা পরমামৃত হায়?
যাহাবে হেরিয়া পরান পরম শান্তিতে ডুবে যায়।
আছে সে কোরান-মজিদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস কেউ তোরা?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও, আজও সে কলমা আছে,
আজও উথলায় আব-জমজম কাবা-শরিফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হতেছিস দলে দলে তোরা কতল-গাহেতে[৪] জবেহ্[৫]?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের[৬] পির, নেতা; কেন হয় হেন?
আজিও তেমনই জামায়েত হয় ঈদগাহে মসজিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল, শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিকো ইমাম, বলিতে হইবে — ইহারা মুসলেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি? কোন সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মতো মরিতে পারে না তবু?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা,—
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহাল না বিভাবরী!
আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই — দেখেছ তাহারে ভাই?
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিধর,
এই মুসলিম-কবরস্তানে পেয়েছ তার খবর?
চায় নাকো যশ, চায় নাকো মান, নিত্য নিরভিমান,

১ বিজ্ঞ, সাত্ত্বিক ব্যক্তি। ২ ধর্মগুরু। ৩ একেশ্বর তত্ত্ব। ৪ বধ্যভূমিতে। ৫ জবাই, হত্যা। ৬ জাতি বা সম্প্রদায়।

নিরহংকার আসক্তিহীন — সত্য যাহার প্রাণ ;
জমায় না যে বিত্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আশমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমিন ;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম — প্রেমের অশ্রুধারা ?

যার পানে চায় — সেই যেন পায় তখনই অমৃত বারি,
যাহারে ডাকে — সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি ?
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সঞ্চারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভরে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান, সে পূর্ণ শক্তিধর,
'উম্মি'[১] হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর !
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলই অন্ধ বন্ধ জীব,
ভোগোন্মত্ত, পঙ্গু, খঞ্জ, আতুর, বদ-নসিব।
কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শ্মশ্রু ছিঁড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত-সাগরতীরে
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হতে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-স্রোতে—
কোন তপস্বী করিছে সাধনা ? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙাবে জাতির ভ্রম ?
দোজখের[২] পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দু-হাত, 'পাইয়াছি' বলে তবু করে মাতামাতি !

সেদিন এমনই মাতালের সাথে পথে মোর হল দেখা,
শুধানু, 'কী পেলে ?' সে বলে, দেখো না, কপালে রয়েছে লেখা ?'
কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
বাদশাহ হতে পারিত যে হায়, পেয়েছে সে জমাদারি !
দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
আজাদির চিন্ — অর্থাৎ কিনা চাকুরির মসিলেখা !
কাঁদিয়া কহিনু, — ওরে বে-নসিব, হতভাগ্যের দল,
মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?
অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনিকো দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
এল যে কোরান, এলেন যে নবি, ভুলিলি সে সব আজ ?
হায় গণ-নেতা ভোটের ভিখারি নিজের স্বার্থ তরে

১ মূর্খ। ২ নরক।

জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে।
সারা জাতি সারারাতি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে —
তাহাদের ধরে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি?
চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি!
উহারা তরুণ, জানে না উহারা, কেন লভিল এ জ্ঞান,
তপস্যা করি জাগাবে উহারা ভারত-গোরস্তান[১]!
ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
ওদেরই শৌর্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ।

তুমি চাকরির কশাইখানায় ঘুরিছ তাদেরে লয়ে,
তুমি কি জান না, ওখানে যে যায় — সে যায় জবেহ্[২] হয়ে?
দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙালির দুর্দশা,
মানুষ যে হত, চাকরি করিয়া হয়েছে সে আজ মশা।
ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধা তৃষ্ণায় জ্বলে —
সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশতলে।
আগুন যে বুকে আছে — তাতে আরও দুখ-ঘৃতাহুতি দাও,
বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক জালিম[৩]-পানে উধাও
যে ইস্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বঁটি করো তারে!
অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে
ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক?
কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড়োলোক।...

আজাদ-আত্মা! আজাদ-আত্মা! সাড়া দাও, দাও সাড়া!
এই গোলামির জিঞ্জির ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া!
হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজও?
ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিন্ধবাদের বাহন সাজ!
জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
জীবন ভরিয়া রোজা রাখি ঈদ আনিবে না অভিনব?
ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতা মাতা ভগ্নীরা চেয়ে আছে,
ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে।
ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলেমেয়ে দুধ নাহি পেয়ে হায়,
তোমরা তাদেরে বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায়?
আজ মুখ ফুটে দল বেঁধে বলো, বলো ধনীদের কাছে,

---

১ কবরস্থান, সমাধি। ২ ইসলামি মতে দোয়া পড়ে কণ্ঠনালি কেটে হত্যা। ৩ অত্যাচারী।

ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিস্‌সা আছে!
ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার; সঞ্চিত যার রয়,
সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয়।
মানুষেরে দিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার
ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার —
তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক — বেহেশ্‌ত-পার হতে,
আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে —
প্রস্তুত হও — আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে —
আল্লাহ্‌ থেকে আবে-কওসর[১] নবীন বার্তা বয়ে।
অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদমুক্ত যারা —
নব-জেহাদের নির্ভীক দুর্বার সেনা হবে তারা,
আমাদেরই আনা নিয়ামত[২] পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
জেহাদের রণে নওশা[৩] সাজিযা মোরা দিব হাততালি!
বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর?
বেহেশ্‌তে হবে তকবির ধ্বনি, আল্লাহু আকবর!
জিন্নাৎ[৪] হতে দেখিব মোদের গোরস্তানের পর
প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর।

ঈদের চাঁদ

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়িওয়ালা;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাতালা!
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়িওয়ালা, দেখো কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেব ঈদগাহে!
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয়;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে — অভিনব পরিচয়।
যে ইসরাফিল[৫] প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে[৬]—
তাঁরই ললাটের চাঁদ আসিয়াছে, আলো দেখাইতে পথে।

---

১ স্বর্গের ঝরনাবারি। ২ সৌভাগ্য, ধনসম্পদ। ৩ নবীন রাজা। ৪ স্বর্গ। ৫ আল্লাহ্‌র সেই দূত যার বিষাণের ফুৎকারে সমগ্র সৃষ্টি বিলুপ্ত হবে। ৬ মহাপ্রলয়ের দিনে।

মৃত্যু মোদের অগ্রনায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফিরদৌসের[১] দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহিদ।
আমাদের ঘিরে চলে বাংলার সেনারা নৌজোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রিশ্চান কি মুসলমান।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম[২] ভাই —
জুলুমের জিন্দানে[৩] জনগণে আজাদ করিতে চাই!
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন ধার্মিক বক?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধনরত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত[৪] আদায় করিব তাদের কাছে।
এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম?
যক্ষের মতো লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ।
তাঁরই ইচ্ছায় — ব্যাঙ্কের দিকে চেয়ো না — ঊর্ধ্বে চাহো,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ!
আল্লার ঋণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখো আকাশে ঈদের চাঁদ!
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কী রূপ ধরেছে, দেখো,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দেখে মনে রেখো!

প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
তাহাদেরই তরে এই রহমত[৫], ঈদের চাঁদের হাসি।
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদগাহে,
কাহার সাধ্য, কোন ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে?
ভেবো না ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার!
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,

১ স্বর্গবিশেষ। ২ উৎপীড়িত। ৩ কারাগার। ৪ শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী সঞ্চিত ধনসম্পদের দাতব্য অংশ। ৫ করুণা।

আবার খালেদ[১] এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে!
কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন!
দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করনি, লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আসগর মরিয়াছে, জান, এই বাপ মা-র বুকে?
সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে!
শহিদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আসগর, আব্বাস,
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস!
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত-সেনা,
সেবারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না।
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উম্মেদ[২]!
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি,
আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা মানুষের দাবি!
বাঁচিবে না আর বেশিদিন রাক্ষস লোভী বর্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে, আল্লাহু-আকবর!
সাত আশমান বিদারি আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে[৩] মারিয়া করিবেন মজলুমের[৪] প্রাপ্য শোধ।

চাঁদিনি রাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্‌বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
নীলিম-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখ[৫] নাজুক[৬] নেকাবে[৭] ঢাকা
দেখা যায় ওই নতুন চাঁদের কালোতে আবছা আঁকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানি,
'লায়লা'-সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি।
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারই
দিক্‌-চক্রের ছায়া-ঘন ওই সবুজ তরুর সারি।

সাতাশ-তারার ফুল-তোড় হাতে আকাশে নিশুতি রাতে

১ বীর সেনাপতি, যিনি ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত করেন। ২ নিরাশ। ৩ শত্রু। ৪ বঞ্চিত, নিপীড়িত। ৫ কুসুমের ন্যায় মুখ। ৬ কোমল, ভঙ্গুর। ৭ ঘোমটা, আবরণ।

গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
'উঁহু উঁহু' করি কাঁচা ঘুম হতে জেগে ওঠে নীলা হুরি,
লুকায়ে দেখে তা 'চোখ গেল' বলে হাসিছে পাপিয়া ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে, বুঝি বধূর নিশাস লাগে।

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি বিনিদ্র করে ফেরে পায়চারি।
সেহেলিরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন আশে,
'হেথা হোথা ছোটে, পিকের কণ্ঠে ফিক ফিক করে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কী
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে, সখী!
নবমী চাঁদের 'সংসারে' ও কে গো চাঁদিনি-শিরাজি ঢালি
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে, 'তহুরা পিয়ো লো আলি!'
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকি
চাঁদের সংসারে কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি!

মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মিড়,
ফরহাদ-শিরী[১] লায়লি-মজনু মগজে করেছে ভিড়!
ছুটিতেছে গাড়ি, ছায়াবাজি-সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে খ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে!
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন বিরহিণী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরই মিলন তাদেরই বিরহ বাজে।

আনমনা সাকি, শূন্য আমার হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখী লিখো মুছো ক্ষণে ক্ষণে।

১ পারসিক প্রেমিক ফরহাদ সুন্দরী শিরীর প্রেমে মত্ত হয়ে তাকে পাবার জন্য পাহাড় কেটে পথ করেছিলেন।

মরু-ভাস্কর

প্রথম প্রকাশ
১৩৫৭

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির তালিকা

প্রথম সর্গ

অবতরণিকা

অনাগত

অভ্যুদয়

স্বপ্ন

আলো-আঁধারি

দাদা

পরভৃত

দ্বিতীয় সর্গ

শৈশব-লীলা

প্রত্যাবর্তন

শাককুস সাদ্‌র

(হৃদয়-উন্মোচন)

সর্ব্বহারা

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর

সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ

শাদী মোবারক

খদিজা

সম্প্রদান

নও কাবা

সাম্যবাদী

প্রথম সর্গ

অবতরণিকা

জেগে ওঠ তুই রে ভোরের পাখি
নিশি-প্রভাতের কবি!
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ তুই, নূতন করিয়া
বেঁধে তোল তোর বীণ!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
আজান[১] মুয়াজ্জিন[২]।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ওই শোন শোন 'সালাতের'[৩] ধ্বনি
'খায়রুমমিনান্নৌম[৪]'!
রবি-শশী-গ্রহ-তারা ঝলমল
গগনাঙ্গানতলে
সাগর উর্মি-মঞ্জীর পায়ে
ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনি ধরার
নাচের ঘূর্ণি লাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে
শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি থমকি দাঁড়ায়
বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম ছাপিয়া উঠিল
অরুণ জ্যোতির জবা।
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল
জাগর পাখির গানে,
ভূলোক দ্যুলোক প্লাবিয়া গেল রে
আকুল আলোর বানে!
আরব ছাপিয়া উঠিল আবার
ব্যোমপথে 'দীন' 'দীন[৫]',

১ উপাসনার আহ্বানধ্বনি। ২ যে উপাসনার জন্য আহ্বান করে। ৩ উপাসনা। ৪ নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা ভালো। ৫ ধর্ম।

কাবার মিনারে আবার আসিল
নবীন মুয়াজ্জিন!
ওরে ওঠ তোরা, পশ্চিমে ওই
লোহিত সাগর জল
রঙে রঙে হল লোহিততর রে
লালে-লাল ঝলমল।
রঙ্গো ভঙ্গো কোটি তরঙ্গো
ইরানি দরিয়া ছুটে,
পূর্ব-সীমায়,— সালাম জানায়
আরব-চরণে লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে
শঙ্খ, আরতি ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য—
মানব-মুকুট-মণি।
উত্তরে চির-উদাসিনী মরু,
বালুকা-উত্তরীয়
উড়ায়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে—
'জাগো রে, অমৃত পিয়ো!'
লু হাওয়া বাজায় সারেঙ্গি বীণ
খেজুর পাতার তারে,
বালুর আবির ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে
স্বর্গে গগন-পারে।
খুশিতে বেদানা-ডালিম ডাঁসায়ে
ফাটিয়া পড়িছে ভুঁয়ে,
ঝরে রসধারা নারঙ্গি[১] শেউ[২]
আপেল আঙুর চুঁয়ে।
আরবি ঘোড়ারা রাশ নাহি মানে
আশমানে যাবে উঠি,
মরুর তরণি উটেরা আজিকে
সোজা পিঠে চলে ছুটি।
বয়ে যায় ঢল ধরে নাকো জল
আজি 'জমজম'[৩] কূপে,
'সাহারা' আজিকে উথলিয়া ওঠে
অতীত সাগর রূপে।

১ কমলালেবু। ২ একপ্রকার সুমিষ্ট ফল। ৩ মক্কার পবিত্র কূপ।

পুরাতন রবি উঠিল না আর
সেদিন লজ্জা পেয়ে,
নবীন রবির আলোকে সেদিন
বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।
চক্ষে সুরমা বক্ষে 'খোর্মা'[১]
বেদুইন কিশোরীরা
বিনি কিম্মতে[২] বিলাল সেদিন
অধর চিনির শিরা!
'ঈদ' উৎসব আসিল রে যেন
দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত 'দুশমনি' ছিল যথা নিল
'দোসতি' আসিয়া জিনে।

নহে আরবের, নহে এশিয়ার,—
বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হল গো
বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন!
ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ
কোটিদল কোকনদ,
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ —
'আসিল মোহাম্মদ!'
অভিনব নাম শুনিল রে
ধরা সেদিন —'মোহাম্মদ!'
এতদিন পরে এল ধরার
'প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ।'
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়
ইহুদি আর ইশাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে
সেই মসিহ্[৩] মহামানব?
'তওরাত'[৪] 'ইঞ্জিল'[৫] ভরি
শুনিল যাঁর আগমনি,
'ইশা' 'মুসা' আর 'দাউদ' যাঁর
শুনেছিল পা-র ধ্বনি,
সেই সুন্দর দুলাল আজ
আসিল কি নীরব পায়?

১ শুষ্ক খেজুর। ২ মূল্য। ৩ হজরত। ৪ বাইবেলের অন্তর্গত প্রথম পাঁচটি পর্ব। ৫ বাইবেলের অন্তখণ্ড।

যেমন নীরবে আসে তপন
পূর্ণ চাঁদ পুব-সীমায়।

এমনই করিয়া ওঠে রবি
ওঠে রে চাঁদ, ধরা তখন
এমনই করিয়া ঘুমায়ে রয়
রবি শশী হেরে স্বপন।

আলোকে আলোকে ছায় দিশি
নব অরুণ ভাঙে রে ঘুম,
তন্দ্রালু সব আঁখি-পাতায়
বন্ধুপ্রায় বুলায় চুম।

তেমনই মহিমা সেই বিভায়
আসিল আজ আলোর দূত,
ঝরনার সুরে পাখিরা গায়,
আতর গায় বয় মারুত।

শুষ্ক সাহারা এত সে যুগ
হেরেছে রে যার স্বপন,
বেহেশ্‌ত হতে নামিল ওই
সেই সুধার প্রস্রবণ।

খোর্মা খেজুরে মরু-কানন
ফলবতী হলুদ-রং
মরুর শিয়রে বাজে রে ওই
জলধারার মেঘ-মৃদং!

শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম —
'মোহাম্মদ' শুনে সে আজ
সেই সে নাম অবিশ্রাম
একী মধুর, একী আওয়াজ!

আঁধার বিশ্বে যবে প্রথম
হইল রে সূর্যোদয়
চেয়েছিল বুঝি সকল লোক
এই সে রূপ সবিস্ময়!

এমনই করিয়া নবারুণের
করিল কি নামকরণ,
সে আলোক-শিশু এমনই রে
হরি আঁধার হরিল মন!

এমনই সুখে রে সেই সেদিন
বিহগ সব গাহিল গান,
শাখায় প্রথম ফুটিল ফুল,
হল নিখিল শ্যামায়মান।

গুলে গুলে শাড়ি গুলবাহার
পরি সেদিন ধরণি মা
আঁধার সূতিকাবাস ত্যজি
হেরে প্রথম দিক্‌সীমা।

ফুলবন লুটি, খোশখবর
দিয়ে বেড়ায় চপল বায়,
'ওরে নদ নদী ওরে নির্ঝর
ছাড়ি পাহাড় ছুটিয়া আয়!

সাগর! শঙ্খ বাজা রে তোর,
আসিল ওই জ্যোতিষ্মান,
একী আনন্দ একী রে সুখ
এল আলোর একী এ বান!

ফুলের গন্ধ, পাখির গান
স্পর্শসুখ ভোর হাওয়ার,
জানিল বিশ্ব সেই সেদিন,
সেই প্রথম; আজ আবার
আঁধার নিখিলে এল আবার
আদি প্রাতের সে সম্পদ
নূতন সূর্য উদিল ওই—
মোহাম্মদ! মোহাম্মদ!

অনাগত

বিশ্ব তখনও ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন। তখনও বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে ; তখনও গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।
আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল — ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।
অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা,
ছিল নাকো সুখ দুখ আনন্দে সৃষ্টির আকুলতা।
ছিল না বাগান, ছিল বনমালী! — সহসা জাগিল সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।
অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যজি — কে বুঝিবে তাঁর লীলা —
বাহিরিয়া এল সৃষ্টি প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুলখেলার মানুষ সৃষ্টি-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর, সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব 'আদমে' সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, 'যাও, করো খেলা ওই ধরার আঙনে গিয়া!'
সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিল মানবদেহে,
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে, 'প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!'
আদমের মাঝে বারেবারে যায় বারেবারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, 'ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে — জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারই সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো
— মোহাম্মদ সে, দিনু তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো!'

মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহমাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি এ কোন জ্যোতি-পাথার।
বন্দনা করি সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
'অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!

কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?'
কহিলেন খোদা, 'এই সে জ্যোতির পুণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময়, সকল কলুষ-হরা
এই সে আলোর দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব — বন্ধু এ প্রিয়; মানব-ত্রাণের লাগি
ইহারে দিলাম তোমাতে — হইতে মানব-দুঃখ-ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।'
সিজদা[১] করিয়া খোদারে আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
'ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোনো ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ,
ধরার সকল ভয়েরে ইহারই পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিমময়!
মোর সাথে হল ধন্য পৃথিবী!' — মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, 'সাল্লাল্লাহু আলায়াহিসাল্লাম!'
ধরায় আসিল আদিম মানব-পিতা আদমের সাথ
'খোদার প্রেরিত', 'শেষ বাণী-বাহী' কাঁদাইয়া জান্নাত।

* * * *

শত শতাব্দী যুগযুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে নাহি-আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ্' ও 'নূহ্'[২] নবি —
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি!
চলে গেল 'ইশা', 'মুসা' ও 'দাউদ', ইব্রাহিম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম[৩]।
গেল 'সুলেমান[৪]', গেল 'ইউনুস[৫]', গেল 'ইউসুফ[৬] রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইসাহাক', 'ইয়াকুব', গেল 'জবীহুল্লাহ্ ইসমাইল'
খোদার আদেশ করি হাসিল।
এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়াল তুতী[৭] পাপিয়া পিক
বুলবুল শ্যামা; ভরিয়া দিক

১ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ২ আল্লাহ্‌র অন্যতম নবি। ৩ বাসস্থান। ৪ সুবিচারের জন্য বিশ্বখ্যাত সম্রাট।
৫ আল্লাহর অন্যতম নবি। ৬ আল্লাহর সুন্দরতম নবি। ৭ সু-স্বর পাখি বিশেষ।

যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান!
ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন 'ইশা'[১] অমর, মর্ত্যে 'খাজাখিজির'
— দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর —
ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপারে তাহারই আসার খোশখবর
যাহার আশায় এ-চরাচর
আছে তপস্যারত চিরদিন ; ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।
আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো উষায় পুরব-গগন-প্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তারে খুঁজিছে হায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন' পরি, হুর পাগলপ্রায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশতায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে, কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
খুঁজিছে তাহারে সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়!
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায়!
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়
বন্ধ-ছেদন নবি কোথায়!
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায়!
শাস্ত্র-আচার-জগদ্দল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায়!
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত ব্যাথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায়!
আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চিরসুন্দর, তুমি কোথায়!
বিশ্ব-প্রণব-ওংকার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায় —
তুমি কোথায়, তুমি কোথায়!

* * * *

১ আল্লাহ যে নবিকে জলরাশির আধিপত্র দান করেছিলেন।

ধেয়ান-স্তব্ধ বিশ্ব চমকি মেলে আঁখি —
আরবের মরু আজিকে পাগল হল নাকি?
খুঁজিছে যাহারে কোটি গ্রহ তারা চাঁদ তপন
মরু-মরীচিকা হেরিল কি আজ তার স্বপন?
পেল নাকো খুঁজে সকল দিশির দিশারি যার,
মরুর তপ্ত বালুতে পড়িল চরণ তাঁর!
রৌদ্র-দগ্ধ চির-তাপসিনী তনু-কঠিন
এরই তপস্যা করি কি আরব যাপিল দিন?
বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত ভাল
তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল
ইহার লাগি কি ছিল হতভাগি জাগিয়া রে,
বিশ্ব-মথন অমৃত ধন মাগিয়া রে!

* * * *

দশদিক ছাপি ওঠে আবাহন, 'ধন্য ধন্য মুত্তালিব[১] !'
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আবদুল্লাহ্[২] খোশ-নসিব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি নিখিল ভুবন করে স্তব।
ধন্য গো তুমি 'আমিনা' জননী কেমনে জঠরে ধরিলে তায়
যোগী মুনি ঋষি পয়গম্বর গেয়ানে যাহার সীমা না পায়!
ধন্য ধরণি-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাঁহারে, যে-জন ধরেনি ; অসীম শূন্যে গো
যাহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সে-জন, এও কি গো কভু সম্ভবে!
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া অস্তপাট!
পূর্বে সূর্য ওঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ওই,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল-শরণ চরণের লাগি তুই কি আরব এত সে দিন
তপস্যা করি করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন!
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবি গো তোমাতে আসিল নবির শেষ!

১ বিশ্বনবির পিতামহ। ২ হজরত মহম্মদের পিতা।

অভ্যুদয়

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে ?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তবু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে ?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে ?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মতো
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত ?
সূর্য ওঠার যবে দেরি নাই, বিহগেরা প্রায় জাগে,
তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে ?
কেন গো কে জানে, নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
অমাবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন !
পুণ্যের শুভ আলোক পড়িবে যবে শতধারে ফুটে
তার আগে কেন বসুমতী পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠে ?
ফুল ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে ?
এই কি নিয়ম ? এই কি নিয়তি ? নিখিল-জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে !

এমনই আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয়-রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশী-বিষ-ফণা তলে
ধরণির আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মানিকের মতো জ্বলে !
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ ; নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভীরু বালিকার সম !
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিততম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু !
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জমে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল !
ধরণি ভগ্ন তরণির প্রায় শূন্য-পাথারতলে
হাবুডুবু খায় বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা — এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ !

এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জজিরাতুল আরবে।'[১]
পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল নাকো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যভিচার-লীলা নির্লাজ নির্বেদ!
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস-রাতি।
জন্মিলে মেয়ে পিতা তারে লয়ে ফেলিতেন অন্ধকূপে
হত্যা করিত, কিংবা মারিত আছাড়ি পাষাণস্তূপে!
হায় রে, যাহারা স্বর্গেমর্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই হেতু!
সুন্দরে লয়ে অসুন্দরের এই লীলা তাণ্ডব
চলিতেছিল, এ দেহ ছিল শুধু শকুন-খাদ্য শব!
দেহ-সরসীর পাঁকের ঊর্ধ্বে সলিল সুনির্মল
— ত্যজিয়া তাহারে মেতেছিল পাঁকে বন্য-বরাহ দল!
চরণে দলিত কর্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর!

আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শিরনি খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত!
শয়তান ছিল বাদশাহ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা,
বিনি সুদে সেথা হতে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা!
সে পাপ-গন্ধে ছিঁড়িয়া যাইত যেন ধরণির স্নায়ু,
ভূমিকম্পে সে মোচড় খাইত যেন শেষ তার আয়ু!
এমনই আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম—
ঊর্ধ্বে উঠিল সংগীত, 'হল আসার সময় মম!'
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণি উঠিল গো উচ্ছ্বসি।
ছুটিয়া আসিল গ্রহ-তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশুচাঁদেরে পুলক লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে; পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় করে এল নিতে সুধার প্রসাদ!

ধরণির নীল আঁখি-যুগ যেন সায়রে শালুক সুঁদি
চাঁদেরে না হেরে ভাসিত গো জলে ছিল এতদিন মুদি,

---

১ আরব দ্বীপপুঞ্জ।

ফুটিল রে তারা অরুণ-আভায় আজ এতদিন পরে,
দুটি চোখে যেন প্রাণের সকল ব্যথা নিবেদন করে!
পুলকে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনি, 'মারহবা! মারহবা!'[১]

স্বপ্ন

প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা।
তেমনই হেরিছে স্বপ্ন আমিনা — যেদিন নিশীথ-শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাঁহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হতে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোসরা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে।
ইরান-অধীপ নওশেরোয়াঁর[২] প্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হয়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া। অগ্নিপূজা দেউল
বিরাণ[৩] হইয়া গেল গো ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি,
মূর্তিপূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি!
নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,
স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি,
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহশ্‌তি হুরপরি।
যত পশু-পাখি মানুষের মতো কহিল গো যেন কথা,
রোম-সম্রাট-কর হতে ক্রুস খসিয়া পড়িল হোথা,
হেঁটমুখ হয়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্তি যত,
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!
টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরি নাই, আগমনি গায় গুলবাগে বুলবুল।
কী এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব-চেতনা লয়ে,
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্যের মিহির লহর তোলে!
শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।

১ শাবাশ! ধন্য। ২ সাসানিয়া রাজবংশের বিখ্যাত নৃপতি। ৩ জনশূন্য।

ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজাল রে তার বাঁশুরিয়া আগমনি!
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে
ইহারই স্বপন জাগেরে নিখিল-চিত্ত-আকাশপটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি
ধরণির পথে অভিসার এর ছিল দিবা শর্বরী।
সাগর শুকায়ে হল মরুভূমি এরই তপস্যা লাগি,
মরু-যোগী হল খর্জুরতরু ইহারই আশায় জাগি।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝরনার ছলে।
খর্জুর-বনে এলাইয়া কেশ সিনানি সিন্ধুজলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!
'ফারাণের' পর্বত-চূড়াপানে ভাববাদী বিশ্বের
কর-সংকেতে দিল ইঙ্গিত ইহারই আগমনের।
সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হাসিল বিশ্বত্রাতা,
'সুয়োরানি' হল আজিকে যেন রে বসুমতী 'দুয়ো' মাতা।

'মারহাবা সৈয়দে মক্কি মদনি আল-আরবি'[১]!
গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্বকবি।
আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল অন্ধ গুহায় ওই পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল বন্যাধারায় 'দজলা'[২] 'ফোরাত'[৩] কন্যা মরুর,
সাহারায় নৌবতেরই বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব ছেড়ে
খেলিছে গেন্ডুয়া-খেল, রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেড়ে!
আরবের কুব্জা বঁধু উট ছেড়ে পথ সব্জা-খেতি
খুঁজিছে আজকে ঈদে খোর্মা আঙুর খেজুর-মেতি।
খর্জুর কণ্টকে আজ বন্ধ খুলি যুক্ত বেণির
ঢালিছে মুক্ত-কেশী আরবি-নিঝর কলসি পানির!
জরিদার নাগরা পায়ে গাগরা কাঁখে ঘাগরা ঘিরা
বেদুইন বউরা নাচে মৌ-টুসকির মৌমাছিরা।
শরমে নৌজোয়ানীরা নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা,
আজি তার রস ধরে না, তাম্বূলী ঠোঁট হিঙুল মাখা
করে আজ খুনসুড়ি ওই শুকনো কাঁটার খেজুর-তরু,
খেজুরের গুলতি খেয়ে 'উঃ' ডাকে 'লু' হাওয়ায় মরু!

১ হজরত মহম্মদের উপাধি। ২ ইরাকের টাইগ্রিস নদী। ৩ ইরাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইউফ্রেটিস নদী যার তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ইমান হোসেন শহিদ হন।

আখরোট বাদাম যত আরবি-বউ-এর পড়ছে পায়ে,
বলে, 'এই নীরস খোসা ছাড়াও কোমল হাতের ঘায়ে!'
আরবের উঠতি বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে রং কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।
ছুটিতে দুম্বাসম স্থূল শ্রোণিভার হয় গো বাধা,
দশনে পেস্তা কাটি পথ-বঁধুরে দেয় সে আধা!
অধরের কামরাঙা-ফল নিঙড়ে মরুর তপ্ত মুখে,
উড়ুনি দেয় জড়ায়ে পাগলা হাওয়ার উতল বুকে।

না-জানা আনন্দে গো 'আরাস্তা'[১] আজ আরব-ভূমি,
অ-চেনা বিহগ গাহে ফোটে কুসুম বে-মরশুমি,
আরবের তীর্থ লাগি ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি,
এসেছে ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি।
'রবিউল'[২] আউওল'[৩] চাঁদ শুক্লা নবমীর তিথিতে
ধেয়ানের অতিথ্‌ এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে।
মসীহের[৪] পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষ পরে[৫]
সোমবার জ্যেষ্ঠ প্রথম — ধরার মানব-ত্রাণের তরে
আসিলেন বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবি,
'মারহাবা সৈয়দে মক্কি মদনি আল-আরবি!'

আলো-আঁধারি

বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি
ওঠে যে সূর্য — প্রদীপ্ততর রূপ তার মনোহারী।
সিক্তশাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে
'বউ কথা কও' পাপিয়া যখন ডাকে—
সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদচারী!
বর্ষায়-ধোয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি!

কান্নার চোখ-ভরা জল নিয়ে আসে শিশু অভিমানী,
হাসির বিজলি চমকি লুকায় তার কাছে লাজ মানি।
কয়লার কালি মাখি যবে হীরা ওঠে,
সে রূপ যেন গো বেশি করে চোখে ফোটে!

১ সজ্জিত বা অলংকৃত। ২ একটি মাসের নাম। ৩ প্রথম দিন। ৪ হজরত ইসা বা জিশুখ্রিস্ট।
৫ ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ।

নীল নভো-ঠোঁটে এক ফালি হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদখানি
পূর্ণশশীর চেয়ে ভালো লাগে — কেন কেহ নাহি জানি!

পথের সকল ধুলো কাদা মাখি যে শিশু ফেরে গো ঘরে,
সে কি গো পাইতে বেশি ভালোবাসা যত্ন জননী করে?
মুছাবেন মাতা অঞ্চল দিয়া বলে
শিশুর নয়নে অকারণে বারি ঝলে?
ধরার আঁচলে পাথরের সাথে সোনা বাঁধা এক থরে,
বিষে নীল হয়ে আসে মণি — সে কি অধিক মূল্য তরে?

ডুবে এক-গলা নয়নের জলে তবে কি কমল ফোটে?
মৃণাল-কাঁটার বেদনায় কি ও শতদল হয়ে ওঠে?
শত সুষমায় ফোটাবে বলিয়া কিরে
মেঘ এত জল ঢালে কুসুমের শিরে?
দগ্ধ লোহায় না বিঁধিলে সুর ফোটে না কি বেণু-ঠোঁটে?
তত সুগন্ধ ওঠে চন্দনে যত ঘষে শিলাতটে!

মুছাতে এল যে উৎপীড়িত এ নিখিলের আঁখিজল,
সে এল গো মাখি শুভ্র তনুতে বিষাদের পরিমল!
অথবা সে চির-সুখ-দুখ-বৈরাগী
আসিল হইয়া নিখিল-বেদনা-ভাগী!
জানে বনমাতা, গন্ধে ও রূপে মাতাবে যে বনতল
সে ফুল-শিশুর শয়ন কেন গো কণ্টক-অঞ্চল!

শুনে হাসি পায় এত শোকে হায়! বিশ্বের পিতা যার
'হাবিব' বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার!
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময় —
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয়!
আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে — বার বার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথি পিতাহীন সবাকার!

আলোকের শিশু এল গো জড়ায়ে আঁধার-উত্তরীয়
জানাতে যেন গো 'বিষ-জর্জর, এবার অমৃত পিয়ো!'
তৃষ্ণাতুরের পিপাসা করিতে দূর
হৃদয় নিঙাড়ি রক্ত দেয় আঙুর!
শোক-ছলছল ধরায় কেমনে হাসিয়া হাসি অমিয়
আসিবে সবার সকল ব্যথার ব্যথী বন্ধু ও প্রিয়!

পূর্ণশশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল তত কলকল যত আনন্দ জাগে!
তেমনই পূর্ণশশীরে বক্ষে ধরি
'আমিনার' চোখে শুধু জল ওঠে ভরি!
সুখের শোকের গঙ্গা-যমুনা বিষাদে ও অনুরাগে
বয়ে চলে, যেন 'দজ্‌লা' 'ফোরাত' বসরা-কুসুম-বাগে[১]!

কাঁদিছে আমিনা[২], হাসিছেন খোদা, 'ওরে ও অবুঝ মেয়ে,
ডুবিয়াছে চাঁদ উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখনা চেয়ে,
ভবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি ওরে!
ঘর সে কি ধরে বিশ্ব যাহার আলোকে উঠিবে ছেয়ে?
নিখিল যাহার আত্মীয় — ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে?

নীড় নহে তার — যে পাখি উদার অম্বরে গাবে গান,
কেবা তার পিতা কেবা তার মাতা, সকলই তার সমান!
নাহি দুখ সুখ আত্মীয়, নাই গেহ,
একের মাঝারে সে যে গো সর্বদেহ,
এ নহে তোমার কুটির-প্রদীপ ভোরে যার অবসান,
রবি এ — জনমি পূর্ব-অচলে ঘোরে সারা আশমান!'

সে বাণী যেন গো শুনিয়া আমিনা-জননী[২] রহে অটল,
ক্ষণেক রাঙিয়া স্তব্ধ রহে গো যেমন পূর্বাচল!
কহিল জননী আপনার মনে মনে, —
'আমার দুলালে দিলাম সর্বজনে!'
থির হয়ে গেল পড়িতে পড়িতে কপোলে অশ্রুজল।
উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল!

'দাদা'

সব-কনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয় আবদুল্লার[৩] শোকে,
সেদিন নিশীথে ঘুম ছিল নাকো মুত্তালিবের[৪] চোখে!
পঁচিশ বছর ছিল যে পুত্র আঁখির পুতলা হয়ে,
বৃদ্ধ পিতারে রাখিয়া মৃত্যু তারেই গেল কি লয়ে!

১ ইরাকের অন্তর্গত বসরা শহরের পুষ্পোদ্যান। ২ হজরতের জননী। ৩ হজরত মোহাম্মদের পিতা। পুত্রের জন্মের ছয়মাস পূর্বে প্রয়াত হন। ৪ হজরত মোহাম্মদের পিতামহ।

হয়ে আঁখিজল ঝরে অবিরল পঁচিশ-বছরি স্মৃতি,
সে স্মৃতির ব্যথা যতদিন যায় তত বাড়ে হায় নিতি!
বাহিরে ও ঘরে বক্ষে নয়নে অশ্রুতে তারে খোঁজে
সহসা বিধবা আমিনারে হেরি সভয়ে চক্ষু বোজে!
ওরে ও অভাগি, কে দিল ও বুকে ছড়ায়ে সাহারা-মরু?
অসহায় লতা গড়াগড়ি যায় হারায়ে সহায়-তরু!
আগুনে বেড়ায় ও যেন রে হায় শোকের শুভ্রশিখা,
রজনিগন্ধা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা!
মন্থরগতি বেদনা-ভারতী আমিনা আঙনে চলে,
হেরিতে সহসা মুত্তালিবের আঁধার চিত্ততলে
ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ওই আমিনার সনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে সে অধিষ্ঠান।
দিন গোনে মনে মনে আর কয়, 'বাকি আর কতদিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন!'

মুত্তালিবের আঁধার চিত্তে জ্বলেছে সহসা বাতি,
সেদিন আসিবে যেন শেষ হলে আজিকার এই রাতি!
চোখে ঘুম নাই শূন্যে বৃথাই নয়ন ঘুরিয়া মরে,—
নিশি-শেষে যেন অতন্দ্র চোখে তন্দ্রা আসিল ভরে!
কত জাগে আর লয়ে হাহাকার, আঁধারের গলা ধরি
আর কতদিন কাঁদিবে গো, চোখে অশ্রু গিয়াছে মরি!
আয় ঘুম হায়, হয়তো এবার স্বপনে হেরিব তারে,
বিরাম-বিহীন জাগি নিশিদিন খুঁজিয়া পাইনি যারে!
হেরিল মুত্তালিব অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-ঘোরে,—
অভূতপূর্ব আওয়াজ যেন গো বাজিছে আকাশ ভরে!
ফেরেশতা সব যেন গগনের নীল শামিয়ানা-তলে
জমায়েত হয়ে তকবীর[১] হাঁকে, সে আওয়াজ জলে থলে
উঠিল রণিয়া। 'সাফা'[২] 'মারওয়ান'[৩] গিরি-যুগ সে আওয়াজে
কাঁপিতে লাগিল, উঠিল আরাব[৪], 'আসিল সে ধরা মাঝে!'
কে আসিল? সে কী আমিনার ঘরে? ছুটিতে ছুটিতে যেন
আসিল যে ঘরে আমিনা! ওকি ও, গৃহের ঊর্ধ্বে কেন
এত সাদা মেঘ ছায়া করে আছে? শত স্বর্গের পাখি
বসিতেছে ওই গেহ-পরি যেন চাঁদের জোছনা মাখি!

---

১ আল্লাহ আকবর ধ্বনি। ২, ৩ মক্কা-মদিনার পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল। ৪ দৈববাণী।

ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিছে কী যেন গ্রহ তারাদল আসি
আকাশ জুড়িয়া নৌবত বাজে ভুবন ভরিয়া বাঁশি !...

টুটিল তন্দ্রা মুত্তালিবের অপরূপ বিস্ময়ে —
ছুটিল যথায় আমিনা — হেরিল নিশি আসে শেষ হয়ে।
আমিনার শ্বেত ললাটে ঝলিত যে দিব্য জ্যোতি-শিখা,
কোলে সে এসেছে — হাতে চাঁদ তার ভালে সূর্যের টিকা !
সে রূপ হেরিয়া মূর্ছিত হয়ে পড়িল মুত্তালিব,
একী রূপ ওরে একী আনন্দ একী এ খোশনসিব !
চেতনা লভিয়া পাগলের প্রায় কভু হাসে কভু কাঁদে,
যত মনে পড়ে পুত্রে, পৌত্রে তত বুকে লয়ে বাঁধে !
পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনই আসিলেন কাবা-ঘরে,
বেদি পরে রাখি শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশুতরে।
'আরশে' থাকিয়া হাসিলেন খোদা — নিখিলের শুভ মাগি
আসিল যে মহামানব — যাচিছে কল্যাণ তারই লাগি !
ছিল কোরেশের[১] সর্দার যত সে প্রাতে কাবায় বসি
যোগ দিল সেই 'মুনাজাতে'[২] সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি।

সাতদিন যবে বয়স শিশুর — আরবের প্রথামতো
আসিল 'আকিকা'[৩] উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত !
উৎসব শেষে শুধাল সকলে শিশুর কী নাম হবে,
কোন সে নামের কাঁকন পরায়ে পলাতকে বাঁচি লবে।
কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি নিখিলের সম্পদ,—
"নয়নাভিরাম ! এ শিশুর নাম রাখিনু 'মোহাম্মদ' !"
চমকি উঠিল কোরেশির দল শুনি অভিনব নাম,
কহিল, 'এ নাম আরবে আমরা প্রথম এ শুনিলাম।
বনি-হাশেমের[৪] গোষ্ঠীতে হেন নাম কভু শুনি নাই,
গোষ্ঠী-ছাড়া এ নাম কেন তুমি রাখিলে, শুনিতে চাই !'
আঁখিজল মুছি চুমিয়া শিশুরে কহিলেন পিতামহ —
"এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি 'মোহাম্মদ' যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ !"

---

১ মক্কার একটি সম্প্রদায়। ২ আবেদন, প্রার্থনা। ৩ নবজাত শিশুর নামকরণ, কেশকর্তন ইত্যাদি উপলক্ষে পশুর মাংস বিতরণ বা ভোজন করানো। ৪ ??

নাম শুনি কহে আমিনা — "স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
'আহ্‌মদ' নাম রাখি যেন ওর!" 'জননী, ক্ষতি কি তাতে'
হাসিয়া কহিল পিতামহ, 'এই যুগল নামের ফাঁদে,
বাঁধিয়া রাখিনু কুটিরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে!'
একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দুটি সে নামের ফুল,
একটি সে নদী মাঝে বয়ে যায়, দুইধারে দুই কূল!

পরভৃত

পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে?
মেঘ-শিশু ছাড়ি সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি বর্ষাধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে?
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পলাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর,
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী স্রোতধারা —
শস্য ছড়ায়ে সিন্ধুতে হয় হারা?
বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষপুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে
বিহগ-শিশুরে, মুক্ত-কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্বদাই?
বেণু-বন কাটি লয়ে যায় শাখা গুণী,
তাই কি গো তাতে বাঁশরির ধ্বনি শুনি?

উদয়-অচল ধরিয়া রাখে না বলি
তরুণ অরুণ রবি হয়ে ওঠে জ্বলি!
আড়াল করিয়া রাখে না তামসী নিশা,
তাই মোরা পাই পূর্ণশশীর দিশা।
আকাশ-জননী শূন্য বলিয়া — তার
কোলে এত ভিড় গ্রহ চাঁদ তারকার।
তেমনই আমিনা-জননী শিশুরে লয়ে
'হালিমা'র[১] কোলে ছেড়ে ছিল নির্ভয়ে!
মা-র বুক ত্যজি আসিল ধাত্রীবুকে,
গিরি-শির ছাড়ি এল নদী গুহামুখে!

১ হজরত মোহাম্মদের ধাত্রী-মাতা।

কেমনে নির্ঝর এল প্রান্তরে বহি
অভিনবতর সে কাহিনি এবে কহি।

আরবের যত 'খাদানি' ঘরে বহুকাল হতে ছিল রেওয়াজ
নবজাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ ;
ধাত্রীর করে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লিতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রীমায়।
মরু প্রান্তর বাহি ধাত্রীরা ছুটিয়া আসিত প্রতি বছর,
ভাগ্যবান কে জনমিল শিশু বড়ো বড়ো ঘরে — নিতে খবর।
দূর মরুপারে নিজ পল্লিতে শিশুরে লইয়া তারে তথায়
করিত পালন সন্তানসম যত্নে — পুরস্কার-আশায়।
ঊর্ধ্বে উদার গগন বিথার নিম্নে মহান গিরি অটল,
পদতলে তার পার্বতী মেয়ে নির্ঝরিণীর শ্যামাঞ্চল।
সেই ঝরনার নুড়ি ও পাথর কুড়ায়ে কুড়ায়ে দুই সেই তীর
রচিয়াছে মরু-দগ্ধ আরবি শ্যামল পল্লি শান্ত নীড়।
সেথায় ছিল না নগরের কল-কোলাহল কালি ধূলি-স্তূপ,
ঝরনার জলে ধোয়া তনুখানি পল্লির চির-শ্যামলী রূপ।
সে আকাশতলে সেই প্রান্তরে — সেই ঝরনার পিইয়া জল,
লভিত শিশুরা অটুট স্বাস্থ্য, ঋজুদেহ, তাজা প্রাণ-চপল।
খেলা-সাথি ছিল মেষ-শিশু আর বেদুইন-শিশু দুঃসাহস,
মরু-গিরি-দরি চপল শিশুর চরণের তলে ছিল গো বশ।
মরু-সিংহেরে করিত না ভয় এইসব শিশু তিরন্দাজ,
কেশর ধরিয়া পৃষ্ঠে চড়িয়া ছুটাত তাহারে মরুর মাঝ।
আরবি ঘোড়ায় হইয়া সওয়ার বল্লম লয়ে করিত রণ,
মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।
নাশপাতি সেব আনার বেদানা নজরানা দিত ফুল ফলের,
সোজা পিঠ কুঁজো করিয়াছে উট সালাম করিতে যেন তাদের!
'লু' হাওয়ায় ছুটে পালাত গো মরু ইহাদেরই ভয়ে দিক ছেয়ে,
রক্ত-বমন করিত অস্ত-সূর্য এরই তির খেয়ে!

আরবের যত গানের কবিরা 'কুলসুম'[১] 'ইমরুল কায়েস'[২]
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!

১ ইসলাম পূর্বকালের আরবদেশীয় এক প্রখ্যাত মহিলা কবি। ২ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেকার অন্ধকার যুগে (আইয়্যাম-ই-জাহিলিসহ) এই কবির মৃত্যুঞ্জয়ী কাব্য ছিল আরববাসীর একমাত্র সান্ত্বনা। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও সুশিক্ষিত সাহিত্যমনস্ক আরবদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাঁর অবিনশ্বর কাব্য 'সাবতা মু-আল্লাহকাহ' বিগত তিন শতক ধরে ইউরোপের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে।

গাহিত হেথাই আলোর পাখি ও গানের কবিরা যত সে গান,
নগরে কেবল ছিল বাণিজ্য, পল্লিতে ছিল ছড়ানো প্রাণ।
আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া মেষ উদাসী রাখাল গোঠে মাঠে,
আরবি ভাষারে লীলাসাথি করে রেখেছিল পল্লির বাটে...।

যে বছর হল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়।
ঊর্ধ্বে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্র শুষ্ক হইল নিঝর, তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা-আতুর,
ছাড়ি প্রান্তর, পল্লির বাট খর্জুর-বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী 'বনি সায়াদ',
সেই গোষ্ঠীর 'হালিমা' জননী — দুর্ভিক্ষেতে গণি প্রমাদ
আসিল মক্কা, যদি পায় হতে কোনো সে শিশুর ধাত্রী-মা ;
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, 'আমিনা-কোল জুড়ি' চাঁদ পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী লয় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন —
ভাবিল — কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন ?
শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরে না জল,
বক্ষ ভরিয়া এল স্নেহ-সুধা — শুষ্ক মরুতে বহিল ঢল।
আরবি ভাষার ধাত্রীমা ছিল এই সে গোষ্ঠী 'বনি সায়াদ',
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরিফ করিত সাধ।
এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি শিশু লভিল ভাষার যে সম্পদ,
ভাবিত নিরক্ষর নবিবরে সকলে 'আলেম'[১] মোহাম্মদ।
শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লি দূর,
ছায়া করে চলে সাথে সাথে তার ঊর্ধ্বে আকাশে মেঘ মেদুর।
নতুন করিয়া আমিনা-জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে 'দলিজে'[২] মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল!
পলাইয়া গেল চপল শশক-শিশু শুনি দূর ঝরনা-গান,
বনমৃগ-শিশু পলাল মা ছাড়ি শুনি বাঁশরির সুদূর তান।
বিশ্ব যাঁহার ঘর, সে কি রয় ঘরের কারায় বন্দি গো ?
ঘর করে পর অপরের সাথে সেই বিবাগির সন্ধি গো!
শিশু-ফুল হরি নিল বনমালী ফুলশাখা হতে ভোরবেলায়,
লতা কাঁদে, ফুল হেসে বলে, 'আমি মালা হব মা গো গুণী-গলায়!'

---

১ ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক পণ্ডিত। ২ বৈঠকখানায়।

আসিল হালিমা কুটিরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুলবুল পথ-প্রান্তরে।
পাহাড়তলির শ্যাম প্রান্তর হল আরও আরও শ্যামায়মান,
ঊর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন-ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান!

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর কণ্ঠে ফুটুক নতুন দিনের নতুন বোল!

দ্বিতীয় সর্গ
শৈশবলীলা

খেলে গো ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়ে গো উপচে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
সে বেড়ায়, হীরক নড়ে,
আলো তার ঠিকরে পড়ে!
ঘোরে সে মুক্ত মাঠে পল্লিবাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায় — শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দশী।

অদূরে স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী-প্রায়,
পায়ে তার পুষ্প-তনু কন্যা যেন উপত্যকায়।
শিরে তার উদার আকাশ,
ব্যজনী দুলায় বাতাস।
বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝরনা নহর লহর লীলায়,
যেতে সে খোশবুপানি ছিটায় কূলের ফুলমহলায়!
পাখি সব শিস দিয়ে যায় কিশমিশেরই বল্লরিতে,
আকাশ আর বনদেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
মাঝে তার ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল-দোলানো।
কভু সে দুম্বা[১] চরায়, সাধ করে হয় মেষের রাখাল,
কভু তার দৃষ্টি হারায় দূর সাহারায়, যায় কেটে কাল।
অচপল মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় বসে সে,
খেলাতে মন বসে না যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে।
অসীম এই বিশাল ভুবন
ওগো তার স্রষ্টা কেমন!

---

১ মেষ-সদৃশ আরব দেশের গৃহপালিত পশু বিশেষ।

কে সে জন করল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা ?
মেষেরা যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।
কভু সে বংশী বাজায়, উট-শিশুরা সঙ্গে নাচে,
ভুলে নাচ বেড়ায় খুঁজে কে যেন তায় ডাকছে কাছে।
সহসা আনমনা হয় সঙ্গীজনের সংগীতে সে,
চোখে তার কার অপরূপ বেড়ায় রূপের ভঙ্গি ভেসে।
সাথি সব ভয় পেয়ে যায় চক্ষুতে তার এ কোন জ্যোতি !
ও আঁখি নীল সুঁদিফুল সুন্দরেরে দেয় আরতি।

ও যেন নয় গো শিশু, পথভোলা এক ফেরেশতা কোন
ও যেন আপন হওয়ার ছল করে যায়, নয়কো আপন।

হালিমা ভয়-চকিতা রয় চেয়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন পূর্ণ জ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে, কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে, কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়।
কভু সে শিশুর মতো,
কভু সে ধেয়ান-রত।

একী গো পাগল তবে, কিংবা ভূতে ধরল এরে,
এনে হায় পরের ছেলে পড়ল কী কু-গ্রহের ফেরে !
স্বামী তার বলল ভেবে, "শোন হালিমা, কাল সকালে
দিয়ে আয় যাদের ছেলে তাদের কাছে, নয় কপালে
আছে সে বদনামি ঢের, নাই এ গ্রামে ভূতের ওঝা,
কাবাতে 'লাত মানাতের'[১] কৃপায় এ ভূত হবেই সোজা !"

হালিমা অশ্রু মুছে মোহাম্মদে আনল আবার
হারানো মাতৃক্রোড়ে, বললে, 'লহো পুত্র সোনার !'

আমিনার বক্ষ বেয়ে অশ্রু ঝরে আকুল স্নেহে,
ওরে মোর সোনার দুলাল আজ ফিরেছে আঁধার গেহে !
এল আজ মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,
এল আজ সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের !
পারায়ে কৃষ্ণা তিথি শুক্লা তিথির আসল অতিথ,
কত সে দিনের পরে আঁধার ঘরে উঠল রে গীত !

১ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের পৌত্তলিক বনি সম্প্রদায়ের পূজ্য দুই দেবী বিশেষ।

প্রত্যাবর্তন

সেবার দূষিত ছিল বড়ো বায়ু মক্কাপুরীর,
নিশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ হাওয়ায় সুরীর[১]।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব, 'গো হালিমা শুনো,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন!
আবার যেদিন ডাকিব, আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো মোর চাঁদেরে!'
আমিনার চোখে ফুরাল শুক্ল চাঁদের তিথি,
আবার আসিল ভবনে অতীত-আঁধার ভীতি।
স্বপনে চলিয়া গেল যেন চাঁদ স্বপনে এসে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ লুকাল আকাশে ক্ষণেক ভেসে।
অঙ্গা ভরিয়া অশ্রু-চুমায় চলিল ফিরে
সোনার শিশু গো — নীড় ত্যজি পুন অজানা তীরে।
হালিমার বুকে খুশি ধরে নাকো, নীলাঞ্চলে
হারানো মানিক পুন পেল তার ভাগ্যবলে!
চলে অলক্ষ্যে সাথে বেহেশ্‌ত-ফেরেশতারা,
মক্কার মণি পুন মরুপথে হইল হারা।
হালিমার দুই কন্যা 'আনিসা' 'হাফিজা' ছুটি
চুমিল খুশিতে মোহাম্মদের নয়ন দুটি!
'আবদুল্লাহ্' হালিমা-দুলাল মানের ভরে
রহিল দাঁড়ায়ে অদূরে, নয়নে সলিল ঝরে।
সে যখন ছিল ঘুমায়ে, তাহার জননী কখন
নিয়ে গেল কোথা মোহাম্মদেরে; ভাঙিতে স্বপন
খুঁজিল কত না সাথিরে তাহার কানন গিরি,
রোদন করুণ প্রতিধ্বনিতে এসেছে ফিরি!
শয়নে স্বপনে ওই মুখ তার স্মৃতির মাঝে
উঠিয়াছে ভাসি, হেরেছে তাহারে সকল কাজে।
নড়িয়া উঠেছে খেজুরের পাতা বাতাসে যবে
সে ভেবেছে তারে ডাকিতেছে সাথি নূপুর-রবে।
শিস দিত যবে বুলবুলি বসি আনার-শাখে,
মনে হত তার, বন্ধু বংশী বাজায়ে ডাকে।
দুম্বা মেষের শিশুরা করুণ নয়ন তুলি
চাহিয়া থাকিত, খুঁজিত কাহারে সকল ভুলি।
মেষ-চারণের মাঠে তরুতলে বসিয়া একা
পাঠায়েছে তার হারানো সখারে সলিল-লেখা।

---

১ মদ্যবিশেষ।

ফিরিয়া আসিল লুকোচুরি খেলে যদি সে চপল,
ওর সাথে আড়ি — বল মায়ে ওরে নিয়ে যেতে বল!
হালিমার স্বামী হারিস শিশুরে লইল কাড়ি,
আনন্দ তার পুনরায় যেন ফিরিল বাড়ি।
মোহাম্মদ সে আবদুল্লার কণ্ঠ ধরি
বলে, 'আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি।'
ছুটিল আবার দুটিতে পাহাড়ি চারণ-মাঠে,
বংশী বাজায়ে দুম্বা চরায়ে সময় কাটে!
রাখালের রাজা আসিল ফিরিয়া রাখাল-দলে,
আবার লহর-লীলায় পাহাড়ি নহর চলে!

'শাককুস সাদর'
হৃদয়-উন্মোচন

এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ, বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান,
খেলে শিশু নবি রাখালের রাজা মরুর সচল মরূদ্যান।
চন্দ্র তারার ঝাড় লন্ঠন ঝুলানো গগন চাঁদোয়া-তল,
নিম্নে তাহার ধরণির চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চল-চপল।
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশদাম কলঙ্ক শুধু এই চাঁদের,
ঘুমালে এ চাঁদ কৃষ্ণা তিথি গো, জাগিলে শুক্লা তিথি গো ফের!
চাঁদ কি আকাশে বংশী বাজায়, গ্রহ তারকারা শুনি সে রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশে মেষ বৃষ রাশি রূপে গো সব?
খেলিতে খেলিতে আনমনা চাঁদ হারাইয়া যায় দূর মেঘে
অন্ধকারের অঞ্চলতলে, আনমনে পুন ওঠে জেগে।
খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক মোহাম্মদ
খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার সাথিরা প্রান্তর বন গিরি ও নদ।
কোথাও সে নাই! খুঁজি সব ঠাঁই ফিরিয়া আসিল বালক দল,
হালিমারে বলে, 'আমাদের রাজা হারাইয়া গেছে, দেখিবি চল!'
কাঁদিয়া ছুটিল হালিমা, খুঁজিল প্রান্তর গিরি মরু কানন,
রবিরে হারায়ে নিশীথিনী মাতা এমনই করিয়া খোঁজে গগন!
এমনই করিয়া সিন্ধু-জননী হারামণি তার খুঁজিয়া যায় —
কোটি তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া ধূলির ধরায় বালুবেলায়।
কত নাম ধরে ডাকিল হালিমা, 'ওরে জাদুমণি, সোনা মানিক!
ফিরে আয়, আয়, ও চাঁদ-মুখের হাসিতে আবার প্লাবিয়া দিক।
পেটে ধরি নাই, ধরেছি তো বুকে, চোখে ধরা মোর মণি যে তুই
মোর বনভূমে আসিসনি ফুল, এসেছিলি পাখি এ বনভুঁই!'

সহসা অদূরে চিরচেনা স্বরে শুনিবে ও কার মধুর ডাক,
ওকে ও মধুচ্ছন্দা গায়ন-কণ্ঠে উহার ওকী ও বাক?
ও যেন শান্ত মরু-তপস্বী, ধেয়ানে উঠিছে কণ্ঠে শ্লোক,
শিশু-ভাস্কর — উহারই আশায় জাগিয়া উঠিছে সর্বলোক।
হালিমা বক্ষে জড়াযে ধরিতে ভাঙিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা লযে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
'একী এ কোথায আসিয়াছি আমি' — জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী, 'তোর মার বুকে' কাঁদিয়া কয়।
'ওরে ও পাগল, কী স্বপন-ঘোরে ছিলি নিমগ্ন বল রে বল।
ওরে পথভোলা, কোন বেহশ্‌ত-পথ ভুলে এলি করিয়া ছল?
দেহ লয়ে আমি খুঁজেছি ধরণি, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনই করিয়া, পলাতকা ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ?'
এবার বালক মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া বলে, "জননী গো,
কী জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে, যেন সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ-মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে — কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলায় চুম।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, 'আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।
খোদার হাবিব — জ্যোতির অংশ ধরার ধূলিব পাপ-ছোঁয়ায়
হয়েছ মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুন তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক, আমি ফেরেশতা জিব্রাইল,
বেহেশ্‌ত হতে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্‌।'
এই বলি মোরে করিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরির দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরভি জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়!
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে [জমাট] মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র 'আব-জমজম'[১] দিয়ে জিব্রাইল[২],
বলিল, 'আবার হল পবিত্র জ্যোতির্মহান তোমার দিল্‌।
এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগে ছিল যাহা গ্লানি-কলুষ
যে কলুষ লেগে ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জমজম-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম — তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশতি, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ।'"

১ মক্কা-শরিফের পবিত্র জমজম কূপের পূত বারি। ২ স্বর্গের দূত।

সেলাই করিয়া দিল পুন মোর বক্ষে রাখিযা ধৌত দিল্‌,
সালাম করিয়া উর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক-জিব্রাইল!
বুঝিতে পারে না অর্থ ইহার — হালিমা কাঁদিয়া বুক ভাসায়,
বলে 'কত শত জিন পরি আছে ওই পর্বতে ওই গুহায়,
আর তোরে আমি আসিতে দিব না মেষ-চারণের এই মাঠে
কোনদিন তোরে ভুলাইয়া তারা লয়ে যাবে দূর মরু-বাটে।'
ছুটিয়া আসিল পড়শি আবালবৃদ্ধবনিতা ছেলেমেয়ে,
বলে, 'আসেবের'[১] আসর হয়েছে উহার উপরে, দেখ চেয়ে!
অমন সোনার ছেলে, ওকি আর মানুষ, ও যে গো পথভোলা
কোকাফ্‌মুলুক[২] পরিস্থানের পরিজাদা কোনো রূপওলা।'
বিস্ময়াকুল নয়নে চাহিয়া খানিক কহিল মোহাম্মদ হাসি,
'আম্মা গো, ওরা কী বলিছে সব? আমি যে তোরেই ভালোবাসি!
তুমি আম্মা ও আমি আহ্‌মদ, পায়নি তো মোরে জিন পরি,
এসেছিল সেতো জিব্রাইল সে ফেরেশতা! মাগো, হেসে মরি!
এই তো তোমার কোলে আছি বসে, দিওয়ানা কি আমি? তুই মা বল!
আমারে পায়নি পরিতে, ওদেরে পাইয়াছে ভূতে তাই এ ছল।'
হালিমা জড়ায়ে বক্ষে বালকে বলে, 'বাবা তুমি বলেছ ঠিক!'
মনের শঙ্কা যায় নাকো তবু, বাহিরে দস্যু ঘরে মানিক।
মনে পড়ে তার, সেদিনও ইহার জননী আমিনা এই কথাই
বলেছিল, 'কই খোকার আমার কোথাও তেমন আভাসও নাই!
দেখিছ না ওর চোখ মুখ কত তেজ-প্রদীপ্ত, তাই লোকে
যা-তা বলে! আমি মানি না এসব, যদি দেখি ইহা নিজ চোখে!'
জননীর মন অন্তর্যামী, সে তো করিবে না কখনও ভুল,
দেখেনি তো এরা দুনিয়ায় কভু ফুটিবে এমন বেহেশ্‌ত-গুল!
বারে বারে চায় বালকের চোখে — ও যেন অতল সাগরজল,
কত সে রত্ন মণিমাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল।
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, 'যদি হস বাদশা তুই
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে? পড়িবে মনে এ পল্লি ভুঁই?'
'মা গো মনে রবে।' হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা-র;
ভবিষ্যতের দফতরে লেখা রহিল সে কথা, ও বাণী যেন গো খোদ খোদার!

১ ভূত-প্রেত। ২ কল্পকাহিনিতে কথিত দুর্গম ও সুবিস্তৃত পর্বত-বিশেষ, যেখানে নাকি পরিরা বাস করে থাকে।

সর্বহারা

সকলের তরে এসেছে যে-জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাঁই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে!
আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে —
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়মনে —
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারি সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে!
আসিল আকুল অন্ধকারের বুকে হেথাই।
আলোর স্বপন হেরিবে, আলোর দিশারি, তাই
নিখিল পিতৃহীনের বেদনা নিজ করে
মুছাবে বলিয়া — নিখিলের পিতা ধরা পরে
পাঠাইল তার বন্ধুরে করি পিতৃহীন,
দীনের বন্ধু আসিল সাজিয়া দীনাতিদীন।
পিতৃহীন সে শিশু পুনরায় মাতারে তার
হারাইল আজ! শোক-নদী হল শোক-পাথার!

* * *

হালিমার কোলে গত হয়ে গেল পাঁচ বছর —
শশীকলা সম বাড়িতে লাগিল শশী-সোদর।
সহসা সেদিন শ্যাম প্রান্তরে নিষ্পলক
চাহিয়া অদূরে কী মেঘের ছায়া হেরি বালক
উতলা হইল ফিরিবার লাগি জননী-ক্রোড়;
গগন বিহারী বিহগের চোখে নীড়ের ঘোর!
কত গ্রহ তারা কত মেঘ ডাকে নীলাকাশে,
বিহরি খানিক চপল বিহগ ফিরে আসে
আপনার নীড়ে! ভুলিতে পারে না মা-র পাখা,
আকাশের চেয়ে তপ্ততর সে স্নেহমাখা!...
কাঁদিতে লাগিল মরুপল্লির মাঠ ও বাট,
ভাঙিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালি নাট।
পাহাড়তলিতে দুম্বা শিশুরা চাহিয়া রয়,
তাহাদের চোখে আজ পাহাড়ের ঝরনা বয়।
হালিমার ঘরে আলো নিভে গেল দমকা বায়,
পুত্র কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্ছা যায়।
তবু তারে ছেড়ে দিতে হল! ভাঙি মেঘের বাঁধ
পলাইয়া গেল রাঙা পঞ্চমী তিথির চাঁদ!

আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন,
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্ঠি — যখের ধন!
স্কন্ধে তুলিয়া বালকে বৃদ্ধ এল কাবায়,
বেদিতে রাখিয়া বালকে খোদার আশিস চায়।
সাতবার তারে করাইল কাবা প্রদক্ষিণ
প্রার্থনা করে, 'রক্ষো পিতা এ পিতৃহীন!'
আমিনা সাদরে হালিমায় কয়, 'কী দিব ধন
আমার রতনে করিয়াছ কত শত যতন,
মনের মতন দিব যে অর্থ নাহি উপায়,
তবু বলো মোর যা আছে ঢালিব তোমার পায়।
আমি ধরেছিনু গর্ভে — তুমি যে ধরি বুকে
করেছ পালন — মোরা সহোদরা সেই সুখে!'
হালিমার চোখে বয়ে যায় জমজম পানি, —
মোহাম্মদেরে ধরে কাঁদে নাহি সরে বাণী।
কাঁদিয়া কহিল মোহাম্মদেরে, 'জাদু আমার,
তুই দে আমায় আমার প্রাপ্য পুরস্কার!
আমিনা-বহিন জানে না তো তোরে কেমন সে
রাখিয়াছি বুকে দুখ দিয়ে না সে ভালোবেসে!'
ছুটিয়া আসিল বালক ফেলিয়া মায়ের কোল,
কণ্ঠ জড়ায়ে হালিমারে বলে মধুর বোল।
চুমু দিয়ে কয়, 'মা গো, এই লহো পুরস্কার!'
হালিমা মুছিয়া আঁখি, কয়, 'কিছু চাহি না আর!
সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক বোন,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন!'
জননীর কোল জুড়াল আবার নব সুখে,
চোখের অশ্রু শিশু হয়ে আজ দুলে বুকে!...
পুন রবিয়ল আউওল চাঁদ এল ফিরে,
এবার চাঁদের ললাট আসিল মেঘে ঘিরে।
কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙিনায়,
আমিনার মনে স্বামী-স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল সেই সে চান্দ্রমাস
আবদুল্লাহ গেল পরবাসে ফেলিয়া শ্বাস,
আর ফিরিল না — মদিনায় নিল চিরবিরাম!
আমিনার চোখে 'সোবেহ্‌সাদেক'[১] হইল 'শাম'[২]!
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,

১ অতি প্রত্যুষ। ২ সন্ধ্যা।

যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায় 'দিদার'[১]।
যে কবরতলে আছে সে লুকায়ে, সেই কবর
জিয়ারত[২] করি পুছিবে স্বামীরে তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্বার?
দেখিবে ডুবিয়া — নাই যদি ফিরে, ভয় কী তায়?
হয়তো একূলে হারায়ে ওকূলে প্রিয়রে পায়!
আহ্‌মদে লয়ে আমিনা-মা চলে মদিনাধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম।
জানে না সে চলে জীবনপথের শেষ সীমায়,
ওপার হইতে চিরসাথি তারে ডাকিছে, 'আয়!'
কত শত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে!
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী হায়
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী প্রায়!
বালকে বক্ষে জড়াইয়া বলে, 'ওঠো স্বামী,
তোমার অ-দেখা মানিকে এনেছি দিতে আমি!'
মা-র দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে — 'মা গো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর?
তোমার মতন ভালোবাসিত সে? তবে কেন
না ধরিয়া কোলে মাটিতে লুকায়ে রয় হেন?'
কী বলিবে মাতা! ক্রন্দনরত বালকে তার
বক্ষে ধরিয়া চুম্বে কবর বারংবার!
মাখিয়া স্বামীর কবরের ধূলি সকল গায়
মক্কার পথে আবার আমিনা ফিরিয়া যায়।
ফিরে যেতে মন সরে না ছাড়িয়া গোরস্থান,
তবু যেতে হবে — এ বালক এ যে স্বামীর দান!
মরুপথে বাজে উটচালকের বংশী সুর,
মনে হয় যেন সেই ডাকে তারে ব্যথা-বিধুর!
মনে মনে বলে — 'অন্তর্যামী! শুনেছি ডাক,
তুমি ডাকিয়াছ — ছিঁড়ে যাব বন্ধন বেবাক।'
কিছুদূর আসি পথমঞ্জিলে আমিনা কয় —
'বুকে বড়ো ব্যথা, আহ্‌মদ, বুঝি হল সময়
তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার! চাঁদ আমার,
কাঁদিসনে তুই, রহিল যে রহমত[৩] খোদার!'

১ দর্শন। ২ মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা। ৩ করুণা।

বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ি ঢলি,
ফিরদৌসের[১] পথে মা আমিনা গেল চলি'!
বজ্র-আহত গিরি-চূড়া সম কাঁপি খানিক
মা-র মুখ চাহি রহিল বালক নির্নিমিখ!
পূর্ণিমা চাঁদে গ্রাসে রাহু এই জানে লোকে,
গরাসিল রাহু আজ ষষ্ঠীর চন্দ্রকে!

* * *

বাজ-পড়া তালতরুসম একা বৃন্তহীন
দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাটে ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
দেখায় তাহার বদনসিব।
আবদুল্লাহ্ গিয়াছিল, আমিনা আজ
মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন!
দরদ-মুলুকে বাদশাহ শিরে বেদনা আজ
উন্নত শির বীর প্রাচীন,
ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গা শির,
'ওরে বালক কেন এলি হেথায়,
নাহি পল্লব-ছায়া পোড়া তরু মরুর তার
কী দিয়া আতপ নিবারি হায়!
খাক হয়ে গেছে মরু-উদ্যান, বালুর উপরে বালুর স্তূপ
রচেছে সেখানে কবর গাহ্
গুল নাই, কেন পোড়াইতে পাখা এলি মধুপ,
শোকপুরী — আমি শাহানশাহ!
নাহি পল্লব-শাখা নাই একা তালতরু,
উড়ে এলি সেথা বুলবুলি!
ঊর্ধ্বে তপ্ত আকাশ নিম্নে খর মরু
'বিয়াবানে'[২] এলি গুল ভুলি!'
যত কাঁদে তত বুকে বাঁধে আরও, কে রে কপট
মায়াবী খেলিছে খেলা এমন,
প্রাচীন বটের সারা তনু ঘিরি, জটিল জট
আঁকড়িয়া আছে পোড়া কানন।
ব্যাধ-ভয়াতুর শিশু-পাখিসম তবু বালক
জড়াইয়া পিতামহেরে তার,
জননীর চলে-যাওয়া পথে চাহে নিষ্পলক
ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার।

---

১ স্বর্গ। ২ মরুভূমি।

যে ডাল ধরে সে সেই ডাল ভাঙে, অ-সহায়
তবু আর ডাল ধরে আবার,
তৃণটিও ধরে আঁকড়ি স্রোতে যে ভাসিয়া যায়
আশা মনে — যদি পায় কিনার।
শোকে ঘুণধরা জীর্ণ সে শাখা, তাই ধরি
রহিল বালক প্রাণপণে,
জানে না, এ ডালও ভাঙিয়া পড়িবে শিরোপরি
আবার ঘোর প্রভঞ্জনে।
পাখা মেলে এল শোকের বিপুল 'সি-মোরগ'
কালো হল ধরা সেই ছায়ায়,
দু-বছর পরে — পিতামহ চলি গেল স্বরগ
ছিঁড়ি বন্ধন মোহমায়ায়।
ওড়ে কালো মেঘ মক্কার শিরে শকুনিপ্রায়
ছিন্ন জটায়ু-পাখা যেন,
আট বছরের বালকের বাহু শক্তি তায়
বাঁধিয়া রাখিবে নাই হেন।
আরবের বীর মক্কার শির মুত্তালিব
কোরায়শি সর্দার মহান,
আখেরি নবির না-আসা বাণীর দূত নকিব
করিল গো আজ মহাপ্রয়াণ।
মুকুটবিহীন মক্কার বাদশাহ আজি
ফেলে গেল ধূলি সিংহাসন,
মক্কার ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন আজি,
মাতম[১] করিছে শত্রুগণ।
ডাকিয়া পুত্র আবুতালেবের মুত্তালিব
দিয়াছিল সঁপি আহমদে,
জ্যেষ্ঠতাতের কোলে এল সব-হারা 'হাবিব',
দিঘির কমল এল নদে।
মূলহারা ফুল স্রোতে ভেসে যায় নির্বিকার
নাহি আর সুখ-দুঃখ লেশ,
শুধু জানে তারে ভাসিতে হইবে বারংবার
এমনই অকূলে নিরুদ্দেশ!
রহস্য-লীলারসিক খোদার অন্ত নাই,
কী জানি সাধিতে কোন সে কাজ
বন্ধুরে বন্ধুর পথে — বেদনা নাই
ফুলেরে ফোটায় কাঁটার মাঝ।

১ শোক।

নির্বেদ সে কি, নাহি গো দুঃখ্ ব্যথা কি তার?
সৃষ্টি কি তার শুধু খেয়াল?
শুধু ভাঙাগড়া পুতুলখেলা কি নির্বিকার
খেলে মহাশিশু চির সে কাল?
জগতেরে আলো দানিবে যে — কেন অন্ধকার
তার চারপাশে ঘিরিয়া রয়?
সব শোকে দিবে শান্তি যে — শৈশব তাহার
কেন এত শোক দুঃখময়?
কেহ তা জানে না, জানিবে না কেহ, সদুত্তর
পাইবে না কেহ কোনো সেদিন,
শুধু রহস্য, জিজ্ঞাসা শুধু, চির-আড়াল
বিস্ময় আদি অন্তহীন!
মাতৃগর্ভে শিশু যবে — হল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়,
ষষ্ঠ বরষে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন
জীবনে কেবলই ঘাত কঠোর!
পুন অষ্টম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয়
পড়িল অকূল তরঙ্গাকুল ব্যথা-দহে,
দশদিশি যেন মৃত্যুময়!
খেলে যে বেড়াবে ধুলা-কাদা লয়ে স্নেহনীড়ে,
ব্যথার উপরে পেয়ে ব্যথা
বালক-বয়সে হল সে ধেয়ানি মরুতীরে —
অতল অসীম নীরবতা
ছাইল আজিকে জীবন তাহার, একা বসি
ভাবে, এ জীবন মৃত্যু হায়
কেন অকারণ? কেন কেঁদে ফেরে ক্রন্দসী
এই আনন্দময় ধরায়?
পলাতক শিশু ঘরে নাহি রয়, নিষ্কারণ
ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে
খুঁজিয়া বেড়ায় মরু-কান্তার খেজুর বন
অন্ধগুহায় পর্বতে,
সকল দিশার দিশারির দেখা পাবে বুঝি,
হবে সমাধান সমস্যার,
'আব-হায়াতের'[১] মৃত্যু-অমৃত পাবে খুঁজি —
খুঁজে পায়নি যা সেকান্দার।

---

১ মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

এমনই করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবি
ভাবে তারই কথা এই রহস্য যার সৃজন
আঁধার যাহার — যার রবি!

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর

বিশ্ব-মনের সোনার স্বপনে কিশোর তনু বেড়ায ওই
তন্দ্রা ঘোরে অন্ধ আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।
বাজিয়ে বাঁশি চরায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয সে ছুট,
'হেরার'[১] গুহায় লুকিয়ে ভাবে — এ আমি তো আমি নই!
অতল জলে বিম্বসম ফুটেই কেন বিলীন হই।
রূপ ধরে ওই বেড়ায় খেলে দাহন-বিহীন অগ্নিশিখ
পথিক ভোলে পথ-চলা তার, দাঁড়িয়ে দেখে নির্নিমিখ।
সাগর অতল ডাগর চোখ
ভোলায় আকাশ অলখ লোক,
যায় যে পথে — ফিনকি রূপের ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌বিদিক,
আরব-সাগর-মন্থন-ধন আরব দুলাল নীল মানিক।
পালিয়ে বেড়ায় পলাতকা রাখতে নারে আপন জন,
কারুর পানে চায় না ফিরে কে জানে তার কোথায় মন।
আদর করে সবাই চায়,
সে চলে যায় চপল পায়,
কে যেন তার বন্ধু আছে ডাকছে তারে অনুক্ষণ,
তার সে ডাকের ইঙ্গিত ওই সাগর মরু পাহাড় বন।
মক্কাপুরীর রত্নমালায় মধ্যমণি এই কিশোর,
পিক পাপিয়া অনেক আছে — দূরবিহারী এ চকোর।
কী মায়া যে এ জানে,
অজানিতে মন টানে,
সবার চোখে নিথর নিশা, উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ফটিক জলের উষর দেশে সে এসেছে বাদল-মৌর।

১ মক্কার অদূরে অবস্থিত পাহাড় বিশেষ, যার গুহায় হজরত মোহাম্মদ সিদ্ধিলাভ করেন।

এমনি করে দ্বাদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি,
আবুতালেব[১] বলল, "এবার করব সোনা এই মাটি!
আহ্‌মদ, তোর দৌলতে!
এবার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে 'শাম'[২] 'মোকাদ্দসে'[৩], তুই যেন বাপ রোস খাঁটি,
দেখিস তুই এ তোর পিতাম-পিতার পূত এই ঘাঁটি।"
'চাচা, তোমার সঙ্গে যাব', বলল কিশোর শেষ নবি,
চক্ষে তাহার উঠল জ্বলে ভবিষ্যতের কোন ছবি।
কে যেন দূর পথের পার
ডাকছে তারে বারংবার,
সন্ধানে তার পার হবে সে এই সাহারা এই গোবি,
আকাশ তারে ডাক দিয়েছে আর কি বাঁধা রয় রবি?
বুঝায় যত আবুতালেব, "মানিক, সে যে অনেক দূর!
দজলা[৪] ফোরাত[৫] পার হতে হয়, লঙ্ঘিতে হয পাহাড় তূর[৬]।
মরুর ভীষণ 'লু' হাওয়া,
যায় না সেথা জল পাওয়া,
কত সে পথ যাব মোরা, ঘুরতে হবে অনেক ঘুর!"
কিশোর চোখে ভেসে ওঠে কোকাফ মুলুক[৭] পরির পুর।
লঙ্ঘি সবার নিষেধ-বাধা চাচার সাথে কিশোর যায়
বাণিজ্যে দূর দেশে প্রথম উটের পিঠে — মরুর নায়।
দেখবি রে আয় বিশ্বজন,
রত্ন খোঁজে যায় রতন!
ধুলায় করে সোনামানিক যেজন ঈষৎ পা-র ছোঁয়ায়,
আনতে সোনা সে যায় রে ওই সোনার রেণু ছিটিয়ে পায়!
দেখবি কে আয়, দরিয়া চলে নহর[৮] থেকে আনতে জল,
আনতে পাথর চলল পাহাড় ঝরনা-পথে সচঞ্চল।
ফুলের খোঁজে কানন যায়,
নতুন খেলা দেখবি আয়!
বেহেশ্‌ত-দ্বারী রেজওয়ান[৯] চায় কোথায় পাবে মিষ্ট ফল!
সূর্য চলে আলোর খোঁজে, মানিক খোঁজে সাগর-তল!
দেখবি কে আয়, আজ আমাদের নওল কিশোর সওদাগর
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের পর

১ হজরত মোহাম্মদের চাচা ও অভিভাবক। ২ উত্তর আরবের অন্তর্গত সিরিয়া। ৩ আবর্জনামুক্ত বা পবিত্র। ৪ টাইগ্রিস নদী। ৫ ইউফ্রেটিস নদী। ৬ যে পাহাড়ে মুসা আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করেন। ৭ দুর্গম পর্বত যেখানে পরিরা বাস করে। ৮ স্রোতস্বিনী। ৯ স্বর্গের দ্বাররক্ষক।

আয় মহাজন ভাগ্যবান,
এই সদাগর এই দোকান
আর পাবিনে, আর পাবিনে এমন বিকিকিনির দর!
আয় গুনাগার[১], এবার সেরা সওদাগরের চরণ ধর!
আয় গুনাগার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বসবে না আর এই মেলা!
ফিরদৌসের এই বণিক
মাটির দরে দেয় মানিক!
জহর নিয়ে জহরত দেয়, নও-বণিকের নও-খেলা।
আয় গুনাগার, ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা।
গুনাগারীর জীবন-খাতায় শূন্য যাদের লাভের ঘর,
এই বেলা আয় — ভুলিয়ে নে সব, কিশোর বয়েস সওদাগর।
আন রে জাহাজ, আন রে উট,
বিশ হাতে আজ মানিক লুট!
অর্থ খুঁজে ব্যর্থ যে জন, এর কাছে খোঁজ তার খবর।
শূন্য ঝুলি দেউলিয়া আয়, পুণ্যে ঝুলি বোঝাই কর!
আপনপ্রেয় শ্রেয় যা সব মৃত্যুরে তা দান করে
অপরিমাণ জীবন-পুঁজি সে এনেছে অন্তরে,
তাই দিবে সে বিলিয়ে আজ
সকলজনে বিশ্বমাঝ!
আয় দেনাদার, বিনা সুদে ঋণ দেবে এ প্রাণ ভরে,
ঋণ-দায়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, শোধ দেবে এ, আন ধরে!...
পঙ্খিরাজে পাল্লা দিয়ে মরুর পথে ছুটছে উট
চরণ তার আজ বারণ-হারা, রুখতে নারে বলগা-মুঠ।
পৃষ্ঠে তাহার এ কোনজন,
চলতে শুধু চায় চরণ
'হজজ্'[২] 'রমল্'[৩] ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট।
উট নয় সে, ফিরদৌসের বোররাক — নয় নয় এ ঝুট!
চলতে পথে মনে ভাবে যতেক আরব বণিক দল —
উষর মরুর ধূসর রোদেও কেমনে তনু রয় শীতল!
মেঘ চাইতেই পায় পানি,
এ কোন মায়ার আমদানি!
খুঁড়তে মরু ঠান্ডা পানি উথলে আসে অনর্গল।
উড়ছে সাথে সফেদ কপোত ঝাঁক বেঁধে ওই গগনতল।

১ পাপী। ২ আরবি কবিতার ছন্দ বিশেষ। ৩ আরবি কবিতার ছন্দ বিশেষ। ৪ পক্ষিরাজ।

বুঝতে নারে, ভাবে এসব খোদার খেলা, নাই মানে!
মরুর রবি নিষ্প্রভ কি হল এবার, কে জানে!
ছিটায় না সে আগুন-খই,
সে 'লু' হাওয়ায় ঘূর্ণি কই,
থাকত না তো এমন ডাঁসা আঙুর মরুর উদ্যানে।
জাদুকরের জাদু এসব — মরুর পথে সবখানে।
পৌঁছাল শেষ দূর বোসরায়[১] তালিব, আরব সওদাগর
নগরবাসী আসল ছুটে, দেখবে জিনিস নতুনতর।
বণিকদলে ও কোনজন —
চক্ষে নিবিড় নীলাঞ্জন,
এই বয়সে কে এল ওই শূন্য করে কোন সে ঘর!
কার আঁচলের মানিক লুটায় মরুর ধুলায় পথের পর।
অপরূপ এক রূপের কিশোর এসেছে 'শাম', উঠল রোল,
মুখর যেমন হয় গো বিহগ আসলে রবি গগন-কোল।
পালিয়ে হুরিস্থান সুদূর
এসেছে এ কিশোর হুর,
নওরোজের আজ বসল মেলা, রূপের বাজার ডামাডোল!
আকাশ জুড়ে সজল মেঘের কাজল নিশান দেয় গো দোল।
রূপ দেখেছে অনেক তারা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক!
আসল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল
'মোহন' ধ্যানে দেখলে যারে, রূপ ধরে কি সেই মানিক
আসল মানব-ত্রাণের তরে কিশোর ছেলে এই বণিক?
কবুতরায় কূজনগীতি গাইছে কবুতরের ঝাঁক,
দুম্বা-শিশু মা ভুলে তার উহার মুখে চায় অ-বাক।
গগন-বিথার কাজল মেঘ,
ফুল-ফোটানো পবন-বেগ,
মনের বনে শহদ[২] ঝরে আপনি ফেটে মধুর চাক,
মুঞ্জরিল পুষ্পে পাতায় মলিন লতা তরুর শাখ।
সেথায় ছিল ঈশাই[৩]-পুরুত 'বোহায়রা'[৪] নাম, ধ্যান-মগন,
ঈশাই-দেউল মাঝে বসে উথলে ওঠে নয়ন মন!
বসল ধ্যানে পুনর্বার,
আগমনি আজকে কার।

১ ইরাকের শহর, গোলাপবাগানের জন্য বিখ্যাত। ২ পুষ্পমধু। ৩ খ্রীষ্টীয়। ৪ একজন খ্রিস্টীয় যাজক।

দেখলে ধ্যানে — সকল নবি ঈশা, মুসা, দাউদ, যন,
আসার খবর কইল যাহার আজ এসেছে সেই রতন!
দেখল — তারে বিলিয়ে ছায়া কাজল নীরদ ফিরছে সাথ,
লুটিয়ে পড়ে মূর্তিপূজার দেউল টুটে, 'লাত মানাত'[১]।
অগ্নি পূজার দেউল সব
যায় নিভে গো, করে স্তব,
তবুর ছায়া সরে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে 'সালাত'[২], নতুন 'দীনের'[৩] 'তেলেসমাত'[৪]
সে এসেছে বণিক বেশে এই সিরিয়ার এই নগর,
ধ্যান ফেলে সে আসল ছুটে, যথায় আরব-সওদাগর।
উদ্দেশ যার পায় না মন
হাতের কাছে আজ সে জন,
'বোহায়রা' চায় পলক-হারা, লুটাতে চায় ধুলার পর।
গগন ফেলে ধরায় এল আজকে ধ্যানের চাঁদ অ-ধর।
কিশোর নবির দস্ত[৫] চুমি 'বোহায়রা' কয়, "এই তো সেই -
শেষের নবি — বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাঁহার উদ্দেশেই।
আল্লার এই শেষ 'রসুল'[৬],
পাপের ধরায় পুণ্যফুল,
দীন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত রূপ, নিখিল খুঁজে পায় না যেই!"
বোহায়রা কয়, 'আমার মাঠ রইল দাওত[৭] আজ সবার!'
মুগ্ধ-চিতে শুনল তালিব সকল কথা বোহায়রার।
হাসল শুনে কোরেশগণ[৮],
বলল, 'ফজুল[৯] ওর বচন!'
শুধায় তবু, 'কেমন করে তুমিই পেলে খবর তার?'
বোহায়রা কয় হেসে, 'যেমন দীপের নীচেই অন্ধকার।
দেখছি আমি ক-দিন থেকেই ধ্যানের চোখে অসম্ভব
অনেক কিছু — পাহাড় নদী কাহার যেন করে স্তব,
প্রতি তরু পাষাণ জড়
এই কিশোরের চরণ পর
পড়েছে ঝুঁকে অধোমুখে সিজদা[১০] করার লাগি সব।
সেদিন হতে শুনছি কেবল নতুনতর 'সালাত'[১১]-রব।

১ ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের দ্বারা পূজিত দেবতা। ২ নামাজ। ৩ জাদু। ৪ ইসলামের। ৫ হাত। ৬ মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্যে আল্লাহ্ প্রেরিত মহাপুরুষ। ৭ নিমন্ত্রণ। ৮ হজরত মহম্মদ মক্কার যে উপজাতির অন্তর্গত ছিলেন। ৯ অতিরঞ্জন। ১০ আভূমি প্রণিপাত। ১১। নামাজ।

'দেখেছি এর পিঠের পরে নবুয়তের[১] মোহর সিল,
চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।
নবি ছাড়া কারেও গড়
করে নাকো পাষাণ জড়!
'নজ্জুম[২] সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল
এই সে মাসে, আমার ধ্যানে তাদের গোনায় আছে মিল।
রুমীযগণ দেখলে এরে হযতো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয আর এনো না, আবুতালিব[৩], এ সম্পদ!
এই যে কিশোর সুলক্ষণ —
দেখলে ইহার শত্রুগণ —
ফেলবে চিনে, মারবে প্রাণে, খোদার কালাম[৪] করবে রদ!'
তালিব শুনে কাঁপল ভয়ে, হাসল শুনে মোহাম্মদ।
এমন সময় আসল সেথা সপ্ত রোমান অস্ত্র-কব,
বোহাযরা কয়, 'কাহার খোঁজে এসেছে এই যাজক-ঘব?'
বলল তারা, 'খুঁজছি তায
শেষের নবির আসন চায়
যে জন — তারে, বেরিয়েছে সে এই মাসে এই পথের পর!'
বোহাযরা কয়, 'বণিক এরা, ইহারা নয নবির চর!'
ফিরে গেল রোমান ইহুদ, বোহাযরা কয়, 'আজ রাতে
পাঠিযে দাও এ কিশোর কুমার তোমার স্বদেশ মক্কাতে!'
কিশোর নবি সওদাগর
চলল ফিরে আবার ঘর,
বেলাল[৫], আবুবকর[৬] চলে সঙ্গী হয়ে সেই সাথে।
জীবন-পথের চির-সাথি সাথি হল আজ প্রাতে।

সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ

আঁধার ধরণি চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,
মক্কায় পুন ফিরিয়া আসিল কিশোর নবি।
ছাগ মেষ লয়ে চলিল কিশোর আবার মাঠে,
দূর নিরালায় পাহাড়তলির একলা বাটে।
কী মনে পড়িত চলিতে চলিতে বিজন পুরে,
কে যেন তাহারে কেবলই ডাকিছে অনেক দূরে।

১। নবির পদ। ২ জ্যোতিষী। ৩ হজরতের চাচা ও পিতার মৃত্যুর পর হজরতের অভিভাবক।
৪ বাণী, হুকুম। ৫ ইসলামের নামাজ যিনি প্রথম পড়েছিলেন। ৬ হজরতের প্রথম শিষ্য।

আশমানি তার তাম্বু টাঙানো মাথার পবে,
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।
ভুলে গিযে পথ, ভুলি আপনায়, বিশ্ব ভুলি
বসিত কিশোব আসন করিয়া পথের ধূলি।
থমকি দাঁড়াত গগনে সূর্য, ধেযান-রত,
কিশোবে হেরিতে নমিত পাহাড় শ্রদ্ধানত।
সাগবের শিশু মেঘেরা আসিত দানিতে ছাযা,
সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরব দেশে,
'ফেজার' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
মরুর মাতাল মাতিল রৌদ্র-শারাব পিযা,
আরবের সব গোত্র সে রণে নামিল গিয়া।
যে গৃহযুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,
আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুন তাহারা।
এ মহারণের জন্ম প্রথম 'ওকাজ'[১] মেলায়,
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।
সকল প্রধান গোত্র মিলিত হেথায় আসি,
একে অন্যের পাত্রে ছিটাতে কাদার রাশি।
কবির লড়াই চলিত সেখানে কুৎসা গালির,
মদের অধিক ছুটিত বন্যা কাদা ও কালির।
এই গালাগালি লইয়া বাধিল যুদ্ধ প্রথম,
দেখিতে দেখিতে লাগিল 'ফেজার' দুপুরে মাতম[২]।
নবির গোত্র 'বনি হাশেমী'রা সে ভীম রণে
হইল লিপ্ত তাদের মিত্র-গোত্র সনে।
তরুণ নবিও চলিল সে রণে যোদ্ধৃসাজে,
যুদ্ধে যাইতে পরানে দারুণ বেদনা বাজে।
ভাযে ভাযে এই হানাহানি হেরি পরান কাঁদে,
নাহি কি গো কেহ — এদেরে সোনার রাখিতে বাঁধে?
সকল গোষ্ঠী সর্দারে ডাকি বোঝায় কত,
আপনার দেহ করিস তোরা রে আপনি ক্ষত!
মৃত্যু-মদের মাতাল না শোনে নবির বাণী,
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।
সদা নিরন্ন আতুর দুঃখী দরিদ্রেরে
সেবিত যে তারে ফেলিলে গো খোদা এ কোন ফেরে!
যুদ্ধভূমিতে গিয়া নবি হায় যুদ্ধ ভুলি
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি।

১ মক্কার অদূরবর্তী ওকাজ নামক স্থান যেখানে মেলা হত। ২ বিলাপ, ক্রন্দন।

দেখিতে দেখিতে তরুণ নবির সাধনা সেবায়
শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি সকলে।
বসিল সালিশ 'ইবনে জদ্‌আন' গৃহে মক্কায়,
মধ্যে মধ্যমণি আহমদ শোভে সে সভায়!
'হাশেম', 'জোহরা' গোত্রের যত সেরা সর্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশি সভার।
মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেববাজি[১]!
আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম রবে।
একটি পশম ভেজাবার মতো সমুদ্র জল
রবে যতদিন, ততদিন রবে শর্ত অটল!
ফেলি হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি ভাই ভাই
এই সে শর্তে হল প্রতিজ্ঞাবন্ধ সবাই।
(১) আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনাভাগী।
(২) বিদেশির মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নিচু।
(৩) অকুণ্ঠ চিত্তে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ ফেরে।
(৪) কবির দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্বল দেশ, দুর্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্বনাশী!
দু-চারি বছর সন্ধির এই শর্ত মতো
আরবের মরু হল না কলহ-ঝটিকাহত।
রক্তের তৃষ্ণা ব্যাঘ্র কদিন ভুলিয়া রবে,
মাতিল আরব বারে বারে তাই ঘোর আহবে[২]।
ভোলেনি আরবে শুধু একজন একথা কভু,
মোহাম্মদ সে সত্যাগ্রহী দীনের প্রভু!
বহুকাল পরে পেয়ে পয়গাম্বরী নবুয়ত
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।

১ প্রতারণা। ২ যুদ্ধ, সংগ্রাম।

ভীষণ 'বদর'[১] সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ-জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন, 'মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোনরে সবে,
যুদ্ধে-বন্দি শত্রুরা আজ মুক্ত হবে!
শত্রু-পক্ষ কেহ যদি আজ হাসিয়া বলে,
প্রতিজ্ঞা করি ভোলাও এমনই মিথ্যা ছলে!
কেহ নাহি দেয় — আমি দিব সাড়া তাহার ডাকে,
সত্যের তরে এই 'ইসলাম' কহিব তাকে!
অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হয়ে
বাঁচাতে এসেছে 'ইসলাম' নিজে পীড়ন সয়ে!'
ন্যায়েরে বসাবে সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার;
মুসলিম সেই, এই ন্যায়-নীতি ধেয়ান যাহার!
এমনই করিয়া ভবিষ্যতের সহস্রদল
মেলিতে লাগিল পাপড়ি তাহার আলোর কমল।
অনাগত তার আলোক-আভাস গগনে লেগে
উঠিতে লাগিল নতুন দিনের সূর্য জেগে।
আকাশের পর-কোণা রেঙে ওঠে সেই পুলকে,
দ্যুলোকের রবি আলো দিতে আসে এই ভূলোকে।
স্তব করে আর কাঁদে ধরণির সন্তানগণ,
ব্যথা-বিমথন এসো এসো ওগো অনাথ-শরণ!

চতুর্থ সর্গ

শাদি মোবারক

[গজল-গান]

মোদের নবি আল-আরবি
সাজল নওশার নওল সাজে;
সে রূপ হেরি নীল নভেরই কোলে রবি লুকায় লাজে।
আরাস্তা[২] আজ জমিন আশমান
হুরপরি সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে, কাবাতে নৌবত বাজে॥
কয় 'শাদি মোবারক বাদি'
আউলিয়া আর আম্বিয়ার[৩],

১ মক্কার নিকটবর্তী তদানীন্তন ময়দান বিশেষ, যেখানে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়েও বিশ্বনবি বিশাল কাফের বাহিনীকে পরাজিত করেন। ২ অলংকৃত। ৩ মহাজ্ঞানী দরবেশ।

ফেরেশতা সব সওদা খুশির বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥
গ্রহ তারা গতিহারা
চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে॥
আয়রে শাপী দুঃখী তাপী
আয় হবি কে বরাতী,[১]
শাফায়তের[২] শিরীন[৩] শিরনি পাবি না আর পাবি না যে॥
বিপুল বিত্ত-শালিনী 'খদিজা'[৪] ছিল আরবের চিত্ত-রানি,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহায় মুগ্ধ আরব অর্ঘ্য দানি।
স্তুতি গাহি তার যশ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা,
শুভ ভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা!
শুদ্ধাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহারে 'তাহেরা' বলে।
হজরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।
বীর 'আবুহানা'[৫] বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথি,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।
বিধবার বেশে রহি কতকাল বরিল খদিজা 'আতীক'[৬] বীরে,
জীবনের পারে সে-ও গেল চলি, আসিল শোকের তিমির ঘিরে।
সে শোকের স্মৃতি শিশুদের বুকে চাপি ভুলে রয় বুকের ব্যথা,
দ্বি-বিংশতি গো বৎসর গেল কাটি জীবনের, কেমন কোথা।
এমন সময় এল আহমদ তরুণ অরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো-ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরি যুবক তখন নবি আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ-কুলের নয়ন-মণি।
'সাদিক' — সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবিরে ভক্তিভরে,
যুবক নবিরে 'আমিন' বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি
মোহাম্মদের আর সব নাম; কায়েম হইল 'আমিন' বুলি।
'আমিন' 'তাহেরা'[৭] সাধু ও সাধ্বী, ইঙ্গিতে ওগো খোদারই যেন
আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদেরে হেন!
মহান খোদারই ইঙ্গিতে যেন 'সাধু' ও 'সাধ্বী' মিলিল আসি,
শক্তি আসিয়া সিদ্ধির রূপে সাধনার হাত ধরিল হাসি।

১ বিবাহে বরের অনুগামীরা। ২ আল্লার কাছে বান্দার সুপারিশ, অনুরোধ। ৩ মিষ্টান্ন, পায়েস।
৪ বিশ্বনবির সহধর্মিনী। ৫ খদিজার প্রথম স্বামী। ৬ পূর্বতন। ৭ সতী, পূণ্যময়ী।

গিরি-ঝরনার স্রোতোবেগে আসি যোগ দিল যেন নহর-পানি,
ঊষর মরুর ধূসর বক্ষে বান ডেকে গেল উদার বাণী!
মরুর আকাশে ঘনাল যে ছায়া, বক্ষ ছাইল যে শীতলতা,
সুজলা সুফলা ধরা যুগে যুগে হেরেছে স্বপ্নে ইহারই কথা।

খদিজা

সদাগর-জাদি বিবি খদিজার সোনার তরি
ফেরে দেশে দেশে মণি-মাণিক্য বোঝাই করি।
সচ্ছলতার বান ডেকে যায় বাহিরে ঘরে,
তবু কেন সব শূনো-শূনো লাগে কাহার তরে।
কী যে অভাব রিক্ততা কোন চিত্ততলে
মরু-ভিখারিনি কী যেন ভিক্ষা মাগিয়া চলে!

'সাদিক'[১] সত্যব্রতী আহমদ জানিত সবে
'আমিন' শুদ্ধাচারী সাধু যে গো হইল কবে।
'তাহেরা' শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী আরব দেশে
সে-ই ছিল, এল প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ বেশে!
কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ সাধু সে তারে
দেখিবে বলিয়া দ্বার খুলি রয় হৃদয়-দ্বারে।
হেথা ঘর ছাড়ি গিরি-শিরে ফেরে অরুণ যুবা,
সহসা তাহারে নাম ধরে ডাকে কে দিল্‌রুবা?
খোঁজে গিরি-গুহা মরু-প্রান্তর যে আলো-শিখা,
পাবে না কি তার দিশা, এই ছিল ললাটে লিখা?
জন্ম-ধেয়ানী বসি একদিন ধেয়ান মধুর
অসীম আলোক-পারাবারে ফেরে স্বপ্ন আতুর —
আহ্বানে কার ভাঙিল ধেয়ান, স্বপ্ন টুটে,
চিত্ত-কাননে আলোর মুকুল মুদিল ফুটে।
নিশিদিন শোনে যে দিল্‌রুবার মঞ্জু-গীতি
অন্তর-তলে, আজ কি গো এল সেই অতিথি?
মেলিতে নয়ন টুটিল স্বপন! নহে সে নহে,
তাহেরা খদিজা পাঠায়েছে তার বার্তাবহে!

কুর্নিশ করি কহিল বান্দা, 'মোদের রানি
দরশ-পিয়াসি তোমার, এনেছি তাহারই বাণী।

১ সত্যবাদী।

বিবি খদিজার প্রাসাদে তোমার চরণ-ধূলি
পড়িবে কখন, সেই আশে আছে দুয়ার খুলি।
বিশাল হেজাজ[১] আরব যাহার প্রসাদ যাচে,
যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে!'
অন্তর-লোক-বিহারী তরুণ বুঝিতে নারে,
তবু আনমনে এল দূত সাথে খদিজা-দ্বারে।

সম্ভ্রম-নতা কহিল খদিজা সালাম করি,
'হে পিতৃব্য-পুত্র! কত সে দিবস ধরি
তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার মহিমা বিপুল,
তব চরিত্র কলঙ্কহীন শশী সমতুল,
তোমার শুদ্ধ আচার, চিত্ত মহানুভব —
হেরিয়া তোমারে অর্ঘ্য দিয়াছি নিত্য নব!
এই হেজাজের সকলের সাথে গোপনে আমি,
আমিন, তোমারে শ্রদ্ধা দিয়াছি দিবস-যামী!
বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।
বিশ্বাসী কেহ নাই পাশে, তাই বিত্ত মম
হইয়াছে ভার, দংশন করে কাঁটার সম।
মম বাণিজ্য-সম্ভার, মোর বিভব যত —
তুমি লও ভার, আমিন, ইহার! চিত্তগত
সন্দেহ মোর দূর হোক! আমি শান্তমুখ
ভুলে রব মোর গত জীবনের সকল দুখ!
তোমার পরশে তব গুণে মম বিভব-রাজি
সোনা হয়ে যাবে, সহস্র-দলে ফুটিবে আজি!
তুমি ছাড়া এই সম্পদ মোর হেজাজ দেশে
রবে না দু-দিন, স্রোতে অসহায় যাইবে ভেসে!
আরবে তুমিই বিশ্বাসী একা, কাহারে আর
নাহি দিতে পারি নিশ্চিন্তে এ বিপুল ভার!'

তরুণ উদাসী বসিয়া বসিয়া ভাবে কী যেন —
'ওগো খোদা, কেন কর পরীক্ষা আমারে হেন!
আমার চিত্তে সকল বিত্ত তুমি যে প্রভু,
তুমি ছাড়া মোর কোনো সে বাসনা নাহি তো কভু!'
মরীচিকা-মাঝে ভ্রান্ত-পথ সে মৃগের মতো
ভীরু চোখ দুটি তুলি কহে যুবা শ্রদ্ধানত, —

১ আরব দেশের পশ্চিমাঞ্চল, বর্তমানে সৌদি-আরব।

'পিতৃতুল্য পিতৃব্য এ মাথার পরে
রয়েছেন আজও, তাঁরে জিজ্ঞাসি তোমার ঘরে
আসিব আবার, কহিব তখন যা হয় আসি।'
লইল বিদায় ; খদিজা হাসিল মলিন হাসি!

তরুণ তাপস চলিয়া গেল গো যে পথ বাহি
সকল ভুলিযা খদিজা রহে গো সে পথ চাহি।
বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে, কোন মায়ায়!
'জুলেখার'[১] মতো অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ 'য়ুসোফ'[২] যেন!
দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয় ইহার চেয়ে
সুন্দরতর ছিল না সে কভু। বেহেশ্‌ত বেয়ে
সুন্দরতম ফেরেশতা আজ এসেছে নামি
এল জীবনের গোধূলি-লগনে জীবন-স্বামী!
ফোটেনি যে আজও সে মুকুলি মনে শতেক আশা,
শোনে কি গো কেহ ঝরার আগের ফুলের ভাষা!
চিরযৌবনা বাসনার কভু মৃত্যু নাহি,
মনের রাজ্যের অক্ষয় তার শাহানশাহি।

উদয়-বেলায় মন ছিল তার জলদে ঢাকা,
হেরেনি প্রেমের রবির কিরণ সোনায় মাখা।
আসিল জীবন-মধ্যাহ্নে যে — সে নহে রবি,
দিন চলি গেছে — হেরিল না দিনমণির ছবি।
বেলা বয়ে যায় — সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ
বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন!

আছে আছে বেলা, বেলা-শেষের সে অনেক দেরি,
পুরবিতে নয় — শ্রী রাগে এখনও বাজিছে ভেরি!
ওরে আছে বেলা, ভাঙেনিকো মেলা, ইহারই মাঝে
প্রাণের সওদা করে নে, বরে নে হৃদয়-রাজে।
ফেরেনি রে নীড়ে এখনও বিদায়-বেলায় পাখি,
নাহিকো' কাজল, আজও আছে জলভরা এ আঁখি।

---

১ মিশরের মন্ত্রী আচার্য মিশরের পত্নী, য়ুসোফের প্রতি প্রেমাসক্তির জন্য বিখ্যাত। ২ আল্লাহর অন্যতম রসুল।

শুকায়েছে ফুল, শুকায়েছে মালা, — নয়ন-জলে
রাজাধিরাজের হবে অভিষেক হৃদয়তলে।
হোক হোক অপরাহ্ন এ বেলা হৃদ-গগনে
এই তো প্রথম উদিল সূর্য শুভ-লগনে।
হোক অবেলায় — তবু এ প্রেমের প্রথম প্রভাত,
পহিল প্রেমের উদয়-উষার রাঙা সওগাত।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে সাজিয়া তারে,
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।

আবু তালিবের কাছে আসি কহে তরুণ নবি
তাহেরা খদিজা কয়েছিল যাহা যাহা — সে সবই।
বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি
খোদারে স্মরিয়া ভেজিল শোকর[১] জুড়িয়া পানি।
সুবৃহৎ ছিল পরিবার তাঁর পোষ্য বহু
চিন্তায় তারই পানি হয়ে যেত দেহের লোহু।
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ওঠে আরব জুড়ি,
যাহা কিছু ছিল সঞ্চিত যার গেল গো উড়ি।
হেন দুর্দিনে আসিল যেন গো গায়েবি ধ্বনি,
না চাহিতে এল শুভ ভাগ্যের আমন্ত্রণী।
সৌভাগ্যের এ দাওত[২] কেহ ফিরায় কি গো,
আপনি আসিয়া ধরা দিল আজ সোনার মৃগ।

আনমনে চলে তরুণ 'আমিন' সেই সে পথে,
যে-পথে দৃষ্টি পাতিয়া খদিজা কখন হতে
বসি আছে একা; জাফরির ফাঁকে নয়ন-পাখি
উড়ে যেতে চায়, — কারে যেন হায় আনিবে ডাকি।
ধন্য যে আজ হেজাজের[৩] মাঝে ভাগ্যবতী —
ওই আসে ওই তরুণ অরুণ মৃদুল-গতি।
'মোতাকারিব'[৪] আর 'হজজ্'[৫] 'রমল্'[৬] ছন্দ যত
লুটাইয়া পড়ে যেন গো তাহার চরণাহত।

বাতায়নে বসি খদিজার বুকে বেদনা বাজে,
না জানি কত না কণ্টক আছে ও-পথ মাঝে!
কঙ্করময় অকরুণ পথে চলিতে পায়ে
কত যেন লাগে, সে বাঁচে হৃদয় দিলে বিছায়ে!

কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ। ২ নিমন্ত্রণ। ৩ আরবের পশ্চিমাঞ্চল। ৪,৫ ও ৬ আরবি ছন্দ বিশেষ।

আসিল তরুণ, কহিল সকল স্বপন সম,
দৃষ্টি নাহি কো কোথা ফোটে ফুল গোপনতম
কোন সে কাননে আলোকে তাহারই! আপন মনে
খোঁজে সে কাহারে আকুল আঁধারে অজানা জনে।

খদিজা তাহার বাণিজ্য-ভার 'আমিনে' দিয়া
কহিল, 'সকলই দিলাম তোমারে সমর্পিয়া।'
নীরবে লইল সে ভার 'আমিন' স্বপ্নচারী, —
পুলকে খদিজা রুধিতে পারে না নয়ন-বারি।
লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হাবিব[১] খোদার সাজিল আবার তাঁরই ইঙ্গিতে সওদাগর!
'কাফেলা'[২] লইয়া চলে আবার
'শাম'[৩] 'এয়্মন্'[৪] মরুভূমি-পার,
'হোবাশা'[৫] 'জোরশ'[৬] কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর,
সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর বদর!

রোজ কিয়ামতে পাপ-সিন্ধুর নাইয়া হবে যে নবি রসুল,
হল বাণিজ্য-কাণ্ডারি সে গো, লীলা-বাতুলের মধুর ভুল!
বিদেশ ঘুরিয়া ফেরে স্বদেশ
পুন যায় দূর দেশের শেষ,
সোনার ছোঁয়ায় পণ্য-তরুর শাখে শাখে ফোটে মণির ফুল।
উপকূলে খোঁজে রতন — যাহারে খুঁজিছে রত্নাকর অকূল।

অনুরাগ-রাঙা খদিজার হিয়া ধৈরজ যেন মানে না আর,
ভার হয়ে ওঠে, তরুণ বণিক বয়ে আনে যত রতন-ভার।
প্রতিভা জ্ঞানের নাহি সীমা —
একী চরিত্র-মাধুরিমা,
একী এ উদয়-অরুণিমা আজি ঝলকি ওঠে গো দিগ্‌বিথার!
পল্লবে ফুলে উঠিল গো দুলে শুষ্ক মাধবী-লতা আবার!

কী হবে এ ছার মণিসম্ভার বিপুল করিয়া নিরবধি,
পরানে তৃষ্ণা অমৃতের ক্ষুধা মিটিল না এ জীবনে যদি।
উদাসীন যুবা ফিরে না চায়,
কোন বিরহিণী খোঁজে গো তায়,

১ বন্ধু, সখা। ২ তীর্থযাত্রীর দল। ৩ আরবের অন্যতম দেশ, সিরিয়া। ৪ আরবের দেশ ইয়েমেন উত্তর দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত। ৫, ৬ আরবের শহর বিশেষ।

সিন্ধুর তাতে কী বা আসে যায় যদি তারে নাহি চায় নদী,
আপনাতে সে যে পূর্ণ আপনি — বিরাট বিপুল মহোদধি।
মনের দেশের ও যেন নহে গো, বনের দেশের চির-তাপস,
মন নিয়ে খেলা ও যেন বোঝে না, ও চাহে না সম্মান ও যশ।
নয়নে তাহার অতল ধ্যান
রহস্য-মাখা বিধু বয়ান,
ধরার অতীত ও যেন গো কেহ, ধরা নারে ওরে করিতে বশ।
ও যেন আলোর মুক্তির দূত, সৃজন-দিনের আদি-হরষ।

যত মনে হয় ধরার নহে ও, মায়াপুরীর ও রূপকুমার,
তত খদিজার মন কেন ধায় উহারই পানে গো দুর্নিবার।
যে কেহ হোক সে, নাহিকো ভয়,
খদিজা তাহারে করিবে জয়,
নহে তপস্যা একা পুরুষের — নব-তপস্যা প্রেমের তার।
হয় তারে জয় করিবে, নতুবা লভিবে অমৃত মরণ-পার।

ছিল খদিজার আত্মার আত্মীয় সহচরী 'নাফিসা' নাম,
কহিল তাহারে অন্তর-ব্যথা, হরেছে কে তার সুখ আরাম!
অনুরাগ-ভরে বেপথু মন
হুহু করে কেন সকল খন,
'সখী লো, জহর পিইয়া মরিব, না পুরিলে মোর মনস্কাম।
সে বিনে আমার এই দুনিয়ার সব আনন্দ সুখ হারাম।

কে রেখেছে সখী শহদ্-শিরীন[১] হেন মধুনাম — মোহাম্মদ!
হেজাজের নয় — ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ!
সব ব্যবধান যায় ঘুচে
বয়সের লেখা যায় মুছে,
যত দেখি তত মনে হয় সখী, আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দি করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদি-মোবারক-বাদি-সনদ।
দূতী হয়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রানি যারে চায় বুলন্দ-নসিব বলি তারে।
প্রসাদ যাহার যাচে আরব,
করে গুণগান — রচে স্তব,
যাচিয়া সে যাহারে চাহে বরি নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে?
বিরাট সাগরে পায় কি ঝরনা? মহানদী মেশে পারাবারে!

১ মধু, পুষ্পরস।

যৌবন ? সে তো ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়,
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু-মায়ায়।
নাহি শতদল শুধু মৃণাল —
কামনা-সায়র টাল-মাটাল,
সেথা উদ্দাম মত্ত বাসনা ফুলবনে ফেরে করীর প্রায়,
সুন্দর চাহে ফুলের সুরভি, অরসিকে শুধু সুষমা চায়।

যুবা আহমদ মগ্ন ধেয়ানে, নাফিসা আসিয়া ভাঙিল ধ্যান,
কহিল, 'আমিন ! আজিও কুমার-জীবন যাপিছ হয়ে পাষাণ,
কোন দুখে বলো, তাপস-প্রায়
কোনো কিছু যেন চাহ না, হায় !
হেজাজ-গগনে তুমি যে হেলাল[১], তুমি কেন থাক চিন্তাম্লান ?

রুচির শুভ্র হাসি হেসে বলে তরুণ ধেয়ানী মহিমময়,
'বিবাহের মোর সম্বল নাই, বিবাহ আমার লক্ষ্য নয় !'
কহিল নাফিসা, 'হে সুন্দর !
যাচে যদি কেহ তোমারে বর,
গুণে গৌরবে তুলনা যাহার নাই, গাহে যার হেজাজ জয়,
সেই মহীয়সী নারী যদি যাচে, তুমি হবে তার ? দাও অভয় !'

ধ্যানের মানস-নেত্রে হেরিল তরুণ ধেয়ানী ভবিষ্যৎ —
কল্যাণী এক নারী দীপ জ্বালি গহন তিমিরে দেখায় পথ।
চারিধারে অরি — বন্ধুহীন
যুঝিছে একাকী যেন আমিন,
সে নারী আসিয়া বর্ম হইয়া দাঁড়াল সুমুখে, ধরিল রথ !
সাধনা-ঊর্ধ্বে সে এল সহসা শক্তিরূপিণী — সিদ্ধিবৎ !

এমনই চোখের চেনাচেনি নিতি, মানস-চক্ষে দেখেনি তায়,
দেখেনি তাহার অন্তরে কবে ফুটিয়াছে প্রেমে শত বিভায়।
প্রেম-লোক সে যে জ্যোতির্মতী
চির-যৌবনা চির-সতী !
তবু নাফিসারে কহিল আমিন, 'কোন ললনা সে, বাস কোথায় ?"
নাফিসা হাসিয়া কহিল, 'খদিজা, হেজাজ লুটায় যাহার পায় !'

হজরত কন, 'বামন হইয়া কেমনে বাড়াব চন্দ্রে হাত !'
নাফিসা কহিল, 'অসম্ভব যা, সে আসে এমনই অকস্মাৎ !'

১। নতুন চাঁদ।

খদিজা শুনিল খোশখবর,
পরানে খুশির বহে নহর।
আবুতালিবের কাছে এল নিযে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরে নবির খুল্লতাত।
তালিবের মনে খুশির বন্যা টইটম্বুর সর্বদাই,
আরবের রানি তাহিরা খদিজা বধূমাতা হবে, আর কী চাই।
'আমার ইবনে আসাদ' বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর
শুভ বিবাহের পয়গাম[১] তারে পাঠাল — দেশের রেওযাজ তাই।
দিন ও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুব,
খদিজার মন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিধুর!
প্রণয়-সূর্য হল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ধ্যান ভেঙে যায, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর!

তরুণ নবির রবির আলোক চুরি করে এল এ কোন চাঁদ,
স্বর্গের দূত ধরিতে কি সে গো পেতেছে ধরায় নয়ন-ফাঁদ!
মানবীর প্রেম এই যদি
টলমল করে মন-নদী,
না জানি কেমন প্রেম তার করে সৃজন যে-জন নিরবধি!
নদী হেরি মন এমন, না জানি কী হয় হেরিলে সে জলধি!

সম্প্রদান

বাজিল বেহেশতে বীণ আসিল সে শুভদিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে
সুন্দর সুন্দরতর হল আজ ধরা পর
সন্ধ্যারানি বধূবেশে নামিল গো হেসে।
হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখীরা সবে মূক বাণীহারা,

১ সুসংবাদ।

কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে, বুঝিতে নারে,
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখিতারা।

শাদির মহফিল[১] মাঝে বসিয়া নওশার[২] সাজে
নবিবর, আত্মীয় কুটুম্ব ঘিরি তারে,
চারিদিকে তারাদল, মাঝে চাঁদ ঝলমল,
হুরপরি লুকায় তা হেরি দিকপারে।
তালিব উঠিয়া কহে 'লগ্ন যায়, আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য হোক সমাপন!'
আনন্দের সে সভায় সকলে দানিল সায়
মজলিশে বসিল আসি কন্যাপক্ষগণ।

হেজাজি আচারমতো রেসম রেওয়াজ যত
হলে শেষ — খদিজার পিতৃব্য আসাদ
আহমদের কর ধরি দিল সমর্পণ করি
কন্যারে — সভায় ওঠে মোবারকবাদ!

কহিল আসাদ বীর করে মুছি অশ্রু-নীর,
'হে সাদিক, হে আমিন, হেজাজের মণি,
পিতৃহীনা খদিজায় দিলাম তোমার পায়,
তোমারে জামাতা পেয়ে ভাগ্য বলে গণি।
হে নয়ন-অভিরাম! সার্থক তোমার নাম
রয় যেন চিরদিন পবিত্র হেজাজে,
চির-প্রেমাস্পদ হয়ে এ বধূ-রতনে লয়ে
আদর্শ দম্পতি হও আরবের মাঝে।'
'তাই হোক, তাই হোক' কহিল সভার লোক;
বর-বেশ-নবি সবে করিল সালাম।
নহবতে বাঁশি বাজে, হোথায় অন্দর মাঝে
নৃত্যগীত-স্রোত বয়ে চলে অবিরাম।
হুরিপরি নাচে গায় বেহেশ্‌তের জলসায়
আরশ[৩] আরাস্তা[৪] হল! — খোদার হবিব
হবিবায় পেল আজি, ভেরি তূরী ওঠে বাজি,
খুশির খবর বিশ্বে শোনায় নকিব।
বয়সের বন্ধনে কে বাঁধিবে যৌবনে,
য়ুসোফ বুঝিয়াছিল দেখে জুলেখায়,

১ আসর, জলসা। ২ নবীন রাজা। ৩ আল্লার সিংহাসন। ৪ সজ্জিত, শোভিত।

চল্লিশ বছর তার বয়স হইল পার
তবু তারে দেখে জোহরা আকাশে পলায়।
সে কাহিনি নব-রূপে রূপ ধরি এল চুপে,
গোধূলি-বেলার রূপ দেখিবি কে আয়,
উদয়-উষাও আজ পলায় পাইয়া লাজ,
উঠিয়া ঈদের চাঁদ আবার লুকায়।

চল্লিশ বসন্ত দিন আছে এ মালায় লীন,
শুকায়নি আজও বঁধু পরেনিকো বলে,
প্রেমের শিশিরজলে ভিজায়ে অন্তরতলে
রেখেছিল জিয়াইযে — দিল আজি গলে।
উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইযা দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধবা দিল রাহুমুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।

নও কাবা

হিয়ায মিলিল হিয়া,
নদীস্রোত হল খরতর আরও পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।
স্রোতোবেগ আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসি কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কত দূর পথ, কোন দিকে হবে যেতে,
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।
কত মরু-পথ গিরি-পর্বত মাঝে কত দরি বন,
বাধা-নিষেধের সব ব্যবধান লঙ্ঘিয়া অনুখন
তবু ছুটে চলে, শুনিয়াছে সে যে দূর সিন্ধুর ডাক,
রক্তে তাহারই প্রতিধ্বনি সে আজও শোনে নির্বাক।
সকল ভাবনা হয়ে গেছে দূর, অনন্ত অবকাশ
ধ্যানের অমৃতে উঠিছে ভরিয়া। দিবস বরষ মাস
কোথা দিয়া যায়, উদ্দেশ নাই! শুধু অন্তর-পুর
শুনিতেছে দূর আহ্বান-বাণী অনাগত বন্ধুর।
পথে যেতে যেতে চমকিয়া চায়, কে যেন পথের পাশে
ডাকনাম ধরে ডেকে গেল তারে, হাতছানি দিয়া হাসে।
তারই সন্ধানে উষর মরুর ধূসর বুকে সে ফেরে,
সে বুঝি লুকায়ে গিরি-গহ্বরে ওই দূর একটেরে!

কোথাও না পেয়ে তরুণ ধেয়ানী হারায় ধেয়ান-লোকে,
এ কী এ বেদনা-আর্ত মুরতি ফোটে গো সহসা চোখে।
যে দোস্ত লাগি ফেরে সে বিবাগি, খোঁজে সে যে সুন্দরে,
সে কোথাও নাই, বিরাট বেদনা দাঁড়ায়ে বিশ্ব পরে।
অনন্ত দুখ-শোক-তাপ ব্যথা, অসীম অশ্রুজল —
অকূল সে জলে একাকী সে দোলে বেদনা-নীলোৎপল।
বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গা বেয়ে।
শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনাধাম।

পড়ে যায় মাঝে কালো যবনিকা, সহসা আঁখির আগে
অসুন্দরের কুৎসিত লীলা ব্যভিচার শত জাগে।
উদ্যত-ফণা কুটিল হিংসা দ্বেষ হানাহানি শত
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরে দংশি মারিতেছে অবিরত।
পাপে অসূয়ায় পঙ্কিল পাঁকে ডুবে আছে চরাচর,
দিশারি তাদের শয়তান, তার অনুচর নারী নর।
দেখিতে পারে না এ-দৃশ্য আর, নিমিষে টুটে সে ধ্যান,
দুঃখ-পাপের লোকালয় পানে ছুটে আসে ব্যথা-ম্লান।

হেরে প্রান্তরে কুটিরের দ্বারে কাঁদে অনাথিনি একা,
কাল তার স্বামী গিয়াছে চলিয়া, জীবনে হবে না দেখা!
অদূরে পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রের নাম ধরি
ডাকে আর কাঁদে — বঞ্চিত স্নেহ আঁখিজল পড়ে ঝরি।
পথে যেতে যেতে খঞ্জ অন্ধ ভিখারিরা অসহায়
ক্ষুধার তাড়নে পড়ে মুমূর্ষু, ভরে মন করুণায়।
পিতৃমাতৃহীন শিশুদল চায় পথিকের পানে,
তাহারা তাদের পিতা ও মাতার সন্ধান বুঝি জানে।

তরুণ তাপস চলিতে পারে না, বেদনার উচ্ছ্বাস
ফুলে ফুলে ওঠে অন্তর-কূলে, বন্ধ হয় বা শ্বাস!
উর্ধ্বে আলোর অনন্ত-লীলা, নিম্নে ধরণি পরে
এমন করিয়া দুঃখ-গ্লানির কেন গো বরষা ঝরে।
ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে হেরে পথে ধনী যুবা
নগ্ন মাতাল টলে আর চলে, পাশে তার দিলরুবা।
দিলরুবা নয় — প্রতিবেশিনী ও কুমারী চেনা সে মেয়ে,
অর্থের বিনিময়ে ও মাতাল এনেছে তাহারে চেয়ে!

সহসা হেরিল — বর্বর এক পিতা তার ক্রোড়ে লয়ে
চলিছে সদ্যোজাত কন্যাবে বধিতে সমাজ-ভয়ে!
কন্যা হওয়া যে 'লাত মানাতের'[১] অভিশাপ, তাই তারে
বধিতে চলেছে — অভাগি জননী কাঁদিছে পথের ধারে।
হেরিল অদূরে ভীম হানাহানি পশুতে পশুতে রণ
নারী লয়ে এক — বিজয়ীবে বীর বলিছে সর্বজন!
চলিতে চলিতে হেরে দূরে এক বাজার বসেছে ভারী,
ছাগ উট সাথে বিক্রয় লাগি বসে অপরূপা নারী।
মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন-জর্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম।
তাহারই পার্শ্বে পশু-ধনী এক তাহার গোলামে ধরি
হানিছে চাবুক — কুক্কুরে; বুঝি মারে না তেমন করি!
সহসা শুনিল অনাহত বাণী ঊর্ধ্বে গগন-পারে —
'হে ত্রাণ-কর্তা, জাগো জাগো, দূর করো এই বেদনারে!'
চমকিয়া ওঠে নবির চিত্ত, শিহরন জাগে প্রাণে,
মনে লাগে যেন ইহাদের সে-ই মুক্তির দিশা জানে।

স্বপ্ন-আতুর যুবক ধেয়ানী আনমনে পথ চলে,
চলিতে চলিতে কখন সন্ধ্যা ঘনায় আকাশতলে।
ধরার ঊর্ধ্বে অসীম গগন, কোটি কোটি গ্রহ-তারা
সে গগন ভরি ঢালে আনন্দে নিশিদিন জ্যোতিধারা।
তাহাদের মাঝে নাহি তো বিরোধ, প্রেমের আকর্ষণে
ভালোবেসে নিজ নিজ পথে চলে, মাতে না প্রলয়-রণে।
এই আলো — এই আনন্দ — এই সহজ সরল পথ
এই প্রেম, এই কল্যাণ ত্যজি — রচে এরা পর্বত
শত ব্যবধান-নদীপ্রান্তর ঘরে ঘরে মনে মনে,
অকল্যাণের ভূত শয়তান পূজা করে জনে জনে!
তপঃপ্রভাবে সাধনার জোরে অসুন্দর এ ধরা
করিতে হইবে সুন্দরতম, রবে না এ শোক জরা।
রবে না হেথায় পাপের এ ক্লেদ, এ গ্লানি মুছিতে হবে,
পতিতা পৃথ্বী পাবে ঠাঁই পুন আলোর মহোৎসবে।
আঁধার ইহার কক্ষে আবার জ্বলিবে শুভ্র আলো,
হে মানব, জাগো! মেঘময় পথে বজ্র-মশাল জ্বালো।

১ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের বনি সফিকের পূজ্য দুই দেবী।

আছে পথ, আছে দুঃখের শেষ, আমি শুনেছি সে বাণী,
বিশ্ব-সুষমা-সভায় এ-ধরা হাসিবে অতীত-গ্লানি!
দেখেছি বেদনা-সুন্দরে আমি তোমাদের ম্লান মুখে,
ঘুচিবে বিষাদ — আসিবে শান্তি প্রেম-প্রশান্ত বুকে।

হেথায় খদিজা একা
কাঁদে বিরহিণী, উদাসীন তার স্বামীর নাহিকো দেখা!
পলাতকা ওরে বাঁধিবে কেমনে, কোথায় তেমন ফাঁসি,
কার কথা ভাবি চমকিয়া ওঠে হেরে ভালোবাসাবাসি!
বক্ষে তাহারে পুরিয়া রাখিলে নিশাসে উড়িয়া যায়,
নয়নে রাখিলে আঁখি-বারি হয়ে গলে পড়ে সে যে, হায়!
বাহুতে বাঁধিলে ঘুম-ঘোরে সে যে ছিঁড়ে বন্ধন-ডোর,
বক্ষের মণি-হার করে রাখে, চুরি করে নেয় চোর!

কেন এ বিবাগি, কার অনুরাগী সকল সুখেরে দলে
রৌদ্র-তপ্ত কঙ্করভরা মরুপথে যায় চলে।
আপনার মনে সে কাহার সনে নিশিদিন কথা কয়,
বসিলে ধেয়ানে চাহিতে পারে না, রবি সে জ্যোতির্ময়!
আদর করিয়া পাগল বলিলে শিশুর মতো সে হাসে,
একী রহস্য, এত অবহেলা, তবু যেন ভালোবাসে।

একদা ইহারই মাঝে
প্রেমিকে তাঁহার লাগালেন খোদা তাঁর প্রিয়তম কাজে।
আদি উপাসনা-মন্দির কাবা — যাহারে ইব্রাহিম
নির্মল কোন প্রভাতে পূজিতে খোদারে মহামহিম, —
সেই কাবাঘরে ছিল না প্রাচীর, ভেঙেছিল তারে কাল,
চারিদিক ঘিরি জমেছিল তার মূর্তি ও জঞ্জাল।
বর্ষার জল ঢুকি সেই ঘরে করিত পঙ্কময়,
পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর, তাও কিছুকাল পরে
বর্ষার স্রোতে ভেসে গেল। ওঠে আল্লার ঘর ভরে
ধূলি-জঞ্জালে, মিলিয়া তখন ভক্ত কোরেশ সবে
ভাবিতে লাগিল কী উপায়ে এর রক্ষা-সাধন হবে।
পূজা-মন্দিরে রবে নাকো ছাদ, এই বিশ্বাসে তারা
ছাদহীন করে রেখেছিল কাবা, ঝরিবে আশিস-ধারা
উর্ধ্ব হইতে। ভূত প্রেত যত দেবতারা নামি রাতে
লইবে সে পূজা, ফিরে যাবে যদি বাধা পায় তারা ছাতে!

লঙ্ঘি কাবার ভগ্নপ্রাচীর এরই মাঝে এক চোর
মূর্তি-পূজারি ভক্তের মনে হানিল ব্যথা কঠোর।
মূর্তির গায়ে ছিল অমূল্য যা কিছু অলংকার
মণি-মাণিক্য, — হরিল সকল! অভাবিত অনাচার!
কাবার সুমুখে ছিল এক কূপ, ভক্ত পূজারি দল
পূজা-সামগ্রী দেব-উদ্দেশে সেই কূপে অবিরল
ফেলিতে লাগিল, সেই সব বলি, ফুল পাতা ক্রমে পচে
কাবা-মন্দিরে বিকট-গন্ধ নরক তুলিলা রচে।
হেরিল একদা ভক্ত সে এক — সে কূপ-গাত্র বেয়ে
উঠিয়া আসিছে অজগর এক সর্পিল বেগে ধেয়ে।
ক্রমে নাগরাজ কূপ-গুহা ছাড়ি কাবায় পাতিল হানা,
ভক্ত পূজারি ভয়ে সেথা হতে উঠাইল আস্তানা।
পূজা দিতে আর কেহ নাহি আসে, ভীষণ সর্প-ভীতি,
কত শত করে মানত তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি।
একদিন এক ঈগল পক্ষী সহসা সে অজগরে
ছোঁ মারিয়া লয়ে গেল তারে দূর পর্বত কন্দরে।
আবার চলিল নব-উদ্যমে মূর্তিপূজার ঘটা।
ভক্তদলের মনে এল এই বিশ্বাস আলো-ছটা;
কাবা-মন্দির সংস্কারের মানত করেছে বলে
অজগরে লয়ে গেলেন ঠাকুর ঈগল পাখির ছলে!

সকল গোত্র-সর্দার আসি মিলিল সে এক ঠাঁই,
যা দিয়া গড়িবে কায়েম করিয়া কাবারে, হেজাজে নাই
তেমন কিছুই। শুনিল তাহারা একদিন লোকমুখে —
গ্রিক-বাণিজ্য-পোত এক গেছে ভাঙিয়া 'জেদ্দা'-বুকে;
ঝটিকা-তাড়িত ভগ্ন সে তরি আছে, বিক্রয় লাগি।
সর্দার সব এ খবর পেয়ে উঠিল আবার জাগি।
আনিল অলিদ[১] ভগ্ন পোতের তক্তা সকল কিনে,
কাবা মন্দির গড়িয়া তুলিল সবে মিলে কিছুদিনে।

নির্মিত যবে হল মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন এক অজানায়।
আছিল 'হাজর আস্‌ওয়াদ্'[২] নামে প্রস্তর কাবার দ্বারে,

১ ইসলাম-বিরোধী কোরেশ-নেতা, খালেদের পিতা। ২ কাবা শরিফের প্রাচীরের কালো পাথর। হজযাত্রীগণ পবিত্রজ্ঞানে চুম্বন করে।

কাবাব বোধন-দিনে হজরত ইব্রাহিম সে তারে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামতো,
সেই হতে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধানত।
কেহ কেহ বলে, আদিম মানব 'আদম' স্বর্গ হতে
আনিয়াছিলেন ওই প্রস্তর ধূলির ধরণি-পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি যে-গোত্র কাবা-দ্বারে
রক্ষিবে — সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
এই ধারণায় সকল গোত্রে বাধিল কলহ ঘোর,
প্রতি গোষ্ঠী সে বলে, 'ও-পাথরে একা অধিকার মোর।'
সে কলহ ক্রমে হইতে লাগিল ভীম হতে ভীমতর ;
আবার ভীষণ যুদ্ধ সূচনা, কাঁপে দেশ থরথর!
রক্ত-পূর্ণ পাত্রে হস্ত ডুবাইয়া তারা সবে
করিল মরণ-প্রতিজ্ঞা তারা — মাতিবে ভীম আহবে!
দামামা নাকাড়া ডিমি ডিমি বাজে, হাঁকিল নকিব তূরী,
পক্ষ মেলিয়া 'মালিকুল মউত'[১] আঁটিল কটিতে ছুরি।

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সে জইফ[২] 'আবু উমাইয়া',
যুযুৎসু সব গোত্রে অনেক কহিলেন সমঝাইয়া —
'যে শুভব্রতের করিলে সাধনা, অশুভ কলহ-রণে
নাশিয়ো না তারে সিদ্ধিলাভের মহান শুভক্ষণে।
শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃদ্ধের শোনো উপদেশ-বাণী,
সংবরো এই আত্মবিনাশী হীন রণ হানাহানি।
কাবা-মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই
এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই!'

শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধের এই কল্যাণ-বাণী শুনি,
বিরত হইল কলহে তাহারা, বলে, 'মারহাবা'[৩] গুণী!
অপলক চোখে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল সবে,
না জানি সে কোন অজানিত জন পশিবে কাবায় কবে -

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কাবা-মন্দিরে
সর্বপ্রথম উপাসনা লাগি পশে আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চিৎকারি —
'সম্মত এরে মানিতে সালিশ — আমিন এ ব্রতচারী!'

১ মৃত্যুর দূত। ২ বলহীন। ৩ ধন্য, শাবাশ।

হেজাল-দুলাল সত্যব্রতী বিশ্বাসী আহমদ
ছিল সকলের নয়নের মণি গৌরব-সম্পদ।
শুনিয়া সকল, কহিল তরুণ সাধক, 'আমার বিধি
মান যদি সব বীর সর্দার — স্ব-গোত্র প্রতিনিধি
করো নির্বাচন, তারপরে সব প্রতিনিধি মিলে
পবিত্র এই প্রস্তর নিয়ে চলো কাবা-মঞ্জিলে।
আমার উত্তরীয় দিয়া এরে বাঁধিয়া তাহার পর
এক সাথে এরে রাখিব কাবায়।' কহে সবে 'সুন্দর!
সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমিন, হেজাজে ধন্য!
তুমি রাখো এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য!'
রাখিলেন হজরত পবিত্র প্রস্তর কাবা-ঘরে,
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস-বরে।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমিন মোহাম্মদ আরবস্তানে।

জব্বুর তওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্বে, বেহেশ্‌ত হইতে টানি
আনিল পীড়িতা মূক ধরণির তপস্যা আজি তারে,
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ, অবতার এল দ্বারে!
সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর — আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবি অমৃতেশ!
হেরিল প্রাচীনা ধরণি আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্তা আসিল, ভয় নাই, গাহো জয়।
যে সিদ্দিক ও আমিনে খুঁজেছে বাইবেল আর ইশা
তওরাত দিল বারে বারে সেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে 'মহামর্দে' অথর্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি,
সে অতিথি এল, কতকাল ওরে — আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল! বিশ্ব উঠিল ভরে, —
আলোকে, পুলকে, ফুলে ফলে, রূপে রসে, বর্ণ ও গন্ধে,
গ্রহতারা-লোক পতিতা ধরায় আজি পূজা করে, বন্দে!

সাম্যবাদী

আদি উপাসনালয় ·

উঠিল আবার নূতন করিয়া — ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্তি নূতন করি
বসিল সোনার বেদিতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি।
সহিতে না পারি এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
যেখানে মুক্তি পথ খোঁজে নবি, কাঁদিয়া ওঠে পরান।
খদিজারে কন — "আল্লাতালার কসম, কাবার ওই
'লাৎ' 'ওজ্জা'র করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া।"
সাধ্বী পতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে —
'দূর করো ওই লাত্ মানাতেরে পূজে যাহা সব-জনে!
তব শুভ বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।'
ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল — মোহাম্মদ আমিন
করে নাকো পূজা কাবার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

শেষ সওগাত

প্রথম সংস্করণ
২৫ বৈশাখ ১৩৬৫
মে ১৯৫৯

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির তালিকা

জাগো সৈনিক আত্মা
কেন আপনারে হানি' হেলা
নবাগত উৎপাত
বন্ধুরা এসো ফিরে
নারী
নিত্য প্রবল হও
আগ্নেয়গিরি বাঙলার যৌবন
তুমি কি গিয়াছ ভুলে
চির বিদ্রোহী
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা
সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি
হুল ও ফুল
কোথা সে পূর্ণযোগী
রবির জন্মতিথি
করুণ বেহাগ
বড়দিন
নবযুগ
শোধ করো ঋণ
মোহর্রম
আর কত দিন
বিশ্বাস ও আশা
ডুবিবে না আশাতরী
সকল পথের বন্ধু
তোমারে ভিক্ষা দাও
বক্‌রীদ্
আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও
এ কি আল্লার কৃপা নয়
মহাত্মা মোহ্‌সীন
এক আল্লাহ্ 'জিন্দাবাদ'
গোঁড়ামি ধর্ম নয়
জোর জমিযাছে খেলা
বোমার ভয়
কচুরীপানা
টাকাওয়ালা
কবির মুক্তি
ছন্দিতা
পূরববঙ্গা
আরতি
পার্থ-সারথি
আত্মগত
কাবেরী-তীরে
অমৃতের সন্তান

জাগো সৈনিক-আত্মা

জাগো সৈনিক-আত্মা! জাগো রে দুর্মদ যৌবন!
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি আসিছে ভয়াল প্রভঞ্জন।
রক্ত রসনা বিস্ফারি আসে করাল ভয়ংকর!
অগ্নি উগারি ওড়ে আগ্নেয়ী জুড়িয়া নীলাম্বর।
এখনও তন্দ্রা নিদ্রা জড়তা ক্লৈব্য গেল না তোর?
ব্রজ দমকে দামিনী চমকে, এল ঘনঘটা ঘোর!
এখনও ঘুমাবে হে অমর মানবাত্মা অন্ধকারে
পরি দৈন্যের শৃঙ্খল হায় পাতালের কারাগারে!
গরজে কামান, তোপ, গোলাগুলি ছুটিছে দিগ্‌বিদিকে,
জড়াইয়া ধরে প্রিয়া-সম সৈনিক সেই বহ্নিকে।
গুলি ও গোলারে প্রিয়ার বুকের মালার ফুলের মতো
লইতেছে তুলি আজ জগতের বীর সৈনিক যত।
জাগো জাগো এদেশের দুর্বার দুরন্ত যৌবন!
আগুনের ফুল-সুরভি এনেছে চৈতালি সমীরণ।
সেই সুরভির নেশায় জেগেছে অঙ্গে অঙ্গে তেজ,
রক্তের রঙে রাঙায় ভুবন ভৈরব রংরেজ[১]!
জাগো অনিদ্র অভয় মুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ,
তোমাদের পদধ্বনি শুনি হোক অভিনব উত্থান
পরাধীন শৃঙ্খল-কবলিত পতিত এ ভারতের!
এসো যৌবন রণ-রস-ঘন হাতে লয়ে শমশের[২]!
মৃত্যুর নয় — অমৃতের উৎসবের আমন্ত্রণ
আসিতেছে ওই রক্ত-রঙিন লিপি লয়ে যে মরণ—
বরণ করিয়া চলো সেই উৎসব-অভিযান-পথে,
মহাশক্তির তুষার গলিয়া ছুটুক প্রবল স্রোতে!
দঙ্গল বাঁধি এসো ময়দানে করিয়া কুচকাওয়াজ,
গর্জি উঠুক বক্ষে রণোন্মত্ত গোলন্দাজ!
রক্তে রক্তে এ কোন রুদ্র নটরাজ নাচে নাচে রে!
মৃত্যুরে খুঁজি মধুমাছি, মৃত্যুর মধু কোথা আছে রে!
সাইক্লোন নাচে শিরায় শিরায় মন সেথা চলে ছুটে
কোথায় বোমার ধূপদানি হতে বারুদের ধোঁয়া উঠে?

১ যিনি বস্ত্রাদিতে রং করেন। ২ তরবারি।

চলো জাগ্রত মানবাত্মা সামরিক সেনাদল,
যথা প্রাণ ঝরে-ঝরে পড়ে যেন বাদলের ফুলদল!
মাদল বাজিছে কামানের ওই শোনো মহা-আহ্বান!
জীবনের পথে চলো আর চলো — 'অভিযান, অভিযান'!

কেন আপনারে হানি হেলা?

বন্ধুরা কহে, 'হায় কবি, খেল এ কী নিষ্ঠুর খেলা,
কোন অকারণ অভিমানে আপনারে হান অবহেলা?'
হাসিয়া কহিনু — 'হয়েছে কী?' বন্ধুরা কহে — 'চুলোর ছাই!
আপন সৃষ্টি করিছ নাশ, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নাই?'
আমি কহিলাম — 'জানি না তো সৃষ্টি করেছি কিছু আমি,
আমি শুধু জানি, নদীর প্রায় ছুটিয়া চলেছি দিবাযামী!
সাগরের তৃষা লয়ে নদী কেবল সুমুখে ছুটিয়া যায়,
পথে পথে যেতে ঢেউ তাহার কত কথা বলে, কত কী গায়!'

অকারণ কথাগুলিরে তার যদি কেহ বলে, 'চমৎকার
মধুচ্ছন্দা কাব্যশ্লোক, বাজে তরঙ্গে সুরবাহার!'
কেউ বলে, 'পাগলের প্রলাপ, কোনো মানে নাই ওর কথার,
এ নয় গোলাপ, লিখি-কলাপ, এ শুধু প্রকাশ মূর্খতার!'
শোনে না স্তুতি, নিন্দাবাদ-উন্মাদ বেগে প্রবল ঢেউ
আগে ছুটে চলে, কী গান গায় কী কথা কয় সে, বোঝে না কেউ।
জন্ম-শিখর হইতে মোর কোন সে অসীম মহাসাগর
টানিয়া আনিল, দিল সে ডাক, তারই পানে ছুটি ছাড়িয়া ঘর!

বন্ধু গো, সুর-স্রষ্টা নই, কবি নই, আমি সাগরজল,
কভু মেঘ হয়ে ঝরে পড়ি, কভু নদী হয়ে বহি কেবল।
মৌন উদার হিমালয়ে কভু জমে হই হিম-তুষার,
সহসা সে ধ্যান ভাঙে আমার গাঢ় চুম্বনে রাঙা উষার!
কেন সারা রাত জেগে কাঁদি, দিনে কাজ করি, হেসে বেড়াই,
আমিই জানি না! জানি না কী লিখেছি; কী সুরে কী গান গাই!
পাগলের মতো বকি প্রলাপ, কেন যে ভিক্ষা চাই আমি,
হয়তো জানে পরমোন্মাদ পরম-ভিক্ষু মোর স্বামী।
কেউ বলে, আমি নদীর ঢেউ দু-কূলে ফুটাই ফুল-ফসল,
কেউ বলে, আমি কূল ভাঙি ধ্বংস-বিলাসী বন্যা-জল।

যার যাহা সাধ বলিয়া যায়, আমি মোর পথে তেমনই ধাই,
ওরা কূলে বসে আমারে কয়, 'কার সাথে কহ কী কথা ছাই?'
বুঝিতে পারি না, কেন আসি, তোমারে কেন যে ভালোবাসি,
মনে হয়, বিনা প্রয়োজনের তব এ কান্না, তব হাসি।
আমি কহি, 'প্রিয় সাথিরা মোর, ছিনু রংরেজ আশমানে,
যে তুলি আঁকিত রামধনু, বাঁশি বাজিত যে-গুলিস্তানে,
সে বাঁশি সে তুলি কোন সে চোর লয়ে গেছে চুরি করিয়া, হায়!
আমার মনের ছন্দিতা আর সে নূপুর পরে না পায়।'

রস-প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজপথে,
সম্মুখে এল ভিখারিনি মৃত ছেলে-কোলে কোথা হতে।
কহিল, 'বিলাসী! পুত্র মোর, দুধ পায় নাই এক ঝিনুক,
শুকায়ে গিয়াছে অন্নহীন দেখো দেখো এই মায়ের বুক!
মাতৃস্তন্য পায়নি সে, দিয়াছে মৃত্যুস্তন্য তায়,
কাফন কেনার পয়সা নাই, কী পরায়ে গোরে দিব বাছায়?'
সাত আশমান যেন হঠাৎ দুলিতে লাগিল ঘোর বেগে,
ঝরিতে লাগিল গ্রহ-তারা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে!
কহিলাম — 'মা গো, আমি কবি, দেশে ফিরি নাকি রস ঢেলে,
সে রসের কিছু পাওনি কি তুমি আর তব মৃত ছেলে?'

কহে ভিখারিনি আঁখিজলে, 'রস পান? সে তো বিলাসীদের!
তেল মাখ তুমি তেলা মাথায়, হায়, কেহ নাই ভিক্ষুকের!'
মরা খোকা লয়ে ভিখারিনি চলে গেল কোন পথে সুদূর,
জ্ঞান হলে আমি চেয়ে দেখি,— বুকে জাগে গোর মরা শিশুর!
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বিলাসের বেণু, রাঙা গেলাস,
পাঁশের স্তূপের পাশে পড়ে আতরদানি ও গোলাবপাশ!
যেতে যেতে দেখি, মোটরকার ধাক্কা মারিয়া অন্ধে হায়
ছুটে চলে গেল চার চাকায়, চার-পায়া চড়ে অন্ধ যায়!

বন্ধু, বিলাস-সৃষ্টি এই আমার কবিতা, আমার গান
অন্ধেরে আলো দিত যদি, অপঘাতে তার যেত না প্রাণ!
যেতে যেতে হেরি বস্তিতে-শুয়ে আছে কারা ভাঙা কাচে?
গুদাম ঘরের বস্তা, এই বস্তির চেয়ে সুখে আছে!
রূপ দেখিয়াছি কল্পনায় এঁকেছি স্বপ্ন-গুলবাহার,
দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার!
নগ্ন ক্ষুধিত ছেলেমেয়ে কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,
শুনিলাম আমি এই প্রথম শিশুর কাঁদনে আল-কোরান!

মোর বাণী ছিল রসলোকের আল্লার বাণী শুনিনু এই,
বিলাসের নেশা গেল টুটে, জেগে দেখি আর সে আমি নেই!
গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরে দেখিয়াছি পায়ে-দলা কাদামাখা কুসুম,
বক্ষে লইয়া কাঁদিছে মা, চক্ষে পিতার নাহিকো ঘুম!
শিয়রের দীপে তৈল নাই, পীড়িত বালক কাঁদিয়া কয়,
'দেখিতে পাই না মা তোর মুখ, বাবা কোথা, বড়ো লাগিছে ভয়!'
মাঠের ফসল, কাজলা মেঘ স্বপ্নে দেখিছে ঘুমায়ে বাপ,
মরো মরো পুত্রেরে বাঁচায় মা-র মমতার উষ্ণ তাপ!
জমিদার-মহাজনপাড়ায় মেয়ের বিয়ের বাজে সানাই,
ইহাদের ঘরে বার্লি নাই, ওদের গোয়ালে দুধাল গাই।

আগুন লাগুক রসলোকে, কত দূরে সেথা কারা থাকে?
অভিশাপ দিনু — নামিবে সব এই দুখে শোকে, এই পাঁকে!
প্রায়শ্চিত্ত করি আমি — বন্ধু, আমারে কোরো ক্ষমা!
বহু ভোগ বহু বিলাস পাপ, প্রভুজি জানেন, আছে জমা!
এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের আজীবন পদসেবা করি
প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের পূর্ণ করিয়া যেন মরি!
ওরা যদি আত্মীয় নহে কেন এ আত্মা কাঁদে আমার?
উহাদের তরে কেন এমন বুকে ওঠে রোদনের জোয়ার?
মুক্তি চাহি না, চাহি না যশ, ভিক্ষার ঝুলি চাহি আমি,
এদেরই লাগিয়া মাগিব ভিখ দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী!

নবাগত উৎপাত

মনে পড়ে আজ পলাশির প্রান্তর —
আসুরিক লোভে কামানের গোলা বারুদ লইয়া যথা
আগুন জ্বালিল স্বাধীন এ বাংলায়।
সেই আগুনের লেলিহান শিখা শ্মশানের চিতা সম
আজও জ্বলিতেছে ভারতের বুকে নিষ্ঠুর আক্রোশে।
দুই শতাব্দী নিপীড়িত এই দেশের নর ও নারী
আঁখিজল ঢালি নিভাতে নারিল সেই আগুনের শিখা।
এ কোন করালী রাক্ষুসি তার রক্তরসনা মেলি
মজ্জা অস্থি রক্ত শুষিয়া শক্তি হরিয়া যেন
চল্লিশ কোটি শবের উপরে নাচিছে তাথই থই!
অক্ষমা অভিশপ্তা শক্তি তামসী ভয়ংকরী।

চল্লিশ কোটি নরকঙ্কাল লয়ে এই অকরুণা
জাদুকরি নিশিদিন খেলিতেছে জাদু ও ভেলকি, হায়!
যত যন্ত্রণা পাইযাছি তত তার ভূত-প্রেত সেনা
হাসিয়া অট্টহাসি বিদ্রুপ করেছে শক্তিহীনে!

এ কাহার অভিশাপ সর্পিণী হয়ে জড়াইয়া আছে,
সারা দেহ মন প্রাণ জরজর করি কালকূট বিষে
লয়ে যায় যমলোকে! — হায়, যথা গঙ্গা যমুনা বহে —
যথায় অমৃত-মধুরসধারা বর্ষণ হত নিতি,
যে ভারতে ছিল নিত্য শান্তি সাম্য প্রেম ও প্রীতি,
যে ভারতের এই আকাশ হইতে ঝরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি
সে আকাশ আজ মলিন হয়েছে বোমা বারুদের ধূমে।
যে দেশে জ্বলিত হোমাগ্নি, সেথা বোমার আগুন এল,
ক্ষুধিত দৈত্য-শক্তি শকুনি হয়ে আজ ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়িয়া বেড়ায় আমাদের পচা গলা মাংসের লোভে।

হে পরম পুরুষোত্তম! বলো, বলো, আর কতদিন
উদাসীন হয়ে রহিবে? — তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর
নিদারুণ যাতনায় নিশিদিন করিছে আর্তনাদ!
নিরস্ত্র দেশে লয়ে তব জ্যোতি সুন্দর তরবারি
দুর্বল নিপীড়িতের বন্ধু হইয়া প্রকাশ হও!
বন্দি আত্মা কাঁদে কারাগারে, 'দ্বার খোলো, খোলো দ্বার!
পরাধীনতার এই শৃঙ্খল খুলে দাও, খুলে দাও!
নিপীড়িত যেন নতুন পীড়ার যন্ত্রণা নাহি পায়,
প্রভু হয়ে নয়, বন্ধু হইয়া এসো বন্দির দেশে।'

বন্ধুরা এসো ফিরে

বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
সেই আগেকার নিত্য শুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।
প্রিয়ার চেয়েও প্রিয় ছিল মোর তোমাদের ভালোবাসা,
আমাদের মাঝে ছিল কত ভালো, কত আলো, কত আশা।
মৃত পুত্রেরে ভুলেছি, ভুলিনি তোমাদের সেই প্রাণ,
আজও মনে হলে বক্ষ বহিয়া নামে রোদনের বান।
তোমাদের কাছে থাকি না, একেলা রাতে মনে পড়ে সব,

নিথর শান্ত আনন্দ-বীণা করে উঠে কলরব!
বহ্নিগিরির উৎপাত সম এসেছিনু আমি কবে,
আজ মনে হয় স্বপ্ন — সে সব কথা কয় কেহ যবে।
চাঁদের মতন স্নিগ্ধ তোমরা মোরে করনিকো ভয়,
প্রেম-চন্দনে করেছিলে মোর অগ্নির দাহ ক্ষয়।
মোদের স্মৃতিতে জাগেনি কখনও জাতি-ধর্মের ভেদ,
মানুষে সবার বড়ো বলিতাম, মানিনি কোরান বেদ।
সহসা নিভিল আগুন! অগ্নি-গিরির পাষাণ বুকে
ফাগুনের ফুল ফুটিতে চাহিল অহেতুক কৌতুকে।
ছিল ফাগুনের ফুল কি লুকায়ে আগুনের ফুলকিতে,
দগ্ধ ললাট স্নিগ্ধ হইল নদীজল-উলকিতে!
বহুদিন পরে পথে যেতে যেতে হয়তো হয়েছে দেখা,
মনে হত মোরা হইনু দু-জন, আর নহি আমি একা!

ও কথা থাকুক! রাগ করিয়ো না, যদি এই কথা বলি —
আনারকলির বাগানে কচুরিপানার কুসুমকলি
আসিবে ভাসিয়া। বলিতে পার কি, মোর মনে হয় যেন —
শতদল হয়ে ছিনু যথা, সেথা আজ দলাদলি কেন।
কোন আনন্দ-মৃণালে বন্ধ ছিনু রস-সরসীতে,
সেই আনন্দ হারায়ে, ছড়ায়ে পড়েছি কি ধরণিতে?
যেথা নির্মল মধু ছিল, সেথা বিষ ওঠে মাঝে মাঝে,
সেই বিষ-লেখা পড়ি, আর বুকে কাঁটার মতন বাজে।
মানুষে মানুষে যে-হিংসা আজ এনেছে অকল্যাণ,
অভাবে পড়িয়া স্বভাব ভুলিব? গাহিব কি তারই গান?
কবি ও শিল্পী হওয়া এই দেশে দুর্ভাগ্যের কথা,
বেনে-মাড়োয়ারি-ভুক্ত এদেশে বাঁচে না মাধবীলতা।
জানি সংবাদপত্রের যাঁরা মালিক, তাঁহারা বেনে,
অর্থের লোভে তারাই এ বিদ্বেষ আনিয়াছে টেনে!
তাদেরই মেনে চলতে হবে কি? ওই রাক্ষুসে লোভে
দেশের জাতির অকল্যাণের কারণ হব কি সবে?
আছে দুর্দিন দুর্গতি ঋণ, ভবনে ব্যাধির বাসা,
তারই তরে মোরা ভাঙিয়া দেব কি ভারতের সাধ আশা?
দশটি লোকের বেড়ে যাবে বাড়ি, ব্যাংকে জমিবে টাকা,
ভারত-ললাটে তারই তরে রবে মসি-কলঙ্ক আঁকা
আমাদের লেখা হয়ে? বন্ধু গো, অবুঝ চোখের বারি
এ-কথা ভাবিতে, বহে স্রোত সম, কিছুতে বুঝিতে নারি।

বন্ধুরা ফিরে এসো, আজও দেশে মুষ্টিভিক্ষা মেলে,
এ পাপের ক্ষমা নাই, কোটি বার নরক ঘুরিয়া এলে!
দেশের জাতির ক্ষতি করে তবে অন্ন পড়িবে পাতে?
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা লিখিতে লেখনী কাঁপে না হাতে?
লইব মাথায়, তোমরা যে পথে চল সে পথের ধূলি,
ক্ষমা করো, এর চেয়ে হও গিয়া রিকশাওয়ালা কী কুলি!
এই মহা অপরাধ করিয়ো না, আপনারে প্রতারণা
করিয়া, হে সখা, ক্ষুধার অশুচি কদন্ন আনিয়ো না!
অভিশপ্ত এ চাকরির টাকা অভিশাপ আনে ঘরে,
এই অপরাধে শান্তি কখনও পাইবে না ঘরে-পরে!
এই সাত কোটি বাঙালির ঘরে ঈর্ষা-আগুন জ্বালি
ভরিবে ভাতের থালা, সভাতলে নেবে মালা করতালি?
হে সখা, তোমরা জান, এ জীবনে বহু যশ আর মালা
পেয়েছি, — এ বুকে বিষের মতন আজও করে তাহা জ্বালা!
কেবলই আত্ম-প্রতিষ্ঠা চাহে ভারতের নেতা যত,
উহাদেরই লোভে হতেছে দেশের কল্যাণ অপগত!

ফিরে এসো সেই অতীত দিনের বন্ধুরা, পায়ে ধরি,
এর চেয়ে, এসো সহজ মৃত্যু-পথ ধরে মোরা মরি!
পলাতক ছিনু, ধরিয়া এনেছে নবযুগ পুন মোরে,
তোমরা না এলে নবযুগ পুন আসিবে কেমন করে?
সখা, তোমাদের সখ্য সাক্ষী! নেতা হইবার নেশা
কোনোদিন জাগে নাই এ জীবনে, এ নহে আমার পেশা।
পূর্ণের তৃষা ছাড়া সব কিছু নিয়েছেন কেড়ে 'তিনি'
— যাঁর ইচ্ছায় আমারে তাঁহার 'ইচ্ছা' বলিয়া চিনি।

তবু আসিলাম, তবু ভাসিলাম আবার কর্মপথে,
পরম পূর্ণ তিনিই সারথি হউন আমার রথে।
একার মুক্তি চাহিতে আমারে দেয়নি ইচ্ছা তাঁর, —
পরম শূন্য হইতে ধূলিতে নামি তাই বারবার।
কিছুতেই যেন ভুলিতে নারি এ মাটির মায়ের মায়া,
মোর ধ্যানে হেরি আল্লার পাশে এই বাংলার ছায়া!

আনন্দধাম বাংলায় কেন ভূত-প্রেত এসে নাচে?
দেশি পরদেশি ভূতেরা ভেবেছে বাঙালি মরিয়া আছে!
এ ভূত তাড়াব; পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,
ভায়ের বক্ষে কাঁদিবে আবার এক জননীর ব্যথা।

তোমরা বন্ধু, কেহ অগ্রজ, অনুজ, সোদর সম,
প্রার্থনা করি, ভাঙিয়া দিয়ো না মিলনের সেতু মম!
এই সেতু আমি বাঁধিব, আমার সারা জীবনের সাধ,
বন্ধুরা এসো, ভেঙে দিব যত বিদেশির বাঁধা বাঁধ।

নারী

হায় ফিরদৌসের ফুল!
ফুটিতে আসিলে ধূলির ধরায় কেন?
সে কি মায়া? সে কি ভুল?

কোন আনন্দধামে
জড়াইয়া ছিলে কোন একাকীর বামে?
তাঁহারই জ্যোতির্মণিকা-কণিকা এসেছে প্রকৃতি হয়ে
সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরী লয়ে।
পরম জ্যোতির্দীপ্তিরে নাহি ডরিলে
পরম রুদ্রে প্রেম-চন্দন মাখায়ে স্নিগ্ধ করিলে!
শুভ্র জ্যোতির্পুঞ্জ-ঘন অরূপে
গলাইলে তুমি ময়ূরকণ্ঠী নবীন নীরদ রূপে!
নীল মেঘে হলে শক্তি বিজলি-লেখা
শূন্যবিহারী একাকী পুরুষে রহিতে দিলে না একা।

স্রষ্টা হইল প্রিয়-সুন্দর সৃষ্টিরে প্রিয়া বলি
কল্পতরুতে ফুটিল প্রথম নারী আনন্দকলি!
নিজ ফুলশরে যেদিন পুরুষ বিঁধিল আপন হিয়া,
ফুটিল সেদিন শূন্য আকাশে আদিবাণী — 'প্রিয়া, প্রিয়া!'
আকাশ ছাইল অনন্তদল শতদলে আর প্রেমে,
শান্ত মৌনী এল যৌবন-চঞ্চল হয়ে নেমে।

কে দেখিত সেই পরম শূন্য, অসীম পাষাণ-শিলা,
সীমায় যদি না বাঁধিতে তাহারে না দেখাতে রূপ-লীলা!
কোন সে গোপন পরমাশ্রী প্রকৃতি লুকায়ে ছিলে?
ভুবনে ভুবনে ভবন রচিয়া রস-দীপ জ্বালাইলে!
অনন্তশ্রী ঝরে পড়ে নিতি অনন্ত দিকে তব,
তুমি এলে, তাই সম্ভাবনায় আসিল অসম্ভব!
হে পবিত্রা চির-কল্যাণী, কে বলে তোমায় মায়া?

এই সুন্দর রবি শশী তারা
গিরি প্রান্তর নদীজলধারা
অসীম আকাশ সাগর ধরিতে পারে না তোমার কায়া,
তব রূপে দেখি না-দেখা পরম সুন্দরের যে ছায়া, —
কে বলে তোমায় মায়া?

তুমি তাঁর তেজ, তব তেজে জ্বলে আমার এই জীবন,
সূর্যের মতো চাঁদসম আকাশের কোলে অনুখন।
মাতা হয়ে তুমি দিয়াছ এ মুখে প্রথম-স্তন্যরস,
স্নেহ-অঞ্চলে বাঁধিয়া এ ঘর ছাড়ায়ে করেছ বশ।
যখনই পালাতে চাহিয়াছি বনে, কে তুমি অশ্রুমতী,
কাঁদিয়াছ মোর হৃদয়ে বসিয়া, রোধ করিয়াছ গতি?
সুন্দর প্রকৃতিরে হেরি মোর তৃষ্ণা জাগিল প্রাণে,
এত সুন্দর সৃষ্টি করে যে, সে থাকে সে-কোনখানে।
আমার পূর্ণ সুন্দরের যে পথের দিশারি তুমি,
তুমি ছায়া হয়ে সাথে চল যবে পার হই মরুভূমি?
যতবার নিভে যায় আশা-দীপ, ততবার তুমি জ্বাল,
শূন্য আঁধারে সম্মুখে জ্বলে তোমার আঁধারি-আলো!

অনন্তধারা প্রেমের ঝরনা কোথা লুকাইয়া ছিলে?
উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে!
পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি-নর,
তেজোময়ী আদি-নারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থরথর।
নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা-জুঁই
আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হল দুই!
এই দুই হয়ে দ্বন্দ্ব আসিল, ছন্দ জাগিল পায়,
সোনাতে কাঁকরে দুজনে মিলিয়া নূপুর বাজায়ে যায়!
সালাম লহো গো প্রণাম লহো গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দধামের জ্যোতি!
প্রেমের প্রবাহ লইয়া যখন আস হয়ে উপনদী —
মরুতে মরে না নরের তৃষ্ণানদী —
সাগরের পানে ছুটে চলে নিরবধি!
পুরুষের জ্ঞান রসায়িত হয় প্রকৃতির প্রেমরসে,
তরবারি ধরে উদাসীন নর রণক্ষেত্রে পশে!
যে দেশে নারীরা বন্দিনী, আদরের নন্দিনী নয়,
সে দেশে পুরুষ ভীরু কাপুরুষ জড় অচেতন রয়!

অভিশপ্ত সে দেশ পরাধীন, শৌর্য-শক্তিহীন,
শোধ করেনি যে দেশ কল্যাণী সেবিকা নারীর ঋণ!
নারী অমৃতময়ী, নারী কৃপা — করুণাময়ের দান,
কল্যাণ কৃপা পায় না, যে করে নারীর অসম্মান!
'বেহেশ্‌ত' স্বর্গ শুকাইয়া যায় প্রকৃতি না থাকে যদি,
জ্বলে না আগুন, আসে না ফাগুন, বহে না বায়ু ও নদী!
আজও রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে,
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে।
নারী আজও পথে চলে
তাই ধূলিপথ হয় বিধৌত শুভ্র মেঘের জলে!
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!

নিত্য প্রবল হও

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও!
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে ওঠো,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম,
রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লার হুকুম — ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
'শেরে-খোদা' সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে!
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে নাকো ভয় আল্লাহ্ যার প্রভু!
নিন্দাবাদের মাঝে 'আল্লাহ্ জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি!
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির!
কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কী ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে!

জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ!
তারা দুনিয়ার বাদশাহি করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনও ক্ষণিকের পরাজয়ে।
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
তারা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ!
জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,
শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে তো সেনাপতি নয়!
শত্রু-সৈন্য যত দেখে তত রণ-তৃষ্ণা তার বাড়ে,
দাবানল সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে!
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
নিরাশ হোয়ো না! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না করে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত!
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা[১] করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিয়ো না সে মাথা কখনও কোনো ভয়ে কোনো মারে!
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার।
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার!
ভীরু মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বলি আমি, প্রেম মোর তারই সাথে।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
তারই তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তারই শির-তাজ!
গরিবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে।
অকল্যাণের দূত যারা, যারা মানুষের দুশমন,
তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ —
মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়েতে,
অচেতন ছিল যারা, যারা তারা আসিতেছে সে তীর্থপথে।
আমি তকবীর[২]-ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে!
অনাগত 'নবযুগ'-সূর্যের তূর্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোনো ভয় দ্বিধা নাই।

১ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ২ আল্লাহ্-আকবর।

একা 'নবযুগ'-মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দরমার হাঁস না আসে, আসিবে মুক্তপক্ষ পাখি।
এ পথে ভীষণ বাজপাখি আর নিঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসি পাখিরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি।

মৃত্যু-ভয়াক্রান্ত আজিকে বাংলার নরনারী,
তাদের অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফরয়্যাদ[১],
আমরা তাদেরে রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ!
আমরা হুকুম-বর্দার তাঁর পাইয়াছি ফরমান[২],
ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ!
বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র-প্রহারে আত্মা উঠিবে জেগে!
রাজনীতি করে তৈরি মোদের কুচকাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসিবে দেখিয়ো আবার বিজয়-রথ।
প্রবল হওয়ার সাধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তাদেরই দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সঙ্ঘবন্ধ হতেছে তাহারা বঙ্গভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই উর্ধ্বে দোলে!

আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন

ঘুমাইয়া ছিল আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবন,
বহু বৎসর মুখ চেপে ছিল পাষাণের আবরণ।
তার এ ঘুমের অবসরে যত ধনলোভী রাক্ষস
প্রলোভন দিয়ে করেছিল যত বুদ্ধিজীবীরে বশ।
অর্থের জাব খাওয়ায়ে তাদের বলদ করিয়ে শেষে
লুণ্ঠতরাজের হাট ও বাজার বসাইল সারা দেশে।
সেই জাব খেয়ে বুদ্ধিওয়ালার হইল সর্বনাশ,
'শুদ্ধি স্বামী' ও 'বুদ্ধু মিয়াঁ'-র হইল তাহারা দাস!
বুঝিল না, এই শুদ্ধি স্বামী ও বুদ্ধু মিয়াঁরা কারা
খাওয়ায় কাগুজে পুরিয়ায় পুরে এরাই আফিম, পারা!
সাত কোটি বাঙালির সাত জনে শুধু টাকা দিয়ে
দাস করে, এরা হল কোটিপতি বাঙালি রক্ত পিয়ে।

১ বিচার-প্রার্থনা। ২ নির্দেশ।

কাগুজে মগুজে ধূর্ত বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবলে,
ছুরি আর লাঠি ধরাইয়া দিল বাঙালির করতলে।
জানে এরা ভায়ে ভায়ে হেথা যদি নাহি করে লাঠালাঠি,
কেমন করিয়া শাঁস শুষে খাবে, ইহাদের দিয়া আঁটি?
আঁটি খেয়ে যবে ভরে নাকো পেট, শূন্য বাটি ও থালা,
বাঙালি দেখিল এত পাট, ধান, মেটে না ক্ষুধার জ্বালা!
তখন বিরাট আগ্নেয়গিরি বাংলার যৌবনে
নাড়া দিয়া যেন জাগাইয়া দিল ঝঞ্ঝা প্রভঞ্জনে!
জেগে উঠে দেখে রক্তনয়নে আগ্নেয়গিরি একী!
ওরই ধান ওরই বুকে কুটিতেছে বিদেশি কল ও ঢেঁকি!
উহারই বিরাট অঙ্গে উঠেছে মিলের চিমনিরাশি,
উহারই ধোঁয়ায় ধোঁয়াটে হয়েছে আঁখির দৃষ্টি, হাসি।
এ কোন যন্ত্রদৈত্য আসিয়া যন্ত্রণা দেয় দেহে?
দাসদাসী হয়ে আছে নরনারী স্বীয় পৈতৃক গেহে।
একী কুৎসিত মূর্তিরা ফেরে আগুনের পর্বতে,
ক্যাঙালির মতো, বাঙালি কি ওরা — লেজ ধরে চলে পথে?
ভুঁড়ি-দাস আব নুড়ি-দাস যত মুড়ি খায় আর চলে,
যে-কথা উহারা বলাইতে চায়, চিৎকার করে বলে!
বিদারিত হল বহ্নিগিরির মুখের পাষাণভার,
কাঁপিয়া উঠিল লোভীর প্রাসাদ ভীম কম্পনে তার!
ক্রোধ হুংকার ওঠে ঘন ঘন প্রাণ-গহ্বর হতে,
'লাভা' ও অগ্নিশিখা উঠে ছুটে ঊর্ধ্ব আকাশপথে।

কই রে কই রে স্বৈরাচারীরা বৈরী এ বাংলার?
দৈন্য দেখেছ ক্ষুদ্রের, দেখনিকো প্রবলের মার!
দেখেছ বাঙালি দাস, দেখনিকো বাঙালির যৌবন,
অগ্নিগিরির বক্ষে বেঁধেছ যক্ষ তব ভবন!
হেরো, হেরো, কুণ্ডলী-পাক খুলি আগ্নেয় অজগর
বিশাল জিহ্বা মেলিয়া নামিছে ক্রোধ-নেত্র প্রখর।
ঘুমাইয়া ছিল পাথর হইয়া তার বুকে যত প্রাণ,
অগ্নিগোলক হইয়া ছুটিছে তিরবেগে সে পাষাণ!
নিঃশেষ করে দেবে আপনারে আগ্নেয়গিরি আজি,
ফুলঝুরি-সম ঝরিবে এবার প্রাণের আতসবাজি!
ঊর্ধ্বে উঠেছে ক্রুদ্ধ হইয়া অদেখা আকাশ ঘেরি;
তোমাদের শিরে পড়িবে আগুন, নাই বেশি আর দেরি!
তোমাদের যন্ত্রের এই যত যন্ত্রণা-কারাগার
এই যৌবনবহ্নি করিবে পুড়াইয়া ছারখার।

সুতি ধুতিপরা দেখেছ বিনয়-নম্র বাঙালি ছেলে,
ঢল ঢল চোখ জলে ছলছল একটু আদর পেলে!
দুধ পায় নাই, মানুষ হয়েছে শুধু শাকভাত খেয়ে,
তবুও কান্তি মাধুরী ঝরিছে কোমল অঙ্গ বেয়ে।
তোমাদের মতো পলোয়ান নয়, নয় মাংসল ভারী,
ওরা কৃশ, তবু ঝকমক করে সুতীক্ষ্ণ তরবারি!
বঙ্গভূমির তারুণ্যের এ রঙ্গনাটের খেলা
বুঝেও বোঝেনি যক্ষ রক্ষ, বুঝিবে সে শেষ বেলা!

শাড়ি-মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী দেখো বাংলার নারী,
দেখনি এখনও, ওঁরাই হবেন অসি-লতা তরবারি!
ওরা বিদ্যুল্লতা-সম, তবু ওরাই বজ্র হানে,
ওরা কোথা থাকে, তোমরা জান না, সাগর ও মেঘ জানে।
যুগান্তরের সূর্য যখন উদয়-গগনে ওঠে,
সূর্যের টানে ছুটে আসে মেঘ; তাহারই আড়ালে ছোটে
ওরা যেন ভীরু পর্দানশীন! ওরাই সময় হলে
ঘন ঘন ছোঁড়ে অশনি অত্যাচারীর বক্ষতলে!
শ্যামবঙ্গের লীলা সে ভীষণ সুন্দর, রেখো জেনে,
বাঘের মতন নাগের মতন দেখি, যে বাঙালি চেনে!
তাদেরই জড়তা-পাষাণ টুটিয়া ঝরিছে অগ্নিশিখা,
কে জানে কাহার তকদীরে[১] ভাই কী শাস্তি আছে লিখা!
ধোঁয়া দেখে যদি না নোয়াও মাথা, বছর খানিক বেঁচো!
দেখিবে হয়েছি ফেরেশতা[২] মোরা, তোমরা হয়েছ কেঁচো!

চির-বিদ্রোহী

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না!
তোমার সর্বশক্তি আমায়,
বাঁধতে গিয়ে হার মেনে যায়!
হায়! হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধতে তুমি পারবে না।

অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?
তোমার সর্বমায়ার কাঁদন,

১ অদৃষ্ট। ২ আল্লাহ্‌র দূত।

মা-র মমতা প্রেমের বাঁধন
স্পর্শ করে বিদগ্ধ হয়, রুদ্রস্বরূপ মোর কায়া।
অশান্ত এ ধূমকেতুকে ঘুম পাড়াবে কোন মায়া?

ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ!
সে জাল ছিঁড়ে এ ধূমকেতু
বিনাশ করে বাঁধার সেতু,
সপ্ত স্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ।
এই ধূমকেতু ছিঁড়ে সে জাল
এই মহাকাল! রুদ্র দামাল
শূন্যে নাচে প্রলয়-নাচন সংহারিয়া সর্বনাশ।

শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধুলায় আনতে চাও,
দুর্গে এনে দুরন্তকে —
অশ্রু চাহ রুক্ষ চোখে!
আমার আগুন নিভবে নাকো যতই গলায় মালা দাও!
শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধুলায় আনতে চাও!

সংহার মোর ধর্ম, আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা ঝড়,
স্বধর্মে নিধন ভালো —
কেন আন প্রেমের আলো?
সতী-দেহত্যাগের পর শংকর কি বাঁধে ঘর?

আনন্দ আর অমৃত রস কার আগুনে যায় জ্বলে?
শান্তি সমাহিতের মাঝে
কেন রুদ্র বিষাণ বাজে?
কোন যাতনায় শিশু কাঁদে, শান্তি পায় না মা-র কোলে?

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?
লোভী ভোগীলক্ষ্মী লয়ে
রাক্ষস আর দৈত্য হয়ে
কী নির্যাতন করছে তোমার সৃষ্টিতে।
লক্ষ্মীছাড়ার হাতে তুমি ঐশ্বর্য চাও দিতে?

করব আমি ধ্বংস সর্ব বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বকে।
মিথ্যা হল কোরান ও বেদ
এই অসাম্য অশান্তি ভেদ

প্রলয়কে কি বাঁধতে পারে বলয়-পরা নর্তকী!
এখানে সিংহ থাকে!
অহিংস সব মহাত্মাকে
দাও গিয়ে ওই হরিনামের হরতকি!
রুদ্রকে কে শূদ্র করে
ক্ষুদ্র ধরায় রাখবে ধরে।
অহম শিকল কে পরাবে সোহম স্বয়ম্ভুকে!

হে মৌনী, উত্তর দাও সামনে এসে রূপ ধরে,
পূজা করে ক্ষমা করে
তোমায় মানুষ জনম ভরে,
কী দিয়েছ তাদের বলো, থেকো নাকো চুপ করে!

কেন দুর্বলেরে করে প্রবল নির্যাতন?
এই সুন্দর বসুন্ধরা
রাক্ষস আর দৈত্যভরা
কেমন করে করব তোমায় অভেদ বলে সম্ভাষণ।

লজ্জা তোমার হয় না যখন তোমায় বলে কৃপাময়!
পুত্র মরে, মা তবু, হায়!
প্রেমভরে ডাকে তোমায়;
ওগো কৃপণ! বিশ্বে তোমার দাতা বলে পরিচয়!

কেন পাপ ও অপরাধের কথা তোমার শাস্ত্র কয়!
কে দিল মানবজন্ম,
কে দিল ধর্মাধর্ম,
মুক্ত তুমি, মানুষ কেন এ বন্ধন-জ্বালা সয়?

তুমি বল, 'আমার একা তোমার উপর অধিকার!'
সেই অধিকার তোমার পরে
বলো কেন দাও না মোরে?
তোমার মতো পূর্ণ হব, এই ছিল মোর অহংকার!

মনের জ্বালা স্নিগ্ধ নাহি করে তোমার চন্দ্রালোক!
এত কুসুম এত বাতাস
কেন তবু এ হাহুতাশ,
কোন শোকে অশান্তিতে দেবতা হয় চণ্ডাশোক!

কেন সৃষ্টি করলে নরক, জন্মায়নি যখন মানব!
কেন তাদের ভয় দেখাও?
ভয় দেখিয়ে ভক্তি চাও?
তোমার পরম ভক্তেরা তাই হয় শয়তান, হয় দানব!

বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান।
তোমার ধরার দুঃখ কেন
আমায় নিত্য কাঁদায় হেন?
বিশৃঙ্খল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ!
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান!

বিদ্রোহ মোর আসবে কীসে, ভুবন-ভরা দুঃখশোক!
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায় —
শান্ত হব, আগে তারা সর্বদুঃখ-মুক্ত হোক!

ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা

তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কমবখ্‌তের[১] মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামি খেলা।
ভয় করিয়ো না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পোড়ো না দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।
তখ্‌তে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভাবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধূলি-লগন হাসে!
যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তারই দাহ ফিরে এসে
ভীম দাবানল-রূপে জ্বলিতেছে তাহাদেরই দেশে দেশে।

সত্যপথের তীর্থ-পথিক! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয়!
অশান্তিকামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,

১ হতভাগ্য।

অবশেষে চিরলাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
পথের ঊর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা,
তাই বলে তারা ঊর্ধ্বে উঠেছে — কেহ কভু ভাবিয়ো না!
ঊর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরই পথে হয় ওরা বাধা,
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় নাকো কাদা!

জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে!
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর!
হয়তো কখনও জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোরা তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু!

বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পথভ্রান্ত ফিরে?
ভালোবাসা দিয়ে তাদেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে।
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন, মানুষের অধিকার
কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরই তরে আল্লার তলোয়ার।
অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিয়ো না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে।
সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো,
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো।
সর্ববিশ্ব প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হলে,
সত্যপথের সর্বশত্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে!
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন!

আগে চলো, আগে চলো দুর্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি-প্রবাহ কাহারও কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চির-সাথি,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!
ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যারা, তারা হবে লয়!
বলো, এ পৃথিবী মানুষের, ইহা কাহারও তখ্‌ত্‌ নয়!

পুণ্য তখ্‌তে বসিয়া যে করে তখ্‌তের অসম্মান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দান!

ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ওই শেষ,
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরই হইবে সর্বদেশ!
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান! সাবধান!
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফরমান?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি না ভয়,
মোদের পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ, পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারা সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা!
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!

সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কী হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টিধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিষহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত ফুকারি ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্রতপ্ত ঠোঁটে।
জানি না সে ভাষা, হয়তো বা জানি, ছল করে তাই হাসিতে চাহি,
সহসা নিরখি— নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি।
ইরানি-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি করি ভরি ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি বুঝি আমারই বাদল-মেঘশেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে যে কেতকী, তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি, ধরণি তো তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম করে তুমি ভ্রমিতে ধরায় এসেছ, ফুলের দেশের পরি,
জানিতে না হেথা সুখদিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার করি।
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা,
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার, আমি সেই মেঘ সলিল ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি

সেই অশ্রুর সপ্ত পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল করে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন-বেদনা অশ্রুমুখীরে ; এ নহে মাধবীকুঞ্জ নব।
মাটির করুণাসিক্ত এ মন, হেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে
তারই বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরই অশ্রু ক্ষরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের মেলা,
জাগিয়া তাহারই স্মৃতি লয়ে কাটে আমার সকাল সন্ধ্যাবেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নহে আমারও তোমারও — স্বপন-রানি!
আমার বাণীতে তোমার মুরতি বীণাপাণি নয় বেদনাপাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরি এপার হইতে ওপারে চলে ;
কান্ডারিহীন ভাঙা তরি মোর ডুবে গেল তব অতল তলে।
ওরা শুধু তব মুখ চেয়ে যায়, সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল জলশেষে চোরা বালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরি তব বিস্মৃতি-বালুকাতলে
দু-দিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী, তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।
কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধুকূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়তো ফেলে দেবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা-কাঁদন যেটুকু, সে শুধু বিলাস, পুতুলখেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।
মোর দেহমনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রুসজল নীরদ মাখা,
কী হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানি, তব ধ্যান ওই চন্দ্র তারকা।
সে চাঁদ উঠেছে গগনে তোমার-আমার সন্ধ্যাতিমির শেষে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথায় সকল আঁধার মেশে।
আমার প্রেমের বরষায় ধুয়ে তব হৃদি হল সুনীলতর —
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ উজ্জ্বলতর তাহারে করো।
যদি সে-চন্দ্রহসিত নিশীথে বিস্বাদ লাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত তোমারে খুঁজিয়ো আমার বিধুর গানের লোকে।
সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে-ফুল জীবনে ঝরে না সে-ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের চির-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকণ্ঠে মম,
চিরশেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল —
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায় এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরি,
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি।

হুল ও ফুল

ওরা কয়, 'আগে ফুল ফুটাইতে, এখন ফুটাও হুল।'
আমি কই, 'যদি হুল না ফুটাই ফুটিবে কি তবে fool?'
বন্ধু, মিথ্যা অপত্য-স্নেহে আপত্তি নাহি করি
ধর্ম লয়েছে অধর্ম নাম, সত্য গিয়াছে মরি!
গাঁয়ের বউঝি জল নিতে যায় মেছুড়ে বুঝিতে নারে,
গাল দেয় রেগে — ইহাদেরই দোষে মাছ বসে নাকো চারে!
ভোগী বলে, 'বাবা, কেন কাঁদ তুমি, মামা নহে তব চাষা,
ধনীর দুঃখ দেখ নাকো, একী একঘেয়ে ভালোবাসা!'
'আল্লা বলান' বলি। ওরা বলে — 'দালানে তা আসে কেন?
টাকাওয়ালাদের কী করে চিনিলে, তুমি তো আল্লা চেন!'
ওরা বলে, 'মোরা টাকার পুকুর দুয়ারে খুঁড়িয়া রাখি,
উহারাই তার দু-এক কলশি জল ভরে নেয় নাকি?'
আরও বলে, 'দিই কলশিতে জল দিই না তো সাথে দড়ি,
আমরা কী জানি, কেন এ পুকুরে ওরা ডুবে যায় মরি?'
ওরা বলে, 'চাষা খাইতে পায় না— আর জন্মের পাপ,
পাওনা সুদের নালিশ করিলে ওরা কেন দেয় শাপ?'
মোরা যত দিই উত্তর তার ওরা 'দুত্তোর' কহে,
বলে, 'জমিদারি স্বত্ব আমার, তোমার মামার নহে।'
মোরা বলি, 'কত ইম্পিরিয়াল ব্যাংকে তোমার টাকা!'
ওরা বলে, 'কোনো কাজে তা লাগে না, (বাবা) ফিক্‌স্‌ড ডিপোজিটে রাখা!'
মোরা বলি, 'মোরা যাব না, মোদের প্রাপ্য যা তা না পেলে!'
ওরা বলে, 'কেন জেলে যাবে, বাবা, ভদ্রলোকের ছেলে!'
আমি বলি, 'জাগ, দৈত্যেরে মার, দা নিয়ে দুয়ার খুল।'
ওরা বলে, 'বাঘ হলে কেন বন- বাগিচার বুলবুল?'
আমি বলি, 'কেন অসত্য বল, ভ্রান্ত পথ দেখাও?'
ওরা বলে, 'আহ্, চুপ করো কবি, ফুল শোঁকো, মধু খাও!'
আমি বলি, 'চোর ঢুকিয়াছে ঘরে, মারো তারে পায়ে দলে!'
ওরা বলে, 'বাঁশুরিয়া! বাঁশি কেন বংশদণ্ড হল!'
ওরা বলে, "দাদা, এতদিন তুমি বেশ তো ঘুমায়ে ছিলে!
কখন হইল 'ইনসমনিয়া'? সারা দেশ জাগাইলে!"
আমি বলি, 'দেশ জাগে যদি, কেন তোমাদের ডর লাগে?'
ওরা বলে, 'আসে রাম-দা লইয়া। রামদা বলিত আগে!'
কে যে বলে ঠিক, কে বলে বেঠিক, ঠিকে ভুল হয় কার?
চাষা ও মজুরে ঠকাইয়া খায় দুনিয়ার ঠিকাদার!

'ওরা তো বলে না, তুমি কেন বল, কেন তব মাথাব্যথা?'
জিজ্ঞাসে সাধু। — আমি বলি, 'কহে ওদেরই আত্মা কথা!'
হায় রে দুনিয়া দেখি মৌলানা মৌলবিতে একাকার,
আমি একা হেথা কাফের রে দাদা আমি একা গুনাগার!
গুনাগারি দেয় বণিকেরা নাকি, চাষারাই করে লাভ,
ধনী যেন সদা তৃষিত, এবং চাষা সদা কচি ডাব!
শুনেছি সেদিন ধনিক-সভায় — নতুন আইন হবে,
চাষাদের দা, দাঁত আর নখ খেঁটে লাঠি নাহি রবে।
আমি বলি, 'হয়ে অভাবে স্বভাব নষ্ট, হয়েছে চোর!'
ওরা বলে, 'তাই বল, তাই চুরি হয় না বাড়িতে তোর!'
আমি বলি, 'খেয়ো না এ কদন্ন, হালালি অন্ন খাও!'
ওরা বলে, 'তুমি এদেরই দালালি করে বুঝি টাকা পাও?'
'যার যত তলা দালান, সে তত আল্লা-তালার প্রিয়—'
ওরা কয়। আমি বলি, 'বেশ করে সে তালায় তালা দিয়ো!'
আমি ভিক্ষুক কাঙালের দলে — কে বলে ওদের নীচ?
ভোগীরা স্বর্গে যাবে, যদি খায় ওদের পানের পিচ!
ওরা হাসে, 'এ কি কবিতার ভাষা? বস্তিতে থাক বুঝি?'
আমি কই, 'আজও পাইনি পুণ্য— বস্তির পথ খুঁজি!
দোওয়া করো, যেন ওই গরিবের কর্দমাক্ত পথে
যেতে পারি, এই ভোগ-বিলাসীর পাপ-নর্দমা হতে!'

কোথা সে পূর্ণযোগী

কোথা সে পূর্ণ সিদ্ধ ও যোগী, দেখেছ কি কেউ তাঁরে,
দনুজ-দলনী শক্তিরে পুন ভারতে জাগাতে পারে?
কোথা সে শ্রীরাম, বশিষ্ঠ, কোথা তাপস কাত্যায়ন,
যাঁর সাধনায় হইবে কাত্যায়নীর অবতরণ!
ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভিড়,
তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?
'প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী, নাহি বিশ্বম্' বলি কেউ
আবার আনিতে পারে কি ভারতে মহাশক্তির ঢেউ?
পাতাল ফুঁড়িয়া দানব দৈত্য উঠিয়াছে পৃথিবীতে,
এল না তো কেউ শক্তি-সিদ্ধ তাদের সংহারিতে!
কোথা সেই মহাতান্ত্রিক, কোথা চিন্ময়ী মহাকালী?
মন্দিরে মন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা খালি!

শক্তিরে খুঁজি পটুয়ার পটে, মাটির মুরতি মাঝে
চিন্ময়ী শ্রীচণ্ডিকা তাই প্রকাশ হল না লাজে।
কোন দুর্গারে পূজিয়া শ্রীরাম হরিলেন দুর্গতি ?
সেই শ্রীদুর্গা কোথা আজ, কেউ দেখেছ তাঁহার জ্যোতি ?
শুম্ভ নিশুম্ভেরে যে মারিল, সে চণ্ডী কি গেছে মরে ?
কুম্ভমেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে ?
জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক ?
পরিশ্রমের ভয়ে আশ্রমে আশ্রমে ছেলেমেয়ে
আশ্রয় লয়ে বাঁচিয়াছে! মেদ বাড়িতেছে খেয়ে দেয়ে!
মহাপ্রভুর নাম রাখিয়াছে ভিক্ষুক নেড়া নেড়ি,
এরা কি ভাঙিবে অসুরের কারা, পায়ের শিকল বেড়ি ?
ধর্মের নামে এই অধর্ম, তাই তো ধর্মরাজ
অভিশাপ দেন দারিদ্র্যব্যাধি দুর্গতিরূপে আজ।
গঙ্গায় নেয়ে তীর্থে গিয়ে কে শক্তি লভিয়া আসে ?
মাংসের স্তূপ বেড়ে বেড়ে শুধু যায় মৃত্যুর গ্রাসে।
কে ঘুচাবে এই লজ্জা ও ঘৃণা, কোথা সে যুগাবতার ?
জগন্নাথের রথ দেখিব না, পথ চেয়ে আছি তাঁর।

রবির জন্মতিথি

রবির জন্মতিথি কয়জন জানে ?
অঙ্ক কষিয়া পেয়েছ কি বিজ্ঞানে ?
ধ্যানী যোগী দেখেছে কি ? জ্ঞানী দেখিয়াছে ?
ঠিকুজি আছে কি কোনো জ্যোতিষীর কাছে ?
নাই — নাই —! কত কোটি যুগ মহাব্যোমে
আলো অমৃত দিয়ে ধ্রুব রবি ভ্রমে!
জানে না জানে না। উদয় ও অস্ত তাঁর
সে শুধু লীলাবিলাস, গোপন বিহার।
রবি কি অস্ত যায় ? অন্ধ মানব
রবি ডুবে গেল বলে করে কলরব।
রবি শাশ্বত, তাঁর নিত্য প্রকাশ
রূপ ধরি পৃথিবীতে ক্ষণিক বিলাস
করিয়া চলিয়া যায় জ্যোতির্লোকে,
এখনও দ্রষ্টা নেহারে তাঁর চোখে।
এই সুরভির ফুল রস-ভরা ফল

রবির গলিত প্রেমবৃষ্টির জল
কবিতা ও গান সুর-নদী হয়ে বয়
রবি যদি মরে যায় পৃথিবী কি রয়!
জন্ম হয়নি যাহার জ্যোতির্লোকে,
তন্দ্রা টুটেনি যাহার অন্ধ চোখে,
রবির জন্মতিথি দেখেনি সে-জন
আজও তার কাছে রবি অপ্রয়োজন।
কবি হয়ে এল রবি এই বাংলায়
দেখিল বুঝিল বলো কতজন তাঁয়?
রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
তাঁরই মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাংলায়
অক্ষরজ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অ-ক্ষর অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।
সেদিন নিত্য রবির জন্মতিথি
হইবে। মানুষ দিবে তাঁরে প্রেমপ্রীতি।

বড়োদিন

বড়োলোকদের 'বড়োদিন' গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের রাত কাটিতে চায় না, ক্ষিদে বলে, 'নিধে! ওঠো!'
খেটে খুটে শুতে খাটিয়া পাই না, ঘরে নাই ছেঁড়া কাঁথা,
বড়োদের ঘরে কত আসবাব, বালিশ বিছানা পাতা!
অর্ধনগ্ন-নৃত্য করিয়া বড়োদের রাত কাটে,
মোদের রক্ত খেয়ে মশা বাড়ে, গায়ে আরশুলা হাঁটে।
আঁচিলের মতো ছারপোকা লয়ে পাঁচিল ধরিয়া নাচি,
মাল খেয়ে ওরা বেসামাল হয়, মোরা কাশি আর হাঁচি!
নানারূপ খানা খেতেছে, ষণ্ড অণ্ড ভেড়ার টোস্ট,
কুলুকুলু করে আমাদের পেট, যেন 'হনলুলু কোস্ট'।
চৌরঙ্গিতে বড়োদিন হইয়াছে কী চমৎকার,
গৌরজাতির ক্ষৌরকর্ম করেছে! অমত কার?
মদ খেয়ে বদহজম হইয়া বাঙালির মেয়ে ধরে,
শিক্ষাও পায় শিখ-বাঙালির থাপ্পড় লাথি চড়ে!
এ কি সৈনিক-ধর্ম, এরাই রক্ষী কি এদেশের?
সর্বলোকের ঘৃণ্য ইহারা, কলঙ্ক ব্রিটিশের।
যে সৈনিকের হাত চাহে অসহায় নারী পরশিতে,

চাহে নারীর ধর্ম নিতে,
বীর ব্রিটিশের কামান যে নাই সেই হাত উড়াইতে।
হায় রে বাঙালি, হায় রে বাংলা, ভাত-কাঙালের দেশ,
মারের বদলে মার দেয় নাকো, তারা বলদ ও মেষ!
মান বাঁচাইতে প্রাণ দিতে নারে, পলাইয়া যায় ঘরে,
ঊর্ধ্বের মার আগুন আসিছে সেই ভীরুদের তরে!
পলাইয়া এরা বাঁচিবে না কেউ! হাড় খাবে, মাস খাবে,
শেষে ইহাদের চামড়ায় দেখো ডুগডুগিও বাজাবে!
পথের মাতাল মাতা-ভগ্নীর সম্মান নেয় কেড়ে,
শাস্তি না দিয়ে মাতালের, এরা পলায় সে পথ ছেড়ে।
কোন ফিল্মের দর্শক ওরা, ঝোপের ইঁদুর বেজি,
ইহাদের চেয়ে ঘরের কুকুর, সেও কত বেশি তেজি!
মানবজাতির ঘৃণ্য ভীরুরা, কাঁপে মৃত্যুর ডরে,
প্রাণ লয়ে ঢুকে খোপের ভিতর, দিনে দশবার মরে!
বড়োদিন দেখে ছোটো মন হায় হতে চাহে নাকো বড়ো,
হ্যাট কোট দেখে পথ ছেড়ে দেয় ভয়ে হয়ে জড়সড়!
পচে মরে হায় মানুষ, হায় রে পঁচিশে ডিসেম্বর!
কত সম্মান দিতেছে প্রেমিক খ্রিস্টে ধরার নর!
ধরেছিলে কোলে ভীরু মানুষের প্রতীক কি মেষশিশু?
আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছ যিশু!

নবযুগ

—বিশ বৎসর আগে
তোমার স্বপ্ন অনাগত 'নবযুগ'-এর রক্তরাগে
রেঙে উঠেছিল। স্বপ্ন সেদিন অকালে ভাঙিয়া গেল,
দৈবের দোষে সাধের স্বপ্ন পূর্ণতা নাহি পেল!
যে দেখায়েছিল সে মহৎ স্বপ্ন, তাঁরই ইঙ্গিতে বুঝি
পথ হতে হাত ধরে এনেছিলে এই সৈনিকে খুঁজি?
কোথা হতে এল লেখার জোয়ার তরবারি-ধরা হাতে
কারার দুয়ার ভাঙিতে চাহিনু নিদারুণ সংঘাতে!—
হাতের লেখনী, কাগজের পাতা নহে ঢাল তলোয়ার,
তবুও প্রবল কেড়ে নিল দুর্বলের সে অধিকার!
মোর লেখনীর বহ্নিস্রোত বাধা পেয়ে পথে তার
প্রলয়ংকর ধূমকেতু হয়ে ফিরিয়া এল আবার!
ধূমকেতু-সম্মার্জনী মোর করে, নাই মার্জনা

কারও অপরাধ ; অসুরে নিত্য হানিযাছে লাঞ্ছনা !—
হারাইযা গেনু ধূমকেতু আমি দু-দিনের বিস্ময়,
মরা তারাসম ঘুরিযা ফিরিনু শূন্য আকাশময়।

সে যুগের ওগো জগলুল ! আমি ভুলিনি তোমার স্নেহ,
স্মরণে আসিত তোমার বিরাট হৃদয়, বিশাল দেহ।
কত সে ভুলের কাঁটা দলি, কত ফুল ছড়াইয়া তুমি,
ঘুরিযা ফিরেছ আকুল তৃষায জীবনের মরুভূমি।
আমি দেখিতাম, আমার নিরালা নীল আশমান থেকে
চাঁদের মতন উঠিতেছ, কভু যাইতেছ মেঘে ঢেকে।
সুদূরে থাকিযা হেরিতাম তব ভুলের ফুলের খেলা,
কে যেন বলিত, এ চাঁদ একদা হইবে পারের ভেলা।

সহসা দেখিনু, এই ভেলা যাহাদের পার করে দিল,
যে ভেলার দৌলত ও সওদা দশ হাতে লুটে নিল,
বিশ্বাসঘাতকতা ও আঘাত-জীর্ণ সেই ভেলায়
উপহাস করে তাহারাই আজ কঠোর অবহেলায় !
মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা দেখি উঠি শিহরিযা,
দানীরে কি ঋণী স্বীকার করিল এই সম্মান দিযা ?
যত ভুল তুমি করিয়াছ, তার অনেক অধিক ফুল
দিয়াছ রিক্ত দেশের ডালায, দেখিল না বুলবুল !
যে সূর্য আলো দেয, যদি তার আঁচ একটুকু লাগে,
তাহারই আলোকে দাঁড়ায়ে অমনি গাল দেবে তারে রাগে ?
নিত্য চন্দ্র সূর্য ; তারাও গ্রহণে মলিন হয় ;
তাই বলে তার নিন্দা করা কি বুদ্ধির পরিচয় ?
এই কি বিচার লোভী মানুষের ? বক্ষে বেদনা বাজে,
অর্থের তরে অপমান করে আপনার শির-তাজে !
দুঃখ কোরো না, ক্ষমা করো, ওগো প্রবীণ বনস্পতি !
যার ছায়া পায় তারই ডাল কাটে অভাগা মন্দমতি।

আমি দেখিয়াছি দুঃখীর তরে তোমার চোখের পানি,
এক আল্লাহ্ জানেন তোমারে, দিয়াছ কী কোরবানি !
এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদেরে করো ক্ষমা,
আবার এদেরে ডেকে আল্লার ঈদগাহে করো জমা।
শপথ করিয়া কহে এ বান্দা তার আল্লার নামে,
কোনো লোভ কোনো স্বার্থ লইয়া দাঁড়াইনি আমি বামে।

যে আল্লা মোরে রেখেছেন দূরে সব চাওয়া পাওয়া হতে,
চলিতে দেননি যিনি বিদ্বেষ-গ্লানিময় রাজপথে,
যে পরম প্রভু মোর হাতে দিয়া তাঁহার নামের ঝুলি,
মসনদ হতে নামায়ে, দিলেন আমারে পথের ধূলি,
সেই আল্লার ইচ্ছায় তুমি ডেকেছ আমারে পাশে !—
অগ্নিগিরির আগুন আবার প্রলয়ের উল্লাসে
জাগিয়া উঠেছে, তাই অনন্ত লেলিহান শিখা মেলি,
আসিতে চাহিছে কে যেন বিরাট পাতাল-দুয়ার ঠেলি,
অনাগত ভূমিকম্পের ভয়ে দুনিয়ায় দোলা লাগে,
দ্যাখো দ্যাখো শহিদান[১] ছুটে আসে মৃত্যুর গুলবাগে !
কে যেন কহিছে, 'বান্দা আর এক বান্দার হাত ধরো,
মোর ইচ্ছায় ওর ইচ্ছারে তুমি সাহায্য করো,'
তাই নবযুগ আসিল আবার। রুদ্ধ প্রাণের ধারা
নাচিছে মুক্ত গগনের তলে দুর্মদ মাতোয়ারা।
এই নবযুগ ভুলাইবে ভেদ, ভায়ে ভায়ে হানাহানি,
এই নবযুগ ফেলিবে ক্লৈব্য ভীরুতারে দূরে টানি।
এই নবযুগ আনিবে জরার বুকে নবযৌবন,
প্রাণের প্রবাহ ছুটিবে, টুটিবে জড়তার বন্ধন।
এই নবযুগ সকলের, ইহা শুধু আমাদের নহে,
সাথে এসো নওজোয়ান ! ভুলিয়া থেকো না মিথ্যা মোহে।
ইহা নহে কারও ব্যাবসার, স্বদেশের স্বজাতির এ যে,
শোনো আশমানে এক আল্লার ডঙ্কা উঠিছে বেজে।

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহতের আজ নবজাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগবিলাসের লোভে ?
আর দেরি নাই, ওদের কুঞ্জ ধূলিলুণ্ঠিত হবে !
আছে যাহাদের বৃহতের তৃষা, নির্ভয় যার প্রাণ,
সেই বীরসেনা লয়ে জয়ী হবে নবযুগ-অভিযান।
আল্লার রাহে ভিক্ষা চাহিতে নবযুগ আসিয়াছে,
মহাভিক্ষুরে ফিরায়ো না, দাও যার যাহা কিছু আছে।
জাগিছে বিরাট দেহ লয়ে পুন সুপ্ত অগ্নিগিরি,
তারই ধোঁয়া আজ ধোঁয়ায়ে উঠেছে আকাশভুবন ঘিরি।
একী এ নিবিড় বেদনা
একী এ বিরাট চেতনা
জাগে পাষাণের শিরায় শিরায়, সাথে জনগণ জাগে,

১ প্রাণোৎসর্গকারীগণ।

হুংকারে আজ বিরাট, 'বক্ষে কার পা-র ছোঁয়া লাগে,
কোন মায়াঘুমে ঘুমায়ে ছিলাম, বুঝি সেই অবসরে
ক্ষুদ্রের দল বৃহতের বুকে বসে উৎপাত করে!
মোর অণুপরমাণু জনগণ জাগো, ভাঙো ভাঙো দ্বার,
রুদ্র এসেছে বিনাশিতে আজ ক্ষুদ্র অহংকার।'

শোধ করো ঋণ

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান,
আল্লা যাদের নিয়ামত দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ!

কত ক্ষুধাতুর শিশুর রসনা খুদকণা নাহি পায়,
মা-র বুক ছেড়ে গোরস্তানের মাটিতে গিয়া ঘুমায়।
যত দৌলত হাশমতওয়ালা[১] হেরে তাহা পাশে থেকে,
আতর মাখিয়া পাথরের দল যেন ছায়াছবি দেখে!

ভেবেছে এমনই নিজে খেয়ে দেয়ে হইয়া খোদার খাসি
দিন কেটে যাবে! এ সুখের দিন কভু হবে নাকো বাসি।
জগতের লোভী মরিতেছে আজ আল্লার অভিশাপে,
তবুও লোভের কাঁথা জড়াইয়া লোভী সব নিশি যাপে!

একটা খাসিরে ধরিয়া যখন জবাই করে কশাই,
আর একটা খাসি তখনও দিব্যি পাতা খায়, ভয় নাই।
ভেবেছ ওদেশে হতেছে শাস্তি, তোমাদের হইবে না,
তাই শোধ করিলে না আজও সেই পরম দানীর দেনা।

আর ক-টা দিন বেঁচে থাকো, যাঁর ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি।
কী ভীষণ মার খাইবে সেদিন, বোঝ না অন্ধ জীব,
তোমাদের হাড়ে ভেলকি খেলিবে সেদিন এই গরিব।

বেতন চাহিলে শুনিতে পায় না, মনিবের রাগ হয়,
'তিনদিন হাঁড়ি চড়েনিকো' শুনে ভাবে, একী কথা কয়!
ঘরের পার্শ্বে লেগেছে আগুন, বোঝে না স্বার্থপর,
আর দেরি নাই, পুড়িয়া যাইবে তাহারও সোনার ঘর।

১ জাঁকজমকের অধিকারী।

বঞ্চিত রেখে দরিদ্রে, যারা করিয়াছে সঞ্চয়,
দেখিবে এবার, তার সঞ্চয় তার অধিকারে নয়।
অর্থের ফাঁদ পেতে দস্যুরে ডাকিয়া আনিছে যারা,
তাহারাই আগে মরিবে, ভীষণ শাস্তি পাইবে তারা।

উপবাস যার দিনের সাধনা, নিশীথে শয়নসাথি,
যাহারা বাহিরে গাছতলে থাকে, ঘরে জ্বলে নাকো বাতি,
তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার?
তারা তিলে তিলে মরে আনিয়াছে এবার খোদার মার!

তাদেরই করুণ মৃত্যু এনেছে ভয়াল মৃত্যু ডাকি,
তাদের আত্মা শান্তি পাইবে ভোগীর রক্ত মাখি।
মানুষের মার নয় এ রে দাদা, এ যে আল্লার মার,
এর ক্ষমা নাই, এ নয় ধরার ভাঁড়ামি রাজবিচার।

উৎপীড়ক আর ভোগীদের আসিয়াছে রোজ-কিয়ামত[১]
ধূলি-রেণু হয়ে উড়ে যাবে সব ইহাদের নিয়ামত[২]।
এদেরই হাতের অস্ত্র কাটিবে এদেরই স্কন্ধ, শির,
ইহারা মরিলে দুনিয়া হইবে স্নিগ্ধ, শান্ত, স্থির।

বাক্সের পানে চেয়ে চেয়ে চোখ ফ্যাকাশে হয়েছে বুঝি!
বাক্স ও চাবি নেবে না উহারা, কেড়ে নেবে শুধু পুঁজি।
খাবি খায় তবু চাবি ছাড়ে নাকো! উৎকট প্রলোভন
মরে না কিছুতে, আত্মঘাতী তা না হয় যতক্ষণ!

আমরা গরিব, শুকায়ে হয়েছি চামড়ার আমচুর,
খামচে ধরেছে মাংসওয়ালারে ক্ষুধিত বুনো কুকুর।
কোন বন থেকে কে জানে এসেছে নেকড়ে বাঘের দল,
আমাদের ভয় নাই, আমাদের নাইকো গোরু-ছাগল।

সামলাও মাল মালওয়ালা, দেখো পয়মাল হবে সব,
ঊর্ধ্বে নিত্য শুনিতেছ নাকি শকুনের কলরব?
ধূমকেতু নয়, কোন মেথরানি হাতে মুড়ো ঝাঁটা লয়ে
এসেছে আকাশে; পৃথিবী উঠেছে ভীষণ নোংরা হয়ে!

নোংরা, লোভী ও ভোগী রহিবে না শুদ্ধ এ পৃথিবীতে,
এ আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে নরকের চুল্লিতে।
আসিছে ফিরিয়া এই বাংলায় কাঙালের শুভদিন,
আজিও সময় আছে ধনী, শোধ করো তাহাদের ঋণ!

১ প্রলয়ের দিন। ২ ধনসম্পদ।

মোহররম

ওরে বাংলার মুসলিম, তোরা কাঁদ!
এনেছে এজিদি বিদ্বেষ পুন মোহররমের চাঁদ।
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে
তখতের লোভে এসেছে এজিদ কমবখ্‌তের বেশে!
এসেছে 'সীমার', এসেছে 'কুফা'র বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্মে এসেছে লোভের প্রবল নির্মমতা!
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আশমান জমিন, কাঁদিছে মোহররমের চাঁদ।
একদিকে মাতা ফাতেমার বীর দুলাল হোসেনি সেনা,
আর দিকে যত তখ্‌ত-বিলাসী লোভী এজিদের কেনা।
মাঝে বহিতেছে শান্তিপ্রবাহ পুণ্য ফোরাত নদী,
শান্তিবারির তৃষাতুর মোরা, ওরা থাকে তাহা রোধি!
একদিকে ইসলামি ইমামের সিপাহি শান্তিব্রতী,
আর একদিকে স্বার্থান্বেষী হিংসুক ক্রোধমতি!
এই দুনিয়ার মৃত্তিকা ছিল তখ্‌ত যে খলিফার,
ভেঙে দিয়েছিল স্বর্ণ-সিংহাসনের যে অধিকার,
মদগর্বী ও ভোগী বর্বর এজিদি ধর্মী যত,
যুগে যুগে সেই সাম্য ধর্মে করিতে চেয়েছে হত।
এই ধূর্ত ও ভোগীরাই তলোয়ারে বেঁধে কোরআন,
'আলীর' সেনারে করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান!
এই এজিদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায়
হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মদিনা ও মক্কায়।
এরাই আত্মপ্রতিষ্ঠা-লোভে মসজিদে মসজিদে
বক্তৃতা দিয়ে জাগাত ঈর্ষা হায় স্বজাতির হৃদে।
ঐক্য যে ইসলামের লক্ষ্য, এরা তাহা দেয় ভেঙে।
ফোরাত নদীর কূল যুগে যুগে রক্তে উঠেছে রেঙে
এই ভোগীদের জুলুমে! ইহারা এজিদি মুসলমান,
এরা ইসলামি সাম্যবাদেরে করিয়াছে খান খান!
এক বিন্দুও প্রেম-অমৃত নাই ইহাদের বুকে,
শিশু আসগরে তির হেনে হাসে পিশাচের মতো সুখে!
আপনার সুখ ভোগ ও বিলাস ছাড়া জানে নাকো কিছু,
একজন বড়ো হতে চায়, করে লক্ষ জনেরে নিচু।

আজন্ম রহি শ্বেতমর্মর-প্রাসাদে মদবিলাসী,
তখ্‌ত টলিলে বলে, 'দরিদ্রে মোরা বড়ো ভালোবাসি!'
দরিদ্রের ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেঁপে হল ধামা ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্বি গলিয়া পড়ে চাপকান ফুঁড়ি,
যাদের চরণ পরশ করেনি কখনও ধরার ধূলি,
যাহারা মানুষে করেছে ভৃত্য মুটে মজুর ও কুলি,
অকল্যাণের দূত তাঁরা আজ ভূত সেজে পথে পথে
মৃত্যুর ভয়ে ফিরিতেছে নেমে সোনার প্রাসাদ হতে।
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের সাম্যবাদ
যুগে যুগে এই অসুর-সেনারা করিয়াছে বরবাদ।
ফোরাত নদীর স্রোত [ধারা]-সম ধনসম্পদ লয়ে
দেয় নাকো পিয়াসের এক ফোঁটা পানি। নির্মম হয়ে
মারে কাটে এরা বে-রহম, এরা টলে নাকো কোনোদিন,
এজিদি তখ্‌ত টুটেছে বলিয়া ছুটিছে শ্রান্তিহীন।
আল্লা রসুল মুখে বলে, তাঁর ক্ষমা পায়নিকো এরা,
দেখেছে শুষ্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কাবা ও হেরা।
শোনেনি ইহারা আল-আরবির সাম্য প্রেমের বাণী।

আল্লা! এরাও মুসলিম, এরা রসুলের উম্মত,
কেন পায়নিকো প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত ?
ভুল পথে নিতে চায় অন্যেরে, ভুল পথে চলে, তবু
এরা মোর ভাই, এদেরে জ্ঞান ও প্রেম ক্ষমা দাও প্রভু!
লোভ ও অহংকার ইহাদেরে করিয়াছে অজ্ঞান,
সাম্য মৈত্রী মানে না, তবুও এরা যে মুসলমান।
এদের ভুলের, মিথ্যা মোহের করি শুধু প্রতিবাদ,
ইহাদেরই প্রেমে কাঁদি আমি, কেন এরা হল জল্লাদ ?
আমাদের মাঝে যত দ্বন্দ্ব ও মন্দ হউক ভালো,
আল্লা! আবার জ্বালাও প্রেমে শান্ত মধুর আলো!
ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীরে আর ভালো লাগে নাকো,
আমার পরম প্রেমময় প্রভু, প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখো!
খলিফা হইয়া মুসলিম দুনিয়ার বাদশাহি করে,
ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পৃষ্ঠে নিজে চলে রশি ধরে!
খোদার সৃষ্ট মানুষেরে ভালোবসিতে পারে না যারা,
জানি না কেমনে জন-গণ-নেতা হতে চায় হায় তারা!
ত্যাগ করে নাকো ক্ষুধিতের তরে সঞ্চিত সম্পদ,

নওয়াব বাদশা জমিদার হয়ে, চায় প্রতিষ্ঠা-মদ।
ভোগের নওযাব আমির ইহারা, ত্যাগের আমির কই ?
মোহররমের বিষাদ-মলিন চাঁদ পানে চেয়ে রই !
মা ফাতেমা ! কোন জন্নতে আছ ? দুনিয়ার পানে চাহো,
প্রার্থনা করো, দূর হোক ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষ দাহ !
আমাদের মাঝে যার লোভ আছে, তাহা দূর হয়ে যাক,
যাহারা ভ্রান্ত, আসুক তাদের সত্যপথের ডাক।
ফোরাতের পানি ধরার মরুতে শান্তিধারার মতো
না, না, তোমারই মাতৃস্নেহ-রূপে বহে অবিরত।
সেই পবিত্র স্নেহবন্যার দুই কূলে ভায়ে ভায়ে —
হানাহানি করে ! তুমি কাঁদিতেছ কোন জন্নত-ছায়ে ?
ফোরাতের পানি রক্তিম হল ; মা গো, বিদ্বেষ-বিষে,
কারা তির হানে কাবার শান্তি মিনারের কার্নিশে ?
তুমি দাও মাগো ফিরদৌস হতে দুটি ফোঁটা আঁখিবারি,
তব স্নেহবিগলিত অশ্রু, মা, সর্বতৃষ্ণাহারী !
তুমি নবিজির নন্দিনী, নন্দন-আনন্দ দাও,
আল্লার কাছে ভায়ে ভায়ে পুন মিলন-ভিক্ষা চাও !
'সীমার' 'এজিদ' সকলের তরে কেয়ামতে ক্ষমা চাবে,
আজ দুনিয়ায় ভায়ে ভায়ে কী মা রবে দুশমনি ভাবে ?
দূর হোক এই ভাবের অভাব, ভায়ে ভায়ে এই আড়ি,
সকলের ঘরে যাক আরবের খেজুর রসের হাঁড়ি !
অখণ্ড এক চাঁদ আজ বুঝি দু-খণ্ড হয়ে যায়,
শরিকি আসিল হায় যারা মানে লা-শরিক আল্লায় ।
কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহররমের চাঁদে,
তাজিয়া মিছিলে একী কাজিয়ার খেলা, দেখে প্রাণ কাঁদে
শান্তি, শান্তি, আল্লা শান্তি দাও।
সর্বদ্বন্দ্বাতীত তুমি, নাও তব প্রেমপথে নাও।

আর কত দিন ?

প্রভু, আর কত দিন
তোমার প্রথম বেহেশ্‌ত পৃথিবী রহিবে গ্লানি-মলিন ?
ধরার অঙ্ক পাপ-কলঙ্ক-পঙ্ক-লিপ্ত করি,
বরাহ মহিষ অসুর দানব ফিরিতেছে সঞ্চরি ?

অত্যাচারীর মার খেয়ে মরে তব দুর্বল জীব,
যত খুন খায় তত বেড়ে যায় লোভী ও ভোগীর জিভ!
তোমার সত্য-পথভ্রষ্ট হয়েছে মানুষ ভয়ে,
আত্মা আত্মহত্যা করেছে অপমানে পরাজয়ে!
মনুষ্যত্ব মুমূর্ষু আজ, ক্লৈব্য কাপুরুষতা
পঙ্গু পাষাণ করেছে জীবন! —মালিন্য, দৈন্যতা,
হীন প্রবৃত্তি, চামচিকা-সম জীবনের পোড়া ঘরে
বাঁধিয়াছে বাসা! আশার আলোক জ্বলে নাকো অন্তরে।
প্রভু, আলো দাও, আলো!
ঘুচুক ভয়ের ভ্রান্তি, জড়তা, ঘন নিরাশার কালো।

প্রভু আর কত দিন
ধূর্তের কাছে বিশ্বাস সরলতা রবে দীন হীন?
স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে 'সবর ধৈর্য আর,
ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কত দিন খাবে মার?
যত মার খায় তত তারা জপে নিত্য তোমার নাম,
আশ্রয় শুধু যাচে প্রভু তব! চায় না জপের দাম।
আশ্রয় দাও পূর্ণ পরম আশ্রয়দাতা স্বামী,
আশ্রয়হীনে রক্ষিতে তব শক্তি আসুক নামি।
শুনিয়াছি, তুমি নহ জালিমের, উৎপীড়কের নহ,
নির্যাতিত ও অসহায় যথা, তার দ্বারে জাগি রহ;
ডাকিনি বলিয়া অভিমানে বুঝি লও নাই প্রতিশোধ,
আপনার হাতে করেছি আপন ঘরের দুয়ার রোধ।

আর ভয় নাই, প্রভু, দ্বার খুলিয়াছি,
আঁধারে মরেছি তিলে তিলে, যদি আঁধারে আসিয়া বাঁচি।
তুমি কৃপা করো, ক্ষমা-সুন্দর, অপরাধ ক্ষমা করো,
আশ্রয় দাও দুর্বলে, উৎপীড়কেরে সংহারো।
অন্ধ বধির পথভ্রান্তে দেখাও তোমার পথ,
আমাদের ঘিরে থাকুক নিত্য তোমার অভয়-রথ!
পশ্চিমে তব শাস্তি নেমেছে, পূর্বে নামিল কই?
হে চির-অভেদ! আমরা কি তবে তোমার সৃষ্ট নই?
যে শাস্তি দাও পশ্চিমে, পুবে সে ভয় দাওনি প্রভু;
বিশ্বাস আর তব নাম লয়ে বেঁচে আছি মোরা তবু।
সব কেড়ে নিক অত্যাচারীরা, প্রভু গো দাও অভয়,
বিশ্বাস আর ধৈর্য ও তব নাম — যেন সাথি রয়।

এই বিশ্বাসে, তোমার নামের মহিমায় — ফিরে পাব
শান্তি, সাম্য। তব দাস মোর তব কাছে ফিরে যাব।
প্রেম, আনন্দ, মাধুরী ও রস পাব এই দুনিয়াতে,
তোমার বিরহে কাঁদিব আমরা জাগিয়া নিশীথ রাতে।
বলো প্রেমময়, বলো হে পরম সুন্দর, বলো প্রভু,
অন্ধ জীবের এই প্রার্থনা মিথ্যা হবে না কভু!
তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান!
বহু সুখ সহিয়াছি, এইবারে দাও চিরকল্যাণ।
সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ,
তোমারই এ বাণী — দেখিব তোমার কৃপার পূর্ণ চাঁদ।
প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও নিত্য মোদের পর,
পূর্ণ হউক তোমার প্রসাদে আমাদের কুঁড়েঘর।
আমরা কাঙাল, আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন[১]
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।
তুমিই শক্তি, ভক্তি ও প্রেম, জ্ঞান আনন্দ দাও,
কবুল করো এ প্রার্থনা, প্রভু, কৃপা করো, ফিরে চাও!
এক সে তোমারই ধ্যান তপস্যা আরাধনা হোক স্বামী,
নিরভাব হোক মানুষ, গাহুক তব নাম দিবাযামী।
উর্ধ্ব হইতে কে বলে 'আমেন', 'তথাস্তু' বলো, বলো,
চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, দেহ কাঁপে টলমল!
সত্য হউক সত্য হউক উর্ধ্বের এই বাণী,
দরিদ্রে দান করিতে করুণা, আসিছেন মহাদানী!

বিশ্বাস ও আশা

বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে,
নড়াচড়া করে, তবুও সে মড়া, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।
শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে,
পরান গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে!

থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,
যুদ্ধ না করে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিয়ো না।
ভিতরে শত্রু ভয়ের ভ্রান্তি, মিথ্যা ও অহেতুক
নিরাশায় হয় পরাজয় যার, তাহার নিত্য দুখ।

---

১ নিঃস্ব।

'হয়তো কী হবে' এই ভেবে যারা ঘরে বসে কাঁপে ভয়ে,
জীবনের রণে নিত্য তারাই আছে পরাজিত হয়ে।
তারাই বন্দি হয়ে আছে গ্লানি-অধীনতা কারাগারে ;
তারাই নিত্য জ্বালায় পিত্ত অসহায় অবিচারে!

এরা অকারণ ভয়ে ভীত, এরা দুর্বল নির্বোধ,
ইহাদের দেখে দুঃখের চেয়ে জাগে মনে বেশি ক্রোধ।
এরা নির্বোধ, না করে কিছুই জিভ মেলে পড়ে আছে
গোরস্তানেও ফুল ফোটে, ফুল ফোটে না এ মরা গাছে।

এদের যুক্তি অদৃষ্টবাদ, বসে বসে ভাবে একা,
'এ মোর নিয়তি, বদলানো নাহি যায় কপালের লেখা!'
পৌরুষ এরা মানে না, নিজেরে দেয় শুধু ধিক্কার,
দুর্ভাগ্যের সাথে নাহি লড়ে মেনেছে ইহারা হার।

এরা জড়, এরা ব্যাধিগ্রস্ত, মিশো না এদের সাথে,
মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা এরা দুনিয়াতে।
এদের ভিতরে ব্যাধি, ইহাদের দশদিক তমোময়,
চোখ বুজে থাকে, আলো দেখিয়াও বলে, 'ইহা আলো নয়'।

প্রবল অটল বিশ্বাস যার নিশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন আর জীবনের ঢেউ কল-তরঙ্গে আসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত শস্যে কুসুমে ফলে,
কোনো বাধা তার রুধে নাকো পথ, কেবল সুমুখে চলে,

চির-নির্ভয় ; পরাজয় তার জয়ের স্বর্গ-সিঁড়ি,
আশার আলোক দেখে তত, যত আসে দুর্দিন ঘিরি।
সেই পাইয়াছে পরম আশার আলো, যেয়ো তারই কাছে,
তাহারই নিকটে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়-কবচ আছে।

যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,
তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।
অসম্ভবের অভিযান-পথ তারাই দেখায় নরে,
সর্বসৃষ্টি ফেরেশ্‌তারেও তারা বশীভূত করে।

আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্ম-নির্যাতন,
নির্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরান-পণ,

তাহারা বন্ধ জীব পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,
তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।

হাত-পা পাইয়া কর্ম করে না কূর্মধর্মী হয়ে,
রহে কাদা-জলে মুখ লুকাইয়া আঁধার বিবরে ভয়ে,
তাহারা মানব-ধর্ম ত্যজিয়া জড়ের ধর্ম লয়,
তাহারা গোরস্তান, শ্মশানের, আমাদের কেহ নয়!

আমি বলি, শোনো মানুষ! পূর্ণ হওয়ার সাধনা করো,
দেখিবে তাহারই প্রতাপে বিশ্ব কাঁপিতেছে থরথর।
ইহা আল্লার বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,
এই মানুষের হাত পা চক্ষু আল্লার হয়ে যায়!

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,
তাহারই দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্বজয়।
অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানীর,
অটল শান্ত সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।

নিরানন্দের মাঝে আল্লার আনন্দ সেই আনে,
চাঁদের মতন তার প্রেম জনগণ-সমুদ্রে টানে।
অসম সাহস আসে বুকে তার অভয় সজ্জা করে,
নিত্য জয়ের পথে চলো সেই পথিকের হাত ধরে!

পূর্ণ পরম বিশ্বাসী হও, যাহা চাও পাবে তাই,
তাহারে ছুঁয়ো না, সেই মরিয়াছে, বিশ্বাস যার নাই!

ডুবিবে না আশাতরি

তুমি ভাসাইলে আশাতরি, প্রভু, দুর্দিন ঘন ঝড়ে,
ততবার ঝড় থেমে যায়, তরি যতবার টলে পড়ে।
তুমি যে-তরির কাণ্ডারি তার ডুবিবার ভয় নাই,
তোমার আদেশে সে তরির দাঁড় বাহি, গুন টেনে যাই।
আসে বিরুদ্ধশক্তি ভীষণ প্রলয়-তুফান লয়ে,
কাঁপে তরণির যাত্রীরা কেহ নিরাশায় কেহ ভয়ে।
নদীজল কাঁপে টলমল যেন আহত ফণীর ফণা,
দমকে অশনি চমকে দামিনী — ঝঞ্ঝার ঝঞ্ঝনা।

অন্ধ যামিনী, দেখিতে পাই না কাণ্ডারি তুমি কোথা ?
তোমার জ্যোতিতে অগ্রপথের দূর করো অন্ধতা!
তোমার আলোরে আবৃত করে ভযাল তিমির রাতি,
দূর করো ভয, হে চির-অভয, জ্বালায়ে আশার বাতি!
হে নবযুগের নব অভিযান-সেনাদল, শোনো সবে,
তোমরা টলিলে তুফানে তরণি আরও চঞ্চল হবে।
এ তরির কাণ্ডারি আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান,
বিশ্বাস রাখো তাঁর শক্তিতে, এ তাঁহার অভিযান।
ভয় যার মনে যুদ্ধ না করে তার পরাজয় হয়,
ভয যার নাই মরিযাও সেই শহিদের হয় জয়।
অগ্রপথের সেনারা করে না পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
জয়ী হয তারা জীবনে, অথবা মৃত্যু করে বরণ!
জীবন মৃত্যু সমান তাদের, ঘুম জাগরণ সম,
এক আল্লাহ্ ইহাদের প্রভু, বন্ধু ও প্রিযতম।
আল্লার নামে অভিযান করি, আমাদের ভয কোথা,
দুবার মরে না মানুষ, তবুও কেন এ দুর্বলতা।
ডুবে যদি তরি, বাঁচি কীবা মরি, আল্লা মোদের সাথি,
যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি।
মোদের ভরসা একমাত্র সে নিত্য পরম প্রভু,
দুলুক তরণি, আমাদের মন নাহি দোলে যেন কভু।
পাব কূল মোরা পাব আশ্রয় — রাখো বিশ্বাস রাখো,
তাঁর কাছে করো শক্তি ভিক্ষা, তাঁরে প্রাণ দিয়া ডাকো।
পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করিয়া থির করো প্রাণমন,
দূর হবে সব বাধা ও বিঘ্ন, আসিবে প্রভঞ্জন।
হয়তো প্রভুর পরীক্ষা ইহা, ভয় দেখাইয়া তিনি!
ভয় করিবেন দূর আমাদের, জ্ঞাতা একক যিনি!
পার হইতেছি মোরা নিরাশা ও অবিশ্বাসের নদী,
ডুবিবে তরণি, যদি ভয় পাই অধৈর্য আসে যদি!
হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরির নওজোয়ান!
আল্লারে নিবেদন করে দাও আল্লার দেওয়া প্রাণ।
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হতে,
মরিতে হয় তো মরিব আমরা এক-আল্লার পথে।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব আনন্দধামে আল্লার কাছে।
— আমাদের কীবা ভয় —
আমাদের চির চাওয়া-পাওয়া এক আল্লাহ্ প্রেমময়!

তাঁর প্রেমে মোরা উন্মাদ, তাঁর তেজ হাতে তলোয়ার,
মোদের লক্ষ্য চির-পূর্ণতা নিত্য সঙ্গা তাঁর।
দুলুক মোদের রণতরি, যেন মনতরি নাহি দোলে,
যেখানেই যাই মোরা জানি ঠাঁই পাব, পাব তাঁর কোলে।
থেমে যাবে এই দুর্যোগ-ঘন প্রলয় তুফান ঝড়,
'কওসর-অমৃত' পাব, করো আল্লাতে নির্ভর!
মোদের অপূর্ণতা ও অভাব পূরণ করিবে সে,
অসম্ভবের অভিযান-পথে সৈন্য করেছে যে!
তাঁরই নাম লয়ে বলি, বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,
তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।
তাঁহারই কৃপায় তাঁরে ভালোবেসে, বলে আমি চলে যাই,
তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোন চাওয়া-পাওয়া নাই।
আর বলিব না। তাঁরে ভালোবেসে ফিরে এসে মোরে বলো,
কী হারাইয়া কী পাইয়াছ তুমি, কী দশা তোমার হল!

সকল পথের বন্ধু

হে আনন্দ-প্রেম-রসঘন, মধুরম, মনোহর!
একী মদিরার আবেশে নেশায় কাঁপে তনু থরথর!
হৃদি-পদ্মিনী নিঙাড়িয়া বঁধু —
আনিতে চাও কি অমৃতমধু,
উদাসীন মনে আন একী সুরভিত বন-মর্মর!
ঘন অরণ্য-আড়ালে কে হাস প্রিয় জ্যোতিসুন্দর!

কৃষ্ণা তিথির আড়ালে আমার চাঁদ লুকাইয়াছিলে!
আমি ভেবেছিনু, আমি কালো, তুমি তাই প্রেম নাহি দিলে।
বুঝি নাই, রসময়, তব খেলা
ভয় হত, যদি কর অবহেলা।
বেণুকা বাজায়ে পথে এনে হায় কোথা তুমি লুকাইলে?
দেখেছ কি দেহে কাদা, অন্তরে রাধারে নাহি দেখিলে?

তব অভিসার-পথ রুধিয়াছে কে যেন ভয়ংকর!
দিগ্‌দিগন্তে অন্ধ করেছে বাধার তুফান ঝড়।
সীতার মতন কে যেন গো কেশ ধরে
আঁধার পাতালে লইয়া গিয়াছে মোরে।

জড়াইয়া যেন শত শত নাগ বিষাক্ত অজগর
দংশেছে মোরে, বিষে জরজর! — তবু, ওগো মনোহর —

ডাকিনি তোমায়, যদি এই বিষ তব শ্রীঅঙ্গে লাগে!
এই পঙ্ক, এ মালিন্য যদি বাধা আনে অনুরাগে।
বলেছি, 'বন্ধু, সরে যাও, সরে যাও,
আমার এ ক্লেশে আমারে কাঁদিতে দাও!'
আমার দুঃখ 'লু' হাওয়ার জ্বালা না আনে গোলাপ-বাগে!
ক্ষমা কোরো মোরে, ভুল বুঝিযো না, যদি অভিমান জাগে!

জানি তুমি মোরে জড়ায়ে ধরেছ প্রকাশ-ব্রহ্মরূপে,
আমার বক্ষে চেতনানন্দ হয়ে কাঁদ চুপে চুপে!
হৃদি-শতদল কাঁপে মোর টলমল,
মোর চোখে ঝরে তোমার অশ্রুজল!
বক্ষে জড়ায়ে আন প্রেমলোকে, নামিয়া অন্ধকূপে,
অমৃত স্বরূপে হে প্রিয়তম আনন্দ-স্বরূপে!

আঁধারে আলোকে যখন যে পথ টানে, তুমি থাক কাছে।
অরণ্যপথে তব আনন্দ কুরঙ্গ হয়ে নাচে!
আমার তীর্থ-মরুপথে ছায়া হয়ে
সাথে সাথে চলো আঙুরের রস লয়ে,
পথের বালুকা পাখির পালক ফুল হয়ে ফুটিয়াছে!
চোখে জল, বুকে মধু বলে — 'বঁধু, আছে আছে, সাথে আছে!'

তোমারে ভিক্ষা দাও

বলো হে পরম প্রিয়-ঘন মোর স্বামী!
আমাতে কাহারও অধিকার নাই, এক সে তোমার আমি।
ভালো ও মন্দে মধুর দ্বন্দ্বে কী খেলা আমারে লয়ে
খেলিতেছ তুমি, কেহ জানিবে না, থাকুক গোপন হয়ে!
আমারেও তাহা জানিতে দিয়ো না, শুধু এই জানাইয়ো,
আমার পূর্ণ পরম মধুর, মধুর তুমি হে প্রিয়!
আমার জানা ও না-জানা সর্ব অস্তিত্বের প্রভু
একা তুমি হও! সেথা কারও ছায়া পড়ে নাকো যেন কভু!
তোমার আমার পরমানন্দ ফোটে ছন্দ ও গানে,
তুমি শুনো তাহা, তুমি লঘু; গুরুজন হাত দিক কানে!
লতার প্রলাপ গোলাপের মতো কথা মোর কেন ফোটে!

তুমি জান, কেন উষা আসে ভোরে, কেন শুকতারা ওঠে।
ঘুমে জাগরণে শয়নে স্বপনে সর্বকর্মে মম
তব স্মৃতি তব নাম যেন হয় সাথি মোর, প্রিয়তম!
নিবিড় বেদনা হইয়া আমার বক্ষে নিত্য থেকো,
ভুলিতে দিয়ো না, আমি যদি ভুলি অমনি আমারে ডেকো!
তুমি যারে ভোলো, ভাগ্যহীন সে তোমারে ভুলিয়া যায়,
তুমি কৃপা করে চাহ যার পানে, সেই তব প্রেম পায়।
তুমি যারে ডাক, পাগল হইয়া সেই ধায় তব পথে,
বাঁশি না শুনিলে বন-হরিণী কি ছুটে আসে বন হতে?
চাঁদ ওঠে আগে, দেখে অনুরাগে চকোরী ব্যাকুলা হয়,
এত পাখি আছে, চাতকীরই কেন মেঘের সাথে প্রণয়?
কে দিলে তাহারে মেঘের তৃষ্ণা, হে রস-মধুর, বলো!
তুমি রস দিলে আঁখির আকাশ হয় জল-ছলছল।
চাঁদ যবে ওঠে, চকোর তাহার চকোরীরে ভুলে যায়,
চকোরীও ভোলে চকোরে, যখন চাঁদের সে দেখা পায়।
চাঁদের স্বপন ভুলিয়া দুজন নীড়ে কেন ফিরে আসে?
তব লীলা ধরা পড়ে যায়, দেখে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে।
তুমি নির্গুণ নাকি? আমি দেখি গুণের অন্ত নাই,
ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে আসিয়া শুধু তব গুণ গাই!
ভুলে যাই আমি কী ভিক্ষা চাই, পরান কাহারে যাচে,
খুঁজিয়া পাই না ভিক্ষার ঝুলি, চোরে চুরি করিয়াছে!
মন হাসে, প্রাণ কাঁদে! বলে, জানি চুরি করে কোন চোরে।
তোমারে যে চায় ভিক্ষা, তাহার ঝুলিটিও নাও হরে!
যে হাতে ভিক্ষা চায়, ভিখারির সে হাত কাড়িয়া লও,
হে মহামৌনী! কাঁদ কেন এত? কথা কও, কথা কও!
কত যুগ গেল, কত সে জনম শুনিনি তোমার কথা,
এত অনুরাগ দিয়ে, বৈরাগী, কেন দিলে বধিরতা?
তোমারে দেখার দৃষ্টি দিলে না, দিলে শুধু আঁখিজল,
অশ্রু তোমার কৃপা; তবু আঁখি হল নাকি নির্মল?
দৃষ্টিরে কেন ফিরাইয়া দাও — তব সৃষ্টির পানে?
বলো, বলো, কোথা লুকাইয়া আছ সৃষ্টির কোনখানে!
ঊর্ধ্বে যাব না, লহো হাত ধরে তব সৃষ্টির কাছে,
কোথা তুমি, সেথা লয়ে যাও, এই অন্ধ ভিখারি যাচে!
কী ভিক্ষা চায় ভিখারি তোমার, আগে থেকে রাখো জেনে,
চাহিব যখন, হে চোর, তখন পলায়ো না হার মেনে।
আর কিছু নয়, চির প্রেমময়, তোমারে ভিক্ষা চাই,

এক তুমি ছাড়া এই ভিখারির কিছুই চাওযার নাই!
তব দেওয়া এই তনুমনপ্রাণ মোর যাহা কিছু আছে,
তুমি জান, কেন নিবেদন করে দিযাছি তোমার কাছে।
যা-কিছু পেয়েছি, পাইতেছি যাহা, পাইব যা কিছু পবে,
সে যে তব দান, তাই নিবেদিত থাক উহা তব তরে।
তোমার দানের সম্মান, প্রভু, আমি কি রাখিতে পারি?
তব দান দাও সকলে বিলাযে, আমারে করো ভিখারি!
তব দান মোর কামনা ও লোভ সঞ্চিত করে বাখে,
বঞ্চিত করে তোমার মিলনে, ওই সবই ঘিরে থাকে!
দান দিয়ে মোরে দিয়ো না ফিরায়ে, হে দানী, তোমারে দাও,
তব দান নিযে তব ভিখারিরে চিরতরে চিনে নাও!
তোমারেই চাই জেনে করিযাছ চুরি ভিক্ষার ঝুলি,
ধবা পড়িযাছ মনোচোর, দাও চোখেব বাঁধন খুলি।
সব ভুলে যাই, কিছু মনে নাই, খেলাতেছিলে কী খেলা,
আমারই মতন ঘুমাইতে কারে দাওনি?
তব নাম লয়ে সুদূর মিনারে কে ডাকিছে ভোরবেলা?

বকরীদ

'শহিদান'দের ঈদ এল বকরীদ!
অন্তরে চির-নওজোয়ান যে, তারই তরে এই ঈদ।
আল্লার রাহে দিতে পারে যারা আপনারে কোরবান,
নির্লোভ নিরহংকার যারা, যাহারা নিরভিমান,
দানব-দৈত্যে কতল করিতে আসে তলোয়ার লযে,
ফিরদৌস[১] হতে এসেছে যাহারা ধরায় মানুষ হয়ে,
অসুন্দর ও অত্যাচারীরে বিনাশ করিতে যারা
জন্ম লয়েছে চিরনির্ভীক যৌবন-মাতোয়ারা, —
তাহাদেরই শুধু আছে অধিকার ঈদগাহে ময়দানে,
তাহারাই শুধু বকরীদ করে জান মাল কোরবানে।
বিভূতি, 'মাজেজা'[২], যাহা পায় সব প্রভু আল্লার রাহে
কোরবানি দিয়ে নির্যাতিতেরে মুক্ত করিতে চাহে।

১ স্বর্গবিশেষ। ২ অলৌকিক ঘটনা।

এরাই মানব-জাতির খাদেম[১], ইহারাই খাক্‌সার[২],
এরাই লোভীর সাম্রাজ্যেরে করে দেয় মিসমার[৩]!
ইহারাই 'ফিরদৌস-আল্লা'র প্রেম-ঘন অধিবাসী
তসবি[৪] ও তলোয়ার লয়ে আসি অসুরে যায় বিনাশি।
এরাই শহিদ, প্রাণ লয়ে এরা খেলে ছিনিমিনি খেলা,
ভীবুর বাজারে এরা আনে নিতি নব নওরোজ[৫]-মেলা!
প্রাণ-রঙ্গিলা করে ইহারাই ভীতি-ম্লান আত্মায়,
আপনার প্রাণ-প্রদীপ নিভায়ে সবার প্রাণ জাগায়।
কল্পবৃক্ষ পবিত্র 'জৈতুন'[৬] গাছ যথা থাকে,
এরা সেই আশমান থেকে এসে, সদা তারই ধ্যান রাখে!
এরা আল্লার সৈনিক, এরা 'জবীহুল্লা'[৭]-র সাথি,
এদেরই আত্মত্যাগ যুগে যুগে জ্বালায় আশার বাতি।
ইহারা, সর্বত্যাগী বৈরাগী প্রভু আল্লার রাহে,
ভয় করে নাকো কোনো দুনিয়ার কোনো সে শাহানশাহে।
এরাই কাবার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত[৮] চুমি!
কওসর[৯] আনে নিঙাড়িয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি!
'জবীহুল্লা'র দোস্ত ইহারা, এদেরই চরণাঘাতে,
'আব-জমজম'[১০] প্রবাহিত হয় হৃদয়ের মক্কাতে।
ইব্রাহিমের কাহিনি শুনেছ? ইসমাইলের ত্যাগ?
আল্লারে পাবে মনে কর কোরবানি দিয়ে গোরু ছাগ?
আল্লার নামে, ধর্মের নামে, মানব জাতির লাগি
পুত্রেরে কোরবানি দিতে পারে, আছে কেউ হেন ত্যাগী?
সেই মুসলিম থাকে যদি কেউ, তসলিম[১১] করি তারে,
ঈদগাহে গিয়া তারই সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,
চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয়!
লাখো 'বকরা'র বদলে সে পার হবে না পুলসেরাত[১২],
সোনার বলদ ধনসম্পদ দিতে পার খুলে হাত?
কোরান মজিদে আল্লার এই ফরমান দেখো পড়ে,
আল্লার রাহে কোরবানি দাও সোনার বলদ ধরে।

১ সেবক। ২ নগণ্য ব্যক্তি। ৩ বিধ্বস্ত। ৪ মুসলমানদের জপমালা। ৫ নতুন দিন বা নববর্ষ। ৬ জলপাই। ৭ আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি। ইসমাইল-এর অপর নাম। ৮ হস্ত। ৯ অমৃত। ১০ মক্কার অদূরে জমজম কূপের পবিত্র বারি। ১১ ইসলামি কায়দায় অভিবাদন। ১২ নরকের উপরের সাঁকো বা পুল, যা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং তরোয়ালের চেয়ে ধারালো। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই পুল পার হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেন, পাপীরা পিছলে অগ্নিময় নরকে পতিত হয়।

ইব্রাহিমের মতো পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নইলে কখনও মুসলিম নও, মিছে শাফায়ৎ[১] চাও!
নির্যাতিতের লাগি পুত্রেরে দাও না শহিদ হতে,
চাকরিতে দিয়া মিছে কথা কও—'যাও আল্লার পথে'!
বকরীদি চাঁদ করে ফরয়্যাদ[২], দাও দাও কোরবানি,
আল্লারে পাওয়া যায় না করিয়া তাঁহার না-ফরমানি[৩]!
পিছন হইতে বুকে ছুরি মেরে, গলায় গলায় মেলো,
কোরো না আত্ম-প্রতারণা আর, খেলকা[৪] খুলিয়া ফেলো!
উমরে[৫], খালেদে[৬], মুসা[৭] ও তারেকে[৮] বকরীদে মনে কর,
শুধু সালওয়ার পরিয়ো না, ধরো হাতে তলোয়ার ধরো!
কোথায় আমার প্রিয় শহিদদল মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ?
এসো ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দান!

আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও

('ফি সবিলিল্লাহ্')

মোর পরম-ভিক্ষু আল্লার নামে চাই
ভিক্ষা দাও গো মাতা পিতা বোন ভাই,
দাও ভিখারিরে ভিক্ষা দাও।

মোর পরম-ডাকাত ঘরের দুয়ার খুলি
হারিয়া আমার সর্বস্ব সে
দিয়াছে ভিক্ষাঝুলি,
তাঁর মহাদান সেই ঝুলি কাঁধে তুলি
এসেছি ভিখারি, হে ধনী, ফিরিয়া চাও।
আল্লার নামে ভিক্ষা দাও।

হে ধনিক, তাঁর পাইয়াছ বহু দান,
রত্ন মানিক ভোগ যশ সম্মান,
তব প্রাসাদের চারিদিকে ভিখারিরা
প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন,
চায়নি তোমার হিরা।
বলো, বলো, সেই নিরন্নদের মুখে

১ সুপারিশ। ২ বিচার প্রার্থনা। ৩ অমান্য। ৪ তালিযুক্ত পোশাক। ৫ হজরতের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। সুবিচারের জন্য খ্যাত। ৬ খালেদ-বিন-ওয়ালিদ। তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিশাল যুদ্ধায়োজন তছনছ করে আরব দেশের বাইরে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ৭,৮ সোনালি যুগের সুবিখ্যাত বীর।

অন্ন দিয়াছ ? কেঁদেছ তাদের দুখে ?
লজ্জা ঢাকিয়া নগ্ন দেহের তার
মুক্তি, পেয়েছে তোমার মুক্তি-হার ?

তব আত্মার আত্মীয় যারা,
তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
কাঙালের বেশে কাঁদে তব দরজায় —
তাড়ায় তাদেরে গাল দিয়ে দরওয়ান,
তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ ?
হিরা মানিকের পাষাণ পরিয়া
তুমি কি পাষাণ হলে ?
তোমার আত্মা কাঁদে না তোমার দুয়ারে
মানুষ মলে ?

পাওনি শান্তি, আনন্দ প্রেম —
জানি আমি তাহা জানি,
তোমার অর্থ ঢাকিনি রেখেছে
তোমার চোখেব পানি !
কাঙালিনি মা-র বুকে ক্ষুধাতুর শিশু
তোমার দুয়ারে কাঁদে শোনো, ওই শোনো।
ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হিরা মণি
তুলে রাখো আর গোনো।
এ টাকা তোমার রবে না, বন্ধু জানি,
এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।
'আর্শ' আসন টলিয়াছে আল্লার,
শুনি ক্ষুধিতের কাঙালের হাহাকার।
তাই সে পরম-ভিক্ষু ভিক্ষা চায়
ভিখারির মারফতে তব দরজায়।
ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,
ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে।
মৃত্যুর আর দেরি নাই তব —
ফিরে চাও ফিরে চাও,
পরম-ভিক্ষু মোর আল্লার নামে —
দরিদ্র উপবাসীরে ভিক্ষা দাও।

ওগো জ্ঞানী, ওগো শিল্পী, লেখক, কবি,
তোমরা দেখেছ ঊর্ধ্বের শশী রবি।

তোমরা তাঁহার সুন্দর সৃষ্টিরে
রেখেছ ধরিয়া রসায়িত মন ঘিরে।
তোমাদের এই জ্ঞানের প্রদীপ-মালা
করে নাকো কেন কাঙালের ঘর আলা ?
এত জ্ঞান এত শক্তি, বিলাস সে কি ?
আলো তার দূর কুটিরে যায় না
কোন সে শিলায় ঠেকি ?

যাহারা বুদ্ধিজীবী, সৈনিক
হবে না তাহারা কভু,
তারা কল্যাণ আনেনি কখনও
তারা বুদ্ধির প্রভু।
তাহাদের রস দেবার তরে কি
লেখনী করিছ ক্ষয় ?
শতকরা নিরানব্বই জন
তারা তব কেহ নয় ?
এই দরিদ্র ভিখারিরা আজ
অসহায় গৃহহারা
'আলো দাও' বলে কাঁদিছে দুয়ারে —
ভিক্ষা পাবে না তারা ?
অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারের
ইহারা বন্ধ জীব,
উৎপীড়কের পীড়নে পীড়িত
দলিত বদ্-নসিব।
তোমাদের আছে বিপুল শক্তি,
কৃপণ হইয়া তবে
কেন সহ মানুষের অপমান,
মানুষ কি দাস রবে ?
আমার পিছনে পীড়িত আত্মা
অগণন জনগণ
অসহ জুলুম যন্ত্রণা পেয়ে
করিতেছে ক্রন্দন।
পরম-ভিক্ষু আদেশ দিলেন,
ভিক্ষা চাহিতে, তাই
এই অগণন জনগণ তরে
আসিয়াছি দ্বারে, ভাই !
ভোলো ভয়, দূর করো কৃপণতা,

পাষাণে প্রাণ জাগাও,
ভিখারির ঝুলি পূর্ণ হইবে,
তোমরা ভিক্ষা দাও।

তোমরা কি দলপতি,
তোমরা কি নেতা ?
শুনেছি, তোমরা কল্যাণকামী
মহান উদারচেতা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিব
চরম আত্মদান,
চাহিব তোমার অভিনন্দন-মালা,
যশ, খ্যাতি, প্রাণ।
চাহিব তোমার গোপন ইচ্ছা
আত্ম-প্রতিষ্ঠার,
চাহিব ভিক্ষা তোমার সর্ব
লোভ ও অহংকার।
পরম ভিক্ষু পাঠায়েছে মোরে,
দাও সে ভিক্ষা দাও !
আপনার সব লোভ ও তৃষ্ণা
তাঁহারে বিলায়ে দাও !
তিনি নিরভাব, পূর্ণ। ভিক্ষা
চাহেন, এ তাঁর সাধ,
শালুক ফুটায়ে যেমন তাহারই
প্রেম-প্রীতি চায় চাঁদ।
যশ খ্যাতি আর অহংকারের
লোভ তাঁরে দিলে ভিখ ,
ফিরে পাবে তাঁর মহাদান,
হবে মহানেতা নির্ভীক !
নিজেরা আত্মত্যাগ করে মহা
ত্যাগের পথ দেখাও !
ভিক্ষা চাহে এ ভিখারি, ভিক্ষা
দাও গো ভিক্ষা দাও !

তুমি কে ? তুমি মদোন্মত্ত
মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারাজল, মহা
গিরির প্রস্রবণ।
তুমি প্রেম, তুমি আনন্দ, তুমি
ছন্দ মূর্তিমান,

তুমিই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশ,
রুদ্রের অভিযান!
যুগে যুগে তুমিই অকল্যাণেরে
করিয়াছ সংহার,
তুমিই বৈরাগী, বক্ষের প্রিয়া
ত্যজি ধরো তলোয়ার!
জরাজীর্ণের যুক্তি শোন না,
গতি শুধু সম্মুখে,
মৃত্যুরে প্রিয় বন্ধুর সম
জড়াইযা ধরো বুকে।
তোমরাই বীর সন্তান, যুগে
যুগে এই পৃথিবীর,
হাসিয়া তোমরা ফুলের মতন
লুটায়েছ নিজ শির।
দেহেরে ভেবেছ ঢেলার মতন,
প্রাণ নিয়ে কর খেলা,
তোমারই রক্তে যুগে যুগে আসে
অরুণ-উদয়-বেলা।
তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতে
আঁখি ভরে উঠে জলে,
তোমরা যে পথে চল, কেঁদে আমি
লুটাই সে পথতলে।
তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে
এসেছি ভিখারি আমি,
ভিক্ষা চাহিতে পাঠাল সর্ব-
জাতির পরম স্বামী।
তোমরা শহিদ, তোমরা অমর,
নিতি আনন্দধামে
তোমরা খেলিবে, তোমাদের তরে
তাঁর কৃপা নিতি নামে।
তোমরাই আশা-ভরসা জাতির
স্বদেশের সেনাদল,
তোমরা চলিলে, আনন্দে ধরা
কেঁপে ওঠে টলমল।
তোমরা প্রবাহ, তোমরা শক্তি,
তোমরা জীবনধারা,
তোমাদেরই স্রোত যুগে যুগে ভাঙে
সব বন্ধন-কারা।

তুষার হইয়া কেন আছ আজও,
আগুন উঠেছে জ্বলে,
দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, ছুটে
এসো সবে দলে দলে।
তোমরা জাগিলে ঘুচে যাবে সব
ক্লৈব্য ও অবসাদ,
পরম-ভিক্ষু এক আল্লার
পুরিবে সেদিন সাধ।
আর কেহ ভিখ দিক বা না দিক
তোমরা ভিক্ষা দাও,
সাম্য শান্তি আসিবে না, যদি
তোমরা ফিরে না চাও।
নহি নেতা, রাজনৈতিক, প্রেম-
ভিক্ষা আমার নীতি।
পৃথিবী স্বর্গ, পৃথিবীতে ফের
জাগুক স্বর্গ-প্রীতি।
অসম্ভবেরে সম্ভব করা
জাগো নবযৌবন।
ভিক্ষা দাও গো, এ ধরা হউক
আল্লার গুলশন।

একি আল্লার কৃপা নয়?

একি আল্লার কৃপা নয়?
একি তাঁর সাহায্য নয়?
যেথা ছিল শুধু পরাজয় ভয়,
সেখানে পাইলে জয়!
রক্তের স্রোত বহাতে যাহারা এসেছিল এই দেশে,
ধরেছে তাদের টুঁটি টিপে আজ তাঁর অভিশাপ এসে!
আল্লার আশ্রয় চেয়ে, আল্লার শক্তিতে আজ
তোমরা পেয়েছ আশ্রয় আর তারা পাইতেছে লাজ।
লোভ আর ভোগ চাহে যারা, নাই তাদের ধর্ম জাতি,
তাদের শুধু এক নাম আছে, রাক্ষস বলে খ্যাতি!
হউক হিন্দু, হউক ক্রিশ্চান, হোক সে মুসলমান,
ক্ষমা নাই তার, যে আনে তাঁহার দুনিয়ায় অকল্যাণ!
জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,

আল্লার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।
তাহাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,
দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টি মানুষেরে পদতলে!
সকল জাতির সব মানুষের এক আল্লাহ্ সেই,
তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারও অধিকার নেই!
আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারই পথে,
করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হতে!

নির্যাতিতের আল্লাহ্ তিনি, কোনো জাতি নাই তাঁর,
যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাঁহার প্রবল মার।
তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,
মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আল্লার ফরমান।
দূর করো লোভ, ক্ষুদ্র অহংকার,
ফেলিয়া দিয়ো না, পাইয়াছ হাতে আল্লার তলোয়ার!
দূর করে দাও সন্দেহ, দুর্বলের অবিশ্বাস,
সমুখে জাগুক পরম সত্য আল্লার উল্লাস!
খানিক পেয়েছ, মানিক পাওনি, দেরি নাই, তাও পাবে,
তাঁর জ্যোতি চির-অভয়ের পথে নিত্য লইয়া যাবে!
চারিদিক হতে ঘিরিয়া আসিছে হেরো অগ্নির ঢেউ,
যারা তাঁর পথে রহিবে, তাঁদের মারিবে না কভু কেউ!
শুধু তাহারাই রক্ষা পাইবে! সাবধান, সাবধান!
মহাযুদ্ধের রূপে আসিয়াছে তাঁর শেষ ফরমান!
তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে, লয়ে আল্লার নাম, জাগো!
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো!
অন্তরে তব উঠুক ঝলসি আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আরবার!
কোনো ব্যক্তির করিয়ো না পূজা, এক তাঁর পূজা করো,
রাজনীতি নয় মুক্তির পথ, এক তাঁর পথ ধরো!
মানুষের লোভ বাড়ায়ে দিয়ো না, তার জয়ধ্বনি করে,
মানুষেরে ত্রাতা ভাবিলে অমনি আল্লাহ্ যান সরে!
তিনিই সর্বকল্যাণদাতা, সর্ববিপদত্রাতা,
তিনি দিশা দেন সহজ পথের, তিনিই সর্বজ্ঞাতা!

তাঁর দেওয়া কৃপা-শক্তির চেয়ে, ভাই,
মানবের জ্ঞানে দানব মারার কোনো সে শক্তি নাই।

১ মাথা নত করিয়া প্রণাম।

চুক্তিতে আর যুক্তিতে কভু মানুষ বন্ধ হয় ?
তিনি প্রেম দিলে ত্রিভুবন হয় সাম্য শান্তিময় !
আমি বুঝি নাকো কোনো সে 'ইজম' কোনোরূপ রাজনীতি,
আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি !
ভেদ-বিভেদের কথা বলে যারা, তারা শয়তানি চেলা,
আর বেশি দিন নাই, শেষ হয়ে এসেছে তাদের খেলা !
থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায়, তোমরা থাকিয়া দেখো,
সেদিন সিজদা করো আল্লারে, কাঁদিয়া তাঁহারে ডেকো !
সেদিন সত্য হয় যদি তাঁর এই বান্দার কথা,
ঘুচে যাবে মোর চিরজনমের সকল দুঃখ-ব্যথা।
মানুষ আবার তাঁর প্রেমে নেয়ে চিরপবিত্র হোক !
জিনের দুনিয়া লভুক আবার জান্নাতের আলোক !

মহাত্মা মোহ্‌সিন

[গান]

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু হে মোহ্‌সিন !
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ ॥
ভোগ করনিকো বিপুল বিত্ত পেয়ে,
ভিখারি হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হলে আল্লার কৃপা পেয়ে,
দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন ॥

মানুষের ভালোবাসায় পাইলে আল্লার ভালোবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া, পুরালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়,
বিত্ত হইল নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তারে কয়
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না, যে নহে লোভ-মলিন ॥

এক আল্লাহ্ 'জিন্দাবাদ'

উহারা প্রচার করুক, হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ ;
আমরা বলিব, 'সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ !'
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম, অভেদ।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহিদি দর্জা চাই ;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই !
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাধিলে লুকাইবে ওরা কচু-বনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অঙ্গনে।

ওরা নির্জীব, জিভ নাড়ে তবু শুধু স্বার্থ ও লোভবশে,
ওরা 'জিন', প্রেত, যক্ষ, উহাবা লালসার পাঁকে মুখ ঘষে।
মোরা বাংলার নবযৌবন, মৃত্যুর সাথে সঞ্চরি,
উহাদেরে ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি নাকো তাই দয়া করি।

মানুষের অনাগত কল্যাণে উহারা চির-অবিশ্বাসী,
অবিশ্বাসীরাই শয়তানি-চেলা ভ্রান্ত-দ্রষ্টা ভুলভাষী।
ওরা বলে, হবে নাস্তিক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।
মোরা বলি, হবে আস্তিক, হবে আল্লা-মানুষে জানাজানি !

উহারা চাহুক অশান্তি ; মোরা চাহিব ক্ষমা ও প্রেম তাঁহার,
ভূতেরা চাহুক গোর ও শ্মশান, আমরা চাহিব গুল-বাহার !
আজি পশ্চিম পৃথিবীতে তাঁর ভীষণ শাস্তি হেরি মানব,
ফিরিবে ভোগের পথ হতে ভয়ে, চাহিবে শান্তি সাম্য সব।

হুতুমপ্যাঁচারা কহিছে কোটরে, হইবে না আর সূর্যোদয়,
কাকে তার টাকে ঠোকরাইবে না, হোক তার নখ চঞ্চু ক্ষয়।
বিশ্বাসী কভু বলে না এ কথা, তারা আলো চায়, চাহে জ্যোতি,
তারা চাহে নাকো এই উৎপীড়ন এই অশান্তি দুর্গতি।

তারা বলে, যদি প্রার্থনা মোরা করি তাঁর কাছে একসাথে,
নিত্য ঈদের আনন্দ তিনি দিবেন ধূলির দুনিয়াতে।
সাত আশমান হতে তারা সাত-রঙা রামধনু আনিতে চায়,
আল্লাহ্ নিত্য মহাদানী প্রভু যে যাহা চায়, সে তাহা পায়।

যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে, দ্যাখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই !
ওরা চাহে রাক্ষসের রাজ্য, মোরা আল্লার রাজ্য চাই,
দ্বন্দ্ববিহীন আনন্দ-লীলা এই পৃথিবীতে হবে সদাই।

মোদের অভাব রবে না কিছুই, নিত্যপূর্ণ প্রভু মোদের,
শকুন শিবার মতো কাড়াকাড়ি করে শব লয়ে — শখ ওদের !

আল্লা রক্ষা করুন মোদেরে, ও পথে যেন না যাই কভু,
নিত্য পরম-সুন্দর এক আল্লাহ্ আমাদের প্রভু।

পৃথিবীতে যত মন্দ আছে, তা ভালো হোক, ভালো হোক, ভালো
এই বিদ্বেষ-আঁধার দুনিযা তাঁর প্রেমে আলো হোক, আলো!
সব মালিন্য দূর হযে যাক সব মানুষের মন হতে,
তাঁহার আলোক প্রতিভাত হোক এই ঘরে ঘরে পথে পথে।

দাঙ্গা বাধায়ে লুট করে যারা, তারা লোভী, তারা গুন্ডাদল,
তারা দেখিবে না আল্লার পথ চিরনির্ভয সুনির্মল।
ওরা নিশিদিন মন্দ চায, ওরা নিশিদিন দ্বন্দ্ব চায়,
ভূতেরা শ্রীহীন ছন্দ চায়, গলিত শবের গন্ধ চায!

তাড়াবে ওদের দেশ হতে মেরে আল্লার অনাগত সেনা,
এরাই বৈশ্য, ফসল শস্য লুটে খায, এবা চির-চেনা।
ওরা মাকড়সা, ওদের ঘরের ঘেরোযাতে কভু যেযো না কেউ,
পোড়ো ঘরে থাকে জাল পেতে, ওরা দেখেনি প্রাণের সাগর-ঢেউ।

বিশ্বাস করো এক আল্লাতে প্রতি নিশ্বাসে দিনে রাতে,
হবে 'দুলদুল' - আসওয়ার পাবে আল্লার তলোযার হাতে।
আলস্য আর জড়তায যারা ঘুমাইতে চাহে রাত্রিদিন,
তারা চাহে না চাঁদ ও সূর্য, তারা জড় জীব গ্লানি-মলিন!

নিত্য সজীব যৌবন যার, এসো এসো সেই নওজোয়ান,
সর্বক্লৈব্য করিয়াছে দূর তোমাদেরই চির-আত্মদান!
ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে — ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,
মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব — 'আল্লা জিন্দাবাদ!'

গোঁড়ামি ধর্ম নয়

শুধু গুন্ডামি, ভণ্ডামি আর গোঁড়ামি ধর্ম নয়,
এই গোঁড়াদেরে সর্বশাস্ত্রে শয়তানি চেলা কয়।
এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম কহে না কভু।
তবু অজ্ঞানে যদি শয়তানে শরিকি স্বত্ব আনে,
তার বিচারক এক সে আল্লা — লিখিত আল-কোরানে।

মানুষ তাহার বিচার করিতে পাবে না, নরকে তারে
অথবা স্বর্গে কোন মানুষের শক্তি পাঠাতে পারে?
'উপদেশ শুধু দিবে অজ্ঞানে' — আল্লার সে হুকুম,
নিষেধ কোরানে — বিধর্মীপরে করিতে কোনো জুলুম।
কেন পাপ করে, ভুল পথে যায় মানবজন্ম লয়ে,
কেন আসে এই ধরাতে জন্ম-অন্ধ পঙ্গু হয়ে,
কেন কেহ হয চিরদরিদ্র, কেহ চিরধনী হয়,
কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারও জীবন শান্তিময়?
কোন শাস্ত্রী বা মৌলানা বলো, জেনেছে তাহার ভেদ?
গাধার মতন বযেছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ!

জীবনে যে তাঁরে ডাকেনিকো, প্রভু ক্ষুধার অন্ন তার
কখনো বন্ধ করেননি কেন, কে করে তার বিচার?
তাঁর সৃষ্টির উদার আকাশ সকলেরে থাকে ঘিরে,
তাঁর বায়ু মসজিদে মন্দিরে সকলের ঘরে ফিবে।
তাঁহার চন্দ্র সূর্যের আলো করে না ধর্ম ভেদ,
সর্বজাতির ঘরে আসে, কই আনে না তো বিচ্ছেদ!
তাঁর মেঘবারি সব ধর্মীর মাঠে ঘাটে ঘরে ঝরে,
তাঁহার অগ্নি জ্বলে, বায়ু বহে সকলেরে সেবা করে।
তাঁর মৃত্তিকা ফল ফুল দেয় সর্বজাতির মাঠে,
কে করে প্রচার বিদ্বেষ তবু তাঁর এ প্রেমের হাটে?
কোনো 'ওলি' কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,
অন্য ধর্মে, দেয়নিকো গালি, — কে রাখে তার খবর?
যাহারা গুন্ডা, ভণ্ড, তারাই ধর্মের আবরণে
স্বার্থের লোভে খ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।
জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি
আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত চায় এরা শয়তানি।
ধর্ম-আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত,
বলে এরা, হয়ে মন্ত্রী, করিবে স্বধর্মীদের হিত।
এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবি খেতাব পায়,
কারও কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায়।
ধনসম্পদ এত ইহাদের, করেছে কি কভু দান?
আশ্রয় দেয় গরিবে কি কভু এদের ঘর দালান?
ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে করো সব শেষ।

১ হজরতের তেজস্বী অশ্ব। ২ অশ্বারোহী।

নাই পরমত-সহিষ্ণুতা সে কভু নহে ধার্মিক,
এরা রাক্ষস-গোষ্ঠী ভীষণ অসুর-দৈত্যাধিক।
উৎপীড়ন যে করে, নাই তার কোনো ধর্ম ও জাতি,
জ্যোতির্ময়েরে আড়াল করেছে, এরা আঁধারের সাথি!
মানবে মানবে আনে বিদ্বেষ, কলহ ও হানাহানি,
ইহারা দানব, কেড়ে খায় সব মানবের দানাপানি।
এই আক্ষেপ জেনো তাহাদের মৃত্যুর যন্ত্রণা,
মরণের আগে হতেছে তাদের দুর্গতি লাঞ্ছনা।
এক সে পরম বিচারক, তাঁর শরিক কেহই নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দুদিন পরে তা ভাই!
মোরা দরিদ্র কাঙাল নির্যাতিত ও সর্বহারা,
মোদের ভ্রান্ত দ্বন্দ্বের পথে নিতে চায় আজ যারা
আনে অশান্তি উৎপাত আর খোঁজে স্বার্থের দাঁও,
কোরানে আল্লার এদেরই কন — 'শাখা-মৃগ হয়ে যাও!'

জোর জমিয়াছে খেলা

জোর জমিয়াছে খেলা!
ক্যালকাটা মাঠে সহসা বিকালবেলা।
এই জনগণ-অরণ্যে যেন বহিত না প্রাণবায়ু,
শিথিল হইয়া ছিল যেন সব স্নায়ু!
সহসা মৌন-অরণ্যে আজ উঠেছে প্রবল ঝড়,
ভিড় করে পাখি নীড় ছেড়ে করে কোলাহল-মর্মর।
জমাট হইয়া ছিল সাগরের জল,
সহসা গলিয়া ছুটিল স্রোতের ঢল।
ময়দানে জোর ভিড় জমিয়াছে বড়ো ছোটো মাঝারির,
স্বদেশি বিদেশি লোভী নির্লোভ হেটো মেঠো বাজারির!
এই দিকে 'রাজি', ওদিকে 'নারাজি' দল,
সেন্টারে পড়ে আছে 'ভারতের স্বাধীনতা'-ফুটবল!
'রাজি' জয়ী হবে বলে বাজি রাখে মজুর ও বিড়িওয়ালা,
কেল্লার ধারে জমায়েত হয়ে বাঁধা রেখে ঘটি থালা।
কাহার কেল্লা ফতে হবে সবে কয়,
'রাজি'রা খেলিতে জানে, উহারাই জয়ী হবে নিশ্চয়।
'গ্যালারি' ভরতি মধ্যবিত্ত আধা-বড়োলোক যত,
ছাতা উঁচাইয়া 'রাজি'দের জয়ধ্বনি করে অবিরত।
'নারাজি' দলের 'সাপোর্টার' যত কোট প্যান্ট চাপকান,
সংখ্যায় সাত কুড়ি, তবু তিন হাত তুড়িলাফ খান!
এরা খায় বিড়ি, ওরা খায় সিগারেট,
এরা খায় চানাচুর ও বাদাম, ওরা চপ কাটলেট!

জোর জমিযাছে খেলা,
বুট-পরা পায়ে ফুটবলে লাথি মারে, হুল্লোড় মেলা!
খাইয়া 'ফাউল-কারি' 'নারাজি'রা কেবল ফাউল করে,
রেফারিকে দেয় কাফেরি ফতোযা যদি সে ফাউল ধরে!
'শেম' 'শেম' বলে জনগণ, হ্যাটুয়ারা দেয হ্যাটে তালি,
খেলিতে পারে না, ফেলিতে পারে না ঠেলা দিয়ে, দেয গালি।
কোন দল জেতে কোন দল হারে, উঠিয়াছে কোন্দল,
'নারাজি'র দিকে বুড়োরা, 'রাজি'র জোয়ান নতুন দল।

উঠেছে হট্টগোল
ওই দিল — গোল, গোল!
মটবুর নানা দেড় চোখ কানা, ঝুড়ি তুলে মারে কিক,
লুঙ্গি ধরে চলে 'রাজি'রা এবার গোল দিল দেখো ঠিক!
'নারাজি'রা হল যেন আলু-ভাজি, করে শুধু হ্যান্ডবল,
যত গোল খায় তত গোলমাল করে তারা অবিরল!
কবুতর ওড়ে, মোগলি লম্ফ মারে বগলের ছাতা,
'জয় রাজি' বলে ওড়ায় রঙিন কুচি কাগজের পাতা।

খেলা জমিয়াছে জোর,
'নারাজি'রা রাগে, 'রাজি'রা ততই হাসিয়া করে স্কোর!
'নারাজি'র দলে বিদেশি খেলুড়ি, 'রাজি'র দেশের ছেলে,
'রাজি'রা পায়ের জোরে খেলে 'নারাজি'রা গা-র জোরে ঠেলে।
আজও খেলা শেষ হয় নাই ময়দানে,
'হাফটাইমের' আগেই কে গোল খেয়েছে সবাই জানে।

এরই মাঝে আসিয়াছে ঘনঘটা রুক্ষ আকাশ ঘিরে,
কারা যেন ক্রোধে নীল আশমান বিজলি-নখরে চিরে!
বাজে বাদলের মাদল ঝাঁজর মৃদঙ্গ গুরুগুরু,
মাথার উপরে ছাতার তাম্বু, বৃষ্টি হয়েছে শুরু!
দর্শক দ্যাখে, এঁকেবেঁকে পড়ে মাঠে কারা পিছলায়ে,
'রাজি' দল ছোটে তিরের মতন চাকা বাঁধা যেন পায়ে!

খেলা জোর জমিয়াছে,
দর্শক সব এবার এগিয়ে এসেছে দড়ির কাছে।
বৃষ্টি নেমেছে, এবার দৃষ্টি প্রখর করো রে দাদা,
কার দিকে কত হয় সে ফাউল, কে ছিটায় কত কাদা।

খেলা দ্যাখো, দ্যাখো খেলা,
'রাজি' কি 'নারাজি' জয়ী হল, বলো তোমরাই সাঁঝ-বেলা!

কবুতরগুলি ফেরে নাই ঘরে, ঘুরিছে মাথার পর,
কাহারা জিতিল, দেশে দেশে গিয়া শুনাবে খোশখবর!

বোমার ভয়

বোমার ভয়ে বউ, মা, বোন, নেড়রি গেঁড়রি লয়ে
দিগ্‌বিদিকে পলায় ভীরু মানুষ মৃত্যুভয়ে!
কোনখানে হায় পলায় মানুষ, মৃত্যু কোথায় নাই?
পলাতকের দল! বলে যাও সে-দেশ কোথায় ভাই?
মানুষ মরে একবার, সে দুবার মরে নাকো,
হায় রে মানুষ! তবু কেন মৃত্যুর ভয় রাখ।
আরেক দেশে পালিয়ে তোমার মৃত্যুভয় কি যাবে?
মৃত্যু-ভ্রান্তি দিবানিশি তোমায় ভয় দেখাবে।
মা মরিয়া বীরের মতো মৃত্যু আলিঙ্গিয়া,
তিলে তিলে মরে ভীরু যে যন্ত্রণা নিয়া,
সে যাতনার চেয়ে বোমার আগুন স্নিগ্ধ আরও!
মরণ আসে বন্ধু হয়ে, মরতে যদি পার
তেমন মরণ। দেখবে সেদিন সবে,
পৃথ্বী হবে নতুন আবার মৃত্যু-মহোৎসব।

আল্লাহ্ ভগবানের আমরা যদি আশ্রয় পাই,
সেই সে পরম অভয়াশ্রমে মৃত্যুর ভয় নাই!
যেতে পার তাঁর কাছে ছুটে তুমি প্রবল তৃষ্ণা লয়ে?
তাঁহারে ছুঁইলে ছোঁবে না তোমারে কখনও মৃত্যুভয়ে!
সেখানে যাওয়ার ট্রেন কোন ইস্টিশনে সে পাওয়া যায়?
সে প্ল্যাটফর্ম দেখেছ কি কভু? দেখনিকো তুমি হায়!
যেখানেই তুমি পালাও, মৃত্যু সাথে সাথে দৌড়াবে!
জানিয়াও কেন অকারণে মৃত্যুর ভয়ে খাবি খাবে?
দেখেছি ভীষণ মানুষের স্রোত ভীষণ শাস্তি সয়ে,
চলেছে অজানা অরণ্যে যেন ভীতি-উন্মাদ হয়ে!
পুরুষের রূপে দেখেছি বউমা করে কোণ ঠাসাঠাসি,
আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া বাক্স বোঁচকা পোঁটলা রাশি।
যাহারা যাইতে পারিল না, পড়ে রহিল অর্থাভাবে
সঞ্চিত নাই অর্থ, কোথায় ক্ষুধার অন্ন পাবে?
তাহাদের কথা ভাবিল না কেউ, ধরিল না কেহ হাতে,
কেহ বলিল না, 'মরিতে হয়তো এসো মরি এক সাথে!'

কেহ বলিল না, 'কেন পলাইব, এসো দল বেঁধে রই,
সংঘবন্ধ হইয়া আমরা এসো সৈনিক হই।'
ক্ষুদ্র অস্ত্র লয়ে কি করিয়া যুদ্ধ করিছে চীন?
অস্ত্র ধরিতে পারে না, যাহারা অন্তরে বলহীন।
যাহারা নির্যাতিত মানবেরে রক্ষা করিতে চায়,
আকাশ হইতে নেমে আসে, হাতে অস্ত্র তারাই পায়!
বোমার ভয় এ নহে, ইহা ক্লীব ভীরুর মৃত্যুভয়,
ইহারা ধরার বোঝা হয়ে আছে, ইহারা মানুষ নয়।
যে দেশে তাদের জন্ম সে দেশ ছেড়ে এরা পরদেশে,
কেমন করিয়া খায় দায়, মুখ দেখায়, বেড়ায় হেসে?
অর্থের চাকচিক্য দেখায়, হায় রে লজ্জাহীন,
ইহাদেরই শিরে বোমা যেন পড়ে, ইহারা হোক বিলীন!
বোমা দেখেনিকো, শব্দ শোনেনি, শুধু তার নামে প্রেমে
এদের সর্ব অঙ্গ ব্যাকুল হইয়া উঠিছে ঘেমে!
জীবন আর যৌবন যার আছে, সেই সে মৃত্যুহীন,
গোরস্তানের শ্মশানের ভূত যারা ভীরু যারা দীন!
কেন বেঁচে আছে এরা পৃথিবীরে ভারাক্রান্ত করে?
ইহাদেরই শিরে পড়ে যেন যদি বোমা কোনোদিন পড়ে!

নওজোয়ানরা এসো দলে দলে বীর শহিদান সেনা;
তোমরা লভিবে অমর-মৃত্যু, কোনো দিন মরিবে না!
ইতিহাসে আর মানবস্মৃতিতে আছে তাহাদেরই নাম,
যারা সৈনিক, দৈত্যের সাথে করেছিল সংগ্রাম!
যারা ভীরু, তারা কীটের মতন কখন গিয়েছে মরে,
তাদের কি কোনো স্মৃতি আছে, কেউ তাদের কি মনে করে?
ক্ষুদ্র-আত্মা নিষ্প্রাণ এরা, ইহারা গেলেই ভালো,
ভিড় করেছিল নিরাশা-আঁধার, এবার আসিবে আলো!
দেশের জাতির সৈনিক যদি কোনো দিন জয় আনে,
এই আঁধারের জীব যদি ফিরে আসে আলোকের পানে,
ইহাদের কাঁধে লাঙল বাঁধিয়া জমি করাইয়ো চাষ,
তবে যদি হয় চেতনা এদের, হয় যদি ভয় হ্রাস!
চল্লিশ কোটি মানুষ ভারতে, এক কোটি হোক সেনা,
কোনো পরদেশি আসিবে না, কোনো বিদেশিরা রহিবে না!
বিরাট বিপুল দেশ আমাদের, কার এত সেনা আছে,
ভারত জুড়িয়া যুদ্ধ করিবে? পরাজয় লভিয়াছে,
এই মৃত্যুর ভয়ে শুধু, এরা রোগে ভুগে পচে মরে,
তবু লভিবে না অমৃত ইহারা মৃত্যুর হাত ধরে!

সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা ভাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ভবে,
এই অস্ত্রেই সর্ব অসুর দানব বিনাশ হবে,
চল্লিশ কোটি মানুষ মারিতে কোথা পাবে গোলাগুলি,
সর্বভয়ের রাক্ষস পশু পালাবে লাঙ্গুল তুলি।
বোমা যদি আসে, দেখে যাব মোরা বোমা সে কেমন চিজ,
তাহারই ধ্বনিতে ধ্বংস হইবে সর্ব ক্লৈব্য-বীজ!
যাহারা জন্ম-সৈনিক, তারা ছুটে এসো দলে দলে,
শক্তি আসিবে পৃথিবী কাঁপিবে আমাদের পদতলে।
আমরা যুঝিয়া মরি যদি সব ভীরুতা হইবে লয়,
পৃথিবীতে শুধু বীর-সেনাদের জয় হোক, হোক জয়।

কচুরিপানা

[গান]

ধ্বংস করো এই কচুরিপানা!
(এরা) লতা নয়, পরদেশি অসুরছানা॥ (ধুয়া)
ইহাদের সবংশে করো করো নাশ,
এদের দগ্ধ করে করো ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশমন, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা। —
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥ (ধুয়া)
(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক!
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা।
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা।
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥ (ধুয়া)
(এরা) বাংলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,
(এসো) সমূলে কচুরিপানা করে ফেলি সাফ!
(এরা) শ্যামল বাংলা দেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানি দূত দুর্ভিক্ষ-আনা।
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥ (ধুয়া)
(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,
(এরা) রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই
(এরে) নির্মূল করে ফেলো, শুনো না মানা।
ধ্বংস করো এই কচুরিপানা॥ (ধুয়া)

টাকাওয়ালা

জলের সাগরে আসিনু বাহিতে তরি,
'জল দাও' বলে কাঁদে সর্বহারার দল —
চারিদিকে জল, জলের তৃষায় মরি!
টাকা নাই নাকি শুনি টাঁকশালে এসে,
টাকার সঙ্গে মাখামাখি, বলে — 'টাকা থাকে কোন দেশে?'
লক্ষ্মী-বাহন প্যাঁচারা আসিয়া সারা দেশ ভরিয়াছে,
বিধাতার দেওয়া ঐশ্বর্যরে রক্ষিতা করিয়াছে!
টাকার সাকার আকার এসেই হয়ে যায় যেন পাখি,
এত টাকা আসে, উড়ে যায় সব, পাখা গজাইল নাকি?
কোথা বাসা বাঁধে এই সে টাকার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি?
কোথা ডিম পাড়ে, ছানা হয় তার কোন সে ব্যাংকে জমি?
মহাকাল-ব্যাধ দেখিতে পেয়েছে তাদের টাকার বাসা,
মৃত্যু-শায়ক লইয়া এসেছে— যত টাকা ট্যাঁকে ঠাসা!
এই চাকতির খাঁকতি ছিল না এ জীবনে কোনোদিন,
টাকার মহিমা বুঝিনু, যেদিন আকণ্ঠ হল ঋণ।
যত শোধ করি, তত সুদ বাড়ে! ঋণ, না কচুরিপানা?
শিলমোহরের ভয়ে চাইনিকো মোহরের মিহি-দানা!
ধন্না দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারেও কখনও বলিনি হুজুর, প্রভু!
টাকাওয়ালাদের দেখে এই জ্ঞান হইয়াছে সঞ্চয়,
টাকাওয়ালাদের চেয়ে ঝাঁকাওয়ালা অনেক মহৎ হয়!

সোনা যারা পায়, তাহারাই হয় সোনার পাথর-বাটি,
আশরফি পেয়ে আশরাফ হয় চালায়ে মদের ভাঁটি!
মানুষের রূপে এরা রাক্ষস রাবণ-বংশধর,
পৃথিবীতে আজ বড়ো হইয়াছে যত ভোগী বর্বর!
এদের ব্যাংক 'রিভার-ব্যাংক' হইবে দুদিন পরে,
বোঝে না লোভীরা, ভীষণ মৃত্যু আসিছে এদেরই তরে!
জমানো অর্থ যত অনর্থ আনিয়াছে পৃথিবীতে,
পরমার্থের প্রভু আসিয়াছে তাহার হিসাব নিতে!
রবে না এ টাকা, বংশেও বাতি দিতে রহিবে না কেউ,
তবু কমিল না নিত্য লোভীর ভুঁড়ির ঢেঁকুর-ঢেউ!
ইহাদের লোভ নিরন্ন দেশবাসী করিবে না ক্ষমা,
বহু আক্রোশ বহু ক্রোধ বহু প্রহরণ আছে জমা।
রুটি কাগজের হয়ে যায়, তবু কাগজের টাকা লয়ে,

পাতালের জীব পৃথিবীতে আজও বেড়ায় মাতাল হয়ে।
কোন অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিনু কোথা ?
অক্টোপাসের মতো কেন মোরে জড়াল স্বর্ণলতা ?
ভিখারি হওয়ার ভিক্ষা চাহিয়াছিনু আল্লার কাছে,
আজ দেখি মোর চারপাশে যত ভূত প্রেত যেন নাচে !
আল্লাহ্ ! মোরে এ শাস্তি হতে ফিরাইয়া লয়ে যাও !
টাকাওয়ালাদের কাছ থেকে ফাঁকা আকাশের তলে নাও !

কবির মুক্তি

[আধুনিকী]

মিলের খিল খুলে গেছে !
কিলবিল করছিল, কাঁচুমাচু হয়েছিল —
কেঁচোর মতন —
পেটের পাঁকে কথার কাতুকুতু !
কথা কি 'কথক' নাচ নাচবে
চৌতালে ধামারে ?
তালতলা দিয়ে যেতে হলে
কথাকে যেতে হয় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে
তালের বাধাকে গুঁতিয়ে গুঁতিযে !
এই যাঃ ! মিল হয়ে গেল !
ও তাল-তলার কেরদানি — দুত্তোর !
মুরগিছানায় চিলের মতন
টেকো মাথায় ঢিলের মতন
পড়বে এইবার কথার বান্ডিল।
ছন্দ এবার কন্ধকাটা পাঁঠার মতন ছটফটাবে।
লটপটাবে লুচির লেচির আটার মতন !
অক্ষর আর যক্ষর টাকা গোনার মতো
গুনতে হবে না —

অঙ্কলক্ষ্মীর ভয়ে কাব্যলক্ষ্মী থাকতেন
কুঁকড়োর মতন কুঁকড়ে !
ভাবতেন, মিলের চিল কখন দেবে ঠুকরে !
আবার মিল ! —
গঙ্গার দু-ধারে অনেক মিল,
কটন মিল, জুট মিল, পেপার মিল —

মিলের অভাব কী ?
কাব্যলোকে মিল থাকবে কেন ?
ওকে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দাও !
ওখানেও যে মিল আছে !
ধুলো যদি কুলোয় যায় চুলোয় যায়,
হুলো ভুলোয় যদি ল্যাজে মাখে !
ল্যাজ কেটে বেঁড়ে করে দেব !
এঁড়ে দামড়া আছে যে !
আমার মিল আসছে ! — মুশকিল আসান।
অঙ্কলক্ষ্মীকে মানা করেছিলাম,
মিলের শাড়ি কিনতে।
অঙ্কলক্ষ্মীর জ্বালায় পঙ্কলক্ষ্মী পদ্ম
আর ফোটে না !
তা বলতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে।
এ কবিতা যদি পড়ে
গায়ে ধানি লংকা ঘষে দেবে ! —
আজ যে বিনা প্রয়াসেই অনুপ্রাসের
পাল পেয়েছি দেখছি !
মিল আসছে — যেন মিলানের মেলায়
মেমের ভিড় !
নাঃ ! — কবিতা লিখি।
তাকে দেখেছিলাম — আমার মানসীকে
ভেটকি মাছের মতো চেহারা !
আমাকে উড়ে বেহারা মনে করেছিল !
শাড়ির সঙ্গে যেন তার আড়ি।
কাঁখে হাঁড়ি — মাথায় ধামা।
জামা ব্লাউজ শেমিজ পরে না।
দরকার বা কি ?
তরকারি বেচে !
সরকারি ষাঁড়ের মতন নাদুস-নুদুস !
টিকিঙ্গের মতন বেণি দুলছিল।
সে যে-দেশের, সে-দেশে আঁচলের চল নাই !
চলেন গজ-গমনে।
পায়ে আলতা নাই, চালতার রং।
নাম বললে — 'আজুলি'
আমি বললাম — 'ধ্যেৎ, তুমি কাজলি।'
হাতে চুড়ি নাই,

তুড়ি দেয় আর মুড়ি খায়।
গলায় হার নাই, ব্যাগ আছে।
পায়ে গোদ,
আমি বলি, 'প্যাগোডা' সুন্দরী!
গান গাই, 'ওগো মরমিয়া!'
ও ভুল শোনে! ও গায় —
'ওগো বড়ো মিয়াঁ!'
থাকত হাতে 'এয়ার গান!'
ও গায় গেঁয়ো সুরে, চাঁপা ফুল কেয়ার গান। —
দাঁতে মিশি, মাঝে মাঝে পিসি বলতে ইচ্ছা করে।
ডাগর মেয়েরা আমাকে যে হাঙর ভাবে।
হৃদয়ে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ!
ভিক্ষা চাই না, শিক্ষা দিয়ে দেবে।
তাই ধরেছি রক্ষাকালীর চেড়িকে।
নেংটির আবার বকেয়া সেলাই!
কবিতা লেখার মশলা পেলেই হল
তা না-ই হল গরম মশলা। —
নাঃ, ঘুম আসছে,
রান্নাঘরের ধূম আসছে।
বউ বলে, নাক বাজছে,
না শাঁখ বাজছে।
আবার মিল আসছে —
ঘুম আসছে —
দুম্বা ভেড়ার দুম আসছে!

ছন্দিতা

১। 'স্বাগতা' — ১৬ মাত্রা (তা — না তা — নাবাবা —
তা — নানা — তা — তা —)
স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝরনা।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে এসো গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া কবির প্রাণ অপর্ণা॥

২। 'প্রিয়া' — ৭ মাত্রা (নাবা তা — না তা —)
মহুয়া-বনে বন-পাপিয়া এখনও ঝুরে নিশি জাগিয়া।

ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া॥
শুনি, নীরবে গগনে বসি কহ যে-কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু এ মনে যমুনা বহে কূল প্লাবিয়া॥

৩। 'মধুমতী' — ৮ মাত্রা (নাবাবাবা নানা তা — দু-বার)
বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী।
ঢলঢল নয়নে রস-ঘন মিনতি।
ঝুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঘুমু বিবশা,
নিথর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা, মুরছিত চরণে শত মদন রতি॥
রস-ছলছল গো তব মধু-কলসে
ঝরঝর ঝরনা অনুখন বরষে, — অরুণিত-নয়না মধুর রসবতী॥

৪। 'মত্তময়ূর'— ২২ মাত্রা
মত্তময়ূরছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।
ঝুম ঝুম ঝুম মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণিবন্ধে॥
রিমঝিম রিমঝিম ঝিম কেকা-বর্ণ ঘন বরষে,
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দনলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল বাজে শূন্যে মেঘ-মন্দ্রে॥
পল্লব-ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পুব-হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা।
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দাবন-চন্দে॥

৫। 'রুচিরা' — ১৮ মাত্রা
ভ্রমর নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণ-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন-ঝনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা॥
মলয়-সমীর ঝিরিঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে।
কদম কেশর ঝুরুঝুরু চম্পা মুঞ্জরে।
চটুলনয়ন চমকিতা জ্যোৎস্না-অঞ্চলা॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত আম্রকুঞ্জে গো,
রূপের পরাগ ঝরে তব পুঞ্জে পুঞ্জে গো।
নিখিল-ভুবন তব রাস নৃত্য হিন্দোলা॥

৬। 'দীপক-মালা' — ১৬ মাত্রা (তা — নানা — তা — তা,
তা না তা নাতা)
দীপক-মালা গাঁথো গাঁথো গাঁথো সই।
মাধব আসে পারিজাত কই॥
আনত আঁখি তোলো তোলো গো!

বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো!
মান-ভুলানো এল রাত সই॥
কাজল আঁকো নীল আঁখিতে,
চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
আসন প্রাণে পাতো পাতো সই॥

৭। 'মন্দাকিনী' — ১৬ মাত্রা (নানা নানা নানা
তা না তা তা নাতা)
জল-ছলছল এসো মন্দাকিনী।
রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী॥
হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণাভরে
উতল হইল প্রেম-গঙ্গা তরে,
মুদিত নয়ন খোলো বৈরাগিনী॥
বিরস ভুবন রাখো সঞ্জীবিতা,
সজল সলিল আনো হিল্লোলিতা,
ঝর-ঝর স্রোত-উন্মাদিনী॥

৮। 'মঞ্জুভাষিণী' — ১৮ মাত্রা (নানা তা — নাতা নানানা
তানা তানাতা)
আজও ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে,
কহে কোন কথা নিশীথ স্বপনে আনমনে॥
মৃদুমর্ম্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে,
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে॥
গ্রহচন্দ্রে কয় — সে কি গো মৃত্যু-দ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন শোকে পরম সুন্দরের সনে॥

৯। 'মণিমালা' — ২০ মাত্রা

মঞ্জু মধু-ছন্দা	নিত্যা, তব সঙ্গী
সিন্ধুর তরঙ্গা	নৃত্যের কুরঙ্গী॥
গুঞ্জা বেলা পদ্ম	পুঞ্জীভূত বক্ষে,
অশ্রু-লাজ কুণ্ঠা	শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামকান্তা	মন্দাকিনী-ভঙ্গি॥
অঙ্গুলিতে বন্দী	অঙ্কুরিত ছন্দ,
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী	বৃন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে	সন্ধ্যারাগে রঙ্গি॥

১০। 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত' — ৪৮ মাত্রা
তারকা-নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন ছন্দিতার
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ,
সংগীতেব হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম আবেশ,
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর॥

সৌরাষ্ট্র ভৈরব — তেতালা (বাদী মধ্যম)
মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে
অরুণ-বিভাসিত অম্বর-মাঝে॥
কোন মহা-মৌনীর ধ্যান হল ভঙ্গ?
নেচে ফেরে অশান্ত মায়া-কুরঙ্গ
তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে॥
নিদ্রিত রুদ্রের ললাট-বহ্নি
পাশে তার হেসে ফেরে বনবালা-তন্বী।
বিজড়িত জটাজূটে খেলে শিশু শশী
দেয় মালা চন্দন ভীরু উর্বশী
শংকর সাজিল রে নটরাজ সাজে॥

পুরববঙ্গা

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব-দিগন্তে
তরুণ অরুণ বীণা বাজে তিমির বিভাবরী-অন্তে।
ব্রাহ্ম মুহূর্তের সেই পুরবাণী
জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায় — নব চেতনা দানি
সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায়
পশ্চিমে সুদূর অনন্তে॥
উর্মিছন্দা শত-নদীস্রোত-ধারায় নিত্য পবিত্র —
সিনান-শুদ্ধ-পুরববঙ্গা
ঘন-বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য
শক্তি-প্রবুদ্ধ পুরববঙ্গা
আজি শুভলগ্নে তারই বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা
ঝংকার হানি যায় তারই পুরবাণী
জীবন্ত হউক হিম-জর্জর ভারত
নবীন বসন্তে॥

আরতি

শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি।
অশান্ত এ চিত করো হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখো মতি॥
দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি॥

মন যেন না টলে খল কোলাহলে, হে রাজ-রাজ,
অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ।
বহে তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া, হে গুণী
ওংকার-সংগীত সুর-সুরধুনী,
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি॥

পার্থসারথি

হে পার্থসারথি
বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর করো, করো দূর
ভয়-ভীত জনে করো হে নিঃশঙ্ক॥
জড়তা ও দৈন্য হানো হানো
গীতার মন্ত্রে জীবন দানো
ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতঙ্ক॥

মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে,
শোনাও শোনাও, অনন্তকাল ধরি
অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে॥
দুরন্ত দুর্মদ যৌবন-চঞ্চল
ছাড়িয়া আসুক মা-র স্নেহ-অঞ্চল
বীর সন্তান দল
করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক॥

আত্মগত

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা
আপনার মনে কয়ে যাব আমি আপন মনের ব্যথা।
ভোরের প্রথম-ফোটা ফুলগুলি গোপনে তুলিয়া আনি
অঞ্জলি দিতে তোমার দুয়ারে দাঁড়াই যুক্তপাণি।
আমার চেয়েও সকরুণ চোখে ফুলগুলি চেয়ে থাকে,
মোর সাথে ওরা তব পায়ে চাহে অর্পিতে আপনাকে, —
তব তনু হেরি ফুলগুলি যেন অধিক ফুল্ল হয়,
মনে ভাবে, ওই অঙ্গের সাথে কবে হবে পরিচয়!
তুমি দ্বিধাভরে যেন ভয়ে ভয়ে আস উহাদের কাছে,
ভাব বুঝি ওই ফুলের ঝাঁপিতে লোভের সাপিনি আছে!
মুখ ফুটে তাই বলিতে পার না, 'ওই ফুলগুলি দাও!'
আমার গানের ফুলগুলি বোঝে, উহাদের ভয় পাও।
চেয়ে দেখি, হায়, বেদনায় মোর ফুল্ল ফুলের গুছি
সূর্যের নামে শপথ করিয়া কাঁদে — 'শুচি মোরা শুচি!'
ছড়াইয়া দিই পথের ধুলাতে প্রেম-ফুল-অঞ্জলি,
'দেখ সাপ নাই, নাই কাঁটা' — আমি ফিরে যেতে যেতে বলি।
অবুঝ ভিখারি-মন যেতে যেতে পিছু ফিরে ফিরে চায় —
ছড়ানো একটি ফুল তুলে সে কি লুকাল এলো-খোঁপায়?
দূর হতে দেখে পাষাণ-মুরতি তেমনি দাঁড়ায়ে আছে,
ফুল এড়াইয়া চলে গেলে তুমি কলঙ্ক লাগে পাছে!
তোমার চলার পথে পড়ে যত এই পৃথিবীর ধূলি
তারও চেয়ে কি গো মলিনতা-মাখা আমার কুসুমগুলি?
ধুলায় তোমায় ভুলায় না পথ, পথ ভোলাবে কি ফুল?
ভয় পাও কি গো যদি শোনো পথে গাহে বন-বুলবুল?
তুমি শুনিলে না, তবু মোর কথা থামিতে চাহে না কেন?
তোমার ফুলের ফাল্গুন মাসে ঝোড়ো মেঘ আমি যেন!
তব ফুল-ভরা উৎসবে কেন জল ছিটিয়ে সে যায়
তব সাথে তার কোন সে জীবনে কোন যোগ ছিল, হায়!
ভয় করিয়ো না, মেঘ আসে — মেঘ শেষ হয়ে যায় গলে,
আমার না-বলা কথা বলা হলে আমিও যাইব চলে।
আমি জানি, এই ফাগুন ফুরাবে, খর-বৈশাখ এসে
কী যেন দারুণ আগুন জ্বালাবে তোমাদের এই দেশে।
ভালো লাগিবে না কিছু সেই দিন উৎসব হাসি গান,
ফাগুনে যে মেঘ এসেছিল, তার তরে কাঁদিবে গো প্রাণ।
ডাকিবে, 'এসো হে ঘনশ্যাম বারিবাহ,
জ্বলে গেল বুক, জুড়াও জুড়াও দাহ।'

অভিমানী মেঘ সেদিন যদি গো নাহি আসে আর ফিরে,
যে সাগর থেকে মেঘ এসেছিল — যেয়ো সে সাগর তীরে।
তোমারে হেরিলে হয়তো আমার অভিমান যাব ভুলে,
তব কুন্তল-সুরভিতে সাড়া পড়িবে সাগরকূলে।
আমি উত্তাল তরঙ্গ হয়ে আছাড়ি পড়িব পায়ে,
জলকণা হয়ে ছিটায়ে পড়িব তব অঞ্চলে, গায়ে।
এই ভিখারির কথা শুনি আজ হাসিবে হয়তো প্রিয়া,
তবু বলি, তুমি কাঁদিয়া উঠিবে সাগর দেখিতে গিয়া।
মনে পড়ে যাবে, তোমার আকাশে মেঘ হয়ে কোনোদিন
কেঁদেছিল এই সাগর তোমারে ঘিরিয়া বিরামহীন।
তোমারে না পেয়ে শত পথ ঘুরে কেঁদে শত নদীনীরে
সাগরের জল সাগরে এসেছে ফিরে।
তোমারে সিনান করায়েছিল সে অমৃতধারার কূলে
ছেয়ে দিয়েছিল তোমার ভুবন বিহ্বল ফুলে ফুলে!
তব ফুলময় তনু লয়ে ওঠে বৃন্দাবনে যে গীতি,
তোমারে যে আজ নিবেদন করে ত্রিলোক শ্রদ্ধা প্রীতি।
মেঘ-ঘনশ্যাম কোনো বিরহীর স্মৃতি আছে তার সাথে,
মেঘ হয়ে কেঁদে এসেছিল, গেছে আঁধারে মিশায়ে রাতে।
সাগরে যেদিন ঝাঁপায়ে পড়িবে! তোমার পরশ পেয়ে
প্রলয়-সলিলে রূপ ধরে আমি উঠিব গোপনে গেয়ে!
আমার হৃদয় ছোঁয় যদি প্রিয়া তোমার তনুর মায়া,
পরম শূন্যে ভাসিয়া উঠিবে আবার আমার কায়া।
আজ চলে যাই — এই পৃথিবীরে আর লাগে নাকো ভালো।
হেথা মানুষের নিশ্বাসে নিভে যায় যে প্রেমের আলো!
সেদিন যেন গো দ্বিধা নাহি আসে
কোনো লোক যেন নাহি থাকে পাশে,
যে নামে আমারে ডাকিলে না আজ সেদিন ডেকো সে নামে
কী বলে ডাকিলে বেঁচে উঠি আমি শুধাইয়ো রাধা শ্যামে।

যে নিরাধার শ্যাম শ্রীরাধার প্রেমে
রূপ ধরে আসে পৃথিবীর বুকে নেমে,
যদি কোনো দিন দেখা পাও তার — মোর স্মৃতি থাকে মনে,
রোদনের বান আনে যদি তব প্রেমের বৃন্দাবনে,
'কোথায় হারায়ে গেছি আমি' শুধায়ো নিরালা ডাকি,
খুঁজিয়া আনিবে হয়তো আমারে তাঁহার পরম আঁখি॥

কাবেরী-তীরে

কর্ণাটের গঙ্গা-পূত কাবেরীর নীরে
প্রভাতে সিনানে আসে শ্যামা বেণিবর্ণা
কর্ণাটকুমারী এক, নাম মেঘমালা।
সিনানের আগে নিতি কাহার উদ্দেশে
চামেলি চম্পক ফুল তরঙ্গে ভাসায়।

ভিনদেশি বুঝি এক বণিক কুমার
হেরিয়া সে এণাক্ষীরে তরণি ভিড়ায়ে
রহে সেই ঘাটে বসি, যেতে নাহি চায়।
স্নান-স্নিগ্ধা শ্যামলীর স্নিগ্ধতর রূপে
ডুবে যায় আঁখি তার, কণ্ঠে ফোটে গান —

(কর্ণাটি সামন্ত — তেতালা)

কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা।
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা॥
প্রভাত সিনানে আসি আলসে
কঙ্কণ তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা॥
দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে।
ঝিলম রেবা নদীতীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা॥

দ্বিধাহীনা মেঘমালা জানিত না লাজ
কুণ্ঠাহীন মুখে তার ছিল না গুণ্ঠন!
গান শুনি কুমারের কাছে আসি কহে —
কারে খোঁজে মেঘদূত? হে বিদেশি কহো!
কহিতে কহিতে চাহি কুমারের চোখে
কী যেন হেরিয়া মুখে বেধে যায় কথা।
সেদিন প্রথম যেন আপনারে হেরি,
আপনি সে উঠিল চমকি! দেহে তার
লজ্জা আসি টেনে দিল অরুণ আঙিয়া!

ভরা ঘট লয়ে ঘরে ফিরে! নিশি রাতে
সুরের সুতায় গাঁথে কথার মুকুল। —

(নাগ স্বরাবলী — তেতালা)

এসো চিরজনমের সাথি।
তোমারে খুঁজেছি দূর আকাশে জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥
খুঁজেছি প্রভাতে, গোধূলি-লগনে, মেঘ হয়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণি আমার কাঁদনে অসীম তিমির রাতি॥
ফুল হয়ে আছে লতায় জড়ায়ে মোর অশ্রুর স্মৃতি
বেণুবনে বাজে বাদল নিশীথে আমারই করুণগীতি!
শত জনমের মুকুল ঝরায়ে ধরা দিতে এলে আজি মধুবায়ে
বসে আছি আশা-বকুলের ছায়ে বরণের মালা গাঁথি॥
গান গাহি চমকিয়া ওঠে মেঘমালা।
আপনারে ধিক্কারে সে মরিয়া মরমে —
যদি কেহ শুনে থাকে তাহার এ গান,
কী ভাবিবে যদি শোনে বিদেশি বণিক!
সেদিন কাবেরীতীরে এল মেঘমালা
বেলা করি। গাঁয়ের বধূরা একে একে
সিনান সারিয়া ফিরে গেছে গৃহকাজে।
বণিককুমার খোঁজে কী যেন মানিক!
নীল শাড়ি পরি তন্বী মেঘমালা আসে
শ্লথগতি মদালসা, বিলম্বিতা বেণি।
বণিককুমার চাহি ওপারের পানে,
গাহে গান, — না দেখার ভান করি যেন। —

(নীলাম্বরী — তেতালা)

নীলাম্বরী শাড়ি পরি, নীল যমুনায় কে যায়, কে যায়, কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী, ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়॥
কলসে কঙ্কণে রিনিঠিনি ঝনকে চমকায় উন্মন চম্পাবনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ, মাধবী, অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বনতুলসীর মঞ্জরি উলসিয়া ওঠে!
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি।
তাহারই অঙ্গ-তরঙ্গ-বিভঙ্গে কূলে কূলে নদীজল উথলায়॥
মেঘমালা কুমারের আঁখি ফিরাইতে
কত রূপে শব্দ করে কলসে কঙ্কণে।

সাঁতারিয়া কাবেরীর শান্ত বক্ষ মাঝে
অশান্ত তরঙ্গ তোলে! বণিক কুমার
হাসি তীরে আসি কহে, 'অঞ্চলের ফুল
অকারণে নদীজলে ভাসাও বালিকা।
ও ফুল আমারে দাও! দেবতা তোমার
প্রসন্ন হবেন, পাবে মনোমতো বর।'
মেঘমালা আঁচলের ফুলগুলি লয়ে
নদীজলে ভাসাইয়া — ঘটে জল ভরি
চলে এল ঘরপানে, চাহিল না ফিরে —
দেখিল না কার দুটি আঁখি আঁখিনীরে
ভরে গেছে কূলে কূলে। ঘরে ফিরে আসি
মেঘমালা আপনার মনে মনে কাঁদে —

(নারায়ণী-আম্বা—কাওয়ালি)

রহি রহি কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিযাছি যারে অনাদরে অকারণে॥
উদাস চৈতালি দুপুরে মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে
যে বনপথে সে ভিখারি-বেশে করুণা জাগায়েছিল সকরুণ নয়নে॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর ঘটে ছিল বারি।
পিযাসি ফটিকজল জল পাইল না গো ঢলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি॥
তার অঞ্জলির ফুল পথধূলিতে ছড়ায়েছি সেই ব্যথা নারি ভুলিতে।
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥

জলে আর যায় নাকো কর্ণাট কুমারী
চলে গেল তরি বাহি বিদেশি কুমার
তরণি ভরিয়া তার নয়নের নীরে!
সেদিন নিশীথে ঝড় বাদলের খেলা,
মেঘমালা চেয়ে আছে বাতায়ন খুলি
কাবেরী নদীর পানে! ঘন অন্ধকারে
বিজলি-প্রদীপ জ্বালি কোন বিরহিণী
খুঁজে যেন তারই মতো দয়িতে তাহার।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কবে পড়ে যে ঘুমায়ে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখে গাহিছে বিদেশি —

(মিশ্র নারায়ণী — তেতালা)

নিশি রাতে রিম-ঝিম-ঝিম বাদল নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর।
দেয়া গরজে বিজলি চমকে জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধ ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে
কে এল, কে এল বলে ডাকিছে ময়ূর।

দ্বার খুলি পড়শি কৃষ্ণা মেয়ে আছে চেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে।
কারে দেখি আমি কারে দেখি, মেঘলা আকাশ, না ওই মেঘলা মেয়ে।
ধায় নদীজল মহাসাগর পানে বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে নিশির আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

মেঘমালা চমকিয়া জাগি ছুটে যায়
পাগলিনিপ্রায় নদীতীরে। ডাকি ফেরে
ঝড় বাদলের সাথে কণ্ঠ মিশাইয়া —
'কুমার! কুমার! কোথা প্রিয়তম মোর!
লয়ে যাও মোরে তব সোনার তরিতে!'
হারাইয়া গেল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
অনন্ত যুগের বিরহিণীর কাঁদন
যে পথে হারায়ে যায়। আজও মোরা শুনি
কাবেরীর জল-ছলছল অশ্রু-মাখা
কর্ণাটিকা রাগিণীতে তাহারই বেদনা॥

(মনোরঞ্জনী — তেতালা-ঢিমা)

ওগো বৈশাখী ঝড়! লয়ে যাও অবেলায়
ঝরা এ মুকুল।
লয়ে যাও আমার জীবন,— এই পায়ে দলা ফুল॥
ওগো নদীজল! লহো আমারে
বিরহের সেই মহা পাথারে
চাঁদের পানে চাহি যে পারাবার,
অনন্তকাল কাঁদে বেদনা-ব্যাকুল॥
ওরে মেঘ! মোরে সেই দেশে রেখে আয়
যে দেশে যায় না শ্যাম মথুরায়,
ভরে না বিষাদ-বিষে এ-জীবন
যে দেশের ক্ষণিকের ভুল॥

অমৃতের সন্তান

নীহারিকালোকে অনিমিখে চেয়ে আছেন বৈজ্ঞানিক,
কত শত নব সূর্য জনমি রাঙায় অজানা দিক!
আমি চেয়ে আছি তোদের পানে যে, ওরে ও শিশুর দল,
নূতন সূর্য আসিছে কোথায় বিদারিয়া নভোতল!
দিব্য জ্যোতির্দীপ্ত কত সে রবি শশী গ্রহ তারা
তোদের মাঝারে লভিয়া জনম ঘুরিতেছে পথহারা,

আত্মা আমার জেগে আছে যেন মেলি অনন্ত আঁখি,
মাহেন্দ্রক্ষণ উদয় উষার — আরও কতদিন বাকি?
জাগো অমৃতের সন্তান, জাগো বেদ-ভাষিণীর দল!
বিশ্বে ভোগের মন্থনে আজ উঠিয়াছে হলাহল।
অসুর-শক্তি শ্রান্ত হইয়া আজিকে আপন বিষে
ঊর্ধ্বে চাহিছে দেবতার পানে, জ্বালা জুড়াইবে কীসে।
আমি দেখিয়াছি, তোমাদের শুচি ক্ষুদ্র তনুর মাঝে
সেই ঊর্ধ্বের দিব্য শক্তি শান্তি অমৃত রাজে।
খোলো গুণ্ঠন, ভোলো বন্ধন, ভাঙো ভবনের কারা,
বাহির ভুবনে আসিয়া দাঁড়াও, বাধাহীন ভয়হারা।
শোনো অমৃতের পুত্র! দুয়ারে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
জরাগ্রস্ত ভিখারি যযাতি নবযৌবন যাচে!
কুমারী উমার রূপে কতকাল অচল পিতার গেহে
হে মহাশক্তিরূপিণী শিবানী, বন্ধ রহিবে স্নেহে?
হে মহাশক্তি, তোমারে হারায়ে পুরুষোত্তম শিব
পথের ভিখারি, মৃতের শ্মশানে হয়েছে ঘৃণ্য জীব!
কে বলে তোমরা বালক বালিকা? তোমরা ঊর্ধ্ব হতে
নামিয়া এসেছ শুদ্ধ শক্তি দিব্য জ্যোতিস্রোতে।
হৃদয়-কমণ্ডলু হতে তব অমৃতধারা ছিটাও,
ঈর্ষাক্রান্ত জর্জরিত এ বিশ্বে শান্তি দাও।
বাঁচাতে এসেছ, বাঁচিতে আসনি হেথা শুধু পশু সম,
তপস্যা ত্যাগে পুরুষ হেথায় হয় পুরুষোত্তম;
সংসারী হয়ে নারী এই দেশে হয় ঋষি বেদবতী,
আনো সেই আশা, শক্তি, ধরায় স্বর্গের সেই জ্যোতি।
দূর করো এই ভেদজ্ঞান, এই হানাহানি, মলিনতা,
আনো ধূর্জটি-জটা হতে তব জাহ্নবীর পবিত্রতা।...
প্রণাম-পুষ্পাঞ্জলি লয়ে আছি পূজারি বসিয়া একা,
তোমাদের সেই দিব্য স্বরূপে কবে পাব হায় দেখা!

৪

যা কিছু পেয়েছি, ~~যা কিছু পাইয়াছি~~
পাইয়াছি তোমা, তাহাও যা কিছু
আছে,
~~[illegible]~~
সে সব তব দান; ~~[illegible]~~
ঐ ফিরিয়ে দিই - হাত - ভরে
তব তরে।
তোমার দানের সম্মান, প্রভু, রাখিতে
পারি?
তব দান - দাও সবলে ফিরায়ে, সমান কর
ভিখারী!
~~সহিত [illegible] তব দান, ফিরে [illegible]~~
তব ~~[illegible]~~ দান ~~[illegible]~~ যেন প্রসাদ-
তোমার নেশা সহিত যেন
তোমারে - প্রসাদে প্রেম - ভিক্ষে, পথ-,
ঐ সব দিয়ে
দান দিলে - সব ফিরায়ে দিলাম, হে দাতা,
হাত!
তব দান নিলে - তব ভিখারীরে - তোমারে দাও!
~~ভিক্ষার [illegible]~~ ভিক্ষারে ফিরে দাও!
তোমারেই ঐ তোরে তরিয়াছি ভিক্ষার ঝুলি।
হে মোর প্রভু চাহি দাও, দাও তোমার ছবি
ঝুলি!
প্রণয় লেখা

দ্র. তোমারে ভিক্ষা দাও : শেষ সওগাত : পৃ ১৪৯-১৫১

ঝড়

প্রথম প্রকাশ
১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
নভেম্বর ১৯৬০

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত কবিতা ও গানগুলির তালিকা

উঠিয়াছে ঝড়
জীবনে যাহারা বাঁচিল না
আমানুল্লাহ
ভোরের পাখী
বাংলার আজিজ
শাখ-ই-নবাত
খোকার গপ্‌প বলা
গদাই-এর পদবৃদ্ধি
কর্থ্যভাষা
দীওয়ান-ই-হাফিজ
ক্ষমা করো হজরত
সাম্পানের গান
চিঠি
রীফ-সর্দার
খালেদ
শরৎচন্দ্র
তরুণের গান
অনামিকা
জীবন
যৌবন
তর্পণ
নগদ কথা
জাগরণ
আরবী ছন্দের কবিতা

উঠিয়াছে ঝড়

উঠিয়াছে ঝড়, কড় কড় কড় ঈশানে নাকাড়া বাজিছে তার,
ওরে ভীরু, ওঠ্, এখনই টুটিবে ধমকে তাহার রুদ্ধ দ্বার!
কৃষ্ণ মেঘের নিশান তাহার দোলে পশ্চিম-তোরণে ওই,
ভ্রূকুটি-ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে নাচে নদনদী তাথই থই।
তরবারি তার হানিছে ঝিলিক সর্পিল বিদ্যুল্লেখায়,
হানিবে আঘাত তোর স্বপ্নের শিশমহলের দরোয়াজায় ;
কাঁদিবে পূর্ব পুবালি হাওয়ায়, ফোটাবে কদম জুঁই কুসুম ;
বৃষ্টিধারায় ঝরিবে অশ্রু, ঘনালে প্রলয় রবে নিঝুম?

যে দেশে সূর্য ডোবে — সেই দেশে হইল নবীন সূর্যোদয়,
উদয়-অচলে টলমল করে অস্ত-রবির আঁধার ভয়!
যুগ যুগ ধরি, তপস্যা দিয়ে করেছি মহিরে মহামহান,
ফুটায়েছি ফুল কর্ষিয়া মরু, ধূলির উর্ধ্বে গেয়েছি গান।
আজি সেই ফুলে-ফসল-মেলায় অধিকার নাই আমাদেরই,
আমাদের ধ্যান-সুন্দর ধরা আমাদের নয় আজি হেরি!
গীত-শেষে নীড়ে ফিরিবার বেলা হেরি নীড়ে বাসা বেঁধে শকুন,
মাংস-লোলুপ ফিরিতেছে ব্যাধ স্কন্ধে রক্ত-ধনুর্গুণ!
নীড়ে ফিরিবার পথ নাই তোর, নিম্নে নিষাদ, উর্ধ্বে বাজ,
তোর সে অতীত মহিমা আজিকে তোরে সব চেয়ে হানিছে লাজ!

উঠিয়াছে ঝড় — ঝড় উঠিয়াছে প্রলয়-রণের আমন্ত্রণ,
'আদাওতি'র'[১] এ দাওতে[২] কে যাবি মৃত্যুতে প্রাণ করিয়া পণ?
ঝড়ে যা উড়িবে, পুড়িবে আগুনে, উড়ুক পড়ুক সে সম্বল,
মৃত্যু যেখানে ধ্রুব তোর সেথা মৃত্যুরে হেসে বরিবি চল!
অপরিমাণ এ জীবনে করিবি জীবিতের মতো ব্যয় যদি,
উর্ধ্বে থাকুক ঝড়ের আশিস, চরণে মরণ-অম্বুধি!

বিধাতার দান এই পবিত্র দেহের করিবি অসম্মান?
শকুন-শিবার খাদ্য হইবি, ফিরায়ে দিবি না খোদার দান?
এ-জীবন ফুল-অঞ্জলি সম নজরানা দিবি মৃত্যুরে, —
জীবিতের মতো ভুঞ্জি জীবন ব্যয় করে যা তা প্রাণ পুরে!

১ শত্রুতার। ২ নিমন্ত্রণ।

চরণে দলেছি বিপুলা পৃথ্বী কোটি গ্রহ তারা ধরি শিরে,
মোদের তীর্থ লাগি রবি শশী নিশিদিন আসে ফিরে ফিরে।
নিঃসীম নভ ছত্র ধরিয়া, বন্দনা-গান গাহে বিহগ,
বর্ষায় ঝরে রহমত-পানি-প্রতীক্ষমাণ সাত স্বরগ।
অপরিমাণ এ দানেরে কেমনে করিবি, রে ভীরু অস্বীকার ?
মৃত্যুর মারফতে শোধ দিব বিধির এ মহাদানের ধার।
রোগ-পাণ্ডুর দেহ নয় — দিব সুন্দর তনু কোরবানি,
রোগ ও জরারে দিব না এ দেহ, জীবন-ফুলের ফুলদানি।
তাজা এ স্বাস্থ্য সুন্দর দেহ মৃত্যুরে দিবি অর্ঘ্যদান,
অতিথিরে দিবি কীটে-খাওয়া ফুল ? লতা ছিঁড়ে তাজা কুসুম আন !

আসিয়াছে ঝড়, ঘরের ভিতর তাজিম[১] করিয়া অতিথে ডাক,
বন্ধুর পথে এসেছে বন্ধু, হাসিয়া দস্তে দস্ত[২] রাখ।
যৌবন-মদ পূর্ণ করিয়া জীবনেরে মৃৎপাত্র ভর,
তাই নিয়ে সব বেহুঁশ হইয়া ঝঞ্ঝার সাথে পাঞ্জা ধর।

ঝঞ্ঝার বেগ বুধিতে নারিবে পড়-পড় ওই গৃহ রে তোর,
খুঁটি ধরে তার কেন বৃথা আর থাকিস বসিয়া, ভাঙ এ দোর !
রবির চুল্লি নিভিয়া গিয়াছে, ধূম্রায়মান নীল গগন,
ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটিয়া পাখা, ধেয়ে আয় তুই ক্ষীণ পবন !

শাখ-ই-নবাত

[‘শাখ-ই-নবাত’ বুলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসীপ্রিয়া ছিলেন।]

শাখ-ই-নবাত[৩] শাখ-ই-নবাত ! মিষ্টি রসাল ‘ইক্ষু-শাখা’।
বুলবুলিরে গান শেখাল তোমার আঁখি সুরমা-মাখা।
বুলবুল-ই-শিরাজ হল গো হাফিজ গেয়ে তোমার স্তুতি,
আদর করে ‘শাখ-ই-নবাত’ নাম দিল তাই তোমার তুতি[৪]।
তার আদরের নাম নিয়ে আজ তুমি নিখিল-গরবিনি,
তোমার কবির চেয়ে তোমায় কবির গানে অধিক চিনি।
মধুর চেয়ে মধুরতর হল তোমার বঁধুর গীতি,
তোমার রস-সুধা পিয়ে, তাহার সে-গান তোমার স্মৃতি।
তোমার কবির — তোমার তুতির ঠোঁট ভিজালে শহদ[৫] দিয়ে,
নিখিল হিয়া সরস হল তোমার শিরিন সে রস পিঁয়ে।

১ সমাদর। ২ হাত। ৩ ইক্ষুশাখা। ৪ তোতাপাখি। ৫ মধু।

কল্পনারই রঙিন পাখায় ইরান দেশে উড়ে চলি,
অনেক শত বছর পিছের আঁকাবাঁকা অনেক গলি—
তোমার সাথে প্রথম দেখা কবির যেদিন গোধূলিতে,
আঙুর-খেতে গান ধরেছে, কুলায়-ভোলা বুলবুলিতে।
দাঁড়িয়েছিলে একাকিনী 'রোকনাবাদের নহর'[১] তীরে,
রঙিন ছিল আকাশ যেন কুসুম-ভরা ডালিম-শাখা
তোমার চোখের কোনায় ছিল আকাশ-ছানা কাজল আঁকা।
সন্ধ্যা ছিল বন্দি তোমার খোঁপায়, বেণির বন্ধনীতে ;
তরুণ হিয়ার শরম ছিল জমাট বেঁধে বুকের ভিতে।
সোনার কিরণ পড়েছিল তোমার দেহের দেউল চূড়ে,
ডাঁসা আঙুর ভেবে এল মউ-পিয়াসি ভ্রমর উড়ে।
তিল হয়ে সে রইল বসে তোমার গালের গুলদানিতে,
লহর বয়ে গেল সুখে রোকনাবাদের নীল পানিতে।
চাঁদ তখনও লুকিয়ে ছিল তোমার চিবুক গালের টোলে,
অস্তরবির লাগল গো রং শূন্য তোমার সিঁথির কোলে।
ওপারেতে একলা তুমি নহর-তীরে লহর তোলো,
এপারেতে বাজল বাঁশি, 'এসেছি গো নয়ন খোলো!'

... ...

তুললে নয়ন এপার পানে — মেলল কি দল নার্গিস তার ?
দুটি কালো কাজল আখর — আকাশ ভুবন রঙিন বিথার !
কালো দুটি চোখের তারা, দুটি আখর, নয়কো বেশি ;
হয়তো 'প্রিয়', কিংবা 'বঁধু' — তারও অধিক মেশামেশি !
কী জানি কী ছিল লেখা — তরুণ ইরান-কবিই জানে,
সাধা বাঁশি বেসুর বোলে সেদিন প্রথম কবির কানে।
কবির সুখের দিনের রবি অস্ত গেল সেদিন হতে,
ঘিরল চাঁদের স্বপন-মায়া মনের বনের কুঞ্জপথে।
হয়তো তুমি শোননি আর বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনি,
স্বপন-সম বিদায় তাহার স্বপন-সম আগমনি।
রোকনাবাদের নহর নীরের সকল লহর কবির বুকে,
ঢেউ তোলে গো সেদিন হতে রাত্রি দিবা গভীর দুখে।
সেই যে দুটি কাজল হরফ দুটি কালো আঁখির পাতে,
তাই নিয়ে সে গান রচে তার ; সুরের নেশায় বিশ্ব মাতে !
অরুণ আঁখি তন্বী সাকি পাত্র এবং শারাব ভুলে,
চেয়ে থাকে কবির মুখে করুণ তাহার নয়ন তুলে।
শারাব হাতে সাকির কোলে শিরাজ কবির রঙিন নেশা
যায় গো টুটে ক্ষণে ক্ষণে — মদ মনে হয় অশ্রু মেশা।

১ কবি হাফিজের বাসস্থানের পাশে ছিল রোকনাবাদের খাল।

অধর-কোণে হাসির ফালি ঈদের পহিল চাঁদের মতো—
উঠেই ডুবে যায় নিমেষে, সুর যেন তার হৃদয়-ক্ষত।
এপারে ঘুরে কবির সে গান ফুলের বাসে দখিন হাওয়ায়
কেঁদে ফিরেছিল কি গো তোমার কানন-কুঞ্জ ছায়ায় ?
যার তরে সে গান রচিল, তারই শোনা রইল বাকি ?
শুনল শুধু নিমেষ-সুখের শারাব-সাথি বে-দিল্ সাকি ?

শাখ-ই-নবাত ! শাখ-ই-নবাত ! পায়নি তুতি তোমার শাখা,
উধাও হল তাইতে গো তার উদাস বাণী হতাশ-মাখা।
অনেক সাকির আঁখির লেখা, অনেক শারাব পাত্র-ভরা,
অনেক লালা নার্গিস গুল বুলবুলিস্তান গোলাব-ঝোরা
ব্যর্থ হল, মিটল না গো শিরাজ কবির বুকের তৃষা,
হয়তো আখের শাখায় ছিল সুধার সাথে বিষও মিশা !
নইলে এ গান গাইত কে আর, বইত না এ সুরধুনী ;
তোমার হয়ে আমরা নিখিল বিরহীরা সে গান শুনি।
আঙুর-লতায় গোটা আঙুর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবারি,
শিরাজ-কবির সাকির শারাব রঙিন হল তাই নিঙাড়ি।
তোমায় আড়াল করার ছলে সাকির লাগি যে গান রচে,
তাতেই তোমায় পড়ায় মনে, শুনে সাকি অশ্রু মোছে !
তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসিব ভালো, হায় ইরানি !
শুনলে নাকো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী।
তোমার কবির রচা গানে মোদের প্রিয়ার মান ভাঙাতে
তোমার কথা পড়ে মনে, অশ্রু ঘনায় নয়ন-পাতে !

ঘুমায় হাফিজ 'হাফেজিয়া'[১]য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে,
দিওয়ানার সে দিওয়ান-গীতি একলা জাগে কবর-ধারে।
তেমনি আজও আঙুর-খেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা,
তুতির ঠোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজও চিনির সিরা।
তেমনি আজও জাগে সাকি পাত্র হাতে পানশালাতে —
তেমনি করে সুরমা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে।
তেমনি যখন গুলজার হয় শারাব-খানা, 'মুশায়েরা'[২],
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড়-ঘেরা।
গোধূলি সে লগ্ন আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম-ফুলি,
ইরান মুলুক বিরান[৩] ঠেকে, নাই সেই গান, সেই বুলবুলি।
হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজও যেন সন্ধ্যা প্রভাত —
'কোথায় আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ-ই-নবাত !'

১ কবি হাফিজের সমাধিস্থল। ২ কবি-সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ। ৩ জনশূন্য।

দন্তে কেটে খেজুর-মেতি আপেল-শাখায় অঙ্গা রেখে
হয়তো আজও দাঁড়াও এসে পেশোয়াজে[১] নীল আকাশ মেখে,
শারাব-খানায় গজল শোনো তোমার কবির বন্দনা-গান ;
তেমনি করে সূর্য ডোবে, নহর-নীরে বহে তুফান।
অথবা তা শোন না গো, শুনিবে না কোনো কালেই ;
জীবনে যে এল না তা কোনো লোকের কোথাও সে নেই!

অসীম যেন জিজ্ঞাসা ওই ইরান-মরুর মরীচিকা,
জ্বালনি কি শিরাজ-কবির লোকে তোমার প্রদীপ-শিখা ?
বিদায় সেদিন নিল কবি শূন্য শারাব পাত্র করে,
নিঙড়ে অধর দাওনি সুধা তৃষিত কবির তৃষ্ণা হরে!
পাঁচশো বছর খুঁজেছে গো, তেমনি আজও খুঁজে ফিরে
কবির গীতি তেমনি তোমায় রোকনাবাদের নহর-তীরে!

কর্থ্যভাষা

কর্থ্যভাষা কইতে নারি শূর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেঁড়ায় বলি ছিন্ন।
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোর্স্বামী।
বানকে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি।
চাবায় আমি চশ্‌শ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোটকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসিরে মাহিষ্য॥
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু।
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড়ুক্কু॥
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর কালায় বলি কঙ্কাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু।
বামারে কই বম্রু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরও অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিণ্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিন্তু॥

১ নর্তকীদের পোশাক বা পায়জামা।

আঁধারে

অমানিশায় আসে আঁধার তেপান্তরের মাঠে ;
স্তব্ধ ভয়ে পথিক ভাবে,— কেমনে রাত কাটে !
ওই যে ডাকে হুতোম-পেঁচা, বাতাস করে শাঁ শাঁ !
মেঘে ঢাকা অচিন মুলুক ; কোথায় রে কার বাসা ?
গা ছুঁয়ে যায় কালিয়ে শীতে শূন্য পথের জু জু—
আঁধার ঘোরে জীবন-খেলার নূতন পালা রুজু।

ঘোষণা

হাতে হাত দিয়ে আগে চলো, হাতে
নাই থাক হাতিয়ার !
জমায়েত হও, আপনি আসিবে
শক্তি জুলফিকার[১] ॥

আনো আলির[২] শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ,
ওমরের[৩] মতো কর্মানুরাগ,
খালেদের[৪] মতো সব অসাম্য
ভেঙে করো একাকার ॥

ইসলামে নাই ছোটো বড়ো আর
আশরাফ[৫] আতরাফ ;
এই ভেদ-জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিসমার[৬] সাফ !

চাকর সৃজিতে চাকরি করিতে
ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে ;
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন,
এ-জুলুম সহেনিকো ইসলাম —
সহিবে না আজও আর ॥

---

১ হজরত আলির তরবারি। ২ হজরতের চাচাতো ভাই ও জামাতা, চতুর্থ খালিফা। ৩ হজরতের প্রিয় শিষ্য ও দ্বিতীয় খলিফা। ৪ ইসলামি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। ৫ অভিজাত। ৬ চূর্ণবিচূর্ণ।

গান

আমার বিফল পূজাঞ্জলি
অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে।
তোমার আরাধিকার পূজা
হে বিরহী, লও হে এসে।
খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন,
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন,
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন
মিটবে কি সাধ ভালোবেসে॥
না-দেখা মোর বন্ধু ওগো,
কোথায় বাঁশি বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে
নয়ন কেন পায় না দেখা!

সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে,
তেমনি করে তোমার পানে
আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

বন্ধন

অনন্তকাল এ-অনন্তলোকে
মন-ভোলানোরে তার খুঁজে ফিরে মন।
দক্ষিণা-বায় চায় ফুল-কোরকে ;
পাখি চায় শাখী, লতা-পাতা-ঘেরা বন।
বিশ্বের কামনা এ — এক হবে দুই :
নূতনে নূতনতর দেখিবে নিতুই॥
তোমারে গাওয়াত গান যার বিরহ
এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যায়,
এল সেই সুদূরের মদির-মোহ
এল সেই বন্ধন জড়াতে গলায়।
মালা যে পরিতে জানে, কণ্ঠে তাহার
হয় না গলার ফাঁসি চারু-ফুলহার॥

জলময়, নদী তবু নহে জলাশয়,
কূলে কূলে বন্ধন তবু গাহে গান ;
বুকে তরণির বোঝা কিছু যেন নয়—
সিন্ধুর সন্ধানী চঞ্চল-প্রাণ।
দুই পাশে থাক তব বন্ধন-পাশ,
সমুখে জাগিয়া থাক সাগর-বিলাস॥
বিরহের চখাচখি রচে তারা নীড়,
প্রাতে শোনে নির্মল বিমানের ডাক ;
সেই ডাকে ভোলে নীড়, ভোলে নদীতীর,
সন্ধ্যায় গাহে : 'এই বন্ধন থাক'!
আকাশের তারা থাক কল্পলোকে,
মাটির প্রদীপ থাক জাগর-চোখে॥

সালাম অস্ত-'রবি'

কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে! বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণি জানি না সে কত দিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা ;
রেখায় রেখায় রূপ দিবে আর কাহার ছন্দ-লেখা?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া?

ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমি
আরবের ইমরুল-কায়েস[১] যে ছিলে এক সাথে তুমি!
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙি
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস!

এক সে রবির আলোকে তিমির-ভীত এ ভারতবাসী
ভুলেছিল পরাধীনতা-পীড়ন দুঃখ-দৈন্যরাশি।
যেন ঊর্ধ্বের বরাভয় তুমি আল্লার রহমত,
নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত।

১ ইসলাম-পূর্ব যুগের বিশিষ্ট কবি, তাঁর অবিনশ্বর কাব্য সাব্‌আ মু-আল্লাহ্‌কাহ্।

সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত-বঙ্গভূমি ॥

তোমার মরুতে তোমার আলোকে ছায়া-তরু ফুল-লতা
জন্মিয়া চির-স্নিগ্ধ করিয়া রেখেছিল শত ব্যথা।
অন্তরে আর পাই না যে আলো মানস-গগন-কবি,
বাহিরের রবি হেরিয়া জাগে যে অন্তরে তব ছবি।
গোলাব ঝরেছে, গোলাবি আতর কাঁদিয়া ফিরিছে, হায়!
আতরে কাতর করে আরও প্রাণ ফলেরে দেখিতে চায়।
ফুলের, পাখির, চাঁদ-সুরুজের নাহিকো যেমন জাতি,
সকলে তাদেরে ভালোবাসে, ছিল তেমনি তোমার খ্যাতি।
রস-লোক হতে রস দেয় যারা বৃষ্টিধারার প্রায়
তাদের নাহিকো ধর্ম ও জাতি, সকলের ঘরে যায়।
অবারিত দ্বার রস-শিল্পীর, হেরেমেও অনায়াসে
যায় তার সুর কবিতা ও ছবি আনন্দে অবকাশে।

ছিল যে তোমার অবারিত দ্বার সকল জাতির গেহে,
তোমারে ভাবিত আকাশের চাঁদ, চাহিত গভীর স্নেহে!
ফুল হারাইয়া আঁচলে রুমালে তোমার সুরভি মাখে
বক্ষে নয়নে বুলায়ে আতর, কেঁদে ঝরাফুল ডাকে।

আপন জীবন নিঙাড়ি যে জন তৃষাতুর জনগণে
দেয় প্রেম-রস, অভয়-শক্তি বসি দূর নির্জনে,
মানুষ তাহারই তরে কাঁদে, কাঁদে তারই তরে আল্লাহ্,
বেহেশ্‌ত হতে ফেরেশতা কহে তাহারেই বাদশাহ!

শত রূপে রঙে লীলা-নিকেতন আল্লার দুনিয়াকে
রাঙায় যাহারা, আল্লার কৃপা সদা তাঁরে ঘিরে থাকে।
তুমি যেন সেই খোদার রহম এসেছিলে রূপ ধরে,
আরশের[১] ছায়া দেখাইয়া ছিলে রূপের আরশি ভরে।

কালাম[২] ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও!
ঊর্ধ্বে থাকি এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও!!

১ আল্লার সিংহাসন। ২ বাণী।

অপরূপ সে দুরন্ত

ভাব-বিলাসী অপরূপ সে দুরন্ত,
বাঁধন-হারা মন সদা তার উড়ন্ত!
সে ঘুরে বেড়ায় নীল আকাশে।
চাঁদের সাথে মুচকি হাসে,
গুঞ্জরে সে মউ-মক্ষীর গুঞ্জনে,
সে ফুলের সাথে ফোটে, ঝরে পরাগ হয়ে অজ্ঞানে।
তার চোখের পলক ভোরের তারায় ঝলে,
ধূমকেতু তার ফুলঝুরি, সে উল্কা হয়ে চলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত।

সে প্রথম-ফোটা গোলাপ-কুঁড়ির সনে—
হিঙুল হয়ে ওঠে লাজে হঠাৎ অকারণে।
ধরা তারে ধরতে নারে ঘরের প্রদীপ দিয়ে,
সে শিশির হয়ে কাঁদে, খেলে পাখির পালক নিয়ে।
সে ঝড়ের সাথে হাসে
সে সাগর-স্রোতে ভাসে,
সে উদাস মনে বসে থাকে জংলা পথের পাশে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

সে বৃষ্টিধারার সাথে পড়ে গলে,
অস্ত-রবির আড়াল টেনে লুকায় গগন-তলে।
দীপ্ত রবির মুকুরে সে আপন ছায়া দেখে,
সে পথে যেতে যায় যেন কি মায়ার মোহ এঁকে।
ঝরা তারার তির হানে সে নিশুত রাতের নভে,
ঘুমন্তরে জাগিয়ে সে দেয় বিপুল বজ্র-রবে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

সে রঙিন প্রজাপতি
কভু ফুলের দিকে মতি,
কভু ভুলের দিকে গতি
তার রুধির-ধারা নদীর স্রোতের মতো
দেহের কূলে বন্ধ তবু মুক্ত অবিরত।

রূপকে বলে সঙ্গিনী সে, প্রেমকে বলে প্রিয়া,
রূপ ঘুমালে উর্ধ্বে ওঠে আত্মাতে প্রেম নিয়া।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

মরণকে সে ভয় করে না, জ্ঞানীর সভায় ভয়,—
ভাবের সাথে ভাব করে সে অভাব করে জয়।
তার তরল হাসি সরল ভাবে মুগ্ধ সবার মন,
মন ভরে না জ্ঞানীর, করে অর্থ অন্বেষণ।
চোখ আছে যার, তারই চোখের পাতা টিপে ধরে,
হাতিশালায় যায় না, যায় ফুল ফোটে যে-ঘরে।
তার পথের পথিক সাথি,
তার বন্ধু নীরব রাতি,
খ্যাতির খাতায় চায় না চাঁদা, চাঁদের সাথে খেলে,
সে কথা কহে, মুক্ত-পাখা পাখির দেখা পেলে।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

তারে জ্ঞান-বিলাসী ডাকে না, তায় গাঁয়ের চাষি ডাকে,
তৃষার জলের পাত্র-সম জড়িয়ে ধরে তাকে।
সে রয় না আন্দোলনে,
যেথা আনন্দ হয় আন্দোলিত যায় সে গোপন বনে।
সে চাঁদের আলো, বর্ষা-মেঘের জল,
আপনার খুশিতে ঝরে আপনি সে চঞ্চল।
সে চায় না ফুলের মালা, সে ফুলের মধু চায়,
সে চায় না তাহার নাম,
দান দিয়ে সে পালিয়ে বেড়ায়
চায় না তাহার দাম।
অপরূপ সে দুরন্ত,
মন সদা তার উড়ন্ত!

কেউ যদি তায় ভালো বলে, আলোর বুকে হয় সে লয়,
বলে, 'ওগো সুন্দর মোর, তোমায় বলে, আমার নয়!'
ছন্দ তাহার স্বচ্ছন্দ, দ্বন্দ্ব মাঝে রয় না সে,
যে বড়ো তাঁর সুনাম নিয়ে ক্ষুদ্র কথা কয় না সে।
তার মন্দ শোনার নাইকো সময়,
রসের সাথে নিত্য প্রণয়,

তারে নিন্দা দিলে চন্দন দেয়
সে নন্দন-জাদুকর,
সুন্দর সে, তাই দেখে না কাহারেও সে অসুন্দর।
তারে লোভ দেখিয়ে যায় না ধরা,
আপনাকে যে দিতে চায়—
প্রেম-ভিক্ষু দুরন্ত সে লুটিয়ে পড়ে তাহার পায়।
পূর্ণের সে প্রতিচ্ছায়া, অপরূপ সে দুরন্ত,
মন কাঁদে মোর তারই তরে, মন সদা যার উড়ন্ত!

আগা মুরগি লে কে ভাগা

[সুর : 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারই এ তরুমূলে']

একদা তুমি আগা দৌড়ে কে ভাগা মুরগি লেকে।
তোমারে ফেলনু চিনে ওই আননে জমকালো চাপ দাড়ি দেখে।
কালো জাম খাচ্ছিলে যে সেইদিন সেই গাছে চড়ে
কালো জাম মনে করে ফেললে খেয়ে ভোমরা ধরে।
'চুঁ করো আওর চাঁ করো ছোড়ে গা নেই,
সব কুছ কালা কালা খা জায়ে গা — বললে হেঁকে।।'
ভুলো আর টেমি জিমি চেনে যে ওই ঝাঁকড় চুলে,
তোমারে দেখলে পরে তারস্বরে আসে তেড়ে ল্যাজুড় তুলে।

ও-পাড়ার হীবু তোমায় দেখেই পালায় পগার-পারে,
'রুপিয়া লে আও,' বলে ধরলে তাহার ছাগলটারে।
দেখিয়াই মটরু মিয়াঁর মুরগি লুকায় ঝোপের আড়ে,
তাই কি ছেলেমেয়ে মুরগি-চোরা বলে ডাকে।।

হিন্দি গান

।। ১ ।।

আজ বন-উপবন-মে
চঞ্চল মেরে মন-মে
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম।
সুনো মোহন নূপুর গুঁজত হ্যেয়,
বাজে মুরলী বোলে রাধা নাম।
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম।।

বোলে বাঁশরি আও শ্যাম-পিয়ারি—
টুঁড়ত হ্যায় শ্যাম-বিহারী,
বনবালা সব চঞ্চল
ওড়াওয়ে অঞ্চল
কোয়েল সখী গাওয়ে সাথ গুণধাম ॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম ॥

ফুলকলি ভোলে ঘুংঘট খোলে
পিয়াকি মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,
পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ
হাঁসত যমুনা সখী দিবস-যাম ॥
কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম ॥

॥ ২ ॥

খেলত বায়ু ফুল-বনমে আও প্রাণ-পিয়া।
আও মনমে প্রেম-সাথি আজ রজনি
গাও প্রাণ-প্রিয়া ॥
মন-বনমে প্রেম মিলি
ভোলত হ্যায় ফুল-কলি,
বোলত হ্যায় পিয়া পিয়া।
বাজে মুরলিয়া ॥

মন্দিরমে রাজত হ্যায় পিয়া তব মুরতি,
প্রেম-পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম-সাথি,
চাঁদ হাসে তারা সাথে
আও পিয়া প্রেম-রাথে,
সুন্দর হ্যায় প্রেম-রাতি, আও মোহনিয়া।
আও প্রাণ-পিয়া ॥

॥ ৩ ॥

চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন
তুম ব্যনে বনওয়ারি।
ছিন লিয়ে হ্যায় গদা পদম সব
মিল করকে ব্রজনারী ॥

চার ভুজা আব দো বনায়ে,
ছোড়কে বৈকুণ্ঠ ব্রিজ-মে আয়ে,
রাস রচাযে ব্রিজ-কে মোহন
ব্যন গয়ে মুরলীধারী ॥

সত্যভামা-কো ছোড়কে আয়ে,
রাধা-প্যারি সাথ-মে লায়ে,
বৈতরণি-কো ছোড়কে ব্যন গয়ে
যমুনাকে তটচারী ॥

॥ ৪ ॥

তুম প্রেমকে ঘনশ্যাম
ম্যায় প্রেম কি শ্যাম প্যারি।
প্রেম কা গান তুমহরে দাম
ম্যায় হুঁ প্রেম-ভিখারি ॥
হৃদয় বিচমে যমুনা-তীর
তুমহরি মুরলী বাজে ধীর,
নযন-নীর কী বহত যমুনা
প্রেমকে মাতোয়ারি ॥
যুগ যুগ হোয়ে তুমহরি লীলা মেরে হৃদয-বনমে।
তুমহরে মোহন মন্দির পিয়া মোহত মেরে মনমে।

প্রেম-নদী-নীর নিত বহি যায়,
তুমহরে চরণ কো কাঁহু না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারি সাথে ব্রজনারী
আও মুরলীধারী ॥

॥ ৫ ॥

ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক ঝোরে,
দেখো সখী চম্পা লচকে।
বাদরা গরজে দামিনী দমকে ॥

আও ব্রজ-কি কুঙারি ওঢ়ে নীল শাড়ি,
নীল কমল-কলিকে পহনে ঝুমকে ॥

হাররে ধান কি লও মে হো বালি,
ওড়নি রাঙাও শতরঙ্গি আলি,
ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি,
আও প্রেম-কুঙারি মন ভাও,
প্যারে প্যারে সুর-মে শাওনি সুনাও !

রিমঝিম রিমঝিম পড়ত কোয়ারে,
সুন পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
ওহি বোলি-সে হিরদয় খটকে ॥

॥ ৬ ॥

ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা মে কিশোরী কিশোর।
দেখে দোউ এক এক-কে মুখকো চন্দ্রমা-চকোর—
য্যায়সা চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম-নেশা বিভোর ॥

মেঘ-মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দ্-মে,
রিমঝিম বাদর বরষে আনন্দ্-মে,
দেখনে যুগল শ্রীমুখ-চন্দ-কো
গগন ঘেরি আয়ে ঘনঘটা-ঘোর ॥

নব নীর বরষনে কো চাতকী চায়,
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায় ;
সব দেবদেবী বন্দনা-গীত গায়—
ঝরে বরষা-মে ত্রিভুবন-কি আনন্দাশ্রু-লোর ॥

॥ ৭ ॥

প্রেমনগর-কা ঠিকানা কর-লে
প্রেমনগর-কা ঠিকানা।
ছোড় কারিয়ে দো-দিন-কা ঘর
ওহি রাহ-মে জানা ॥

দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া,
সুখ-দুখ হ্যায় দো জগৎ কা কায়া,
দুখ-কো তু গলে লাগা লে—
আগে না পসতানা ॥

আতি হ্যায় যব রাত আঁধারি—
ছোড় তুম মায়া বন্ধন ভারি,
প্রেম-নগর কি কর তৈয়ারি
আয়া হ্যায় পরোয়ানা ॥

॥ ৮ ॥

সোওত জগাত আঁঠু জান রাহত প্রভু
মন-মে তুমহারে ধ্যান।
রাত-আঁধেরি-সে চাঁদ সমান প্রভু
উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ ॥

এক সুর বোলে ঝিওর সারে রাত—
এ্যায়সে হি জপ তুহু তেরা নাম, হে নাথ!
ঝুম ঝুম মে রম রহো মেরে
এক তুমহারা গান ॥
গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন—
ত্যজ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুম হো মেরে প্রাণ-আধারণ—
দাসী তুমহারি জ্ঞান ॥

অপরূপ রাস

এ কী পরম বিলাস!
এ কী অপরূপ রাস!
এ কী অপ্রাকৃত কাম-ঘন যৌবন
রস- উন্মদ উল্লাস!
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

এ কী জড়াজড়ি গড়াগড়ি ছড়াছড়ি ফুল,
এ কী প্রগাঢ় আলিঙ্গান; গেল জাতি কুল!
হেথা ধরম শরম নাই,
যাহা সাধ করি তাই,
অঙ্গো অঙ্গো একী তৃষ্ণা-পিয়াস!
একী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস!

হেথা বর ও বধূর নিত্য মধুর শুভ-দৃষ্টি,
হেথা নিতি ফুল-শয্যা ;
হেথা দিন নাই, রাত নাই, নাই জ্ঞান লজ্জা ;
হেথা কথায় কথায করে দেয়-লতিকায়
প্রেম-ঘন আদর-বৃষ্টি ;
এ কী মধুমঞ্জরী — মধুর মধুর
শুধু প্রিয় আর প্রিয়-সম্ভাষ !
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস !

এ কী না-দেখা না-শোনা অপরূপ রূপ।
এ কী না-দেখা কুসুম না-দেখা মধুপ !
এ কী শান্ত মৌন-ঘন উজ্জ্বল রসের প্রকাশ !
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস !

এ কী উদার আনন্দ প্রমত্ত ছন্দ
নৃত্যায়িত একী কায়া !
এই আলো, এই ছায়া, একী লীলা, একী মায়া !
এই পরম জ্যোতিঃ এই মনোরম রতি-অভিলাষ
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস !

কভু হীরক-শুভ্র কভু নীল অঞ্জন,
কভু সে কষিত হিরণ্য দামিনী-বরণ ;
সব আবরণ খুলে যায়,
আভরণ ভুলে যায় ;
এ কী মহিমায় মাধুরীতে মাখামাখি গো—
মহাভাব-বিহ্বল স্বরূপ প্রকাশ !
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস !

এ কী ব্রহ্মল রমণে সমাহিত উৎসব-মগ্ন !
এ কী উমা দেবী হ্লাদিনী অমৃতের লগ্ন !
এ কী প্রেম-মাধুরী-মাখা রস-লেখা-চর্চিত
মদনোন্মাদ মহাকাশ !
এ কী পরম বিলাস, একী অপরূপ রাস !

আবিরাবীর্ম এধি[১]

হউক আবির্ভূত তোমাদের সাধনায়
যুগ-যুগ-সম্ভব জনগণ যারে চায়!
শত 'মধুকৈটভ', 'মুর' ও 'কংস'
সুন্দর সৃষ্টিরে করিতেছে ধ্বংস ;
আনন্দ-নন্দ-লোক নিরানন্দে
কাঁদি কাঁদি মুরারিরে ডাকে আর বন্দে।
তোমাদের একাগ্র তপস্যা-বলে আজ
গোলোকের নারায়ণে টেনে আনো ধরা মাঝ!
আবির্ভাবের বাণী শুনুক এ ত্রিভুবন,
জাগিয়া উঠুক পুনঃ নিপীড়িত জনগণ!

কবির প্রশস্তি

আল্লাহু-আকবর! আল্লাহু-আকবর!
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহমত, কওসর।
আল্লার যারা আশ্রিত, আজ তাদেরই হইল জয়,
ইহা আল্লার ইচ্ছার জয়, আমাদের জয় নয়!

আজিকার জয়, জানিয়ো, পূর্ণজয়ের প্রথম ধাপ,
আজও আমাদের মাঝে আছে কত বন্ধন অভিশাপ,
কত ভেদজ্ঞান কলহ ঈর্ষা লোভ ও অহংকার—
সব দূর করে দেবে পবিত্র নামের মহিমা তাঁর।

তোমরাই হবে নূতন পথিক তাঁর তীর্থের পথে।
তোমাদেরই পদ-চিহ্ন ধরিয়া না-দেখা আকাশ হতে
আসিতেছে নবযুগের যাত্রী তরুণ নৌজোয়ান,
আর দেরি নাই, দেখে যাবে পৃথিবীর দুখ অবসান।

১ স্বপ্রকাশ, আমার মধ্যে প্রকাশিত হোক।

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র

ক্ষুধিত অগ্নিময় ব্যাঘ্র আসিয়া
হত্যা করিল তামসী নিশীথিনীরে।
পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি
সঞ্চরি ফেরে ডেভিলের রুধিরে রুধিরে॥

দৈত্য-দানবের চর্বি খেয়ে চিৎকার করে বাঘ : আয় কে মরবি?
ছিন্ন করি সপ্ত আকাশে চিবাইল হিম গিরিরে॥

চামড়া কামড়ায়ে অবিদ্যা, কাম ও রতির,
সপ্ত পাতালে ছুটে যায় হয়ে উগ্র অধীরে।
থাবা মেরে মাটি ফেলে দিল পাথারের তীরে॥

চার-চিল নখর-চঞ্চুতে মাংস ছিঁড়ে খায়,
এ মারি কীসে মারি ব্যাঘ্র চেঁচায়!
অভেদ ও অভিন্ন, অসাম্যে ল্যাজের আছাড়ে
ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র ফেলে দিল কাছাড়ে।
বাপ কী নাচা রে।
কাছা ও কোঁচা খুলে গেল বিদ্বেষ ও হিংসায়
একী খিঁচাখিঁচি রে॥

ক্ষমা করো হজরত!!

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ
ক্ষমা করো হজরত।
বিলাস বিভব দলিয়াছ পায় ধূলিসম তুমি প্রভু
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু
এই ধরণির ধন সম্ভার
সকলের তাহে সম অধিকার
তুমি বলেছিলে, ধরণিতে সবে সমান পুত্রবৎ॥
ক্ষমা করো হজরত।
তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি করে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।

ভিন-ধর্মীর পূজা মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি, হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনোকো পর-মত ॥
ক্ষমা করো হজরত !!
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥
ক্ষমা করো হজরত্ ॥

সাম্পানের গান

(পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল সুরে)

ওরে মাঝি ভাই !
ওরে সাম্পানওয়ালা ভাই !
তুই কি দুখ পাইয়া কূল হারাইলি অকূল দরিয়ায় ॥
তোর ঘরের রশি ছিঁইড়া রে গেল ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ দরিয়ায় ভাইসা চলিস সাম্পান ভাসাই।
ও ভাই দরিয়ায় আয়ে জোয়ার ভাটিরে
তোর ওই চক্ষের পানি চাই ॥

তোর চোখের জল ভাই ছাপাইতে চাস নদীর জলে আইসা,
শেষে নদীই আইল চক্ষে রে তোর তুই চলিলি ভাইসা,
ও তুই কলস দেইখা নামলি জলে রে
এখন ডুইবা দেখিস কলস নাই ॥

তুই কূলে যাহার কূল না পেলি তারে অগাধ জলে
কেন খুঁইজা মরিস ওরে পাগল সাম্পান বাওয়ার ছলে,
ও ভাই দুই ধারে এর চোরাবালু রে
তোর হেথায় মনের মানুষ নাই ॥

২

কী হইব লাল বাওটা[১] তুইল্যা সাম্পানের উপর।
তোর বাওটায় যত লাগব হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হইব তোর ততই পর ॥

---

১ পান।

তোর কী দুঃখ ভাই ছাড়াইতে চাস বাওটারে রাঙাইয়া,
এবার পরান ভইর‍্যা কাঁইদ্যা নে ভাই অগাধ জলে আইযা,
ও ভাই তোর কাঁদনে উইঠা আসুক রে
ওই নদীর থনে বালুর চর॥

তুই কীসের আশায দিবিরে ভাই কূলের পানে পাড়ি ;
তোর দিয়া[১] সেথা না জ্বলে ভাই আঁধার দে ঘরবাড়ি ;
তুই জীবন কূলে পেলি না তায় রে
এবার মরণ জলে তালাশ কর॥

৩

তোমায় কূলে তুইলা বন্ধু আমি নামছি জলে।
আমি কাঁটা হইয়া রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে॥
আমি তোমায় ফুল দিযাছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হইলাম বিবাগি।
আমি বুকের তলায় রাখছি তোমায় গো
পইর‍্যা শুকাইছি না গলে॥
যে দেশ তোমার ঘর রে বন্ধু সে দেশ থনে আইসা
আমার দুখের সাম্পান ছাইড়া দিছি চলতেছে সে ভাইসা,
এখন যে দেশে নাই তুমি বন্ধু গো
আমি সেই দেশে যাই চলে।
আমি সেই দেশে যাই চলে॥

১ প্রদীপ।

১০ [illegible] X

হাসিকান্না

সদিম কেন্দ্য তোমায় কইতে নারি শুদ্ধ ভাষা চিন্নু।
লেংড়া আমি নিন্নরলি (পেঁচা) ছোঁচা বলি চিন্না।
গোঁসাইকে কই গোবিয়ী, তাই গুসাইকে কই গোস্বামী,
বরকে বলি বন্যা, তাই কানকে ভেন্যা কই সামি।
চাষা সদিম চশম বলি, সাপায় বলি সশ্ব,
ঠোঁটকে বলি ঠোঁচ আর নাসায় বলি নস্য।
শশারে কই শিষ্য আমি ভস্মরে কই ভীষ্ম,
ঝিলিরে কই সিষ্টুচ আর মাসীরে মহিষ্য।
পুকুরকে কই পুষ্করিণী, কুকুরকে কই কুক্কু
বদনকে কই বদম আর গাবুকে উক্কু।
চাপলকে কই চঞ্চল তাই সাগিলকে কই সাগুন,
শালারে কই শলাকা আর ডাবায় বলি গুবিলি
সুন্দরকে কই সশ্রু আর দাদারে কই দক্ষ,
বাপেরে কই বপ্তু আর কাদারে কই কদ্রু।
আরো অনেক বলো জানি, বুঝলে তোমায় মিষ্টি.
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিছু।

দ্র কর্থ্যভাবা ঝড় পৃ ১৯১

বুলবুল : দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম সংস্করণ
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯
মে ১৯৫২

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত গানগুলির তালিকা

মোর গানের কথা যেন আলোকলতা
এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা
কত দূরে তুমি, ওগো আঁধারের সাথী
অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন
বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
বন-বিহঙ্গ! যাও রে উড়ে
এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে
উজান বাওয়ার গান গো এবার
যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি
মোর স্বপনে যেন বাজিয়েছিলে করুণ রাগিণী
আমি সন্ধ্যামালতী বন-ছায়া অঞ্চলে
শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না
বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়
মোর প্রিয়া হবে, এস রানী
ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
নীলাম্বরী শাড়ি পরি
আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়
আমায় নহে গো, ভালবাস শুধু
দোলন-চাঁপা বনে দোলে
জুঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুন্‌গুন্
মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল
আমি জানি তব মন, আমি বুঝি তব
স্বপ্নে দেখি একটি নূতন ঘর
ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল
রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া ববষে
ওগো প্রিয়, তব গান
কেমনে হইব পার হে প্রিয়
সাপুড়িয়া রে! বাজাও কোথায়
নদীর স্রোতে মালার কুসুম ভাসিযে দিলাম
শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ
হে অশান্তি মোর এস এস
গান ভুলে যাই মুখ পানে চাই, সুন্দর হে
মেঘলা নিশি-ভোরে
"চোখ গেল চোখ গেল" কেন ডাকিস রে
পদ্মার ঢেউ রে —
কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও
আমি নহি বিদেশিনী
মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি
নিরজন ফুলবনে এস পিয়া
সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরী বাজে
(তুমি) শুনিতে চেয়ো না আমার মনের
গাঙে জোয়ার এল ফিরে, তুমি এলে কই
রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
নিশি-পবন! নিশি-পবন। ফুলের দেশে
কোন সে সুদূর অশোক-কাননে বন্দিনী
তব চলার পথে আমার গানের ফুল
শুকনো পাতার নূপুর বাজে দখিন বায়ে
জানি, জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না
বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ-শিখায়

নজরুল-রচনাসমগ্র

১

নৌরোজ্‌কা — তেতালা

বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে॥
শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধি পাশে
তরুণ ইরান-কবি কাঁদে নিরজনে।
উদাসীন আকাশ থির হয়ে আছে
জল-ভরা মেঘ লয়ে বুকের কাছে।
সাকির শারাবের পিয়ালার পরে
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে
চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ
মলিন আননে।

২

পুরবি — তেতালা

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত আকাশে।
দিনশেষে শুভদিন এল বুঝি মম,
মরণের রূপে এলে মোর প্রিয়তম,
গোধূলির রঙে তাই দশদিশি হাসে॥
দিন গুনে নিরাশার পথ-চাওয়া ফুরাল,
শ্রান্ত এ জীবনের জ্বালা আজ জুড়াল।
ওপার হতে সে এল তরি বাহি
হেরিলাম সুন্দরে, আর ভয় নাহি।
আঁধারের পারে তার চাঁদমুখ ভাসে॥

৩

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে॥
আমি গান গাহি আপনার দুখে
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে
আলেযার মতো ডাকিয়ো না আর
নিশীথ অন্ধকারে॥
দযা করো, দয়া করো, আর আমারে লইয়া
খেলো না নিঠুর খেলা ;
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না
সেই শুভলগনের বেলা॥
আমি ফিরি পথে, তাহে কার ক্ষতি
তব চোখে কেন সজল মিনতি
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে॥
ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে॥

৪

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।
(আমি) বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ, বেণি যাবে যবে খুলিতে॥
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার বক্ষে ঝুরিতে॥
আসিবে তোমার পরমোৎসব কত প্রিয়জন কে জানে
মনে পড়ে যাবে — কোন সে ভিখারি পায়নি ভিক্ষা এখানে।
তোমার কুঞ্জ পথে যেতে হায়
চমকি থামিয়া যাবে বেদনায়
দেখিবে, কে যেন মরে মিশে আছে তোমার পথের ধূলিতে।

৫

সবার কথা কইলে কবি, নিজের কথা কহো।
(কেন) নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ।
নিজের কথা কহো॥
কে তোমারে হানল হেলা, কবি ?
সুরে সুরে আঁক কি গো সেই বেদনার ছবি
কার বিরহ রক্ত ঝরায় বক্ষে অহরহ —
নিজের কথা কহো॥
কোন ছন্দোময়ীর ছন্দ দোলে তোমার গানে গানে
তোমার সুরের স্রোত বয়ে যায় কাহার প্রেমের টানে গো
কাহার চরণ পানে ?
কাহার গলায় ঠাঁই পেল না বলে
(তব) কথার মালা ব্যথার মতো প্রতি হিয়ায় দোলে।
(তোমার) হাসিতে যে বাঁশি বাজে, সে তো তুমি নহ
নিজের কথা কহো॥

৬

ওরে ডেকে দে দে লো, মহুয়া-বনে ফুল ফোটাত
বাজিয়ে বাঁশি কে।
বনের হরিণ নাচাত, পাখিকে গান গাওয়াতো,
ঢেউ ওঠাতো ঝরনাজলে — পাহাড়তলিতে॥
তার গানের কথা জানিয়ে দিত ফুলের মধুকে,
(তার) সুরের নেশা করত ব্যাকুল মনের বঁধুকে
গো মনের বধুঁকে
বুকের মাঝে বাজত নূপুর চপল হাসিতে
লো তার চপল হাসিতে॥
আঁধার রাতে ফোটাত সে হলুদ গাঁদার ফুল,
সে বন কাঁদাতো, মন কাঁদাতো, কাজ করাতো ভুল
লো কাজ করাত ভুল।
আর সে বাঁশি শুনি না
ধোঁয়ার ছলে কাঁদি না,
আর রাঙা শাড়ি পারি না, নোটন খোঁপা বাঁধি না,
আমি রইতে নারি না হেরে সেই বন-উদাসীকে লো
বন-উদাসীকে॥

৭

নয়নভরা জল গো তোমার আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেব, না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।
ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে গো নয়ন-পাতে,
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল॥
মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরও ভালো লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই
(তাই) ফুল ফুটিয়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল॥

৮

আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ।
শূন্য গগনে আজও নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ॥
শত জনমের অপূর্ণ সাধ লয়ে—
(আমি) গগনে কাঁদি গো ভুবনের চাঁদ হয়ে,
জোছনা হইয়া ঝরে গো আমার অশ্রু বিরহ-তাপ॥
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে মোর তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জোছনায় ঢাকিতে পারি নি তোমার মধুর মায়া
কোন সে সাগর-মন্থন শেষে মোরে
জড়াইয়া যেন উঠেছিলে প্রেমভরে,
(হায়) তুমি গেছ চলে, বুকে তবু দোলে তব অঙ্গের ছাপ।

৯

আমি আছি বলে দুখ পাও তুমি, তাই আমি যাব চলে।
এবার ঘুমাও প্রদীপের কাজ শেষ হয়ে গেছে জ্বলে॥
আর আসিবে না কোনো অশান্তি,
আর আসিবে না ভয়ের ভ্রান্তি,
আর ভাঙিব না ঘুম নিশীথে গো, 'জাগো প্রিয়া জাগো' বলে।
হয়তো আবার সুদূর শূন্য আকাশে বাজিবে বাঁশি,
গোপী-চন্দন-গন্ধ আসিবে বাতায়ন-পথে ভাসি।

চম্পার ডালে বিরহী পাপিয়া
'পিয়া পিয়া' বলে উঠিবে ডাকিয়া,
বৃন্দাবন কি ভাসিবে আবার
সেদিন রোদন-যমুনা-জলে॥

১০

আর অনুনয় করিবে না কেউ কথা কহিবার তরে।
আর দেখিবে না স্বপন রাতে গো
কেহ কাঁদে হাত ধরে।
তব মুখ ঘিরে আর মোর দু-নয়ন
ভ্রমরের মতো করিবে না জ্বালাতন
তব পথ আর পিছল হবে না আমার অশ্রু ঝরে॥
তোমার ভুবনে পড়িবে না আর কোনোদিন ছায়া মম
তোমার পূর্ণচাঁদের তিথিতে আসিব না রাহু-সম।
আর শুনিবে না করুণ কাতর
এই ক্ষুধাতুর ভিখারির স্বর,
শুনিবে না আর কাহারও রোদন
রাতের আকাশ ভরে॥

১১

মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে॥
তমালতরু চাঁপালতার মতো
জড়িয়ে কত জনম হল গত,
সেই বাঁধনের চিহ্ন আজও জাগে
জাগে হিয়ার থরে থরে॥
বাহুর ডোরে বেঁধে আজও ঘুমের ঘোরে যেন
ঝড়ের বন-লতার মতো লুকিয়ে কাঁদ কেন?
বনের কপোত, কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে
চিরতরে হল ছাড়াছাড়ি
(কোন) নিঠুর ব্যাধের শরে॥

১২

গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে
দূর গগনে প্রিয়া তিমির পারে॥
জেগে যবে দেখি হায় তুমি নাই কাছে
আঙিনায় ফুটে ফুল ঝরে পড়ে আছে
বাণ-বেঁধা পাখি সম আহত এ প্রাণ মম
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে॥
মৌনা নিঝুম ধরা, ঘুমায়েছে সবে।
এসো প্রিয়, এই বেলা বক্ষে নীরবে।
কত কথা কাঁটা হয়ে বুকে আছে বিঁধে,
কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে
দেখিবে এসো প্রিয় কত সাধ ঝরে গেল কত আশা
মরে গেল হাহাকারে॥

১৩

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কার স্মৃতি বুকে পাষাণের মতো ভার হযে যেন থাকে -
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কাহার ক্ষুধিত প্রেম যেন, হায়!
ভিক্ষা চাহিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়,
কার সকরুণ আঁখি দুটি যেন রাতের তারার মতো
মুখপানে চেয়ে থাকে —
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
নিশির বাতাস কাহার হুতাশ দীর্ঘ নিশাস সম
ঝড় তোলে এসে অন্তরে মোর; ওগো দুরন্ত মম!
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
মহাসাগরের ঢেউ-এর মতন
বুকে বাজে এসে কাহার রোদন?
পিয়া পিয়া নাম ডাকে অবিরাম বনের পাপিয়া পাখি
আমার চম্পা-শাখে —
সে কি তুমি, সে কি তুমি?

১৪

রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি তোমার অঙ্গে।
শত ফুলশর মুরছায় প্রিয়া, তোমার নয়নভঙ্গে॥
যে আঁখি পরম সুন্দরে দেখিয়াছে
সেই আঁখি কাঁদে তোমার পায়ের কাছে,
দেখেছে সে আঁখি, বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ-তরঙ্গে॥
তোমারে দেখিতে আমার আকাশ আনত হইয়া কাঁদে,
(তব) মণিহার হতে বিবাদ করে গো কোটি গ্রহ-তারা চাঁদে।
তুমি দেখিতে যদি গো আপন রূপের আলো
আমারে ভুলিয়া নিজেরে বাসিতে ভালো,
তোমারে আড়াল করিয়া গো তাই ছায়া-সম ফিরি সঙ্গে॥

১৫

এবার যখন উঠবে সন্ধ্যাতারা — সাঁঝ আকাশে
দেখতে পাবে দুটি নতুন তারা — তাহার পাশে॥
চেয়ে দেখো ভালো করে
কার দুটি চোখ যেন মরে
তারা হয়ে ধরার পানে চাহে
তোমার আঁখি দেখার আশে॥
যে দুটি চোখ নিত্য লোকের মাঝে
তোমায় দিত লাজ
পড়বে মনে গো —
সেই দুটি চোখ চিরতরে এই পৃথিবী হতে —
হারিয়ে গেছে আজ।
পায়নি গো, তাই অভিমানে
চলে গেছে দূর বিমানে
(দেখো) সেদিন যেন আজের মতো চাইতে ওদের পানে
দ্বিধা নাহি আসে॥

১৬

বলেছিলে, তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে।
হায়! তুমি আসিলে না, আশার সূর্য ডুবিল সাগর-নীরে।

চলে যাই যদি, চিরদিন মনে
তোমার সে কথা রহিবে স্মরণে
শুধু সেই কথা শোনার লাগিয়া হয়তো আসিব ফিরে॥
শুধু সেই আশে হয়তো এ তনু মরমে হবে না লীন,
পথ চেয়ে চেয়ে, তব নাম গেয়ে বাজাব বিরহ-বীণ।
হেরো গো, আমার যাবার সময় হল,
তোমার সে কথা মিথ্যা হবে না বলো,
কোন শুভক্ষণে নিমেষের তরে জড়াবে কণ্ঠ ঘিরে॥

১৭

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না।
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙায়ো না॥
(যে) সহস্র করে রূপ-রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া,
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়ো না॥
যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও।
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদেরে নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হেরো হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে তাঁরে নিত্য করো প্রণতি
(আর) কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না॥

১৮

নূরজাহান! নূরজাহান!
সিন্ধুনদীতে ভেসে, এলে মেঘলামতীর দেশে
ইরানি গুলিস্তান॥
নার্গিস লালা গোলাপ আঙুরলতা
শিরি-ফরহাদ সিরাজের উপকথা
এনেছিলে তুমি তনুর পিয়ালা ভরি
বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান॥
তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম সে যে রাজাধিরাজ,
চন্দন-সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।

যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীলাকাশে
(যাহা) লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে
দিবে চিরদিন নন্দন-লোকবাসী
(তব) সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান॥

১৯

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
সেই চির-চেনা সুরে।
যে সুরে বিরহী প্রাণ আজও ঝুরে।
যে সুরে হৃদয়ে হোরির রং লাগে
ভুলে যাওয়া যৌবন-স্মৃতি মনে জাগে,
আকাশ কাঁদে যে সকরুণ রাগে
যে সুর ঘুমায়ে আছে প্রিয়ার নূপুরে।
যে সুর শুনি আজও পল্লির প্রান্তে
মল্লিকা-কুঞ্জে শ্রান্ত দিনান্তে
বিরহ বিধুর দূর হারানো দিনের
ছায়া ফেলে যে সুর মনের মুকুরে।

২০

সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন
শুভদৃষ্টির ক্ষণ?
চেয়েছিল মোর নয়নের পানে যেদিন তব নয়ন॥
সেদিন বকুল শাখে কি গো আঙিনাতে
ডেকে উঠেছিল কুহু-কেকা এক সাথে,
অধীর নেশায় দুলে উঠেছিল মনের মহুয়া বন॥
হে প্রিয়, সেদিন আকাশ হতে কি তারা পড়েছিল ঝরে,
যেদিন প্রথম ডেকেছিলে তুমি মোর ডাকনাম ধরে?
(প্রিয়) যেদিন প্রথম ছুঁয়েছিলে ভালোবেসে
আকাশে কি বাঁকা চাঁদ উঠেছিল হেসে?
শঙ্খ সেদিন বাজায়েছিল কি পাষাণের নারায়ণ॥

২১

মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধো বাদ?
কেন নিরাশা-আঁধারে জ্বালো আশার চাঁদ॥
যে প্রেম লভিয়াছে সমাধি
কী হবে সেথায় আর কাঁদি
বাঁচিবে না নয়নের জলে সে
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ।
যে তরুর কাটিয়াছ মূল, কেন ফুল সেথা চাও
নির্জন অরণ্যে বিরহ-তাপে তারে শুকাইতে দাও।
শুভ লগ্নের ক্ষণ ভুবনে
একবার আসে শুধু জীবনে
বয়ে গেছে সেই শুভদৃষ্টির শুভক্ষণ
আর পাইব না তব আঁখির প্রসাদ॥

২২

আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া।
দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায়, মোর আঁখি রহে জাগিয়া
প্রিয়তম তব লাগিয়া॥
তারারে শুধাই, 'কত দেরি আর?
কখন আসিবে বিরহী আমার?'
ওরা বলে, 'হেরো পথ চেয়ে তার নয়ন উঠেছে রাঙিয়া'।
প্রিয়তম তব লাগিয়া॥
'আসিতেছে সে কি মোর অভিসারে', কাঁদিয়া শুধাই চাঁদে,
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ নীরবে শুধু কাঁদে।
ফাগুন-বাতাস করে হায় হায়
(বলে) 'বিরহিণী তোর নিশি যে পোহায়'।
ফুল বলে, 'আর জাগিতে নারি গো,
ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া॥'
প্রিয়তম তব লাগিয়া॥

২৩

আনো গোলাপ-পানি, আনো আতরদানি গুলবাগে
সেহেলি গো কিছু ভালো নাহি লাগে॥
বেদুইন ছেলের বাঁশি কারে ডাকে
কেঁদে কেঁদে অনুরাগে॥
মরুযাত্রীদের উটের সারি যেমন চাহে তৃষার বারি
তেমনই মম পিয়াসি পরান যেন কার
প্রেম-অমৃত বারি মাগে॥
চাঁদের পিয়ালাতে জোছনা-শিরাজি ঝরে যায়
আমারই হৃদয় কেন গো সে মধু নাহি পায়।
হায়, হায়, বাদাম গাছের আঁধার বনে
নিশ্বাস ওঠে যেন বুলবুলির শিসের সনে,
বিরহী মোর কোথায় কাঁদে কোন মদিনাতে—
ফোরাত নদীর রোদন সম বুকে ঢেউ জাগে॥

২৪

কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া-বনে।
চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে॥
শূন্য ভবনে মৃদুল সমীরে
প্রদীপের শিখা কাঁপে ধীরে ধীরে,
চরণ-চিহ্ন রাখি দলিত কুসুমে
চলিয়া গেছ তুমি দূর-বিজনে॥
বাহিরে ঝরে ফুল আমি ঝুরি ঘরে
বেণু-বনে সমীরণ হাহাকার করে,
বলে যাও কেন গেলে এমন করে
কিছু নাহি বলে সহসা গোপনে॥

২৫

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহুর ডোর আছে, মালায় কী সাধ?

ফুল আনিয়ো না ভবনে
কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে,
হৃদয়ের লাগি মোর হৃদয় কাঁদে
চন্দন লাগে বিস্বাদ ॥
খোলো গুণ্ঠন, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখো হাত, তোলো আনত নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস
বক্ষে লাগুক মোর তব ঘন শ্বাস
চম্পার ডালে বসে মোদেরে দেখে
কুহু আর পাপিয়ায় করুক বিবাদ ॥

২৬

রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি
নাচিছে আরবি নটিনি বাঁদি ॥
বেদুইনি সুরে বাঁশি বাজে
রহিয়া রহিয়া তাঁবু-মাঝে সুদূরে
সে সুরে চাহে বোরখা তুলিয়া শাহাজাদি ॥
যৌবন-সুন্দর নোটন কবুতর
নাচিছে মরু-নটী
গাল যেন গোলাপ, কেশ যেন খেজুর-কাঁদি ॥
চায় হেসে হেসে চায় মদির চাওয়ায়,
দেহের দোলায় রং ঝরে যায়, ঝরঝর
ছন্দে দুলে ওঠে মরু মাঝে আঁধি ॥

২৭

নিশিরাতে রিম ঝিম ঝিম বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর ॥
দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধো-ঘুমঘোরে চিনিতে নারি ওরে
'কে এল কে এল' বলে ডাকিছে ময়ূর ॥
দ্বার খুলি পড়শি কৃষ্ণা মেয়ে মেঘের পানে আছে চেয়ে

কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘলা আকাশ না ওই মেঘলা মেয়ে।
ধায় নদীজল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে
নিশীথ-আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

২৮

ভোরে ঝিলের জলে শালুক পদ্ম তোলে কে
কে ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান 'বিসরি'
একী নতুন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি॥
ঝিলের নিথর জলে আবেশে ঢলঢল
গলে পড়ে শত সে তরঙ্গো
শারদ আকাশে দলে দলে আসে
মেঘ-বলাকার খেলিতে সঙ্গো॥
আলোক-মঞ্জরী প্রভাতবেলা
বিকশি জলে কি গো করিছে খেলা
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি॥

২৯

সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন ঘরে, তব গৃহে জ্বলে বাতি
ফুরায় তোমার উৎসব নিশি সুখে, পোহায় না মোর রাতি,
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি॥
আমার আশার ঝরাফুল দিয়া
তোমার বাসর-শয্যা রচিছ প্রিয়া
তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে,—
আঁধার আমার সাথি।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি॥
ঘুমায়ে পড়েছে আমার কাননে কুহু, নীরব হয়েছে গান,
তোমার কুঞ্জে গানের পাখিরা বুঝি তুলিয়াছে কলতান।

পৃথিবীর আলো মোর চোখে নিভে আসে
বাজিছে বাঁশরি তোমার মিলন-রাসে
ওপারের বাঁশি আমারে ডাকিবে কবে
আছি তাই কান পাতি।
প্রিয়া পোহায় না মোর রাতি।

৩০

মঞ্জুভাষিণী

আজও ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
কহে কোন কথা হৃদয় স্বপ্নে আনমনে
মৃদু মর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন গীতি নিশীথে পানসে জ্যোৎস্নাতে
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে॥
গ্রহে চন্দ্রে কয়, সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টি পার গিয়াছে অমৃতের কূলে
কাঁদে কোন লোকে পরম সুন্দরের সনে॥

৩১

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে।
ভাঙবে সভা, বসব একা রেবা-নদীর তীরে—
তখন এসো ফিরে॥
গীত শেষে গগন-তলে
শ্রান্ত তনু পড়বে ঢলে
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারেঙ্গিরে
তখন এসো ফিরে॥
মোর কণ্ঠের জয়ের মালা তোমার গলায় নিয়ো
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিয়ো, প্রিয় হে মোর প্রিয়।
ঘুমাই যদি কাছে ডেকো
হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজব তোমায় আকুল অশ্রুনীরে—
তখন এসো ফিরে॥

৩২

ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলিয়া বনপথে পড়ে ঝরি
রাঙা অশোকের মঞ্জরী
হাসে বনদেবী বেণিতে জড়াযে মালতীর বল্লরি, নব কিশলয় পরি।
কুমুদি কালিকা ঈষৎ হেলিয়া, চাঁদেরে নেহারি হাসে মুচকিয়া
মহুয়ার বনে ভ্রমর ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি॥
যাহা কিছু হেরি ভালো লাগে আজ লুকাইতে নারি হাসি,
কাজ করি আর শুনি যেন কানে মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।
এক শাড়ি খুলে পরি আর শাড়ি
বারে বারে মুখ মুকুরে নেহারি
দুরু দুরু হিয়া ওঠে চমকিয়া, অকারণে লাজে মরি॥

৩৩

ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো, সই লো দেখে আয়।
বঁইচি বনের বিরহে বাউরি বাতাস বহে এলোমেলো গো,
(সে) আড়বাঁশি বাজায় আড় চোখে তাকায়
—তির হানার ভঙ্গিতে ধনুক বাঁকায়
নন্দন পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ আঁউরে গেল গো।
ঝাঁকড়া চুলের পাশে টুলটুলে চোখ হাসে কতই ছলে,
মউরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায় গো কালো জলে।
মউটুসির মউ ফেলে ভোমরা রয় তাকিয়ে
গুরুজনের মতো বটের তরু দাঁড়িয়ে জট পাকিয়ে
আমলকী গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি
সে দেখতে কি তা পেল গো॥

৩৪

মনে পড়ে আজও সেই নারিকেল কুঞ্জ গুবাক তরুর ঘন-কেয়ারি
বালুচর, বেত বন, দেখা হত দুইজন, মন হত উনমন দোঁহারি॥
গাছ থেকে টুপটাপ ঝরিত কালো জাম
জাম খেয়ে চুপচাপ মেঘ পানে চাহিতাম,
গাব নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভাব হত, হত আড়ি দুজনে,
আমি ছিনু ধনিকের ছেলে গো
ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারি॥

ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি ডুমা-পরা উমা-সম খেলিতে
আমার দালান ঘরে — দোতালায় কেন গো উতলা মনে ছায়া ফেলিতে
সহসা হেরিনু তব বধূরূপ, ভাঙা চালা হাতে তব চালুনি
পার্শ্বে দামাল ছেলে কাঁদিছে হেরিয়া পান্তাভাত আলুনি
ঘোমটা টানিয়া দিলে আমারে হেরিয়া
উদাস চোখে এল কালো মেঘ ঘেরিয়া,
তারে চিনিতে কি পেরেছিলে প্রণাম যে করেছিল
কল্যাণী রূপ তব নেহারি ॥

৩৫

আমি পুরব দেশের পুরনারী
গাগরি ভরিয়া এনেছি গো অমৃত-বারি।
পদ্মাকূলের আমি পদ্মিনী বঁধু গো,
এনেছি শাপলা পদ্মের মধু গো
ঘন বনছায়ার শ্যামলী মায়ায়
শান্তি আনিয়াছি ভরি হেমঝারি ॥
আমি শঙ্খনগর হতে আনিয়াছি শাঁখা, অভয়শঙ্খ
ঝিল ছেনে এনেছি সুনীল কাজল গো
বিল ছেনে এনেছি চন্দনপঙ্ক।
এনেছি শত ব্রত পার্বণ উৎসব
এনেছি সারস হংসের কলরব
এনেছি, নব আশা উষার সিন্দূর
মেঘ-ডম্বরু সাথে মেঘডুমুর শাড়ি।

৩৬

তেমনই চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি,
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুলবুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম ॥
ঘুমায়ে পড়েছে সবে মোর ঘুম নাহি আসে
তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিনও আমার পাশে
সাজানো সে গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম ॥

আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা
রোহিণী গিয়াছে চলি চাঁদ কাঁদে একা একা
কোন দূর তারালোকে কেমনে বযেছ ভুলি।
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিযতম॥

৩৭

নন্দন বন হতে কে গো ডাক মোরে আধো-নিশীথে,
ক্ষণে ক্ষণে ঘুমহারা পাখি কেঁদে ওঠে করুণ গীতে॥
ভেঙে যায় ঘুম চেয়ে থাকি,
চাহে চাঁদ ছলছল আঁখি,
ঝরা চম্পার ফুল যেন কে
ফেলে চলে যায় চকিতে॥
সহিতে না তিলেক বিরহ ছিলে যবে জীবনের সাথি
বলে যাও আজ কোন অমরায় কেমনে কাটাও দিবারাতি।
জীবনে ভুলিলে তুমি যারে
(তারে) ভুলে যাও মরণের ওপারে
আঁধার ভুবনে মোরে একাকী
দাও ওগো দাও ঝুরিতে॥

৩৮

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে॥
ভুলিয়ো স্মৃতি মম, নিশীথ-স্বপন-সম
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিয়ো পথ পরে॥
ঝুরিবে পুবালি বায় গহন দূর বনে
রহিবে চাহি তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদীপারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলি দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু-হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে।

৩৯

কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা
আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিকা
প্রভাত-সিনানে আসি আলসে
কঙ্কণ-তাল হানো কলসে,
খেলে সমীরণ লয়ে কবরীর মালিকা।
দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢলঢল করুণা মাগে।
ঝিলম রেবা নদী তীরে
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা।

৪০

বসন্ত মুখর আজি
দক্ষিণ সমীরণে মর্মর গুঞ্জনে
বনে বনে বিহ্বল বাণী ওঠে বাজি।
অকারণ ভাষা তার ঝরঝর ঝরে
মুহু মুহু কুহু কুহু পিয়া পিয়া স্বরে।
পলাশ বকুলে অশোক শিমূলে
সাজানো তাহার কল-কথার সাজি।
দোয়েল মধুপ বন-কপোত কূজনে
ঘুম ভেঙে দেয় ভোরে বাসর-শয়নে।
মৌনী আকাশ সেই বাণী-বিলাসে
অস্ত চাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসে
বিরহ-শীর্ণা গিরি-ঝরনার তীরে
পাহাড়ি বেণু হাতে ফেরে সুর ভাঁজি॥

৪১

তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না তো কিছু চাঁদ॥
চেয়ে চেয়ে দেখি ফোটে যবে ফুল
ফুল বলে না তো সে আমার ভুল
মেঘ হেরি ঝুরে চাতকিনি, মেঘ করে না তো প্রতিবাদ॥

জানে সূর্যেরে পাবে না, তবুও অবুঝ সূর্যমুখী
চেয়ে চেয়ে দেখে তার দেবতাকে, দেখিযাই সে যে সুখী॥
হেরিতে তোমার রূপ মনোহর
পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর
নয়নের সেই সাধ॥

৪২

তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী,
শিশির-সজল ভোরের আকাশে ভাসে
তোমারই উদাস ছবি॥
বিষাদ গভীর কার কল্পনা
রূপ ধরে তুমি ফের আনমনা।
তোমারই মুরতি ধেয়ায় স্বপনে
বিরহী সুরের কবি
তুমি ধরা দিতে যেন আস নাই ধরণিতে
একা-একা খেলা খেল সারাবেলা
সাথিহীন তরণিতে।
আঘাত হানিয়া সে কোন নিঠুর
জাগাবে তোমাতে আশাবরি সুর
পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী॥

৪৩

কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে
মোর বুকে মুখ রাখি ঝড়ের পাখি-সম কাঁদে ও কে।
গভীর নিশীথে কণ্ঠ জড়ায়ে
শ্রান্ত কেশভার গগনে ছড়ায়ে
হারানো প্রিয়া মোর এল কি লুকায়ে
আমার একা-ঘরে ম্লান আলোকে॥
গঙ্গায় তারই চিতা নিভেছে কবে,
মোর বুকে সেই চিতা আজও জ্বলে নীরবে।
স্মৃতির চিতা তার
নিভিবে না বুঝি আর
কোন সে জনমে কোন সে লোকে॥

৪৪

বন্ধু আজও মনে যে পড়ে আম-কুড়ানো খেলা।
আম কুড়াইবারে যাইতাম দুইজন নিশি ভোরের বেলা।
জোষ্ঠিমাসের গুমোট রে বন্ধু আসত নাকো নিঁদ,
রাত্রে আসত নাকো নিঁদ,
আম-তলার এক চোর আইস্যা কাটিত প্রাণের সিঁদ ;
(আর) নিদ্রা গেলে ফেলত সে চোর আঙিনাতে ঢেলা।
আমরা দুজন আম কুড়াইতাম, ডাকত কোকিল গাছে,
ভোলো যদি — বিহান বেলার সুর্যি সাক্ষী আছে।
(তুমি) পায়ের কাছে আম ফেইল্যা গায়ে দিতে ঠেলা।
আমার বুকের আঁচল থাইক্যা কাইড়া নিতে আম
বন্ধু, আজও পায় নাই দাসী সেই না আমের দাম।
(আজ) দাম চাইবার গিয়া দেখি তুমি দিছ মেলা॥
নিশি জাইগ্যা বইস্যা আছি, জোষ্ঠি মাসের ঝড়ে
সেই না গাছের তলায় বন্ধু, এখনও আম পড়ে ;
(আজ) তুমি কোথায় আমি কোথায়, দুইজনে একেলা॥

৪৫

ধর্মের পথে শহিদ যাঁহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি
আমরা সেই সে জাতি॥
পাপবিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তিধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি।
আমরা সেই সে জাতি॥
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারই নাম।
আমির-ফকিরে ভেদ নাই সবে ভাই সব এক সাথি
আমরা সেই সে জাতি॥
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি নরসম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার
আঁধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আবার ভাতি
আমরা সেই সে জাতি॥

৪৬

তুমি আমার সকাল বেলার সুর
হৃদয় অলস-উদাস-করা অশ্রু-ভারাতুর ॥
ভোরের তারার মতো তোমার সজল চাওয়ায়
ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ায়
রাত্রি-শেষের চাঁদ তুমি গো
বিদায়-বিধুর ॥
তুমি আমার ভোরের ঝরাফুল
শিশির-নাওয়া শুভ্র শুচি
পূজারিনির তুল।
অরুণ তুমি, তরুণ তুমি, করুণ তারও চেয়ে,
হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ-লোকের মেয়ে,
তুমি ইন্দ্র-সভায় মৌনবীণা, নীরব নূপুর ॥

৪৭

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো সকল ফুলের মুখে,
ফুল ঝরে যায় তব স্মৃতি জাগে কাঁটার মতন বুকে।
তব প্রিয়নাম ধরে ডাকি
ফুল সাড়া দেয় মেলি আঁখি
তোমার নয়ন ফুটিল না হায় ফুলের মতন সুখে।
আকাশে বাতাসে তব নাম লয়ে* ওঠে রোদনের বাণী
কানাকানি করে চাঁদ ও তারায় জানি গো তোমারে জানি।
খুঁজি বিজলি প্রদীপ জ্বেলে
কাঁদি ঝঞ্ঝার পাখা মেলে
অন্ধ গগনে আঁধার মেঘের ঢেউ ওঠে মোর দুখে।

৪৮

মোর গানের কথা যেন আলোকলতা
যেন স্বর্ণলতা।
মূল নাই ফুল নাই আছে শুধু
বর্ণের বিহ্বলতা ॥

* পাঠভেদে : তোমার বিরহে আমার ভুবনে

আকাশ-বনস্পতি জড়ায়ে
ধরণির বুকে পড়ে গড়ায়ে
কখন কি আবেশে কার কথা ভাবে সে
কে জানে কেন অযথা॥
রহে কারও বক্ষে, রহে কারও চক্ষে বিরহের অশ্রুজলে
কণ্ঠলগ্না কারও রহে সে গীত-কলি মুঞ্জরে অধরতলে।
রাখি হয়ে কারও হাত বাঁধে সে
কাহারও চরণতলে কাঁদে সে
সুরে সুরে গুঞ্জিত ও যেন পুঞ্জিত
অকারণ মৌন ব্যথা॥

৪৯

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা, কেউ অচেনা নাই।
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু প্রিয় ভাই
কেউ অচেনা নাই॥
কোন সে লোকে, নাই তা মনে
চেনা ছিল সবার সনে
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই।
কেউ অচেনা নাই॥
চোখ যারে কয় 'চিনতে নারি' প্রাণ কেন রে কাঁদে
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চায় এই বুক (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।
সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হলে এত আনন্দ পাই
কেউ অচেনা নাই॥

৫০

কত দূরে তুমি, ওগো আঁধারের সাথি।
হাত ধরো মোর নিভিয়া গিয়াছে বাতি॥
চলিতে চলিতে তোমার তীর্থপথে
হারায়ে গিয়াছি অন্ধকারের স্রোতে
এসে তুলে লও তোমার সোনার রথে
(লহো) প্রভাতের তীরে, শেষ হয় যেথা রাতি॥

যে ধ্রুবতারার পথ দেখাইয়া নীরবে চলেছ তুমি
সে পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়াতৃষ্ণার মরুভূমি।
সাড়া নাহি পাই আজ আর ডেকে ডেকে
কাঁদিছ কি তুমি মোরে সাথে নাহি দেখে?
হয়তো ফিরিবে অমৃতের তীর থেকে
সেই আশে আছি পথ পানে আঁখি পাতি॥

৫১

অনেক ছিল বলার, যদি
সেদিন ভালোবাসতে।
পথ ছিল গো চলার, যদি
দু-দিন আগে আসতে॥
আজকে মহাসাগর-স্রোতে
চলেছি দূর পারের পথে
ঝরা পাতা হারায় যথা
সেই আঁধারে ভাসতে॥
গহন রাতি ডাকে আমায়
এলে তুমি আজকে
কাঁদিয়ে গেলে হায় গো আমার
বিদায় বেলার সাঁঝকে।
আসতে যদি হে অতিথি
ছিল যখন শুক্লা তিথি
ফুটত চাঁপা, সেদিন যদি
চৈতালি চাঁদ হাসতে॥

৫২

বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে
জোয়ার ভাটা খেলে।
আমি একলা ঘাটে কুলবধূ, কেন তুমি এলে
বন্ধু, কেন তুমি এলে॥
আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাজাও যখন বাঁশি;
খিড়কি-দুয়ার দিয়ে বন্ধু জল ভরিতে আসি,
ভেসে নয়ন-জলে ঘরে ফিরি, ঘাটে কলস ফেলে॥

আমার পাড়ায়, বন্ধু, তোমার নাম যদি লয় কেউ
বুকে আমার দুলে ওঠে পদ্মা নদীর ঢেউ।
ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দু-কূল-ভাঙা এমন জোয়ার ;
কত ছল করে জল লুকাই চোখের,
কাঁচা কাঠে আগুন জ্বেলে।

৫৩

বন-বিহঙ্গা! যাও রে উড়ে
মেঘনা নদীর পারে।
দেখা হলে আমার কথা
কইয়ো গিয়া তারে॥
কোকিল ডাকে বকুল-ডালে
যে মালঞ্চে সাঁঝ-সকালে
আমার বন্ধু কাঁদে সেথায়
গাঙেরই কিনারে॥
গিয়া তারে দিয়া আইস আমার শাপলা-মালা
আমার তরে লইয়া আইস তাহার বুকের জ্বালা।
সে যেন রে বিয়া করে
সোনার কন্যা আনে ঘরে
আমার পাটের জোড় পাঠাইয়া দিব সে কন্যারে॥

৫৪

এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা
(রে ভাই) এই তো বিধির খেলা।
সকাল বেলার আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যাবেলা॥
সেই নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়,
যখন ধরল ভাঙন পেলিনে তুই
পারে যাবার ভেলা॥
এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ — তার খোঁজ নিল না কেহ।

রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে
সবই মাটির ঢেলা।
এই তো বিধির খেলা রে ভাই
ভব-নদীর খেলা॥

৫৫

উজান বাওয়ার গান গো এবার, গাসনে ভাটিয়ালি,
আর গাসনে ভাটিয়ালি।
নতুন আশার চাঁদ উঠেছে কুমড়ো জালির ফালি
যেন কুমড়ো জালির ফালি॥
বান এসেছে, বাঁধ ভেঙেছে, নায়ে দোলা লাগে ;
আড় বাঁশিতে তান ছেড়ে তুই দাঁড় বেয়ে চল আগে ;
দেখ জোয়ার-জলে ডুবে গেছে চরের চোরাবালি॥
কালো বউ-এর চোখ যেন, দেখ
মউরলা মাছ ভাসে,
গাঙচিল আর জল-পায়রা উড়ছে
মুখের পাশে,
শোন 'বউ কথা কও' পাখি মোদের করছে দূতিয়ালি।
জল নিয়ে বউ দাঁড়িয়ে আছে, গাছে কচি ডাব,
লোকসানেরই হিসাব দেখিস, লাভের কথা ভাব!
সাজ রে তামাক, নামুক দেয়া, দুঃখু তো ইজমালি।

৫৬

যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিয়ো রাখি॥
রাতের বিরহ যবে প্রভাতে নিবিড় হবে
অকরুণ কলরবে গাহিবে পাখি।
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিয়ো রাখি॥
যেন অরুণ দেখিতে গিয়া তরুণ কিশোর
তোমারে প্রথম হেরি ঘুম ভাঙে মোর,

কবরীর মঞ্জরী আঙিনায় রবে ঝরি
সেই ফুল পায়ে দলি এসো একাকী,
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিয়ো রাখি ॥

৫৭

মোর স্বপনে যেন বাজিয়েছিলে করুণ রাগিণী।
হে রূপকুমার! ঘুমিয়েছিলাম
সেদিন জাগিনি ॥
যেন আধোঘুমের ঘোরে
দেখেছিলাম চুরি করে—
চাইতে গিয়ে চোখের জলে
চাইতে পারিনি ॥
তন্দ্রা আমার টুটল তবু শরম ভরে
(হে) চির-চাওয়া! পারিনিকো ডাকতে আদরে।
চেয়ে চেয়ে আমার পানে
চলে গেলে অভিমানে,
(তোমার) পথের ধূলি হইনি কেন
হতভাগিনি ॥

৫৮

আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে
লুকাইয়া রই ঘন পল্লব-তলে ॥
বিহগের গীতি ভ্রমরের গুঞ্জন
নীরব হয় যখন
আমি চাঁদেরে তখন পূজা করি আঁখিজলে ॥
আমি লুকাইয়া কাঁদি বনের শকুন্তলা,
মনের কথা এ জীবনে হল না বলা
গভীর নিশীথে বন-ঝিল্লির সুরে
ডাকি দূর বন্ধুরে
আমি ঝরে পড়ি যবে প্রভাতে সবার
হৃদয়-মুকুল খোলে ॥

৫৯

শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এল না
বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না॥
ধানি-রং ঘাঘরি, মেঘ-রং ওড়না
পরিতে আমারে মা গো অনুরোধ কোরো না
কাজরির কাজলা মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া
সে কি ফেরার পথ পেল না মা, পেল না॥
আমার বিদেশিরে চিনিতে অনুক্ষণ
বুনো হাঁসের পাখার মতো উড়ু উড়ু করে মন।
অথৈ জলে মা গো মাঠ ঘাট থই থই,
আমার হিয়ার আগুন নিভিল কই,
কদম-কেশর বলে, 'কোথা তোর কিশোর',
চম্পা ডালে দোলে শূন্য দোলনা।

৬০

বেদিয়া বেদিনি ছুটে আয় আয় আয় আয়।
ধাতিনা ধাতিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশিতে পরান মাতায়॥
দলে দলে নেচে নেচে আয় চলে
আকাশের শামিয়ানা তলে
বর্শা তির ধনুক ফেলে আয় আয় রে
হাড়ের নূপুর পরে পায়।
বাঘ-ছাল পরে আয় হৃদয়-বনের শিকারি
ঘাঘরা পরে, পরে পলার মালা
আয় বেদের নারী।
মহুয়ার মউ নিয়ে ধুতুরা ফুলের পিয়ালায়
আয় আয় আয়॥

৬১

মোর প্রিয়া হবে, এসো রানি,
দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির
চৈতি চাঁদের দুল॥

কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস-সারির দুলানো মালিকা
বিজলি-জরিন ফিতায় বাঁধিব
মেঘ-রং এলোচুল ॥
জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে
মাখাব তোমার গায়,
রামধনু হতে লাল রং ছানি
আলতা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার
কবিতার বুলবুল ॥

৬২

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি ?
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি।
যে বীণা তোমার পায়ের কাছে
বুকভরা সুর লয়ে জাগিয়া আছে,
তোমার পরশে ছড়াক হরষে
আকাশে-বাতাসে তার সুরের সুরভি।
তোমার যে প্রিয়া
গেল বিদায় নিয়া
অভিমানে রাতে
গোলাপ হয়ে কাঁদে তাহারই কামনা
উদাস প্রাতে।
ফিরে যে আসিবে না ভোলো তাহারে,
চাহো তাহার পানে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে,
অস্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে অরুণ অনুরাগে
উদিল রবি ॥

৬৩

নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায় কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়॥
কলসে কঙ্কণে রিনিঠিনি ঝনকে
চমকায় উন্মন চম্পা বনকে
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ-মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরী উলসিয়া উঠে।
মেঘ বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি ;
তাহার অঙ্গ-তরঙ্গ বিভঙ্গে
কূলে কূলে নদীজল উথলায়॥

৬৪

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে, বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিয়ো॥
সুরের ডুরিতে জপমালা সম
তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম
দুয়ারে ভিখারি গাহিলে সে গান তুমি ফিরে না চাহিয়ো।
অভিশাপ দিয়ো, বকুল-কুঞ্জে যদি কুহু গেয়ে ওঠে,
চরণে দলিয়ো সেই জুঁই গাছে আর যদি ফুল ফোটে।
মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়
যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,
(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছে ধুলায়
আর তুলে নাহি নিয়ো।
(তারে) তুলে নাহি নিয়ো॥

৬৫

আমায় নহে গো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান।
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান।
চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে
গীত শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে ;
তুমি বুঝিবে না, আলো দিতে পোড়ে কত প্রদীপের প্রাণ।
যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল, হায়, ফুল হয়ে ওঠে ফুটে,
ফুল নিয়ে তায় — দিয়েছ কি কিছু শূন্য পত্রপুটে !
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে
বেদনার মহাসাগরের কাছে করো তার সন্ধান ॥

৬৬

(দোলন-চম্পা)

দোলন-চাঁপা বনে দোলে, দোল-পূর্ণিমা রাতে
চাঁদের সাথে।
(শ্যাম) পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে ॥
(যেন) দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি,
আরতির মৃদুজ্যোতি প্রদীপ-কলি —
দোলে যেন দেউল আঙিনাতে ॥
বন-দেবীর ও কি রুপালি ঝুমকা চৈতি সমীরণে দোলে।
রাতের সলাজ আঁখি-তারা যেন তিমির আঁচলে।
ও যেন মুঠি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রা-যামিনীর মোহন হাতে ॥

৬৭

জুঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুনগুন !
প্রেম-ঝরনার মধু-মঞ্জীর বাজে বক্ষে রুনুঝুন।

মন-গোলাপের পাঁপড়ি কাঁপে কেন গো
স্বপন দেখে পালিয়ে যাওয়া বুলবুলি যেন গো
চুড়ি কঙ্কণে কোন আনমনা সাকি পেয়ালা বাজায়
রিনিঠিনি ঠুনঠুন ॥
ছলছল চোখে চাঁদ আশমানে জলসায়
সঙ্গিনী তারাদের ভুলে ধরার কুমুদীর পানে কেন চায়,
হৃদয়ের এই নির্দয় খেলা দেখে
হাসনুহানা হেসে খুন ॥

৬৮

মোমতাজ! মোমতাজ! তোমার তাজমহল
(যেন) বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম, ফিরদৌসের একমুঠো প্রেম
আজও করে ঝলমল ॥
কত সম্রাট হল ধূলি স্মৃতির গোরস্থানে
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাজাহানে।
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর
গুঞ্জরে অবিরল ॥
কেমনে জানিল শাজাহান, প্রেম পৃথিবীতে মরে যায়!
(তাই) পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়!
(যেন) তাজের পাষাণ অঞ্জলি লয়ে নিঠুর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী-আত্মা আজও অভিযোগ হানে,
(বুঝি) সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায়
শীর্ণা যমুনা-জল ॥

৬৯

আমি জানি তব মন আমি বুঝি তব ভাষা।
তব কঠিন হিয়ার তলে জাগে
কী গভীর ভালোবাসা ॥
ওগো উদাসীন! আমি জানি তব ব্যথা,
আহত পাখির বুকে বাণ বিঁধে কোথা,
কোন অভিমানে ভুলিয়াছ তুমি
ভালোবাসিবার আশা ॥
তুমি কেন হানো অবহেলা অকারণে আপনাকে,
প্রিয়া, যে হৃদয়ে — বিষ থাকে — সেই হৃদয়েই অমৃত থাকে।

তব যে-বুকে জাগে প্রলয়-ঝড়ের জ্বালা
আমি দেখেছি যে সেথা সজল মেঘের মালা
ওগো ক্ষুধাতুর আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব পরানের পিপাসা।

৭০

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর!
তুমি আমি দু-জন প্রিয়, তুমি আমি দু-জন।
বাহিরে বকুল-বনে কুহু পাপিয়ায়
করে কূজন।
আবেশে ঢুলি ফুল-শয্যায় শুই,
মুখ টিপে হাসে মল্লিকা জুঁই,
কানে কানে গানে গানে কহে, 'চিনেছি উতল সমীরণ।।'
পূর্ণিমা চাঁদ কয়, গান আর সুর চঞ্চল, ওরা দুজন!
প্রেম জ্যোতি আনন্দ অবিরল ছলছল ওরা দুজন!
মৌমাছি কয় গুনগুন গান গাই
মুখোমুখি দুজনে সেইখানে যাই,
শারদীয়া শেফালি গায়ে পড়ে কয় —
'ব্রজের মধুবন এই তো ব্রজের মধুবন।'

৭১

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল
দুলায়ে মেঘলা চাঁচর চুল
চপল চোখে কাজল মেখে আসিল কে।।
বাজায়ে কে মেঘের মাদল
ভাঙালে ঘুম ছিটিয়ে জল,
একা-ঘরে বিজলিতে এমন হাসি হাসিল কে।।
এলে কি দুরন্ত মোর ঝোড়ো হাওয়া,
চির-নিঠুর প্রিয়-মধুর পথ চাওয়া।
হৃদয়ে মোর দোলা লাগে,
ঝুলনেরই আবেশ জাগে,
ফেলে-যাওয়া বাসি মালায় —
আবার ভালোবাসিলে কে।।

৭২

রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে
বাজে বাঁশের বাঁশি।
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো, মন লাগে না কাজে লো,
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হল উদাসী লো।
মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে,
দোল লাগে শাল-পিয়াল বনে নোটন খোঁপার ফুলে।
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো॥
চোখে ভালো লাগে যাকে—
তারে দেখব পথের বাঁকে,
তার চাঁচর কেশে পরিয়ে দেব ঝুমকো জবার ফুল,
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল।
তারে নাচের তালে ইশারাতে বলব ভালোবাসি লো॥

৭৩

রিম ঝিম রিম ঝিম ঝিম ঘন দেয়া বরষে
কাজরি নাচিয়া চল পুরনারী হরষে॥
কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে
—কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে।
মনের বনের মুকুল খোলে, নটশ্যাম সুন্দর—
মেঘ পরশে॥
হৃদয়-যমুনা আজ কূল জানে না গো
মনের রাধা আজ বাধা মানে না গো
ডাকিছে ঘর-ছাড়া ঝড়ের বাঁশি,
অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি,
গঞ্জরাক গুরুজন ভবনবাসী
আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যাম দরশে॥

৭৪

ওগো প্রিয়, তব গান!
আকাশ গাঙের জোয়ারে উজান বহিয়া যায়।
মোর কথাগুলি বুকের দুয়ারে
—পথ খুঁজে নাহি পায়।

ওগো দখিনা পবন, ফুলের সুরভি বহো
ওরই সাথে মোর না-বলা বাণী লহো,
ওগো মেঘ, তুমি মোর হয়ে গিয়ে কহো,
বন্দিনী গিরি ঝরনা পাষাণ-তলে
যে কথা কহিতে চায়॥
ওরে ও সুরমা, পদ্মা, কর্ণফুলি, তোদের ভাটির স্রোতে
নিয়ে যা আমার না-বলা বাণীগুলি ধুয়ে মোর বুক হতে।
(ওরে) 'চোখ গেল' 'বউ কথা কও' পাখি,
তোদের কণ্ঠে মোর সুর যাই রাখি কি?
(ওরে) মাঠের-মুরলী কহিয়ো তাহারে ডাকি,
আমার এ কলির না-ফোটা বুলি,
ঝরে গেল নিরাশায়॥

৭৫

কেমনে হইব পার
হে প্রিয়, তোমার আমার মাঝে এ বিরহের পারাবার॥
নিশীথের চখাচখির মতন
দুই কূলে থাকি কাঁদি দুইজন
আসিল না দিন মোদের জীবনে
অন্তহীন আঁধার।
কেমনে হইব পার॥
সেধেছিনু বুঝি বাদ
কাহার মিলনে সে কোন জনমে, তাই মিটিল না সাধ।
স্মৃতি তব ঝরা পালকের প্রায়
লুটায় মনের বালুচরে হায়
সে কোন প্রভাতে কোন নবলোকে
মিলিব মোরা আবার।

৭৬

সাপুড়িয়া রে! বাজাও বাজাও
সাপ খেলানোর বাঁশি!
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ
কালনাগিনি নাচে বাহিরে আসি॥

ফণি-মনসার কাঁটা কুঞ্জতলে,
গোখরো কেউটে এল দলে দলে রে,
সুর শুনে ছুটে এল পাতাল-তলের
বিষধর, বিষধরী রাশি রাশি।
শন শন শন শন পুব হাওয়াতে
তোমার বাঁশি বাজে বাদলা রাতে,
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশির সাথে।
অঙ্গ জরজর বিষে,
বাঁচাও বিষহরি এসে,
একী বাঁশি বাজালে কালা
সর্বনাশী॥

৭৭

নদীর স্রোতে মালার কুসুম
ভাসিয়ে দিলাম প্রিয়
আমায় তুমি নিলে না,
মোর ফুলের পূজা নিয়ো।
পথ-চাওয়া মোর দিনগুলিরে
রেখে গেলাম নদীর তীরে,
আবার যদি আস ফিরে—
তুলে গলায় দিয়ো॥
নিভে এল পরান-প্রদীপ
পাষাণ-বেদির তলে
জ্বালিয়ে তারে রাখব কত
শুধু চোখের জলে।
তারা হয়ে দূর আকাশে
রইব জেগে তোমার আশে,
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে
আমারে স্মরিয়ো॥

৭৮

শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ, তুমি এ প্রাণে শান্তি দাও!
দুখ দিয়ে কাঁদালে যদি তুমি হে নাথ সে দুখ ভোলাও!

যে হাত দিয়ে হানলে আঘাত
(তুমি) অশ্রু মোছাও সেই হাতে নাথ,
বুকের মানিক হরলে যার—
তারে তোমার শীতল বক্ষে নাও
তোমার যে চরণ প্রলয় ঘটায়
সেই চরণ কমল ফোটায়।
শূন্য করলে তুমি যে বুক
সেথা তুমি এসে বুক জুড়াও॥

৭৯

হে অশান্তি মোর এসো এসো!
(তব) প্রবল প্রেমের লাগি ভবন হতে, বৈরাগিনী বেশে
এসেছি বাহির পথে।
কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন,
দস্যু-সম মোরে করো লুণ্ঠন,
তৃণ-সম মোরে ভাসাইয়া লয়ে যাও
কূল-ভাঙা বিপুল বন্যা-স্রোতে॥
নদী যেমন করে টানে পারবার,
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার!
প্রলয়-মেঘের বুকে বিজলি-সম
তোমারে জড়ায়ে রব হে প্রিয়তম!
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায়
মরণ-হানা অশনির-আলোতে॥

৮০

গান ভুলে যাই মুখ পানে চাই, সুন্দর হে
(সুন্দর মোর!)
তব নয়ন পানে চাহি কণ্ঠের সুর কাঁপে থরথর হে
(সুন্দর মোর!)
তোমার অনুরাগে, ওগো বুলবুল!
মোর গানের লতায় ফোটে কথার ফুল,
অশ্রু হয়ে সেই ফুল তব পায়ে ঝরিতে চায় ঝরঝর হে
(সুন্দর মোর!)

এ নহে গান প্রিয়, কান্না এ যে তব বিরহে,
অন্তর-শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।
প্রিয়, এ নহে গানের ছন্দ,
এ যে আনন্দে বিষাদে মনের দ্বন্দ্ব,
(এ যে) রাগিণীর তলে তব অনুরাগিণীর
— মর্মের ক্রন্দন বিলাপ-মর্মর হে
(সুন্দর মোর !)

৮১

মেঘলা নিশি-ভোরে
মন যে কেমন করে,
তারই তরে গো, মেঘবরন যার কেশ।
বুঝি তাহারই লাগি
হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ॥
মৌরি ফুলের খেতে, মৌমাছি ওঠে মেতে,
এলিয়েছিল কেশ কি গো তার এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে রাত হয়েছে শেষ (গো)॥
শিরীষ পাতায় ঝিরিঝিরি, বাজে নূপুর তারই,
সোনার ডালে দোলে তাহার কামরাঙা-রং শাড়ি।
হয়েছে মন ভিখারি—
মন শিকারি আমি
উঠি পাহাড় চূড়ায়—
ঝরনা-জলে নামি,
কালো পাথর দেখে জাগে কার চোখের আবেশ (গো)॥

৮২

'চোখ গেল' 'চোখ গেল' কেন ডাকিস রে—
'চোখ গেল' পাখি রে !
তোরও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে !
তোর চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে—
জানে সবাই

চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে—
তার ওষুধ নাই ;
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় কাহার আঁখি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে ॥
তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশিরাতে বুকে লাগে
'চোখ গেল' ভুলে রে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে
তাই ডাকিস অনুরাগে রে।
ওরে বন-পাপিয়া, কাহার গোপন প্রিয়া ছিলি—
আর-জনমে
আজও ভুলতে নারিস আজও ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল, যে হারায় তাহারে কি
পাওয়া যায় ডাকি রে—
'চোখ গেল' পাখি রে।
'চোখ গেল' পাখি ॥

৮৩

পদ্মার ঢেউ রে—
ও মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যারে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে ॥
মোর পরান-বঁধু নাই,
পদ্মে তাই মধু নাই — নাই রে—
বাতাস কাঁদে বাইরে—
সে সুগন্ধ নাই রে—
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝংকারে।
ও পদ্মারে, ঢেউয়ে তোর ঢেউ ওঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনই ঝিলমিল করে কৃষ্ণ কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

৮৪

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও, মালা গাঁথ অকারণে।
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম, সেই কথা পড়ে মনে॥
তব ফুল-বনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু তারই তলে
চাহিলে না ফিরে, চলে গেলে ধীরে
ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে।
সেই কথা পড়ে মনে॥
অঞ্জলি পাতি চেয়েছিনু, তব ভরা ঘটে ছিল বারি,
শুষ্ক কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী।
বহু দিন পরে দাঁড়াইনু এসে
তোমার দুয়ারে উদাসীন বেশে,
শুকানো মালিকা কেন দিলে তুমি
তব ভিক্ষার সনে?
ভাবি বসি আনমনে॥

৮৫

আমি নহি বিদেশিনি।
(ওই) ঝিলের ঝিনুক, বিলের শালুক
ছিল মোর সঙ্গিনী॥
ওই বাঁধা-ঘাট, ওই বালুচর,
মাটির প্রদীপ, ওই মেটে ঘর
চেনে মোরে ওই তুলসীতলার নববধূ ননদিনি॥
'বউ কথা কও' পাখি—
বাদলা নিশীথে মনের নিভৃতে আজও যায় মোরে ডাকি।
এত কালো চোখ এলোকেশ-ভার
এত শ্যাম-মেঘ আছে কোথা আর
(ওই) পদ্ম-পুকুরে মোরে স্মরি ঝুরে সখি মোর
কমলিনী॥

৮৬

মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি।
ঝুরে বারিধারা,
ফিরে এসো পথহারা,
কাঁদে নদীতট চুমি॥

৮৭

নিরজন ফুলবন, এসো পিয়া
রহি রহি বোলে কোয়েলিয়া।
পথ পানে চাহি
নাহি নিঁদ নাহি,
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া॥

৮৮

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরি বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে॥
মনে পড়ে যায় সহসা কখন
জল-ভরা দুটি ডাগর নয়ন
পিঠ-ভরা চুল সেই চাঁপা ফুল
ফেলে ছুটে যাওয়া লাজে।
হারানো সে দিন পাব না গো আর ফিরে
দেখিতে পাব না আর সেই কিশোরীরে।
তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন,
গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
আজও পথ চাহে সাঁঝে।
(সে) আজও পথ চাহে সাঁঝে॥

৮৯

(তুমি) শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা।
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে —
কহে যাহা বনলতা॥
চুপ করে চাঁদ সুদূর গগনে
মহাসাগরের ক্রন্দন শোনে
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা॥
মনের কথা কি মুখে সব বলা যায়?
রাতের আঁধারে যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায়?
পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহে না চঞ্চলতা॥

৯০

গাঙে জোয়ার এল ফিরে তুমি এলে কই।
খিড়কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে রই॥
কালোজামের ডালের ফাঁকে
আমায় দেখে কোকিল ডাকে,
আজও কেন যায় না দেখা তোমার নায়ের ছই॥
চুল বেঁধে আর সেজে গুজে পিদিম জ্বালাই সাঁঝে,
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে, আমি মরি লাজে।
বাদলা রাতে বৃষ্টি ঝরে
মন যে আমার কেমন করে
আমার চোখের জলে বধূ মাঠ করে থই-থই॥

৯১

রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
ওড়না তাহার ঘূর্ণি হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়॥

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে
তনুর তলোয়ার,
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে
পাথরকুচির হার।
তার ডালিম-ফুলের ডালি
গোলাপ-গালের লালি
(যেন) ঈদের চাঁদও চায়॥
আরবি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে, বাদশাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন মরীচিকায় খুঁজি।
কত তরুণ মুসাফির পথ হারাল হায়,
কত বনের হরিণ মরে তারই রূপ-তৃষায়॥

৯২

নিশি পবন! নিশি পবন! ফুলের দেশে যাও
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা তাহারে জাগাও॥
মউ টুসটুস মুখখানি তার
ঢেউ খেলানো চুল
ভোমরার ঝাঁক ঘেরা যেন ভোরের পদ্ম ফুল।
হাসিতে যার মাঠের সরল বাঁশির আভাস পাও॥
চাঁপা ফুলের পুতলি-ঘেরা চাঁপা রঙের শাড়ি,
তারেই দেখতে আকাশ গাঙে চাঁদ দেয় রে পাড়ি।
(তার) একটু খানি চোখের আদল বাদল-মেঘে পাও।
ধীরে ধীরে জাগাইয়ো তায়
ঝরা কুসুম ফেলিয়া গায়
জাগলে কন্যা যেন রে মোর পত্রখানি দাও॥

৯৩

কোন সে সুদূর অশোক-কাননে বন্দিনী তুমি সীতা
আর কতকাল জ্বলিবে আমার বুকে বিরহের চিতা
সীতা — সীতা।
বিরহে তোমার অরণ্যচারী
কাঁদে রঘুবীর বল্কলধারী,
ঝরা চামেলির অশ্রু ঝরায়ে
ঝুরিছে বন-দুহিতা।
সীতা — সীতা!

তোমার আমার এই অনন্ত অসীম বিরহ নিয়া
কত আদি কবি কত রামায়ণ রচিবে কে জানে প্রিয়া।
বেদনার সুর-সাগর তীরে
দয়িতা আমার এসো এসো ফিরে
আবার আঁধার হৃদি-অযোধ্যা
হইবে দীপান্বিতা॥
সীতা—সীতা!

৯৪

তব চলার পথে আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো
ফুল ছড়িয়ে যাই।
তারা ধূলায় পড়ে কাঁদে, বলে, 'তোমার পরশ হতে চাই গো
আলতা হতে চাই!'
ওরা রাঙা হয়ে অনুরাগের রসে
তোমার চরণ-তলে পড়ে খসে,
ওদের দলে যেয়ো না যদি হয় বক্ষে তোমার —
ঠাঁই গো॥
ওরা বুক পেতে দেয় পায়ের কাছে, অশ্রু-টলমল
বলে, 'ধূলির পথে চলো না গো, ফুলের পথে চলো!'
(তুমি) চরণ ফেল কেন ভয়ে ভয়ে
বিরহ মোর ফুটেছে ফুল হয়ে,
কাঁটা আছে আমার বুকে, ফুলে কাঁটা নাই গো॥

৯৫

শুকনো পাতার নূপুর বাজে
দখিন বায়ে!
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে॥
ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি
উঠল ডাকি বনের পাখি উঠল ডাকি
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না মাখি
সোনার শাখায় দোল দুলায়ে॥

সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে আকাশ ওঠে ঝিলমিলিয়ে।
পিয়াল বনে উঠল বাজি তোমার বেণু,
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়া পরাগ-রেণু
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে কে গো দিল ঘুম ভাঙায়ে।

৯৬

জানি, জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ।
আমি জলের কুমুদিনী ঝরিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি কাঁদিবে চাঁদ॥
আমাদের মাঝে বঁধু বিরহ-বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীরঘ শ্বাস,
কভু পায় না বুকে, তবু মুখে মুখে
চাঁদ কুমুদীর নামে রটে অপবাদ॥
তুমি কত দূরে বঁধু, তবু বুকে এত মধু কেন উথলায়?
হাতের কাছে রহ রাতের চাঁদ মোর, ধরা নাহি যায়
তবু ছোঁয়া নাহি যায়।
মরুতৃষা লয়ে কাঁদে শূন্য হিয়া
(তবু) সকলে বলে, আমি তোমারই প্রিয়া।
সেই কলঙ্ক-গৌরব সৌরভ দিল গো,
মধুর হল মোর বিরহ-বিষাদ॥

৯৭

বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায়
কী যেন অভাব রহে॥
বারে বারে মোরা কত সে ভুবনে আসি
দেখিয়া নিমেষে দুইজনে ভালোবাসি
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
(কেন) চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥
আমার বুঝি গো বাঁধিব না ঘর, অভিশাপ বিধাতার
শুধু চেয়ে থাকি, কেঁদে কেঁদে ডাকি, চাঁদ আর পারাবার।

মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটি হায়
কতবার ফোটে, কতবার ঝরে যায়
(বঁধু) আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়,
(মাঝে) অপার যমুনা বহে॥

৯৮

পঙ্ক প্রাণের প্রদীপ-শিখায়
লহো আমার শেষ আরতি।
ওগো আমার পরম-গতি
ওগো আমার পরম পতি॥
বহু সে কাল বাহির-দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে,
এবার দেহের দেউল ভেঙে
দেখব নিঠুর, তোমার জ্যোতি॥
আমি তোমায় চেয়েছিলাম, শুধু সেই সে অপরাধে
ধ্যান ভেঙেছ আমার, ফেলে নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে।
আজ মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে
পালিয়ে গেলাম পাখা মেলে,
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন
মরণে তার নাইকো ক্ষতি॥
কেটে দিলাম নিঠুর হাতে যে বাঁধনে বেঁধেছিলে,
রইল না আর আমার বলে কোনো স্মৃতি এ-নিখিলে।
আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি॥

মর্জান

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বল্লরী মাঝে, সাধায় কি সাধ॥
ফুল অভিসারিকা ভ্রমরে,
কেশের সুবাস তব খোঁপায় ধরে,
হৃদয়ে পশি' মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন আনে বিষাদ॥
খোলো উত্তরী, খোলো দাও আবরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আনত নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস,
বুকে লাগুক মোর তব নিশ্বাস
~~[illegible]~~
তোমার তনে বাস মোদের দেখে
~~[illegible]~~।
হেসে মরে আঁখিপিয়া চেয়ে বিষাদ॥

দ্র. বুলবুল ২য় : পৃ ২২৩-২২৪

রাঙা জবা

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৩৭৩
এপ্রিল ১৯৬৬

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির তালিকা

বল্ রে জবা বল্
মহাকালের কোলে এসে
ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু
তোর কালো রূপ লুকাতে মা
(ওমা) দুঃখ অভাব ঋণ যত মোর
(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো
মোরে আঘাত যত হান্‌বি শ্যামা
এস আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
ওরে আলয়ে আজ মহালয়া
কে বলে মোর মাকে কালো
মা গো আমি তান্ত্রিক নই
মা গো তোমার অসীম মাধুরী
*কে পরালো মুণ্ডমালা
*নাচে রে মোর কালো মেয়ে
*আনন্দের আনন্দ
*মা এসেছে মা এসেছে
*দেখে যারে রুদ্রাণী মা
*মাতল গগন অঙ্গন ঐ
শ্মশানকালির নাম শুনে
মা হবি না মেয়ে হবি
মা গো আজো বেঁচে আছি তোরি প্রসাদ
দুর্গতি নাশিনী আমার
যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত
পরম পুরুষ সিদ্ধ-যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
*জয় বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী
আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো
মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী
কেঁদো না কেঁদো না মাকে কে বলেছে
তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হলি
মা গো, আমি মন্দমতি
শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা
মা গো আমি আর কি ভুলি
ওমা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে
আমায় যারা দেয় মা ব্যথা, আমায় যারা
করুণা তোর জানি মা গো
আয় নেচে আয় এ বুকে
আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ
কোথায় গেলি মা গো আমার
মা কবে তোরে পারব দিতে
জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্
কালী কালী মন্ত্র জপি
আদরিণী মোর শ্যামা মেয়ে রে
শ্যামা তোর নাম যার জপমালা
আমি নামের নেশায় শিশুর মত
(ওমা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
রক্ষা-কালির রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে
(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা
(মায়ের) অসীম রূপ-সিন্ধুতে রে
(আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
অসুর বাড়ির ফেরৎ এ মা

আঁধার ভীত এ চিত যাচে মা গো আলো
মা তোর চরণ-কমল ঘিরে
আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশি শ্যামা কালী
শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
আয় অশুচি আয় রে পতিত
দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যথা থাকে
(মা) এক্‌লা ঘরে ডাকব না আর
(তুই) বলহীনের বোঝা বহিস্‌ যেথায়
কেন আমায় আনলি মা গো মহারানীর
ভাগীরথীর ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক
মা গো তোরি পায়ের নূপুর বাজে
জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়
তোর কালো রূপ দেখতে মা গো
বল্‌ মা শ্যামা বল্‌ তোর বিগ্রহ কি মায়া
মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব ঘরে
কে সাজালো মাকে আমার
(আমার) আনন্দিনী উমা আজো
আমার উমা কই, গিরিরাজ
সংসারেরই দোলনাতে মা
*মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি
*প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণী
*নন্দলোক থেকে আমি এনেছি রে
*মায়ের আমার রূপ দেখে যা
*নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
*মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা
*কেন আমায় আনলি মা গো মহাবাণী
আয় বিজয়া আয় রে জয়া
সর্বনাশি! মেখে এলি এ কোন চুলোর
আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে
শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
ওমা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে
মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে
আমার শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে
আমার মা আছে রে সকল নামে
ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস
আমার মানস-বনে ফুটেছে রে
শ্যামা নামের লাগল আগুন
ওমা খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে
আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা, দেহ বিল্বদল
যে কালীর চরণ পায় রে
তোরই নামের কবচ দোলে
মাতৃ নামের হোমের শিখা
আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে
আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা
আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের
আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
থির হয়ে তুই বস দেখি মা

তারকা-চিহ্নিত গানগুলি অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible]

রাঙা জবা

বল রে জবা বল!
কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল ॥
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমার লেখা জীবনে হোক সফল ॥
কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা-র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা!

তোর মতো মা-র পায়ে রাতুল
কবে উঠবে প্রসাদি-ফুল
ওরে মায়ের গায়ের ছোঁয়া লেগে উঠবে রেঙে,
কবে তোরই মতো রাঙবে রে মোর মলিন চিত্ত-দল।

২

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হল মা-র রূপের ডালি ॥
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
(সে যে) ছড়িয়ে আছে চন্দ্র-তারায়
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি ॥
উমা হল ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবেরে,
হেরি শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।

অন্ন দিয়ে ত্রিজগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজদুলালি।

৩

ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস,
কাম-ছাগ ক্রোধরূপী মহিষ ;
তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা মোহ-রিপুর ধূম জ্বালিয়ে।
দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর মদ-সলিল তোর চরণে,
মাৎসর্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।

ষড়্‌রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারে বারে
সেই পূজারই মন্ত্র মা গো ভক্তরে তোর দে শিখিয়ে॥

৪

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢাকতে নারে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন॥
মাখিয়ে কালো আমার চোখে
লুকিয়ে রাখিস তোর কালোকে
(তোর) কালো রূপে মা গো অখিল বিশ্ব নিমগন॥
আঁধার নিশীথে সে যেন তোর কালো রূপের ধ্যান
(তোর) গহন কালোয় গাহন করে পুড়ায় ধরার প্রাণ॥
হেরি তোর কালো রূপ স্নিগ্ধ করা
শ্যামা হল বসুন্ধরা,
নিবল কোটি সূর্য তোরে খুঁজে অনুক্ষণ॥

৫

(ওমা) দুঃখ অভাব ঋণ যত মোর
রাখলাম তোর পায়ে
(এবার) তুই দিবি মা, ভক্তের তোর
সকল ঋণ মিটায়ে॥
মাগো সমন-হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন,

তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন
ছেলের ঋণের দায়ে ॥
ওমা সুদ-আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।

আমি আমার আর নহি তো,
(আমি) তোর পায়ে যে নিবেদিত,
এখন তুই হয়েছিস জামিন আমার —
দে ওদের বুঝায়ে ॥

৬

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
রাখবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেললি এমন করে ॥
ও মা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাই কি গো মাফ
ভুগব চিরতরে ॥
এমনি করে সন্তানে তোর
ফেললি মা অকূলে,
তোর নাম যে জপমালা
তাও যাই হায় ভুলে।

পাছে মা তোর কাছে আসি
তাই বাঁধন দিলি রাশি রাশি,
কবে মুক্ত হব মুক্তকেশী
(তোর) অভয় চরণ ধরে ॥

৭

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে গো
ওমা দে ফিরিয়ে মোর হারানিধি!
তুই দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে
মা তোর এ কোন নিঠুর বিধি ॥

বল মা তারা কেমন করে
নয়নতারা নিলি হরে,
দিলি মা হয়ে তুই শিশুর বুকে
নিঠুর মরণ-সাযক বিঁধি॥
তরু যেমন শিকড় দিয়ে তাহার মাটির মাকে
জড়িযে ধরে থাকে স্নেহের সহস্র সে পাকে ;
মা গো তেমনি করে তাহার মায়া
আঁকড়ে ছিল আমার কায়া,
তারে নিলি কেন মহামায়া
শূন্য করে আমার হৃদি।

৮

মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা
ডাকব তত তোরে।
মাযের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥
(ও মা) চারধারে মোর দুখের পাথার,
(তুই) পরখ কত করবি মা আর,
(আমি) জানি তবু হব মা পার
চরণ-তরি ধরে
(তোরই) চরণ-তরি ধরে॥
(আমি) ছাড়ব না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে,
(আমায়) দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি, নই মা তেমন ছেলে।

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
(তুই) স্মরণ করিস পলে পলে,
আমি সেই আনন্দে দুঃখের অসীম
সাগর যাব তরে॥

৯

এসো আনন্দিতা ত্রিলোকবন্দিতা
করো দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা।
ব্যাপিয়া চরাচর শারদ অম্বর
ছড়াও অভয় হাসির লাবণি মা॥

সারাটি বরষ নিখিল ব্যথিত
চাহিয়া আছে মা তব আসা-পথ,
ধরার সন্তানে ধরো তব কোলে
ভোলাও দুঃখ-শোক চির করুণাময়ী মা॥
অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘ পরমায়ু
দাও আরও নির্মল বায়ু,
দশ হাতে তব আনো মা কল্যাণ,
পীড়িত চিত্ত গাহে অকাল জাগরিণী মা॥

১০

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া, মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দে রে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর॥
(এল মা, আমার মা॥)
মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাজের মাঝে মায়ার ঘোরে,
আজ বরষ পরে মাকে ডাকার মিলল অবসর।
(এল মা, আমার মা॥)
মা ছিল না বলে সবাই গেছে পায়ে দলে
মার খেয়েছি যত তত ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে ছুটে রে তাই,
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা অভয়া এসেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এল মা, আমার মা॥)

১১

কে বলে মোর মাকে কালো
মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
নিত্য করে মা-র আরতি॥
কালো রূপের মায়া দিয়ে
মহামায়া রয় লুকিয়ে,
মাকে আমার খুঁজে খুঁজে
নিবল কোটি রবির জ্যোতি।

যোগীন্দ্র যাঁর চরণতলে
ধ্যান করে রে যাঁর মহিমা
(মোরা) দুটি নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে
খুঁজি সেই অসীমার সীমা॥
মোরা সাজিয়ে কালী গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে
মায়ের শুভ্রা রূপ দেখে সে
শুভ্র-শুচি যার ভকতি॥

১২

মা গো আমি তান্ত্রিক নই,
তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা
ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা॥
যাইব না আমি শ্মশান মশান
দিই না পায়ে জীব বলিদান,
খুঁজতে তাকে খুঁজি না মা
অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা॥
ঝিল্লি যেমন নিশীথ রাতে
একটানা সুর গায় অবিরাম,
তেমনি করে নিত্য আমি
জপি শ্যামা তোমারই নাম।
শিশু যেমন অনায়াসে
জননীরে ভালোবাসে,
তেমনি সহজ সাধনা মোর
তাতেই পাব তোর দেখা মা।

১৩

মা গো তোমার অসীম মাধুরী
বিশ্বে পড়িছে ছড়ায়ে।
তোমার আঁখির স্নিগ্ধ লাবণি
ঝরিছে গগন গড়ায়ে।

কুমুদে কমলে দিঘি সরোবরে
তোমার পূজাঞ্জলি থরে থরে
তব অপরূপ রূপ বিহরে
নিখিল প্রকৃতি জড়ায়ে॥
অরুণ-কিরণে হেরি মা তোমারই
মুখের অভয় হাসি,
নাচে আনন্দে নদীতরঙ্গ
প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।
আগমনি গায় সৃষ্টি অশেষ
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ,
তোমারে পূজিতে পূজারিনি বেশ
ধরণিরে দিল পরায়ে॥

১৪

মা হবি না মেয়ে হবি
দে মা উমা বলে।
তুই আমারে কোল দিবি না
আমিই নেব কোলে॥
মা হয়ে তুই মাগো আমার
নিবি কি মোর সংসার-ভার,
দিন ফুরালে আসব ছুটে
মা তোর চরণতলে।
(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখ-জ্বালা তোর স্নেহ-অঞ্চলে॥
এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তি-শতদল,
আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কী নিবি তুই বল।

মেয়ে হয়ে মুক্তকেশে
খেলবি ঘরে হেসে হেসে,
ডাকলে মা তুই ছুটে এসে
জড়াবি মোর গলে।
(তোর) বক্ষে ধরে শিবলোকে যাব আমি চলে।

১৫

মা গো, আজও বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ পেয়ে।
তোর দয়ায় মা অন্নপূর্ণা তোরই অন্ন খেয়ে॥
কবে কখন খেলার ছলে
ডেকেছিলাম শ্যামা বলে,
সেই পুণ্যে ধন্য আমি
আজ তোর নাম গেয়ে॥
তোর নাম-গান বিনা আমার পুণ্য কিছু নাই,
পাপী হয়েও পাই আমি তাই যখন যাহা চাই॥
দুঃখে শোকে বিপদ-ঝড়ে
বাঁচাস মা তুই বক্ষে ধরে,
দয়াময়ী নাই কেহ মা
ভবানী তোর চেয়ে॥

১৬

দুর্গতিনাশিনী আমার
শ্যামা মায়ের চরণ ধর।
যত বিপদ তরে যাবি
মাকে বারেক স্মরণ কর॥
তোর সংসার-ভাবনার ভার
সঁপে দে রে চরণে মা-র
যে চরণে বক্ষ পেতে
আছেন ভূমানন্দে মেতে
দেবাদিদেব দিগম্বর॥
যে দিয়েছে এ সংসারের শিকল পায়ে বেঁধে,
সেই মহামায়ার শ্রীচরণে শরণ নে তুই কেঁদে।
কেটে যাবে সকল মায়া,
পাবি মায়ের চরণ-ছায়া,
শান্তি পাবি রোগে শোকে,
অন্তে যাবি মোক্ষলোকে
শিবানীরে বরণ কর॥

১৭

যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে
সেই নাম তুই শিখিয়ে দে মা, ডাকব আমি তেমন করে॥
বেদ-পুরাণে যে নাম শুনি,
যে নাম জপে ঋষি মুনি,
সেই নাম দে, যে নাম নিতে
বক্ষ ভাসে অশ্রুলোরে॥
ভয় যদি তোর ভক্তি দিতে, কর মা অসুর দানব মোরে,
(তুই) আসবি যখন শাস্তি দিতে, দেখব তোরে নয়ন ভরে।
তোর হাতে মা মরণ হলে
ঠাঁই পাব যে তোরই কোলে;
আঘাত করে ছেলেকে মা কাছে যেমন বক্ষে ধরে॥

১৮

পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহো প্রণাম নমস্কার॥
জাগালে ভারত-শ্মশানতীরে
অশিবনাশিনী মহাকালীরে,
মাতৃনামের অমৃত নীরে
বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥
সত্যযুগের পুণ্য স্মৃতি আসিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ বারি-কলস॥
মন্দিরে মসজিদে গির্জায়
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নামমাখা প্রেমনিকেতনে
ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

১৯

আমার হৃদয় অধিক রাঙা মাগো
রাঙা জবার চেয়ে।
আমি সেই জবাতে ভবানী তোর
চরণ দিলাম ছেয়ে॥

মোর বেদনার বেদির পরে
বিগ্রহ তোর রাখব ধরে,
পাষাণ-দেউলে সাজে না তোর
আদরিণী মেয়ে॥
স্নেহ-পূজার ভোগ দেব মা, অশ্রু-পূজাঞ্জলি,
অনুরাগের থালায় দেব ভক্তি-কুসুমকলি।

অনিমেষ আঁখির বাতি
রাখব জ্বেলে দিবারাতি,
(তোর) রূপ হবে মা আরও শ্যামা
অশ্রুজলে নেয়ে।
(আমার) অশ্রুজলে নেয়ে॥

২০

মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী
মিষ্টি বেলি মেয়ের চেয়ে।
চঞ্চলা এই লীলাময়ী
মুক্তকেশী কালো মেয়ে॥
(সে মিষ্টি যত দুষ্টু তত এই কালো মেয়ে
গিরিঝরনা-সম এল ধেয়ে এই পার্বতী মেয়ে
করুণা-অমৃতধারায় ভুবন ছেয়ে রে
এল এই কালো মেয়ে॥)
মোর নন্দিনী এই আনন্দিনী
আমি সেই গরবে গরিবিনি।
তার আর কী চাওয়ার আছে গো
যার অন্তরে মা আনন্দিনী
তার আর কী পাওয়ার আছে গো।
এই মা যে আমার হৃদয়-গগন
আলোর মতো আছে ছেয়ে॥
মাকে তবু চোখে চোখে রাখি
যদি কভু দেয় সে ফাঁকি
(আমি ভয়ে ভয়ে থাকি গো
এই মায়াময়ী মেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি গো
আমি বহু সাধ্য-সাধনাতে পেয়েছি এই মাকে রে
আমি কোটি জন্মের তপস্যাতে পেয়েছি এই মাকে রে)।

আমি কাঙালিনি, কোথায় রাখি
এই স্বর্গের রত্ন পেয়ে॥

২১

কেঁদো না কেঁদো না, মাকে কে বলেছে কালো।
(মা) ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভুবন আলো॥
কে দিয়েছে গালি তোরে, মন্দ সে মন্দ
যে বলেছে কালী তোরে, অন্ধ সে অন্ধ।
(মোর তারায় সে দেখে নাই।
তার নয়নতারায় নাই আলো, তাই
তারায় সে দেখে নাই।)
(রাখে) লুকিয়ে মা তোর নয়ন-কমল
কোটি আলোয় সহস্রদল,
(তোর) রূপ দেখে মা লজ্জায় শিব-অঙ্গে ছাই মাখাল,
(তুষার-ধবল কান্তি যাঁহার চন্দ্রলেখা যাঁর চূড়ায়
চন্দ্রকান্তমণির জ্যোতি রূপ দেখে যার লজ্জা পায়)
সেই চন্দ্রচূড়ও রূপ দেখে তোর অঙ্গে ছাই মাখাল॥
তোর নীল কপোলে কোটি তারা
চন্দনেরই ফোঁটার পারা
ঝিকিমিকি করে গো,
(যেন আলোর অলকা-তিলক ঝলমল করে গো)
মা তোর দেহলতায় অতুল কোটি রবিশশীর মুকুল
ফুটে আবার ঝরে গো।
তুমি হোমের শিখা বহ্নি-জ্যোতি
তুমিই স্বাহা দীপ্তিমতি,
আঁধার ভুবন-ভুবনে মা কল্যাণীদীপ জ্বালো
তুমিই কল্যাণদীপ জ্বালো॥

২২

তুই পাষাণগিরির মেয়ে হলি
পাষাণ ভালো বাসিস বলে।
মা গলবে কি তোর পাষাণ-হৃদয়
তপ্ত আমার নয়নজলে॥

তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে
লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে ;
মহেশ্বরও পায় না তোকে
পড়ে মা তোর চরণতলে ॥
কোটি ভক্ত যোগী ঋষি
ঠাঁই পেল না তোর চরণে।
তাই ব্যথায় রাঙা তাদের হৃদয়,
জবা হয়ে ফোটে বনে।
আমি শুনেছি মা ভক্তিভরে
মা বলে যে ডাকে তোরে,
(তুই) অমনি গলে অশ্রুলোরে
ঠাঁই দিস তোর অভয় কোলে।

২৩

মা গো, আমি মন্দমতি
তবু যে সন্তান তোরই।
(হায়) পুত্র বেড়ায় কাঙালবেশে
মা যার ভুবনেশ্বরী ॥
তুই যে এত বাসিস হেলা
(তবু) তোরেই ডাকি সারাবেলা ;
মার খেয়ে তোর শিশুর মতো
মাগো তোকেই জড়িয়ে ধরি ॥
মা হয়ে তুই কেমন করে
কোল থেকে তোর দিলি ফেলে,
(মাগো) কেন দিলি ধুলায় ফেলে ?
(আমি) মন্দ এত হতাম না মা
মায়ের স্নেহ-সুধা পেলে।
(মা) তোর উপরে অভিমানে
দু-চোখ যায় যেদিক পানে
সেই দিকে তাই ধাই মা এখন
মরণ-বাঁচন ভয় না করি ॥

২৪

শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা
(তোরে) যায় না পাওয়া কেঁদে।
(তাই) শক্তিসাধক রাখে তোরে
ভক্তিডোরে বেঁধে॥
(মা) শক্ত বড়ো শক্ত ছেলে
(সে) জানে, দড়ি আলগা পেলে
যাবি পালিয়ে চোখে ধুলা দিয়ে
মায়াফাঁদ ফেঁদে।
(তাই) ভয় পেয়ে তুই মুক্তি দিতে চাস মা নিজে সেধে
(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস ইন্দ্রত্বের মোহে,
(ওমা) গুণের কিছু ঘাট নাই তোর নির্গুণ তাই কহে
(তোরে) নির্গুণ তাই কহে॥
তোর মায়াতে ভুলে গিয়ে
বিষ্ণু ঘুমান লক্ষ্মী নিয়ে,
চতুর্মুখে ব্রহ্মা ভাবেন
দেবী আছেন চতুর্বেদে।
(তোর) অন্ত খুঁজে শিব হয়েছেন ভবঘুরে বেদে॥

২৫

মা গো, আমি আর কি ভুলি।
চরণ যখন ধরেছি তোর
মা গো, আমি আর কি ভুলি।
(তুই) বহু জনম ঘুরিয়েছিস মা
পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি॥
(তোর) পা ছেড়ে যে মোক্ষ যাচে
(তুই) বর নিয়ে যাস তাহার কাছে;
আমি যেন যুগে যুগে পাই মা প্রসাদ চরণধূলি।
(মোরে) শিশু পেয়ে খেলনা দিয়ে
রেখেছিলি মা ভুলিয়ে,
(এখন) খেলনা ফেলে কোলে নিতে
মাকে ডাকি দু-হাত তুলি॥
তোর ঐশ্বর্য যা কিছু মা
সে ভক্তগণে বিলিয়ে উমা,

ভিখারি এই সন্তানে দিস
মাতৃনামের ভিক্ষা-ঝুলি।

২৬

ওমা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে
তোর মতো কেউ নাই।
তোর পায়ে মা তাই রক্তজবা
গায়ে মাখা ছাই।
দৈত্য-অসুর হনন-ছলে
ঠাঁই দিস তুই চরণতলে,
আমি তামসিকের দলে মা গো
তাই নিয়েছি ঠাঁই॥
কালো বলে গৌরী তোরে
কে দিয়েছে গালি,
(ওমা) ত্রিভুবনের পাপ নিয়ে তোর
অঙ্গ হল কালি।
অপরাধ না করলে শ্যামা
ক্ষমা যে তোর পেতাম না মা,
(আমি) পাপী বলে আশা রাখি
চরণ যদি পাই॥

২৭

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা, আমায় যারা আঘাত করে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী।
আমায় যারা ভালোবাসে বন্ধু বলে বক্ষে ধরে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

আমায় অপমান করে যে
মা গো তোরই ইচ্ছা সে যে,
আমায় যারা যায় মা ত্যেজে,
যারা আমার আসে ঘরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥
আমার ক্ষতি করতে পারে অন্য লোকের সাধ্য কী মা,

দুঃখ যা পাই তোরই সে দান, মা গো সবই তোর মহিমা।
তাই পায়ে কেহ দলে যবে
হেসে সয়ে যাই নীরবে,
কে কারে দুখ দেয় মা কবে
তোর আদেশ না পেলে পরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥

২৮

করুণা তোর জানি মাগো
আসবে শুভদিন।
হোক না আমার চরম ক্ষতি
থাক না অভাব ঋণ॥
আমায় ব্যথা দেওয়ার ছলে
টানিস মা তোর অভয় কোলে,
সন্তানে মা দুঃখ দিয়ে
রয় কি উদাসীন॥
তোর কঠোরতার চেয়ে দয়া বেশি জানি বলে
ভয় যত মা দেখাস তত লুকাই তোরই কোলে।
সন্তানে ক্লেশ দিস যে এমন
হয়তো মা তার আছে কারণ,
তুই কাঁদাস বলে বলব কি মা
হলাম মাতৃহীন॥

২৯

আয় নেয়ে আয় এ বুকে
দুলালি মোর কালো মেয়ে।
দগ্ধ দিনের বুকে যেমন
আসে শীতল আঁধার ছেয়ে॥
আমার হৃদয়-আঙিনাতে
খেলবি মা তুই দিনে রাতে,
আমার সকল দেহ নয়ন হয়ে
দেখবে মা তাই চেয়ে চেয়ে॥

হাত ধরে মোর নিয়ে যাবি
তোর খেলাঘর দেখাবি মা,
এইটুকু তুই মেয়ে আমার
কেমন করে হস অসীমা।
নিবি লুটে চতুর্ভুজা
আমার স্নেহ প্রেম-পূজা,
নাম ধরে তোর ডাকব মা যেই
যেথায় থাকিস আসবি ধেয়ে॥

৩০

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ
আজও মুক্ত নহি।
আজও অন্যে আঘাত দিয়ে
কঠোর ভাষা কহি॥
মোর আচরণ, আমার কথা
আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা,
আজও আমার দাহন দিয়ে
শতজনে দহি॥
শত্রু-মিত্র মন্দ-ভালোর যায়নি আজও ভেদ,
কেহ পীড়া দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ।
আজও জাগে দুঃখশোকে
অশ্রু ঝরে আমার চোখে
আমার আমার ভাব মা আজও
জাগে রহি রহি॥

৩১

কোথায় গেলি মা গো আমার
খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে।
ক্লান্ত আমি খেলে খেলে
এ সংসারের ধূলি মেখে॥
বলেছিলি সন্ধ্যা হলে
ধূলি মুছে নিবি কোলে,
ছেলেরে তুই গেলি ছলে—
(এখন) পাই না সাড়া মাকে ডেকে॥

একি খেলার পুতুল মাগো
দিযেছিলি মন ভুলাতে,
আধেক তাহার হারিয়ে গেছে
আধেক ভেঙে আছে হাতে।
এ পুতুলও লাগছে মা ভার,
তোর পুতুল তুই নে মা এবার
(এখন) দিন ফুরাল, নামল আঁধার,
ঘুম পাড়া তুই আঁচল ঢেকে॥

৩২

মা কবে তোরে পারব দিতে
আমার সকল ভার।
ভাবতে কখন পারব মা গো।
নাই কিছু আমার॥
(কারেও) আনিনি মা সঙ্গে করে,
রাখতে নারি কারেও ধরে
তুই দিস তুই নিস মা হরে—
আমার কোথায় অধিকার॥
হাসি খেলি চলি ফিরি ইঙ্গিতে মা তোরই,
তোর মাঝে মা জনম লভি, তোরই মাঝে
পুত্র মিত্র কন্যা জায়া
মহামায়া তোর এ মায়া,
মা তোর লীলার পুতুল আমি
ভাবতে দে এবার।

৩৩

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
(তোর) মায়ের জালে মহামায়া
বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে॥
পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে,

তোর মায়াজাল তত বাঁধে
পালাতে চায় যত ধেয়ে॥
চতুর যে মীন সে জানে মা,
জাল থেকে কি মুক্তি আছে?
(তাই) জেলে যখন জাল ফেলে, সে
লুকায় জেলের পায়ের কাছে।
ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে।

তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ
(আমি) এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোমার অভয় চরণ পেয়ে।

৩৪

কালী কালী মন্ত্র জপি
বসে লোকের ঘোর শ্মশানে।
মা অভয়ার নামের গুণে
শান্তি যদি পাই এ প্রাণে।

এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে,
সে হয়তো আবার উঠবে জেগে
মা ভবানীর নামগানে॥
সকল সুখ শান্তি আমার
হরে নিল যে পাষাণী,
শূন্য বুকে বন্দি করে
রাখব আমি তারেই আনি।

মোর যাহা প্রিয় মাকে দিয়ে
জেগে আছি আশা-দীপ জ্বালিয়ে,
মা-র সেই চরণের নিলাম শরণ
যে চরণে আঘাত হানে॥

৩৫

আদরিণী মোর শ্যামা মেয়েরে
কেমনে কোথায় রাখি।
রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে
(তারে) বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁখি
শিরে তারে রাখি যদি
মন কাঁদে নিরবধি,
(সে) চলতে পায়ে দলবে বলে
পথে হৃদয় পেতে থাকি॥
কাঙাল যেমন পাইলে রতন
লুকাতে ঠাঁই নাহি পায়।
তেমনি আমার শ্যামা মেয়েরে
জানি না রাখিব কোথায়।
দুরন্ত মোর এই মেয়েরে
বাঁধিব আমি কী দিয়ে রে,
(তাই) পালিয়ে যেতে চায় সে যবে
অমনি মা বলে ডাকি॥

৩৬

শ্যামা তোর নাম যার জপমালা
তার কি মা ভয় ভাবনা আছে।
দুঃখ অভাব রোগ শোক জরা
লুটায় তাহার পায়ের কাছে॥
যার চিত্ত নিবেদিত তোর চরণে
ওমা কী ভয় তাহার জীবনে মরণে,
মায়ের কোলে সে যে শিশুর সম
নির্ভয় চিতে সদা খেলে নাচে॥
রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম
সকল বিপদ তারে করে প্রণাম।

সদা প্রসন্ন মন তার ধ্যানে মা তোর,
ভূমানন্দে মা গো রহে সে বিভোর;
(তার) নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর
তব নাম প্রসাদ যে লভিয়াছে।

৩৭

আমি নামের নেশায় শিশুর মতো
ডাকি গো মা বলে।
নাই দিলি তুই সাড়া মা গো
নাই নিলি তুই কোলে॥
শুনলে 'মা' নাম জেগে উঠি,
ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটি,
ওই নামে মোর নয়ন দুটি
ভরে উঠে জলে॥
ও নাম আমার মুখের বুলি, ও নাম খেলার সাথি,
ও নাম বুকে জড়িয়ে ধরে পোহায় দুখের রাতি।
মা-হারানো শিশুর মতো
জানি ও-নাম অবিরত,
ওই নামের মন্ত্র আমার বুকে
কবচ হয়ে দোলে॥

৩৮

(ওমা) বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
শরণ নিলাম সেই চরণে।
জীবন আমার ধন্য হল,
ভয় নাই মা আর মরণে॥
যা ছিল মোর এই ত্রিলোকে
তোকে দিলাম, দিলাম তোকে,
আমার বলে রইল শুধু
তোর চরণের ধ্যান এ মনে।

(তোর) কেশ নাকি মা মুক্ত হল
ছুঁয়ে তোরই রাঙা চরণ,
(ও মা) মুক্তকেশী, মুক্ত হব
সেই চরণে নিয়ে শরণ।
(তোর) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে
বিশ্বজনে বলব ডেকে,
দেখে যা কোন রত্ন রাজে
আমার হৃদয়-সিংহাসনে॥

৩৯

রক্ষা-কালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে।
মায়ের পায়ের ফুল কুড়িয়ে বেঁধেছি মোর শিরে॥
মা-র চরণামৃত খেয়ে
অমৃতে প্রাণ আছে ছেয়ে,
দুঃখ-অভাব ভাবনার ভার
দিয়েছি মা ভবানীরে॥
তার নামের নামাবলি গড়িয়ে আমার বুকে
মায়ের কোলের শিশুর মতো ঘুমাই পরম সুখে।
মা-র ভক্তের চরণ-ধূলি
নিয়েছি মোর বক্ষে তুলি,
(মায়ের) পূজার প্রসাদ পেতে আমি
আসি ফিরে ফিরে॥

৪০

(আমার) মুক্তি নিয়ে কী হবে মা,
আমি তোরে চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মা গো
কোল যদি তোর পাই।
মা কী হবে সে মুক্তি নিয়ে
কী হবে সে স্বর্গে গিয়ে,
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
কোল যদি তোর পাই
আর প্রয়োজন নাই॥
যুগে যুগে যে লোকে মা প্রকাশ হবে তোর,
পুত্র হয়ে দেখব লীলা, এই কামনা মোর।
তুই মাখাস যদি মাখব ধূলি,
শুধু তোকে যেন নাহি ভুলি,
তুই মুছিয়ে ধূলি নিবি তুলি,
বক্ষে দিবি ঠাঁই॥

৪১

(মায়ের) অসীম রূপ-সিন্ধুতে রে
বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে,
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা
অনন্ত এই বিশ্ব জুড়ে॥
যোগীন্দ্র শিব পায়ের তলায়
ধ্যান করে রে সেই অসীমায়,
কোটি ব্রহ্মা মহিমা গায়
প্রণব ওংকারের সুরে॥
কোটি গ্রহের নিবল জ্যোতি মহাকালীর সীমা খুঁজে,
সৃষ্টি-প্রলয় বলয় হয়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।
মায়ের একটি আঁখির চাওয়ায়
যুগ-যুগান্ত হারিয়ে যায়,
মায়ের রূপের ঈষৎ আভাস পেয়ে
সাগর দুলে, তিমির ঝরে॥

৪২

(আমার) কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
কে দেবে তায় ধরে।
(তারে) যেই ধরেছি মনে করি
অমনি সে যায় সরে॥
বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
চঞ্চলা মোর যায় পালিয়ে,
(দেখি) ফুল হয়ে মা-র নূপুরগুলি
পথে আছে ঝরে।
তার কন্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ-আঙিনাতে
তারা হয়ে ছড়িয়ে আছে, দেখি আধেক রাতে।
আমি কেঁদে বেড়াই, কাঁদলে যদি
আসে দয়া করে॥

৪৩

আঁধার-ভীত এ চিত যাচে মা গো আলো আলো।
বিশ্ববিধাত্রী আলোকদাত্রী
নিরাশ পরানে আশার সবিতা জ্বালো
জ্বালো আলো আলো॥
হারিয়েছি পথ গভীর তিমিরে,
লহো হাতে ধরে প্রভাতের তীরে,
পাপ তাপ মুছি করো মাগো শুচি
আশিসে অমৃত ঢালো॥
দশপ্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে
মা অগতির গতি
সিদ্ধিবিধায়িনী দনুজদলনী
বাহুতে দাও মা শকতি।

তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি
এবার প্রবল মৃত্যু লাগি
রুদ্র দাহনে ক্ষুদ্রতা দহো
বিনাশো গ্লানির কালো॥

৪৪

মা তোর চরণ-কমল ঘিরে
চিত্ত-ভ্রমর বেড়ায় ঘুরে।
(ও মা) সাধ মেটে না দেখে দেখে
(যত) দেখি, তত নয়ন ঝুরে॥
(ওই) চরণচিহ্ন বক্ষে এঁকে
চরণ-পরাগ-ধূলি মেখে
গ্রহ-তারায় লোকে লোকে
(তোর) নাম গেয়ে যাই সুরে সুরে॥
তোর চরণের ধূলি নিয়ে ললাটে মোর তিলক আঁকি
ওই চরণের পানে চেয়ে ধ্রুবতারা হল আঁখি।
তোর চরণের মধু যদি
(মা) পাই এমনই নিরবধি,
লক্ষ কোটি জনম নিয়ে
বেড়াব ত্রিভুবন জুড়ে॥

৪৫

আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে দিয়ে তাথই তাথই করতালি॥
দশদিক আলো করে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর পরে
দুরন্ত রূপ ধরে
আয় মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি।
আমার স্নেহের রাঙা জবা পায়ে দলে
কালো রূপ তরঙ্গ তুলে গগনতলে
সিন্ধু জলে আমার কোলে
আয় মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে
শান্ত ভবন প্রাণ-চঞ্চল হবে,
এলোকেশে এনে ঝড়
মায়ার এ খেলাঘর
ভেঙে দে মা আনন্দদুলালি॥

৪৬

কৌশী তেতালা

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।
জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ওই
চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে॥
সন্তানে দিতে কোল ছাড়ি সুখ-কৈলাস
বরাভয়া-রূপে মা শ্মশানে করেন বাস;
কী ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণতলে॥
জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার-জ্বালায়—
তাহারে ডাকিছে মা, কোলে আয় কোলে আয়!
জীবনে শান্ত ওরে
ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণের ছলে॥

৪৭

আয় অশুচি আয় রে পতিত,
এবার মায়ের পূজা হবে।
যথা সকল জাতির সকল মানুষ
নির্ভয়ে মা-র চরণ ছোঁবে।
(সেথা) এবার মায়ের পূজা হবে॥
(সেথা) নাই মন্দির নাই পূজারি,
নাই শাস্ত্র নাই রে দ্বারী,
(যেথা) মা বলে যে ডাকবে এসে
মা তাহারেই কোলে লবে॥
(মা) সিংহ-আসন হতে নেমে বসেছে দেখ ধূলির তলে,
(মা-র) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে সবার ছোঁয়া তীর্থজলে।
জননীকে দেখেনি, তাই
ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই,
(আজ) মাকে দেখে বুঝবি মোরা
এক মা-র সন্তান সবে।
(এবার) ত্রিলোক জুড়ে পড়বে সাড়া
মাতৃমন্ত্রের মাভৈঃ-রবে॥

৪৮

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যথা থাকে
ভিখারিনি বেশে সেথা দেখেছি মোর মাকে
(মোর) অন্নপূর্ণা মাকে॥
অহংকারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে খুঁজি,
মা ফেরেন ধূলির পথে যখন ঘটা করে পূজি,
ঘুরে ঘুরে দূর আকাশে
প্রণাম আমার ফিরে আসে
যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে॥
নামতে নারি তাদের কাছে সবার নীচে যারা
যাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।
অপমানের পাতালতলে লুকিয়ে যারা আছে
তোর শ্রীচরণ রাজে সেথায়, নে মা তাদের কাছে
আমায় নে মা তাদের কাছে।

আনন্দময় তোর ভবনে
আনব কবে বিশ্বজনে
দেখব জ্যোতির্ময়ী রূপে সেদিন তমসাকে।

৪৯

(মা) একলা ঘরে ডাকব না আর
দুয়ার বন্ধ করে।
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকব মা সেই ঘরে॥
রুদ্ধ আমার একলা এ মন্দিরে
পথ না পেয়ে যাস বুঝি মা ফিরে
(ঘুরে) জ্যোতির্লোকে ঘুম পাড়িয়ে
তাপিত সন্তান নিয়ে
কাঁদিস মা তুই বুকে ধরে॥
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকব মা সেই ঘরে॥
(আমি) একলা মানুষ হতে গিয়ে হারাই মা তোর স্নেহ,
(আমি) যে ঘর যেতে ঘৃণা করি, মা! সেই তোর গেহ।
দুর্বল মোর ভাই বোনদের তুলে
দাঁড়াব মা সেদিন চরণমূলে,
কোলে তুলে নিবি হেসে
(আর) হারাব না তোরে॥

৫০

(তুই) বলহীনের বোঝা বহিস যেথায় ভৃত্য হয়ে
যথা দাসী হয়ে করিস সেবা, যা মা সেথায় লয়ে
(মোরে) যা মা সেথায় লয়ে॥
(যথা) রুগ্ণ ছেলের বক্ষে ধরে
নিশীথ জাগিস একলা ঘরে
(যথা) দুঃখী পিতার সাথে কাঁদিস উপবাসী রয়ে।
(মোরে) যা মা সেথায় লয়ে॥
শ্রমিক চাষার তরে যথা আঁধার খাদে মাঠে
ক্ষুধার অন্ন নিস মা বয়ে, নে মা তাদের হাটে
(মোরে) নে মা তাদের হাটে॥

তুই ত্রিজগতের পাপ কুড়ালি
(তাই) সোনার অঙ্গ হল কালি
তোরে সেই কোলেতে পাব মহাকালীর পরিচয়ে।

৫১

কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে
(মোর) ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধুজল কেমন করে নেব তুলে॥
চতুর্বেদে এই সিন্ধুর জল
ক্ষুদ্রবারিবিন্দু হয়ে করছে টলমল
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ তারা গগনমূলে।
ইহারই কো ধরতে গিয়ে শিবের জটা পড়ে খুলে॥
অনন্তকাল রবি শশী এই যে মহাসাগর হতে
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগাতে॥
বাঁশিতে মোর, স্বল্প এ আঁধারে
অনন্ত সে বাণীর ধারা ধরতে কি মা পারে,
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্রও তোর চরণ ছুঁলে॥

৫২

ভাগীরথীর ধারার মতো সুধার সাগর পড়ুক ঝরে
মা গো এবার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময়, পড়ুক আলো,
সকল জীব শিব হোক মা, সেই সুধাতে সিনান করে।
তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা,
দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানব-অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথাহত
শ্বেত শতদলের মতো
মা তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে সেই সাগরে॥

৫৩

মা গো তোরই পায়ের নূপুর বাজে
এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে॥
জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে
সাগর-রোলে নদীর কলতানে
সমীরণের মরমরে শুনি সকল সাঁঝে।
মা গো তোরই পায়ের নূপুর বাজে॥
আমার প্রতি নিশ্বাসে মা রক্তধারার মাঝে
প্রাণের অনুরণনে তোর চরণধ্বনি বাজে।
গভীর প্রণব ওংকারে তোর কালী
(মা গো মহাকালী)
তাথই নাচের শুনি করতালি
সেই নৃত্যলীলার স্তবগাথা গান
চরণতলে নটরাজে॥

৫৪

জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়।
ত্রিভুবনবাসী ছেলেমেয়ে আয় রে ছুটে আয়॥
আনন্দ আজ লুট হতেছে কে কুড়াবি আয়।
আনন্দিনী দশভুজা দশ হাতে ছড়ায়॥
মা অভয় দিতে এল ভয়ের অসুর দলে পায়।
আজ জিনব জগৎ মাভৈঃ বাণীর বিপুল ভরসায়॥
বুকের মাঝে টইটুম্বুর ভরা নদীর জল
ওরে দুলছে টলমল।
ঝিলের জলে ফুটল কত রঙের শতদল
ছুঁতে মায়ের পদতল॥
দেব-সেনারা বাচ খেলে রে আকাশ-গাঙের স্রোতে,
সেই আনন্দে যোগ দিবে কে, আয় রে বাহির-পথে।
আর যেতে দেব না মাকে রাখব ধরে পায়—
মাতৃহারা মা পেলে কি ছাড়তে কভু চায়॥

৫৫

তোর কালো রূপ দেখতে মা গো
কালো হল মোর আঁখি।
চোখের ফাঁকে যাস পালিয়ে
মা তুই কালো পাখি॥
আমার নয়ন-দুয়ার বন্ধ করে এই দেহ-পিঞ্জরে
চঞ্চলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধরে,
চোখ চেয়ে তাই খুঁজি তোরে পাইনে ভুবন ভরে
সাধ যায় মা জন্ম জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি॥
তোর কালো রূপের বিজলি-চমক কোটি লোকের জ্যোতি,
অনন্ত তোর কালোতে মা, সকল আলোর গতি!
তোর কালো রূপকে বলে মা 'তমঃ',
ওই রূপে তুই মহাকালী মা গো নমো নমঃ
তুই আলোর আড়ালে টেনে মা গো
দিসনে মোরে ফাঁকি॥

৫৬

বল মা শ্যামা বল, তোর বিগ্রহ কী মায়া জানে,
(আমি) যত দেখি তত কাঁদি ওইরূপ দেখি মা সকলখানে॥
মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে
চোখ ফিরাতে নারে-মা গো, কাঁদে বুকে রেখে।
তোর মূর্তি মোরে তেমনি করে টানে মা গো মরণটানে॥
ওমা, রাত্রে নিতুই ঘুমের ঘোরে দেখি বুকের কাছে
যেন, বিগ্রহ তোর মায়ের মতো জড়িয়ে মোর আছে।
জেগে উঠে আঁধার ঘরে
কাঁদি যবে মা তোর তরে,
দেখি বিগ্রহ তোর কাঁদছে যেন চেয়ে চেয়ে আমার পানে॥
(দেখি) আরশিতে মুখ দেখতে গিয়ে মূর্তি তোরই রাজে,
মুদলে আঁখি বিগ্রহ তোর দেখি বুকের মাঝে,
আর কতকাল ছবি দিয়ে
রাখবি মোরে মা ভুলিয়ে,
তোর কোলে মা যাব কবে, শান্তি কবে পাব প্রাণে॥

৫৭

মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিবে ঘরে,
শূন্য ভুবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার করে॥
মা যে নদীর ঢেউ-এর মতো,
পালিয়ে বেড়ায় অবিরত,
হৃদয়-ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় সরে॥
বিসর্জনের প্রতিমা এ নয়
(এরে) নিত্য কাছে রাখতে সাধ হয়
পাষাণ দেউল ঘিরে রে ভাই বেঁধে ভক্তিডোরে॥
সেই মাকে মোর ভাসিয়ে নদীর জলে
মাতৃহারা শিশুর মতো কাঁদি 'মা মা' বলে।
তেমনি সুদিন আসবে কবে
(মার) নিত্য আগমনি হবে
বিশ্ব-চরাচরে॥

৫৮

কে সাজাল মাকে আমার
বিসর্জনের বিদায়-সাজে।
আজ সারাদিন কেন এমন
করুণ সুরে বাঁশি বাজে॥
আনন্দেরই প্রতিমাকে, হায়
বিদায় দিতে পরান নাহি চায়।
মাকে ভাসিয়ে জলে কেমন করে
রইব আঁধার ভবন মাঝে॥
মা-র আগমনে বেজেছিল
প্রাণে নতুন আশার বাঁশি।
দুখ-শোক-ভয় ভুলেছিলাম
(দেখে) মা অভয়ার মুখের হাসি।
মা দশ হাতে আনন্দ এনেছিল,
বিশ হাতে আজ দুঃখ ব্যথা দিল ;
মা মৃন্ময়ীকে ভাসিয়ে জলে
পাব চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে॥

৫৯

(আমার) আনন্দিনী উমা আজও
এল না তার মায়ের কাছে।
হে গিরিরাজ দেখে এসো
কৈলাসে মা কেমন আছে॥
মোর মা যে প্রতি আশ্বিন মাসে
মা মা বলে ছুটে আসে ;
মা আসেনি বলে আজও
ফুল ফোটেনি লতায় গাছে॥
তত্ত্ব-তালাশ নিইনি মায়ের
তাই বুঝি মা অভিমানে
না এসে তার মায়ের কোলে
ফিরিছে শ্মশানে মশানে।
ক্ষীর নবনী লয়ে থালায়
কেঁদে ডাকি, 'আয় উমা আয়!'
যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন
তাকে ছেড়ে মা কি বাঁচে॥

৬০

আমার উমা কই, গিরিরাজ,
কোথায় আমার নন্দিনী ?
এ যে দেখি দশভুজা
এ কোন রণরঙ্গিণী॥
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে,
এ কোন দেবীমূর্তি নিয়ে এলে।
এ যে মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষমর্দিনী॥
মোর মধুর স্নেহে জ্বালতে আগুন
আনলে কারে ভুল করে,
এরে কোলে নিতে হয় না সাহস,
ডাকতে নারি নাম ধরে।
মা, কে এলি তুই দনুজদলনী বেশে,
কন্যারূপে মা বলে ডাক হেসে,
তুই চিরকাল যে দুলালি মোর
মাতৃস্নেহে বন্দিনী॥

৬১

সংসারেরই দোলনাতে মা
ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলি ?
আমি অসহায় শিশুর মতো
ডাকি মা দুই বাহু মেলি ॥
মোর অন্য শক্তি নাই মা তারা
'মা' বুলি আর কান্না ছাড়া,
তোরে না দেখলে কেঁদে উঠি
(তোর) কোল পেলে মা হাসি খেলি ॥
(ওমা) ছেলেরে তোর তাড়ন করে
মায়ারূপী সৎমা এসে
ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয়
পাপ এল পুতনির বেশে।

মরি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে মা,
শ্যামা আমায় কোলে নে মা,
আমি ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি
দয়াময়ী মা কি এলি ॥

৬২

আয় বিজয়া আয় রে জয়া
উমার লীলা যা রে দেখে।
সেজেছে সে মহাকালী
চোখের কাজল মুখে মেখে ॥
সে ঘুমিয়েছিল আমার কোলে
জেগে উঠে কেঁদে বলে :
আমায় কালী সাজিয়ে দে মা
ছেলেরা মোর কাঁদছে ডেকে ॥
চেয়ে দেখি মোর উমা নাই নাচে কালী দিগম্বরী ;
হুংকার দেয় কোটি গ্রহের মুণ্ডমালা গলায় পরি।
আমি শুধু উমায় চিনি,
এ কোন মহা মায়াবিনী
কালো রূপে বিশ্বভুবন
আকাশ পবন দিল ঢেকে।

৬৩

সর্বনাশী! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই?
শ্মশান ছাড়া খেলবার তোর জায়গা কি আর নাই॥
মুক্তকেশী, কেশ এলিয়ে
বেড়াস কখন কোথায় গিয়ে,
এক নিমেষও তোকে নিয়ে শান্তি নাহি পাই॥
হাড়-জ্বালানি মেয়ে! হাড়ের মালা কোথায় পেলি?
ভুবনমোহন গোরী-রূপে কালি মেখে এলি!
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
ধুইয়ে দেব, আয় মা কোলে।
তোরে বুকে ধরেও মরি জ্বলে, দিই মা গালি তাই।

৬৪

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে,
কে দিয়েছে গালি
(তারে) কে দিয়েছি গালি।
রাগ করে সে সারা গায়ে
মেখেছে তাই কালি॥
যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে
আরও মধুর লাগে তাহার হাসি মুখের চেয়ে।
কে কালো দেউল করল আলো
অনুরাগের প্রদীপ জ্বালি॥
পরেনি সে বসন-ভূষণ, বাঁধেনি সে কেশ,
তারই কাছে হার মানে রে ভুবনমোহন বেশ।
রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে
দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে;
(আমার) রাগি মেয়ে, তাই তারে দিই
জবা ফুলের ডালি॥

৬৫

শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম।

মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু
ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম ॥
ডুবে শ্যামা-যমুনাতে
খেলব খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোর হানবে হেলা
মা পুরাবেন মনস্কাম ॥
আমার মনের দো-তারাতে
শ্যামা ও শ্যামা দুটি তার,
সেই দো-তারায় ঝংকার দেয়
ওংকার রব অনিবার ॥
মাহামায়ার মায়ার ডোরে
আনবে বেঁধে শ্যাম কিশোরে,
কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখব সেথায় ব্রজধাম ॥

৬৬

ওমা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে
যে চোখ তোরে দেখতে পায়।
সে নয়ন-তারায় কাজ কী তারা
যে তারা লুকায় মা তারায় ॥
চাইনে সে চোখ যে চোখ দেখে মায়া,
অনিত্য এই সংসারেরই ছায়া,
যে দৃষ্টি দেখে নিত্য তোরে
সেই দৃষ্টি দে আমায় ॥
ওমা নিভিয়ে দে এ নয়ন-প্রদীপ
দেখায় যাহা দুঃখ-শোক,
এই আলেয়া পথ ভুলিয়ে
যায় মা নিয়ে নরলোক।

তোর সৃষ্টি চির-আনন্দময় না কি!
দেখব সে লোক, দে মোরে সেই আঁখি;
দেখে মা রোগ-মৃত্যু-জরা যা
তোর সন্তান সেই দৃষ্টি চায় ॥

৬৭

মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে,
হাত ধরে মোর নিয়ে যা মা!
পথ নাহি পাই, যে দিকে চাই
দেখি আঁধার ঘোর ত্রিযামা॥
আমি নিজে পথ চলিতে চাই
বারে বারে পথ ভুলি মা তাই
মায়া কূপে পড়ে কাঁদি
কোথায় দয়াময়ী শ্যামা॥
মা তুই যবে হাত ধরে চলিস, রয় না পতন-ভয়
তুই যবে পথ দেখাস মা গো, সে পথ জ্যোতির্ময়।
কী হবে জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে সাথে,
বৃথা এ দীপ জন্মান্ধের হাতে
মা তুই যদি হস নির্ভর মোর
পথের ভয় আর রবে না মা॥

৬৮

আমার শ্যামা বড়ো লাজুক মেয়ে
কেবলই সে লুকাতে চায়।
আলো-আঁধার পর্দা টেনে
(ভীরু) বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায়॥
নিখিল ভুবন আছে তারে ঘিরে,
(আমার) মেয়ে তবু বসন খুঁজে ফিরে;
তারে যে দেখে সে এক নিমেষে
তারই মাঝে লয় হয়ে যায়॥
কোটি শিব ব্রহ্মা হরি অনন্তকাল গভীর ধ্যানে
তার সে লুকোচুরি খেলায় পায় না দিশা, পায় না মানে।

রবি-শশী গ্রহ-তারার ফাঁকে
যে দেখেছে পালিয়ে যেতে মাকে;
সে আপনাকে আর পায় না খুঁজে
মায়াবিনীর মহামায়ায়॥

৬৯

আমার মা আছে রে সকল নামে,
মা যে আমার সর্বনাম।
যে নামে ডাক শ্যামা মাকে
পুরবে তাতেই মনস্কাম॥
ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে
যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে,
সেই নামে মা দেয় রে ধরা
কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম।
এক সাগরে মিশে গিয়ে
সকল নামের নদী
সেই হরিহর কৃষ্ণ ও রাম,
দেখিস তাঁকে যদি,
নিরাকার সাকারা সে কভু,
সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু,
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ,
সর্বলোকে তাঁহার ধাম॥

৭০

ও মা, তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মা গো—
দেখি শুধু কালো॥
সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি,
ও মা, আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি?
ও মা ছেলে কেন মন্দ হল, জননী যার ভালো।
তুই নিত্য মহাপ্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি
কেন, চির-শূন্য রইল মা গো আমার ভিক্ষার ঝুলি?
বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধুজলে রয়ে,
তোর চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে।
মোর জীবন্মৃত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো॥

৭১

ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস
আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া।
তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিধারা॥
ও মা তুই আশ্রয় দিলি না তাই
আমি যা পাই তা পথে হারাই
তোর রসময় ভুবন আমার শ্মশান হল, ও মা তারা॥
আজ আনন্দ-যমুনা ফেলে এসেছি তাই যমের দ্বারে,
ও মা জীবনে যা পেলাম না তা মরণ যদি দিতে পারে।
ও মা তত বাড়ে বুকের জ্বালা
পাই যত যশ খ্যাতির মালা॥
রাজপ্রাসাদে শুয়ে, মাগো, শান্তি কি পায় মাতৃহারা॥

৭২

আমার মানস-বনে ফুটেছে রে
শ্যামা-লতার মঞ্জরী।
সেই মঞ্জুবনে ফিরছে রে তাই
ভক্তি-ভ্রমর গুঞ্জরি॥
সেথা আনন্দে দেয় করতালি
প্রেমের কিশোর বনমালী
সেই লতামূলে শিবের জটায়
গঙ্গা ঝরে ঝরঝরি॥
কোটি তরু শাখা মেলি
এই সে লতার পরশ চায়,
শিরে ধরে ধন্য হতে
এই শ্যামারই শ্যাম শোভায়।
এই লতারই ফুল সুবাসে
কোটি চন্দ্র সূর্য আসে নীল আকাশে
এই লতার ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে
ত্রিলোক আছে প্রাণ ধরি॥

৭৩

শ্যামা নামের লাগল আগুন
আমার দেহ-ধূপকাঠিতে।
যত জ্বালি সুবাস তত
ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে॥

ভক্তি আমার ধূপের মতো
উর্ধ্বে ওঠে অবিরত,
শিবলোকের দেব-দেউলে মা-র শ্রীচরণ পরশিতে ॥
অন্তরলোক শুদ্ধ হল পবিত্র সেই ধূপ-সুবাসে,
(ওরে) মা-র হাসিমুখ চিত্তে ভাসে চন্দ্রসম নীল আকাশে।
সব কিছু মোর পুড়ে কবে
চিরতরে ভস্ম হবে,
মা-র ললাটে আঁকব তিলক সেই ভস্ম-বিভূতিতে ॥

৭৪

ওমা খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে,
নয়ন দিয়ে বহে ধারা।
(এমন) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা তোরই সাজে তারা ॥
করে অসুর মুণ্ডরাশি
অধরে না ধরে হাসি
(তুই) জানিস মরলে তোর আঘাতে তোরই কোলে যাবে তারা।
(মা) দুই হাতে তোর বর ও অভয়
আর দু-হাতে মুণ্ড অসি,
ললাটে তোর পূর্ণিমা চাঁদ
কেশে কৃষ্ণা চতুর্দশী।
(তুই) জননী-প্রায় আঘাত করে,
দিস মা দোলা বক্ষে ধরে,
(তুই) পাপমুক্ত করার ছলে অসুর বধিস ভব-দারা ॥

৭৫

আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা, দেহ বিল্বদল।
মুক্তি পাব ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল ॥
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম,
মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম,
মোর অশ্রু দেব মা-র চরণে, সেই তো গঙ্গাজল ॥
মোর আনন্দ মাকে দেব তাই হবে চন্দন,
মোর পুষ্পাঞ্জলি হবে আমার প্রাণ মন।

মোর জীবন হবে আরতি-দীপ,
মোর গুরু হবেন শংকর শিব,
মোর কাঁটার জ্বালা পদ্ম হবে শুভ্র সুনির্মল।

৭৬

যে কালীর চরণ পায় রে কালীর চরণ পায়।
সে মোক্ষ মুক্তি কিছুই নাহি চায়॥
সে চায় না স্বর্গ চায় না ভগবান,
শ্রীকালীর চরণ আত্মা তাহার দেহ-মন ও প্রাণ ;
সে কালীর চরণ ছেড়ে ব্রহ্মলোকেও নাহি যায়॥
শিবের জটার গঙ্গা নিত্য চরণ ধোয়ায় যাঁর
যোগ-সাধনা আরাধনা সে জানে না ভাই
ওই চরণ তাহার সার॥
ধর্মাধর্ম ভেদ জানে না সে বলে সবাই মায়ের ছেলে,
বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরে চাঁড়াল কাছে এলে ;
সে বেদ-বেদান্ত জানে না শ্রীকালীর নাম গায়॥

৭৭

তোরই নামের কবচ দোলে
আমার বুকে, হে শংকরী !
কী ভয় দেখাস ? আমি তোকেও
ভয় করি না, ভয়ংকরী॥
মৃত্যু-প্রলয় তাদের লাগি
নয় যারা তোর অনুরাগী
(ও মা) তোর শ্রীচরণ আশ্রয় মোর
(দেখে) মরণ আছে ভয়ে মরি॥
আমি তোরই মাঝে ঘুমাই জাগি,
তোরই কোলে কাঁদি হাসি !
তোর যদি না হয় মা বিনাশ
মা আমিও অবিনাশী॥
(তোর) চরণ ছেড়ে পালায় যারা
মায়ার জালে মরে তারা
তোর মায়াজাল এড়িয়ে গেলাম
মা তোর অভয়-চরণ ধরি॥

৭৮

মাতৃনামের হোমের শিখা
আমার বুকে কে জ্বালাল।
সেই শিখা আজ হরবে যেন
ত্রিজগতের আঁধার কালো॥
আজ মনে হয় দিবস যামী
অমৃতেরই পুত্র আমি
আনন্দময় হল ত্রিলোক
যেদিকে চাই কেবল আলো॥
সূর্য যেমন জানে না, তার
আলোয় কত জগৎ জাগে,
বিকারবিহীন তেমনি আমি,
জ্বলি নামের অনুরাগে।

হয়তো আমার আলোক লেগে
নতুন সৃষ্টি উঠছে জেগে,
তাই কি বিপুল আকর্ষণে
সবারে চাই বাসতে ভালো।

৭৯

আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি।
যা আছে সব কিছু মোর লুটে নে মা রাতারাতি॥
আয় মা মশাল জ্বেলে ডাকাত ছেলে ভৈরবদের করে সাথি;
জমেছে ভবের ঘরে অনেক টাকা যশঃ খ্যাতি।
কেড়ে মোর ঘরের চাবি নে মা সবই পুত্রকন্যা স্বজন জ্ঞাতি।
মায়ার দুর্গে আমার দুর্গা নামও হার মেনেছে;
ভেঙে দে সেই দুর্গ, আয় কালিকা তাথই নেচে।
রবে না কিছুই যখন রইবে ভাঁড়ে মা ভবানী
পাব সেদিন টানব না আর মায়ার ঘানি।
খালি হাতে তালি দিয়ে কালী বলে উঠব মাতি,
কালী কালী বলে খালি হাতে তালি দিয়ে উঠব মাতি।

৮০

আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা
ওমা, তোর মুক্তি-সাগর কূলে।
মোর, ভিক্ষা ঝুলি হতে মায়ার
মুক্তামানিক নে মা তুলে॥
মা তুই, সবই জানিস অন্তর্যামী,
সেই চরণ-প্রসাদ ভিক্ষু আমি,
শবেরও হয় শিবত্ব লাভ, মা, তোর যে চরণ ছুঁলে॥
তুই, অর্থ দিয়ে কেন ভুলাস
এই পরমার্থ-ভিখারিরে,
তোর, প্রসাদিফুল পাই যদি মা
গঙ্গাধারাও চাই না শিরে॥
তোর, শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী
আমি, হতে পারি ব্রহ্মজয়ী,
সেই, মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতে নাহি ভুলে।

৮১

আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের
নাম রেখেছি কালী।
পাছে লোকের দৃষ্টি লাগে
মাখিয়ে দিলাম কালি
তার, সোনার অঙ্গে মাখিয়ে দিলাম কালি॥
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে
দিয়েছি তার কেশ এলিয়ে,
তবু, আনন্দিনী নন্দিনী মোর দেয় রে করতালি।
নেচে নেচে দেয় রে করতালি।
চোখে চোখে রাখি তারে, পাছে সে হারায় ;
তাই, কালো মেয়ের রূপ লেগেছে মোর আঁখিতারায়।
সে শ্মশানপথে বেড়ায় একা,
সহজে সে দেয় না দেখা (রে),
শুধু, বনের জবা জানে আমার মেয়ে রূপের ডালি॥

৮২

আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
শ্যামা-ভাবসমাধিতে।
শ্যামা-রসে যে-মন আছে ডুবে
কাজ কীরে তার যশ-খ্যাতিতে।
মধু যে পায় শ্যামা-পদে
কাজ কী রে তার বিষয়-মদে,
মুক্ত যে-মন যোগমায়াতে
ভাবনা কী তার রোগ-ব্যাধিতে।
কাজ কী রে তার লক্ষ টাকায়,
মোক্ষ-লক্ষ্মী যাহার ঘরে ;
কত, রাজার রাজা প্রসাদ মাগে
সেই ভিখারির পায়ে ধরে।

ও মা, শান্তিময়ী অন্তরে যার,
দুঃখ-শোকে ভয় কী রে তার,
সে, সদানন্দ সদাশিব জীবন্মুক্ত ধরণিতে॥

৮৩

থির হয়ে তুই বোস দেখি মা
খানিক আমার আঁখির আগে।
দেখব নিত্য-লীলাময়ী,
থির হলে তুই কেমন লাগে॥
শান্ত হলে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখব চেয়ে,
চিন্ময় শিবশম্ভু কেন চরণতলে শরণ মাগে॥
দেখব চেয়ে জননী তুই সাকারা না নিরাকারা,
কেমন করে কালী হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতির্ধারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে
শ্মশান জাগিস বাহু মেলে,
কেমন করে মহামায়ার বুকে মায়ের মায়া জাগে।

দেবীস্তুতি

ন.র.-৫ম—২০

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭৫
অক্টোবর ১৯৬৮

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত গানগুলির তালিকা

প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি
মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
জয় মহাকালী মধুকৈটভ বিনাশিনী
হ্রীঙ্কাররূপিণী মহালক্ষ্মী
মায়ের আমার রূপ দেখে যা
ঘরছাড়াকে বাঁধতে এলি
সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে
নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জয়, রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা
নীলোৎপল নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী
মা গো তুই কার নন্দিনী

প্রস্তাবনা

প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি
গৌরি শিবে সিদ্ধিবিধায়িনি।
মহামায়া অম্বিকা আদ্যাশক্তি
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনি॥
শুম্ভনিশুম্ভ-বিমর্দিনি চণ্ডি
নমো নমঃ দশপ্রহরণধারিণি॥
দেবি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রি
জয় মহিষাসুরসংহারিণি॥

যুগে যুগে দনুজদলনী মহাশক্তি
যোগনিদ্রা মধুকৈটভনাশিনি
বেদ-উদ্ধারিণি মণি-দ্বীপবাসিনি
শ্রীরাম অবতারে বরাভয়দায়িনি॥

তন্ত্রে শ্রীমহাকাল বলিতেছেন : 'মা ব্রহ্মময়ী! তুমি চিন্তার অতীত হইয়াও সাকার শক্তিস্বরূপা। তুমি প্রতি জীবে একমাত্র সত্ত্বমূর্তিতে অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমি সত্ত্বাদি গুণের অতীতা — নির্গুণা; রাগাদি দ্বন্দ্বরহিতা — কেবলমাত্র অনুভবের সামগ্রী। মা! তুমি পরব্রহ্মরূপিণী!

যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, জল ও তাহার শীতলতা যেমন অভিন্ন, পরমাত্মা ও আদ্যাশক্তিও তেমনই অভিন্ন।

আদি-অন্তহীন কালের বক্ষে লীলা করেন বলিয়া তিনি কালী। বিশ্বের সকল কিছুকে আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। তিনিই শিব, তিনিই রাম, তিনিই হ্লাদিনী শক্তি রাধা। বিশ্বের সকল জড়-জীব বিভিন্ন নামে তাঁহাকেই উপাসনা করে। সকল নামের নদী — ওই পরমাত্মারূপিণী মহাসাগরে গিয়া মিলিয়াছে — এক কথায় তিনি সর্বনাম। যিনি নির্গুণা, নিরাকারা, চৈতন্যরূপিণী, কেবল অনুভব-সিদ্ধা, তাঁহাকে কোন নামে ডাকিব? তিনিই আদি পিতা, তিনিই আদি মাতা, অথচ তিনি পুরুষও নন, নারীও নন।

জীব যখন তাঁহাকে পিতা, স্বামী, সখা পুত্র-রূপে উপাসনা করে, তখন তিনি পুরুষরূপে দেখা দেন। মাতা বলিয়া, কন্যা বলিয়া স্তুতি করে, তখন তিনি নারীরূপে আবির্ভূতা হন। যে যোগী অরূপের পিয়াসি, তাহাকে তিনি দেখা দেন জ্যোতিঃরূপে, চিন্ময়রূপে। রূপ অরূপে লয় হইতেছে, আবার অরূপ রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। — ইহাই তাহার সৃষ্টি প্রলয়-লীলা। বরফ গলিয়া জল হইতেছে, জল বাষ্পে পরিণত

হইতেছে — বাষ্প মেঘ হইয়া বৃষ্টিধারায় গলিয়া পড়িতেছে। আবার সেই বৃষ্টিধারার জলরাশি বরফে পরিণত হইতেছে। যোগাদৃষ্টিসম্পন্ন পূর্ণজ্ঞানীর কাছে যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার। তাঁহার কাছে বুদ্ধের শূন্যবাদ ও শঙ্করাচার্যের পরিপূর্ণবাদ দুই-ই সত্য। এই আদ্যাশক্তি যখন সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্মা, যখন পালন করেন তখন তিনি বিষ্ণু, যখন সংহার করেন তখন তিনি রুদ্র। আবার যখন তিনি নিত্য রাস-লীলা করেন, তখন তিনি কৃষ্ণ। যখন তিনি কিছুই করেন না, তখন তিনি নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম।

অগ্নি অন্য জিনিসকে প্রকাশ করে, আলো ও উত্তাপ দান করে, আবার সেই অগ্নি দগ্ধও করে, অথচ অগ্নির কাহারও উপর প্রেম বা বিদ্বেষবুদ্ধি আছে এমন কথা কেহ বলিবেন না। আগুন যেমন নির্বিকার, তিনিও তেমনই অগ্নির মতোই বিকারহীন। যে-যে প্রয়োজনে তাঁহাকে ডাকে তিনি তাহার সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করেন। আগুনকে প্রদীপ করিয়া জ্বালাও, সে আলো দান করিবে ; তাহাকে ভাত তরকারি রান্নার বা অন্য যে-কোনো কাজে নিযুক্ত কর, সে তাহাই করিয়া দিবে ; আবার তাহাকে দিয়া ঘর জ্বালাও, সে নির্বিকারভাবে দগ্ধ করিবে। ভালো কাজে লাগাইলে অগ্নি মঙ্গলরূপে তোমার মঙ্গল সাধন করিবে, ঘর জ্বালাইলে তাহার শাস্তিও তোমায় ভোগ করিতে হইবে, লোকে ধরিয়া উত্তম-মধ্যম দিবে, উপরন্তু কারাগারে দিয়া ঘানি টানাইবে। আমরা সেই আনন্দরূপিণী মহাশক্তিকে এইরূপে আত্মারামের ঘর জ্বালাইবার কাজে লাগাইয়া সংসার-কারার ঘানি টানিয়া মরিতেছি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া। বিষয়-বুদ্ধি-দোষ-দুষ্ট সাংসারিক লাভালাভের জন্য যাহারা তাঁহার তপস্যা করে, তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ-শোকাদিও ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানীগণ দেখিলেন, অর্থ যশ সম্মান প্রতিষ্ঠা পুত্রাদি লাভে নিত্য আনন্দ বা শান্তি লাভ করা যায় না, তাই তাঁহারা কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই এক হইয়া যাওয়াই মোক্ষ বা মুক্তি।

তিনি সকল জাতির উপাস্য প্রভু। বিশ্বের সকল জড়-জীব, প্রাণী, এই পৃথিবীর সকল ধর্ম, সকল জাতি, তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহারই লীলার প্রকাশ। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জাতি তাঁহারই বৈচিত্র্যের প্রকাশ মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে সকল মানুষ একদিনেই এক-ধর্মাবলম্বী হইয়া যাইত। তিনি নানা রঙের ফুলে এই ধরণির বাগান সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর এই বহু ধর্ম, জাতি সেই রঙের খেলা মাত্র। পৃথিবীতে যখন তুফান, বন্যা, ঝড়, মহামারি, ভূমিকম্প আসে তখন সকল জাতি, সকল মানুষ একসাথেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; আবার তাঁহার বিগলিত করুণারূপে যখন শীতল বৃষ্টিধারা ঝরে তারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের ঘরে ঘরে, সকল জাতির শিরে শিরে, সকল মানুষের মাঠে-ঘাটে বর্ষিত হয়। তাঁহার কাছে ভেদ-জ্ঞান নাই। সকলেই যে তাঁহারই সৃষ্টজীব! ঐকান্তিক আগ্রহে, একনিষ্ঠ তপস্যা দিয়া যে তাঁহাকে যেই নামে ডাকে তিনি তাহার কাছে সেই নামে সাড়া দেন। তিনিই পরমাত্মা, পরব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি।

আদ্যাশক্তি

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা।
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোকপালিকা॥
মহাকালী মহাসরস্বতী
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা॥
কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মা মহামায়া তব মায়ায়
সৃষ্টি করিয়া করিতেছ লয় সমুদ্রে জলবিম্বপ্রায়।
অচিন্ত্য পরমাত্মারূপিণী
সুর-নর-চরাচর-প্রসবিনী ;
নমস্তে শিবে অশুভনাশিনী, তারা মঙ্গলসাধিকা॥

বিভিন্ন অবতারে জীবের কল্যাণের জন্য তাহারই অংশ-শক্তি আবির্ভূতা হন। তাঁহার সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেন দেবদেবী, যোগী, মুনিঋষি প্রভৃতি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নর-নারী। অন্যে দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করে না। কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায় না, তাহাদের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়। তাহাদের ওই দেখা ভুল দেখা। তিনি নিত্যা, তিনি উৎপন্না হন না ; যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের উৎপীড়ন চলে, তাঁহার সৃষ্ট জীব দানব-শক্তির দ্বারা নিপীড়িত হয়, নির্জিত হয়, তখনই তাঁহার শক্তি অবতার রূপে প্রকাশিত হয়। এই পৃথিবীতে তখনই সেই পীড়নকারী অসুরশক্তির সংহার করিয়া তিনি জগতে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা সৎ, যাহা মঙ্গলময়, যাহা জীবের শুভদ, তাহারই সন্ধান দিয়া সেই অবতাররূপিণী শক্তিধ্রুবজ্যোতিঃ অনন্ত শক্তিতে বিলীন হন। নারীরূপে পরমাত্মার যে অবতাররূপে প্রকাশ, আমরা আজ তাঁহারই বন্দনা-গান গাহিব। তাঁহার প্রথম অবতার মহাকালীরূপে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন পৃথিবী কারণ-সলিলে নিমগ্ন ছিল সেই সময় মধু-কৈটভ নামক দুই দৈত্য ব্রহ্মধ্যানরত ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, কিন্তু যোগ-নিদ্রাভিভূত বিষ্ণুকে জাগাইতে না পারিয়া ব্রহ্মা যোগ-নিদ্রারূপিণী শক্তির স্তব করেন। যিনি যোগনিদ্রা হইয়া বিষ্ণুকেও অচেতন করিয়া রাখেন, সেই সকল শক্তির শক্তি, ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া গেলে, বিষ্ণুও জাগ্রত হইয়া মধুকৈটভকে নিহত করেন। ইহাই হইল মধুকৈটভ-বধ উপাখ্যানের সারাংশ।

আমার স্বল্প-পরিসর জ্ঞানে, এই মধুকৈটভ-বধের যে অর্থ প্রতিভাত হইয়াছে তাহা বলিতেছি : মধুকৈটভ আর কেহ নয়, অধৈর্য ও অবিশ্বাস নামক দুই দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধুকৈটভের উৎপত্তি। বিষ্ণু অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার কর্ণমূল অর্থে আমি মনে করি, দিবারাত্রি আমরা পণ্ডিতগণের নিকট যে বিচার-তর্ক ইত্যাদি শুনি — তাহাই। এই ব্রহ্মজ্ঞান-পণ্ডকারী পণ্ডিতদের কূটতর্ক বিচার প্রভৃতিই আমাদের বিশ্বাস স্থিত হইতে দেয় না। এই কর্ণমূল হইতেই অধৈর্য ও অবিশ্বাসরূপী মধুকৈটভের জন্ম। দেবী-ভাগবতে আছে, এই মধুকৈটভ আবার বাগ্‌বীজসিন্ধ। কাজেই বাগ্‌বিতণ্ডাই যে মধুকৈটভের পিতামাতা, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

অধৈর্য ও অবিশ্বাস, এই দুই ভাই, ব্রহ্মা অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থির থাকিতে দেয় না। সর্বদাই তাহাকে তাড়না করে। তখনই রজোগুণ-সম্পন্ন অর্থাৎ তপস্যার অহংজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণুর অর্থাৎ সত্ত্বগুণের শরণাপন্ন হন ; কিন্তু সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেও এই দুই দৈত্যের অর্থাৎ অধৈর্য ও অবিশ্বাসের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। তখন পরমাত্মারূপিণী আদ্যশক্তির শরণাপন্ন হইলে তাঁহার করুণায় বিষ্ণু বা সত্ত্বগুণ অধৈর্য ও অবিশ্বাসীরূপী দুই দৈত্যকে নিহত করেন। তখনই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিতি হয়। এই জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের আগে 'ব্রহ্মরন্ধ্রে মধুকৈটভ-বধ মাহাত্ম্যায় নমঃ' বলিয়া মাহাত্ম্যন্যাস করিতে হয়। যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী ব্রহ্মরন্ধ্রে এই দুই দৈত্যকে নিহত করেন। দেবীর প্রথম অবতার মহাকালীরূপে। এইরূপে তিনি মধুকৈটভকে সম্মোহিত করেন এবং বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করেন।

মহাকালী

জয় মহাকালী মধুকৈটভ-বিনাশিনী।
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া
ধর্ম-প্রদায়িনী॥
ভয়াতুর ব্রহ্মা অসুর-আশঙ্কায়,
বিষ্ণু নিদ্রাতুর তোমার মায়ায়,
রাজসিক সাত্ত্বিক দুই মহাদেবতায়
রক্ষা করো মা তুমি মহাভয়হারিণী॥
নীলজ্যোতির্ময়ী অসীম তিমিরকুন্তলা মা গো,
আসন্ন প্রলয়পয়োধির ঊর্ধ্বে দেখা দাও, জাগো!
দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো,
দশ হাতে দশবিধ আয়ুধ আনো,
দশ-মুখকমলে অভয়বাণী
শোনাও আর্তজনে বিপদবারিণী॥

পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মীরূপে। এইরূপে তিনি মহিষাসুর বধ করেন। আমাদের দেশে শ্রীদুর্গারূপে ইনি পূজিতা হন। প্রথম অবতার মহাকালীরূপা পরমাত্মার সংহার-শক্তি, দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মী রাষ্ট্রীয় শক্তি। এই মহাভারত যখনই তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়াছে তখনই মহালক্ষ্মীরূপিণী শ্রীদুর্গার শরণাপন্ন হইয়া সে তাহার বিলুপ্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপেই পূজান্তে বর লাভ করিয়া রাবণকে নিহত করিয়া ভারতে ধর্ম-অর্থ-শ্রী সম্পদরূপিণী সীতার উদ্ধার করেন। দেবশক্তি এই ক্রোধরূপী মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন বিষ্ণু ও শিবের শরণাপন্ন হন তখন তাঁহাদের ও অন্যান্য দেববৃন্দের তেজ হইতে সমুৎপন্না হন এই মহাশক্তি। অতএব ইনি সমস্ত দেবতার একীভূতা শক্তিস্বরূপা। অর্থাৎ সমস্ত দেবশক্তি

একত্রীকৃত হইলে অবলুপ্ত স্বর্গ বা রাষ্ট্রীয় শক্তি উদ্ধার হয়। ইহাই এই অবতারের ইঙ্গিত। ইনি জীবকে, জগৎকে শ্রী-সম্পদরূপ যশ, খ্যাতি, জ্ঞান, মোক্ষ, মুক্তি, শান্তি দান করেন। মহিষাসুর ক্রোধের প্রতীক। ক্রোধই অশান্তি, অতৃপ্তি, বিরোধ, হিংসা, দ্বেষ, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতি অকল্যাণের হেতু। অক্রোধ অর্থাৎ প্রেম ব্যতীত সাম্য আসিতে পারে না। এই ক্রোধরূপী মহিষাসুর নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অতৃপ্তি, অশান্তি, বিরোধ, হিংসা, কলহ প্রভৃতি জগতের সমস্ত অকল্যাণ বিদূরিত হয়। উহারাই মহিষাসুরের সেনাবৃন্দ। ক্রোধরূপী পশুকে হত্যা করেন বলিয়া দেবী পশুরাজ-বাহিনী। অর্থাৎ পশুশক্তি দেবশক্তির বাহন মাত্র। পশুকে হত্যা করিতে পশু হইবার প্রয়োজন নাই। পশুশক্তির সাহায্য অতীব প্রয়োজনীয়, তবু সে পশুশক্তি থাকিবে দেবশক্তির পায়ের তলায়।

ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতির জীবনে, নিখিল মনুষ্যসমাজে যখন অধৈর্য ও অবিশ্বাস বড়ো হইয়া ওঠে, তখন পরমাত্মার মহাকালী শক্তির শরণ লইলে, অধৈর্য অবিশ্বাস নিহত হয়, তাহারা ব্রাহ্মীস্থিতির মতো আনন্দে, শান্তিতে এই পৃথিবীতেই অমৃতভোগ করে। যোগী-মুনি-ঋষিরা সেই অমৃতের অধিকারী।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মনুষ্যসমাজে যখন অশান্তি, নিরাশা, সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ক্রোধরূপী মহিষাসুরের সেনাদল উৎপাত করে, তখন পরমাত্মার শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীর শক্তির শরণ লইলে এইসব উৎপাত দূর হয় ; তখন শ্রীসম্পদসম্পন্ন হইয়া আবার স্বর্গসুখ ভোগ করে।

মহালক্ষ্মী

হ্রীঙ্কাররূপিণী মহালক্ষ্মী
নমো অনন্ত কল্যাণদাত্রী।
পরমেশ্বরী মহিষমর্দিনী চরাচর-বিশ্ববিধাত্রী॥
সর্বদেব-দেবী-তেজোময়ী
অশিব-অকল্যাণ-অসুরজয়ী,
সহস্রভুজা ভীতজনতারিণী জননী জগৎ-ধাত্রী॥
দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও
দলন করো মা লোভ-দানবে।
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মান দাও,
দেবতা করো ভীরু মানবে।
শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক,
দুঃখ দারিদ্র্য অপগত হোক,
জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক
পোহাক এ দুর্যোগ রাত্রি॥

আদ্যাশক্তির তৃতীয় অবতার মহাসরস্বতীরূপী। এইরূপে তিনি শুম্ভনিশুম্ভ নামক দুই

মহাদৈত্যকে হত্যা করিয়া ত্রিলোকে শান্তি স্থাপন করেন।

জীবের কামনার অবসান না হইলে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ বা উপলব্ধি হয় না। শুম্ভনিশুম্ভ তাহারই নিদর্শন। তাহারা ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াও নিষ্কাম হইতে পারিল না। তাহাদের কামনা ভগবদ্‌শক্তিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তাহাদের তপস্যা, তাহাদের শক্তি ত্রিলোকের দুঃখের কারণ, পীড়নের হেতু হইয়া উঠিল। আবার দেবতারা পরমাত্মারূপিণী মহাশক্তির তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের আর্ত-প্রার্থনায় মূর্তি ধরিয়া আসিলেন মহাশক্তি — মহাসরস্বতীরূপে ; অর্থাৎ পরাজ্ঞানের শুদ্ধা কৌশিকীমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। পরাজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত কামনার অবসান হয় না। তাই শুদ্ধজ্ঞানরূপিণী মহাসরস্বতী জগতের কল্যাণের জন্য, জীবের আর্তি নিবারণের জন্য, কাম ও লোভের প্রতীক শুম্ভ-নিশুম্ভকে অর্থাৎ বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তিকে নিহত করিলেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাকালীর শরণ লইলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মীস্থিতি হয় ; সত্ত্বগুণ তাহার ধর্ম। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীর শরণ লইলে দেবশক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয় হয়। শ্রীশ্রীমহাসরস্বতীর শরণ লইলে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। এই তিন শক্তির ত্রিবেণী-তীর্থে জন্মগ্রহণ করেন সত্যকার ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মর্ষি।

মহাকালী দেন তেজ বা ব্রাহ্মণের তপস্যা, মহালক্ষ্মী দেন প্রেম, মহাসরস্বতী দেন জ্ঞান। এই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপিণী ত্রিধারা শক্তিই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

মহাসরস্বতী

মায়ের আমার রূপ দেখে যা
মা যে আমার কেবল জ্যোতি।
(মা-র) কৌশিকীরূপ দেখ রে চেয়ে
মা, শুদ্ধা মহাসরস্বতী॥
পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।
কোটি শ্বেত-শতদলে
বিরাজে মা বেদবতী॥
সপ্তস্বর্গ সপ্তপাতাল শুদ্ধ হয়ে উঠল নেয়ে
সাত্ত্বিকী মোর জগন্মাতার জ্যোতিঃসুধার প্রসাদ পেয়ে।
নৃত্যময়ী শব্দময়ী কালী
এল শান্তি-কল্যাণ-দীপ জ্বালি।
দেখ রে পরমাত্মায় সব
জননী সে জ্যোতিষ্মতী॥
[ইহার পরে দেবীর অংশরূপে আবির্ভূতা হন সতী ও উমা।]

সতী

ঘরছাড়াকে বাঁধতে এলি
কে মা অশ্রুমতী?
লীলাময়ী মহামায়া
দাক্ষায়ণী সতী॥
কে মা গো তুই কার দুলালি
যোগীন্দ্রেরও যোগ ভুলালি
তোর ছোঁওয়াতে স্নিগ্ধ হল
শিবের তপের জ্যোতি॥
সৃষ্টিরে তোর বাঁচাতে মা করিস কতই রঙ্গ;
তোর মায়াতে শংকরেরও ধ্যান হল তাই ভঙ্গ।
শুদ্ধ শিবে মুগ্ধ করে
চঞ্চলা তুই গেলি সরে।
হরের যদি জ্ঞান হরিস মা
মোদের কোথায় গতি?
আমরা যে তোর মায়ায় অন্ধ
জীব দুর্বলমতি।
ওমা, কোথায় মোদের গতি?

উমা

সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে।
শ্মশানবাসী হরের গলায় বরণ-মালা দুলাতে॥
সতীর শোকে ভৈরব-বেশ
প্রলয়-ধ্যানে মগ্ন মহেশ,
তাই নেমে এলি হিমালয়ে অটল শিবে টলাতে॥
তোর মায়াকে করবে মা জয়
নেই হেন কেউ ত্রিলোকে,
অনন্ত দেবদেবীরে তুই
ভুলাস মায়ায় পলকে
কৈলাসে তুই শিবালয়ে
রইলি এবার নিত্যা হয়ে,
প্রেমের কাছে হার মেনে তুই নেমে এলি ধুলাতে॥

পুরাকালের সেই ক্ষাত্র, বৈশ্য ও শূদ্রশক্তি কলিতে আবার ঘোর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে — তাই দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী—১১/৪১)

অর্থাৎ দেবী বলিলেন —

বৈবস্বত মনুর অধিকার সময়ে অষ্টাবিংশতিতম যুগে (কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে।

তাহার পরেই বলিতেছেন—

... ...
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥
(শ্রীশ্রীচণ্ডী-১১/৪২)

অর্থাৎ — আমি বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্বক এই অসুরদ্বয়কে নিহত করিব।

সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অষ্টাবিংশ যুগের শেষ-কলিযুগ চলিতেছে। এই যুগেই শুম্ভনিশুম্ভের উৎপত্তি হইবে এবং দেবী তাহাদিগকে হত্যা করিবেন। ইহাই দেবীর উক্তি। আর্ত পীড়িত জনগণ আজ ব্যাকুল চিত্তে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছে আর প্রার্থনা করিতেছে :

'জাগো চণ্ডিকা মহাকালী'

চণ্ডিকা মহাকালী

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে
জাগো চণ্ডিকা মহাকালী।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি
দনুজদলনী করালী॥
প্রাণহীন শবে শিব-শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগনিদ্রা ভাঙাও
অগ্নিশিখায় দশদিক রাঙাও
বরাভয়দায়িনী নৃমুণ্ডমালী॥
শ্রীচণ্ডীতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী।
এসেছে কলি, কালিকা এলি কই!
শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মেছে পুন ওই,
অভয়বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ
শুনিব কবে মা গো খর-করতালি।

দেববৃন্দের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের হত্যার পর বরদানকালে দেবী বলিলেন—

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান॥ (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৪৩)
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥ (ওই, ১১/৪৪)

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম॥ (ওই ১/৪৫)

অর্থাৎ— পুনরায আমি অতি ভীষণ মূর্তিতে এই পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইয়া বিপ্রচিত্তি-বংশসম্ভূত দানবগণকে সংহার করিব। তখন ওই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে ভক্ষণ করায় আমার দন্তসমূহ দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তজ্জন্য স্বর্গে দেবগণ ও মর্ত্যে মানবগণ সতত আমার স্তব করিবে ও আমাকে রক্তদন্তিকা বলিয়া কীর্তন করিবে।

কেহ কেহ বলেন, বিপ্রচিত্তি ইন্দ্রসভার এক নর্তকী। এই উক্তিতে মনে হয়, কোনো নর্তকী-গর্ভজাত মানব পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া উৎপীড়ন করিবে এবং দেবী রক্তদন্তিকা রূপ ধরিয়া তাহাকেও হত্যা করিবেন।

রক্তদন্তিকা

জয়, রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা।
নমো রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা ভীষণা উগ্রচণ্ডিকা॥
রক্ত-কেশা, রক্ত-ভূষণা,
রক্ত-রসনা, রক্ত-দশনা
জয় দাড়িম্বকুসুমোপমা দনুজদলনী অম্বিকা॥
জয় সর্বভয়-অপহারিণী জয়,
জয় অতিরৌদ্রা, নিস্তারিণী জয়।
জয় মা পৃথিবীপালিনী।
ভক্তের তুমি জননীরূপিণী
করুণাময়ী অভয়দায়িনী (মাগো)
জয় অসুর-মুণ্ডমালিনী।
অখিল ব্যাপ্ত যোগেশ্বরী
আমি দেখি রূপ একী মরি মরি
চেলি-পরা লাল টুকটুকে মেয়ে আনন্দিনী বাসন্তিকা॥

তাহার পরে দেবী বলিতেছেন — আবার শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিবশত পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণ আমাকে স্তব করিবেন। তখন আমি সেই জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনিজা রূপে প্রাদুর্ভূতা হইব। তৎকালে শত নেত্রে আমি মুনিগণকে দর্শন করিব; তজ্জন্য দেব ও মানবগণ আমাকে 'শতাক্ষী' বলিয়া কীর্তন করিবে। অনন্তর আমি স্বদেহজাত প্রাণরক্ষক শাক দ্বারা যত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত লোকগণকে পালন করিব। এই জন্য তৎকালে আমি 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হইব এবং এই অবতারে দুর্গম নামক এক মহাসুরকে বিনাশ করিব।

বৈবস্বত মন্বন্তরের চত্বারিংশৎ যুগ শতাক্ষী ও শাকম্ভরীর অবতারকাল। সে কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। ইহাই লক্ষ্মীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শতাক্ষী

নীলোৎপল-নয়না নীলবর্ণা শাকম্ভরী।
শত চোখে শতনীল পদ্ম ফুটিয়াছে মরি মরি॥
দয়াময়ী মা-র কর-পল্লবে
ফলমূল ফুল পল্লব শোভে,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও জরানাশিনী
মহাদেবী বিষহরি॥
দারুণ দৈন্য দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কালে
এই জননী আমার শতাক্ষীরূপে শস্যে বৃষ্টি ঢালে।
নাশি দুর্গম দৈত্যে জননী
হলেন দুর্গা দুষ্টদমনী,
ইনিই পার্বতী বিশোকা চণ্ডী কালী পরমেশ্বরী॥

দেবী পুনরায় বলিতেছেন :

যখন অরুণ নামক অসুর ত্রিলোকের অতিশয় পীড়া উৎপাদন করিবে, তখন আমি ত্রৈলোক্যের মঙ্গালের জন্য অসংখ্য ষট্‌পদবিশিষ্ট ভ্রমর-মূর্তি ধারণ করিয়া ওই মহাসুর নিহত করিব — তৎকালে সকলেই আমাকে 'ভ্রামরী' বলিয়া স্তব করিবে।

ভ্রামরী

মাগো গো তুই, কার নন্দিনী
ভ্রমর লয়ে মা করিস খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্ত বর্ণ
ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা॥

একী অপরূপ চিত্রকান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একী প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো মুঠো নিয়ে
আকাশে ছড়াস সারাটি বেলা॥
ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই
তেজোমণ্ডল-বিমণ্ডিতা,
কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী
ভ্রামরীরূপা আনন্দিতা।
কোন সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছাড়িস আকাশে বাতাসে,
সব উৎপাত-বিনাশিনী শিবে
দে মা আমারে চরণ-ভেলা॥

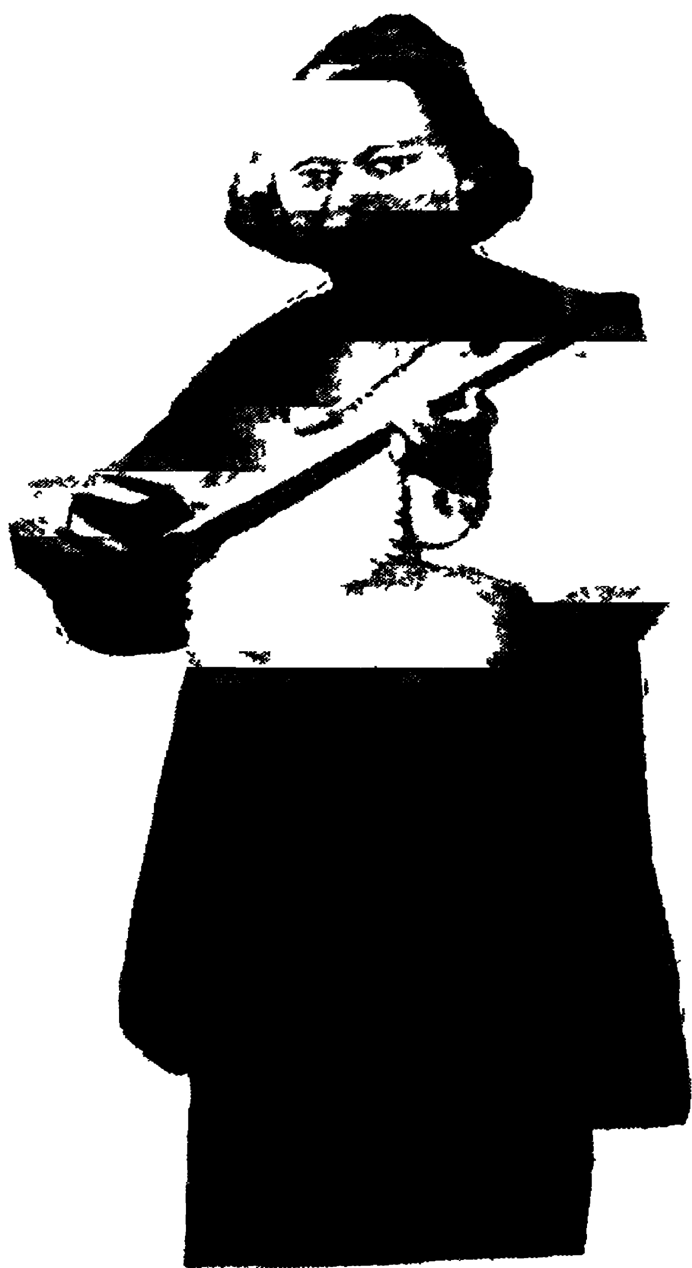
এইরূপে পরব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আশার বাণী শুনাইয়া বলিতেছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম॥ শ্রীশ্রীচণ্ডী- ১১/৫৪-৫৫

অর্থাৎ, যখন যখন দানবকৃত উৎপাত সংঘটিত হইবে তৎতৎকালেই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুগণকে নিহত করিব।

মাভৈঃ

॥ ওম্ তৎ সৎ॥



অভিনেতা নজরুল (ধ্রুব চলচ্চিত্রে)

হরপ্রিয়া

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭৫
অক্টোবর ১৯৬৮

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত গানগুলির তালিকা

(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী
মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে
নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়
যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে
ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা

কোবাস গান

(শিবরঞ্জনী)

(জয়) হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী।
শিব-জটা হতে সুরধুনী-স্রোতে
ঝরি শতধারে ভাসাও অবনি॥
দিবা দ্বিপ্রহরে প্রথম বেলা
কাফি-সিন্ধুর তীরে কর খেলা,
দীপ্ত নিদাঘে সারঙ্গ রাগে
অগ্নি ছড়ায় তব জটার ফণী॥
কভু ধানশ্রীতে মায়া-রূপ ধর,
জ্ঞানী শিবের তেজ কোমল কর,
পিলু বারোঁয়ায় বিষাদ-ভোলানো
নূপুরের চটুল ছন্দ আন॥
বাগীশ্বরী হয়ে মহিমা শান্তি লয়ে
আস গভীর যবে হয় রজনি॥
বরষার মল্লারে মেঘে তুমি আস,
অশনিতে চমকাও, বিদ্যুতে হাস,
সপ্তসুরের রঙে সুরঞ্জিতা
ইন্দ্রধনু-বরণি॥

সৈন্ধবী। কথা কও হরপ্রিয়া শিব-সীমন্তনী।
দিবা দ্বিপ্রহরের প্রথমার্ধ বেলা
তোমার তনুর জ্যোতি চুরি করি যেন
ঝলমল করে স্বর্ণ-রাগে। কথা রাখো,
তুমি না কহিলে কথা, না হাসিলে তুমি
রবির কনক-ছটা ম্লান হয়ে যায়!
হরপ্রিয়া। সৈন্ধবী! তুই তো জানিস—
দেখি নাই কতদিন মনোহর হরে।
ধ্যানমগ্ন কোন লোকে কোন রূপ ধরি
কী লীলা যে করিছেন তিনি —
আমি মহামায়া হয়ে জানিতে না পারি।
বল সহচরী। কেন এলি ফিরি
দেবাদিদেব মোর শিব শঙ্কর
পেয়েছিস কোনো সন্ধান?

সৈন্ধবী। মহাদেবী! সেই কথা এসেছি জানাতে-
যে লীলা করেন তব শিব সুন্দর
শ্যামসুন্দর সাজে, রস-বৃন্দাবনে।
নওল কিশোর রূপ নব ঘনশ্যাম—
মেঘ-অনুলিপ্ত যেন তুষার কৈলাস।
গলে ফণী-হার নাই দোলে বনমালা
জটাজূট হইয়াছে চাঁচর চিকুর,
শশীলেখা হইয়াছে বাঁকা শিখী-পাখা
বিষাণ হয়েছে বাঁশি, বাঘছাল তাঁর
হইয়াছে পীতধরা, মুনি-মনোহর।
শনি সেই চপলের ঘরছাড়া সুর
গোপিনীরা ধেয়ে আসে পাগলিনি হয়ে।

[গান]

সৈন্ধবী-সাদ্রা

মুরলী-ধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা-তটে আসিল ছুটে
কুল-মান-যৌবন দিল চরণে ডারি॥
পবন গতিহীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরি শুনি বিসরে গীত
ময়ূর-ময়ূরী শুকশারি॥
সচকিত ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে;
পুবালি-হাওয়া কানন-পথে
নীপ-কেশর বরষে।
বেভুল আহিরিনি
চেয়ে থাকে উদাসিনী,
বাঁশরি শুনি বিসরি গেল
নিতে গাগরিতে বারি॥

হরপ্রিয়া। সাবন্তী!
তাপদগ্ধ শ্রান্ত তনুলতা
নিদারুণ তৃষ্ণা লয়ে কোথা হতে এলি?
কঠোর তপস্বী মহাযোগী শিব শংকর
কি কহিলেন তোরে?

সাবন্তী। বিস্ময়-বিমূঢ়া আমি ; দেবী হরপ্রিয়া !
হিমগিরি শিরে তোমারে দেখিয়া এনু
বালিকার বেশে, তপস্বিনী উমা-রূপে।
শংকর সেথা উমাপতি-রূপে
করিছেন লীলা।
কৈলাসে পার্বতী তুমি শিব-সোহাগিনি।
হিমালয়ে উমা তুমি শিব-বিরহিণী
তপস্বিনী মহাভাবে নিমগ্না !
উমার তপস্যা-তেজে ধরা দগ্ধপ্রায়,
তৃষ্ণায় কাতর জড়জীব।

[গান]
সাবন্তী সারং — তেতালা

মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে
তৃষ্ণায় কাতর চাতকী ডাকে॥
সমাধি-মগ্না উমা তপতী
রৌদ্র যেন তাঁর তেজঃজ্যোতি
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্তা কপোতী—
কপোত-পাখায় শুষ্ক-শাখে॥
শীর্ণা তটিনী বালুচর জড়ায়ে
তীর্থে চলে যেন শ্রান্ত পায়ে।
দগ্ধ-ধরণি যুক্ত-পাণি
চাহে আষাঢ়ের আশিস-বাণী।
যাপিয়া নির্জলা একাদশীর তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে।

হরপ্রিয়া। কী লো নীলাম্বরী !
একদৃষ্টে মোর পানে চেয়ে
মৃদুমন্দ হাসি — কী হেরিস্ অমন করিয়া ?
দেখেছিস তুই বুঝি পিনাকপাণিরে ?
নীলাম্বরী। হুঁ ! দেখিয়াছি শিবে শিবানীর সাথে।
হরপ্রিয়া। শিবানীর সাথে ? সে কোন শিবানী ?
নীলাম্বরী। যে শিবানীর একরূপ হ্লাদিনী রাধিকা।
যে শিবানী গোলোকে রাধিকা,
শিবলোকে হরপ্রিয়া

বৈকুণ্ঠে কমলা
বৃন্দাবনে তিনিই শ্রীমতী হয়ে নীল শাড়ি পরি
নীল যমুনার তীরে করিছেন লীলা!

। গান ।
নীলাম্বরী-ত্রিতাল

নীলাম্বরী শাড়ি পরি নীল যমুনায়
কে যায়, কে যায়, কে যায়?
যেন জলে চলে থল-কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে বলে পায় পায়॥
কলসে কঙ্কণে রিনিঝিনি ঝনকে,
চমকায় উন্মন চম্পা বনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে,
পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায়॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ-মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি বন-তুলসীর মঞ্জরি উলসিয়া ওঠে।
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এল বুঝি পথ ভুলি।
তাহারই অঙ্গ তরঙ্গ-বিভঙ্গে
কূলে কূলে নদীজল উথলায়॥

হরপ্রিয়া। সাহানা!
পাগলিনি-প্রায় কোথা হতে এলি?
সাহানা। হরপ্রিয়া!
কুমার কিশোর রূপ দেখেছ শিবের?
রেবা-নদী-তীরে আমি দেখিয়াছি।
সে কি স্বপ্ন? সে কি ভুল?
হোক ভুল। সেই ভুল ফুল হয়ে ফুটিয়াছে মনে।
সুগন্ধে ভরপুর সারা অন্তর।
হরপ্রিয়া। কোথায়, কী হেরিলি সাহানা?
সাহানা। হেরিনু স্বপনে — না, না, স্বপ্ন নয়
দিব্য আঁখি পেয়ে আমি হেরিয়াছি—
নিবিড় অরণ্যে এক সুরম্য প্রাসাদে
আমি যেন গাহিতেছি গান।

সহসা দুয়ারে,
আসিল তরুণ শিব ভিখারির বেশে।
কী যেন চাহিল ভিক্ষা।
তখনও সুরের ঘোর কাটেনি আমার।
কী বলিয়া দিয়াছিনু তাহারে বিদায় —
শুনিবে সে গান ?

[গান]
সাহানা ত্রিতাল

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে
ভাঙবে সভা বসব একা রেবা নদীর তীরে॥
গীতশেষে গগনে তলে
শ্রান্ত তনু পড়বে ঢলে
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারঙ্গিরে॥

মোর কণ্ঠের জয়ের মালা তোমার গলায় নিয়ো।
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিয়ো প্রিয়, হে মোর প্রিয়।
ঘুমাই যদি কাছে ডেকো
হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজব তোমায় অকূল অশ্রুনীরে
তখন এসো ফিরে॥

হরিপ্রিয়া। মোর অনুবর্তিনীরা একে একে সবে
আসিল ফিরিয়া মোর কাছে।
কোথায় মেঘলা-মতী ? সে তো ফিরিল না ?
জান হে সন্ধান তাহার ?
তারই শুধু হল নাকি শিব দর্শন ?
কে তুমি তরুণ ?

মল্লার। চরণে প্রণাম লহো দেবী হরপ্রিয়া !
আমি মেঘমল্লার তব কিংকর।
মেঘলামতীরে লয়ে আমি গিয়াছিনু
যোগীন্দ্র শিবের সন্ধানে।
সরযূর তীরে।
হেরিয়া শ্রীরামচন্দ্রে ছদ্মবেশি শিবে,

মেঘবর্ণা তব সহচরী আর ফিরিল না।

রামদাসী মল্লার-রূপে
নব জন্ম, নব দেব লয়ে
নব দূর্বাদলশ্যাম-রামের অর্চনা
করিছে যে অযোধ্যায়, ভারতে, ধরায়।
আজও মোর মনে পড়ে —
তাঁর সেই সকরুণ গান।

[গান]

রামদাসী মল্লার — ত্রিতাল

ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা।
ভবনে এল মোর কে পথহারা॥
বিরহ-রজনি একেলা যাপি
সঘনে বহে ঝড় সভয়ে কাঁপি।
উথলি উঠে ঢেউ কুটিরে নাহি কেউ
গগনে নাহি মোর চন্দ্রতারা॥

নিভেছে গৃহদীপ নয়নে বারি,
আঁধারে তব মুখ নাহি নেহারি।
তোমার আকুল কুন্তল-বাসে
চেনা দিনের স্মৃতি স্মরণে আসে।
আজি কি এলে মোর প্রলয়-সুন্দর
ঝলকে বিদ্যুতে আঁখি-ইশারা॥

দশমহাবিদ্যা

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭৫
অক্টোবর ১৯৬৮

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত গানগুলির তালিকা

নন্দলোক হতে আমি এনেছি রে
ভারত শ্মশান হল মা, তুই
(মা) ব্রহ্মময়ী জননী মোর
তুমিই দিলে দুঃখ অভাব
(ওরা) আমার কেহ নয়
শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে
কে তোরে কি বলেছে মা
তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
মা মেয়েতে খেলব পুতুল
তোমার পূজার ফুল ফুটেছে মা গো
তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা
(আমার) মা যে গোপাল সুন্দরী
শঙ্কর-অঙ্কলীনা-যোগমায়া
(জয়) বিগলিত করুণা-রূপিণী গঙ্গে
আয় মা উমা, রাখব এবার
কি দশা হয়েছে মোদের দেখ মা

১

নন্দলোক হতে আমি এনেছি রে মহামায়ায়।
বন্ধ যথায় বন্দি যত কংস রাজার অন্ধ কারায়॥
বন্দি জাগো! ভাঙো আগল
ফেল রে ছিঁড়ে পায়ের শিকল
বুকের পাষাণ ছুঁড়ে ফেলে
মুক্তলোকে বেরিয়ে আয়॥
আমার বুকের গোপালকে রে
রেখে এলাম নন্দালয়ে,
সেইখানে সে বংশী বাজায়
আনন্দে গোপ-দুলাল হয়ে।
মা-র আদেশে বাজাবে সে
অভয় শঙ্খ দেশে দেশে
তোরা. নারায়ণী-সেনা হবি
এবার নারায়ণীর কৃপায়॥

২

ভারত শ্মশান হল মা, তুই শ্মশানবাসিনী বলে।
জীবন্ত শব নিত্য মোরা চিতাগ্নিতে মরি জ্বলে॥
আজ হিমালয় হিমে ভরা
দারিদ্র্য-শোক-ব্যাধি-জরা,
নাই যৌবনে, যেদিন হতে শক্তিময়ী গেছিস চলে॥
(তুই) ছিন্নমস্তা হয়েছিস তাই, হানাহানি হয় ভারতে
নিত্য-আনন্দিনী, কেন টানিস নিরানন্দ পথে?
শিব-সীমন্তিনী বেশে
খেল মা আবার হেসে হেসে।
ভারত মহাভারত হবে, আয় মা ফিরে মায়ের কোলে॥

৩

(মা) ব্রহ্মময়ী জননী মোর
(মোরে) অব্রাহ্মণ কে বলে?
শ্যামা নামের জঠরে মোর
নব জন্ম ভূতলে॥
(মা) চণ্ডিকারে মা বলে রে
আমি হলাম দ্বিজ।
(আমি দ্বিতীয়বার জনম নিলাম)
(মা) আদর করে নাম রেখেছেন
পুত্র মনসিজ।
(আমি যে মা-র মানস-পুত্র)
(তাই) অক্ষমালার যজ্ঞোপবীত
মা পরালেন মোর গলে।
রুদ্রাক্ষ মালার যজ্ঞোপবীত
মা পরালেন মোর গলে॥
(মোরে) কে কবে অস্পৃশ্য বলে
দিয়েছিল গালি।
(আমি) কেঁদেছিলাম 'মা' বলে
(তাই) মা হলেন মোর কালী।
(মা) হলেন ভদ্রকালী।
(মোরে) পতিত বলে ঘৃণা যারা
করেছিল আগে,
(আজ) মায়ের কোলে তাহাদেরেই
ডাকি অনুরাগে।
(ওরে আয় তোরা আয় রে) —
জগৎ-জননীর কোলে তোরা সবাই আয় রে॥)
(সেই) চণ্ডাল আজ কমল হয়ে
ফুটল মা-র চরণ-তলে।
(মা-র) রাঙা চরণ-কমল ছুঁয়ে
ফুটল মা-র চরণ-তলে॥

৪

তুমিই দিলে দুঃখ অভাব তুমিই করো ত্রাণ।
দীনতারিণী, মঙ্গলময়ী শরণাগত প্রাণ ॥
যখন পরম নির্ভরতায়
শরণ যাচি তোমারই পায়
(তুমি) আপন হাতে বিনাশ কর সকল অকল্যাণ ॥
(আমি) অহংকারে রাখতে যাহা
চাই গো আমার বলে
হরণ করে লও তুমি তা
ভাসিয়ে চোখের জলে।
তাই তো আমার সংসার-ভার
মা গো তোমায় দিলাম এবার,
আমার বলে রইল শুধু তোমার নাম গান।

৫

(ওরা) আমার কেহ নয়।
আজ এসেছে রইবে না কাল, আমার কেহ নয়।
মা গো ওরা তোরে শুধু আড়াল করে রয় ॥
(ওরা) মোর ইচ্ছায় আসেনিকো কেহ
(ওরা) মোর ইচ্ছায় যায় না ছেড়ে গেহ।
এ সংসারের পান্থশালায় ক্ষণিক পরিচয়
মা, ওদের সাথে ক্ষণিক পরিচয় ॥
যারা কেবল আছে মা গো
মা-ভোলাবার তরে,
নে তাদের মায়া হরে।
(তোর) পূজারই ভোগ খায় কেড়ে মা
পাঁচ ভূতে আর চোরে।
(ওরা) সবাই যাবে রইবে নাকো কেউ,
মিথ্যা ওরা ক্ষণিক মায়ার ঢেউ,
ওদের মায়ায় তোকে ভোলার
ভুল যেন না হয় ॥

৬

শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে
কাল-নদীতে দুলি
ঘাটে ঘাটে ঘটে ঘটে
সুরের লহর তুলি।
কাল-তরঙ্গে ভাসিয়ে অঙ্গ
দেখে বেড়াই কতই রঙ্গ;
কায়ায় কায়ায় রং-বেরঙের
শত মায়ার ধূলি॥
জন্মান্তর ঘাটে ঘাটে
ভাসি, উঠি, ডুবি;
কেবলই মা ডাকে আমায় —
'আয় আমারে ছুঁবি!'
(মোরে) কালস্রোতে ভাসাবার ছলে
লীলা দেখান নাটমহলে,
(মা) আপনি এসে খেলার শেষে
বক্ষে লবে তুলি॥

৭

কে তোরে কী বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে।
(ও মা) বরাভয়া, ভয়ংকরীর সাজ পেলি তুই কোথা থেকে।
(তোর) এলোকেশে প্রলয় দোলে
(আমি) চিনতে নারি গৌরী বলে
(ওমা) চাঁদ লুকাল মেঘের কোলে
তোর মুখে না হাসি দেখে॥
(ও মা) আমার দেবলোকে কেন
খেলিস এমন নিঠুর খেলা?
আনন্দেরই হাটে সতী
বসালি পাঁচ ভূতের মেলা।
শংকর কি গঙ্গা নিয়ে
কাঁদায় তোরে দুঃখ দিয়ে (মা)
(ও মা) শিবানী তোর চরণ-তলে
এনেছি তাই শিবকে ডেকে॥

৮

(তুই) কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
পারবি না মা ফাঁকি দিতে।
(ওই) অসীম আঁধার হয় যে উজ্জ্বল
মা তোর ঈষৎ চাহনিতে॥
মায়ের কালি-মাখা কোলে
শিশু কি মা যেতে ভোলে?
(আমি) দেখেছি যে,
বিপুল স্নেহের সাগর দোলে তোর আঁখিতে॥
কেন আমায় দেখাস মা ভয়
খড়্গ নিয়ে, মুণ্ড নিয়ে?
আমি কি মার সেই সন্তান
ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে?
তোর সংসার-কাজে শ্যামা
বাধা আমি হব না মা,
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা
ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিয়ে॥

৯

মা মেয়েতে খেলব পুতুল
আয় মা আমার খেলা-ঘরে।
(আমি) মা হয়ে মা শিখিয়ে দেব
পুতুল খেলে কেমন করে॥
কাঙাল অবোধ করবি যারে
বুকের কাছে রাখিস তারে
(নইলে কে তার দুখ ভোলাবে — যারে রত্ন-মানিক
দিবি না মা উচিত সে তার মাকে পাবে)
(আবার) কেউ বা ভীষণ দামাল হবে
(কেউ) থাকবে গৃহকোণে পড়ে॥
মৃত্যু সেথা থাকবে না মা
থাকবে লুকোচুরি খেলা।
রাত্রি বেলায় কাঁদিয়ে যাবে
আসবে ফিরে সকাল বেলা।

কাঁদিয়ে খোকায় ভয় দেখিয়ে
ভয় ভুলাব আদর দিয়ে (মা)
(বেশি তারে কাঁদাস না মা —
মা ছেড়ে যে পালিয়ে যাবে)
(সে) খেলে যখন শ্রান্ত হবে
ঘুম পাড়াবি বক্ষে ধরে ॥

১০

তোমার পূজার ফুল ফুটেছে
মা গো আমার মনে।
তুমিই এসে লহ যে ফুল
তোমার শ্রীচরণে ॥
কখন তুমি মনের ভুলে
চরণ দিয়ে হৃদয় ছুঁলে,
কমল হয়ে ফুটল হিয়া
তোমার পরশনে ॥

মা গো, সে ফুল ঠাঁই পাবে কি
তোমার গলার মালায় ?
সে ফুল কবে রাখব তোমার
নিবেদনের থালায় ?
তোমার চলার পথের ধূলি
ছেয়ে দিলাম সে ফুল তুলি
কবে তারে দলবে পায়ে
চলতে আনমনে ॥

১১

তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা
আমার প্রথম পূজার ফুল।
ভজন-পূজন জানি না মা
হয়তো হবে কতই ভুল ॥
দাঁড়িয়ে দ্বারে 'মা, মা' বলে
ভাসি মাগো নয়ন-জলে,

ভয় হয় মা ছুঁই কেমনে
মা তোর পূজার বেদিমূল।
আশ্রয় মোর নাই জননী
ত্রিভুবনে কোথাও হায়!
দাঁড়াই মাগো কাহার কাছে
তুইও যদি ঠেলিস পায়।
হানে হেলা সবাই যারে
তুই নাকি কোল দিস মা তারে
(আমি) সেই আশাতে এসেছি মা
অকূলে তুই দে মা কূল॥

১২

(আমার) মা যে গোপাল সুন্দরী।
এক বৃন্তে কৃষ্ণকলি,
অপরাজিতার মঞ্জরী॥
(সে) আধেক পুরুষ আধেক কৃষ্ণা নারী
অর্ধ কালী অর্ধ বংশীধারী
(মা) অর্ধ অঙ্গে পীতাম্বর
আধেক সে দিগাম্বরী॥
(সে) এক পায়ে প্রেম-কুসুম ফোটায়
নূপুর-পরা সেই চরণ।
(মা-র) সেই পায়ে রয় সর্প-বলয়
সে পায়ে প্রলয়-মরণ।
আধো ললাটে অগ্নি-তিলক জ্বলে
চন্দ্রলেখা আধেক ললাট-তলে।
শক্তি আর ভক্তিতে মা
আছেন যুগল রূপ ধরি।

১৩

শংকর-অঙ্কলীনা-যোগমায়া
শংকরী শিবানী।
বালিকা-সম লীলাময়ী
নীল-উৎপল-পাণি॥

সজল-কাজল-বর্ণা
মুক্তবেণি-অপর্ণা
তিমির-বিভাবরী-স্নিগ্ধা
শ্যামা কালিকা ভবানী ॥
প্রলয়-ছন্দময়ী চণ্ডী
শব্দ-নূপুর-চরণা
শাম্ভবী শিব-সীমন্তিনী
শংকরাভরণা।
অম্বিকা দুঃখহারিণী
শরণাগততারিণী
জগদ্ধাত্রী শান্তি-দাত্রী
প্রসীদ মা ঈশানী ॥

১৪

গঙ্গা-বন্দনা

(জয়) বিগলিত করুণা-রূপিণী গঙ্গে।
(জয়) কলুষহারিণী
পতিতপাবনী
নিত্যাপবিত্রা যোগী-ঋষিসঙ্গে ॥
হরি-শ্রীচরণ ছুঁয়ে আপনহারা
পরম প্রেমে হলে দ্রবীভূতধারা।
ত্রিলোকের ত্রি-তাপ-পাপ তুমি নিলে মা
নির্মলে! তোমার পবিত্র অঙ্গে ॥

১৫

আগমনি

আয় মা উমা, রাখব এবার
ছেলের সাজে সাজিয়ে তোরে।
(ওমা) মা-র কাছে তুই রইবি নিতুই,
যাবি না আর শ্বশুর-ঘরে ॥
মা হওয়ার মা কী যে জ্বালা
বুঝবি না তুই গিরিবালা,
(তোরে) না দেখলে শূন্য এ বুক
কী যে হাহাকার করে ॥

তোব টানে মা শংকর শিব
আসবে নেমে জীব-জগাতে,
আনন্দেবই হাট বসাব
নিরানন্দ ভূ-ভারতে।
না দেখে যে মা তোব লীলা
হযে আছি পাষাণ-শিলা,
(আয) কৈলাসে তুই ফিরবি নেচে
বৃন্দাবনের নূপুর পরে॥

১৬

আগমনি

কী দশা হযেছে মোদের
দেখ মা উমা আনন্দিনী।
(তোব) বাপ হযেছে পাষাণ গিবি
মা হযেছে পাগলিনি॥
(মা) এদেশে আর ফুল ফোটে না,
গঙ্গাতে আর ঢেউ ওঠে না,
(তোর) হাসি মুখ না দেখলে যে মা
পোহায় না মোর নিশীথিনী।
আর যাবি না ছেড়ে মোদের
বল মা আমার কণ্ঠ ধরি
সুর যেন তার না থামে আর
বাজালি তুই যে বাঁশরি।
না পেলে তুই শিবের দেখা
রইতে যদি নারিস একা
(আমি) শিবকে বেঁধে রাখব মাগো
হয়ে শিব-পূজারিনি॥

বিজয়া / কাজী নজরুল

[বিজয়ার [illegible] [illegible] কাঁদিতেছে । [illegible]
নাট-মন্দিরে [illegible] (সুরদাসী ও পূজারী)
[illegible] [illegible]
([illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible])
[illegible] (chorus — male & female;

বিজয়োৎসবের [illegible] [illegible] বিদায় দাও বিদায় দাও ।
আনন্দিনী গিরি-নন্দিনী! শিব-লোকে যাবেন
বিদায় দাও বিদায় দাও ॥

কৈলাসে শিব [illegible] যাইতেছি [illegible]
আর নয়, হায় শক্তি-বিহীন
সপ্ত সতী দেব দেবী কাঁদে [illegible] বিসর্জন ॥

([illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]) —
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

দ্র. দেবীস্তুতি : 'বিজয়া' নাটিকার প্রথম পৃষ্ঠা

বিজয়া

প্রথম প্রকাশ
১৬ অক্টোবর ১৯৩৯

বিজয়া

[বিজযাব ঢাক-ঢোল বাজিতেছে। নাট-মন্দিব হইতে সানাই-এব কবুণ সুব (মুলতানি বা পুরবি) ভাসিয়া আসিতেছে।]

[ঊর্ধ্ব হইতে দেবদেবীদের সংগীত ভাসিয়া ক্রমেই নিকটে আসিতেছে।]

গান

[পুরুষ ও স্ত্রী সমবেত কণ্ঠে]

বিজয়োৎসব ফুরাইল মা গো,
ফিরে আয় ফিরে আয় !
মা আনন্দিনী গিরিনন্দিনী
শিব-লোকে অমরায়
ফিরে আয় ফিরে আয় ॥
কৈলাসে শিব যাপিতেছে দিন
শব-সম, হয়ে শক্তি-বিহীন ;
সপ্ত স্বর্গ দেবদেবী কাঁদে
আঁধারে মা নিরাশায় ॥
(দূরে দূরে শব্দ দূরে চলিয়া গেল।)

[নিম্নে ধরণির সন্তানের আর্ত মিনতি শোনা যাইতেছে — কণ্ঠস্বব ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।]

গান

যাসনে মা ফিরে যাসনে জননী
ধরি দুটি রাঙা পায়।
শরণাগত দীন সন্তানে
ফেলি ধরার ধুলায় ॥
(মা গো) ধরি দুটি রাঙা পায় ॥
(মোরা) অমর নহি মা দেবতাও নহি,
শত দুখ সহি ধরণিতে রহি ;
মোরা অসহায়, তাই অধিকারী
মা গো, তোর করুণায় ॥
দিব্য শক্তি দিলি দেবতারে
মৃত্যুবিহীন প্রাণ,
তবু কেন মা গো তাহাদেরই তরে
তোর এত বেশি টান !

(আজও) মরেনি অসুর, মরেনি দানব,
ধরণির বুকে নাচে তাণ্ডব,
সংহার নাহি করি সে-অসুরে
কেন যাস্ বিজয়ায় ॥
(কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে)

জনৈক দেবতা : আমরা দেবতা হলে কী হবে, কথায় ও কান্নায় ধরণির মানুষকে জিততে পারব না।

মানুষ : মা গো! জানি আমরা দুর্বল। রোগ, শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, অভাব, ঋণে নিত্য-জর্জরিত। আমাদের আয়ু শেফালি ফুলের মতো; সন্ধ্যায় ফোটে, সকালে যায় ঝরে। তবু তারই মাঝে ডাকি তোকে, এই মায়া, এত অবিদ্যার ঊর্ধ্বে তুলে নিতে। ফুল ঝরে, তার আশা থাকে, পূজারি তাকে কুড়িয়ে স্থান দেবে দেবতার পায়ে। কিন্তু মানুষের জীবনে আজ সে-আশাও গেছে ফুরিয়ে।

দেবতা : দেখেছিস, বলছিলাম না, ওরা কান্না আর চাটুবাদের জোরেই জিতে গেল।

মানুষ : আমরা অসহায়, তাই ছেলে-ভুলানো খেলনা দিয়ে রাখিস ভুলিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে। মাতৃহীন শিশু-সন্তানকে ফেলে দিস দাসীর কোলে, কান্না ভুলাতে দিস হাতে চুষি-কাঠি!

দেবতা : এই রে, সেরেছে! ওরা যা কান্না জুড়ে দিয়েছে, তাতে মা দয়াময়ী এতক্ষণ গলে গঙ্গাজল হয়ে গেছেন বুঝি! দে, ওদের শিগগির রাগিয়ে দে। ওরা একবার রেগেও যদি মাকে চলে যেতে বলে, অমনি মা ছলনাময়ী পালিয়ে আসবেন।

মানুষ : ওই শোন, আমাদেরই মতো হতভাগ্য একদল সন্তান মাকে ভাসিয়ে দিয়ে গান গাইতে আসছে।

গান

মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে
কেমনে রহিব ঘরে।
শূন্য ভবন শূন্য ভুবন
কাঁদে হাহাকার করে ॥
মা যে নদীর জল-তরঙ্গ প্রায়
ভরা কূলে কূলে, তবু ধরা নাহি যায়;
রাখিতে নারিনু পাষাণীরে মোরা
পাষাণ দেউল ধরে ॥

মানুষ : সত্যই যদি মা পাষাণী হয়, তবে তার সন্তানও হোক পাষাণ। তারাও হোক অনুভূতিহীন, নির্মম। হাঁ, এই আমাদের সাধনা। নিষ্ঠুর হস্তে এই পাষাণের বুক চিরে বহাব স্নেহের নির্ঝরিণী-ধারা।

(ধরার মানুষের গান)

(মোরা) মাটির ছেলে, দু-দিন পরে মাটিতে মিশাই।
(আসে) খড়ের প্রতিমা হয়ে মা আমাদের তাই॥
(সে) কয় না কথা, দেয় না স্নেহ-কোল,
মা, মা বলে যতই কেন বাজা না ঢাক-ঢোল,
(তোর) ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা মেটে হয়ে
শ্মশান-ছাই॥
(সে) দেবতাদের চিন্ময়ী মা,
অসুরও পায় দেখা
মা-র অসুরও পায় দেখা—
(মা-র) জড় পাষাণ মূর্তি হেরে
শুধু মানুষ একা রে ভাই,
শুধু মানুষ একা।
(মোরা) মরে এবার আসব অসুর হয়ে,
মুণ্ড মোদের দুলবে, রে ভাই,
মার কণ্ঠে রয়ে।
(নাই) বিসর্জন যে জননীর,
(সেই) মাকে মোরা চাই॥

(জনৈকা ভিখারিনির গান)

খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা,
মাকে তো তোরা পূজিসনে।
প্রতিমার মাঝে প্রতিমা বিরাজে
হায় রে অন্ধ, বুঝিসনে॥
বছর বছর মাতৃপূজার করে যাস অভিনয়,
ভীরু সন্তানে হেরি লজ্জায় মা-ও যে পাষাণময়।
(মাকে) জিনিতে সাধন-সমরে
সাধক তো কেহ যুঝিসনে॥
মাটির প্রতিমা গলে যায় জলে,
বিজয়ায় ভেসে যায়,
আকাশ বাতাসে মা-র স্নেহ জাগে
অতন্দ্র করুণায়।
তোরই আশে পাশে তাঁর কৃপা হাসে
(কেন) সেই পথে তাঁরে খুঁজিসনে॥

মানুষ : কে তুমি মা, তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।

ভিখারিনি : আমি ভিখারিনি। আমার দুর্বৃত্ত ছেলেরা আমায় তাড়িয়ে দিয়ে, আমায় মৃতা বলে ঘটা করে মাতৃশ্রাদ্ধ করছে, তাই দেখতে এসেছি।

জনৈকা নারী : মা! মাগো! আমি তোকে চিনেছি। মা ছলনাময়ী!—

ভিখারিনি : চুপ! তুই তো চিনবিই, তুই যে আমারই শক্তির অংশ। এই মাতৃশ্রাদ্ধের অভিনয়ে মা, তুইও যোগ দিস্‌নে; যদি পারিস, মূর্তিমতী শক্তিরূপে আমার এই সব জড় সন্তানদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার কর।

মানুষ : একী! একী! ভিখারিনি কোথায় গেল! ও যেন দেবীমূর্তির মাঝে —

নারী : (মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) হাঁ, ভিখারিনি দেবীমূর্তির মাঝে বিলীন হয়ে গেল! তোমরা রাংতার ঐশ্বর্য দিয়ে যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী শ্রীদুর্গার বছর বছর পূজার অভিনয় কর, তিনি ভিখারিনি হয়ে দ্বারে দ্বারে তোমাদের জন্য শক্তি-ভিক্ষা, কল্যাণ-কামনা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁরই পূজামণ্ডপে শিব-শক্তি আসেন ভিখারি-ভিখারিনির রূপে। তোমরা মাটির প্রতিমা পূজা কর, তাই প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পাও না, মাকে পাও না।

(পুরুষ ও নারীর গান)

এবার নবীন মন্ত্রে হবে
জননী তোর উদ্‌বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে,
হবে না তোর বিসর্জন॥
সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদি
মা তোর পীঠস্থান।
(সেথা) শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে
পাতব মা তোর সিংহাসন॥
(সেথা) রইবে নাকো ছোঁয়াছুঁয়ি
উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিবে
মাতৃনামের বেদ।
(মোরা) এক জননীর সন্তান সব, জানি
ভাঙব দেয়াল, ভুলব হানাহানি,
দীন দরিদ্র রইবে না কেউ,
সমান হবে সর্বজন।
বিশ্ব হবে মহাভারত
নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন॥

রুবাইয়াত্-ই-ওমর খৈয়াম

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৬
ডিসেম্বর ১৯৫৯

রুবাইয়াত্‌-ই-ওমর খৈয়াম

১

রাতের আঁচল দীর্ণ করে আসল শুভ ওই প্রভাত,
জাগো সাকি! সকাল বেলার খোয়ারি ভাঙো আমার সাথ।
ভোলো ভোলো বিষাদ-স্মৃতি! এমনি প্রভাত আসবে ঢের,
খুঁজতে মোদের এইখানে ফের, করবে করুণ নয়নপাত।

২

আঁধার অন্তরীক্ষে বুনে যখন রুপার পাড় প্রভাত,
পাখির বিলাপ-ধ্বনি কেন শুনি তখন অকস্মাৎ?
তারা যেন দেখতে বলে উজল প্রাতের আরশিতে—
ছন্নছাড়া তোর জীবনের কাটল কেমন একটি রাত!

৩

'ঘুমিয়ে কেন জীবন কাটাস?' কইল ঋষি স্বপ্নে মোর,
'আনন্দ-গুল[১] প্রস্ফুটিত করতে পারে ঘুম কি তোর?
ঘুম মৃত্যুর যমজ-ভ্রাতা, তার সাথে ভাব করিসনে,
ঘুম দিতে ঢের পাবি সময় কবরে তোর জনম-ভোর।'

৪

আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শিরীন[২] ঠোঁট
গজল শোনাও, শিরাজি দাও, তন্বী সাকি জেগে ওঠ!
লাজ-রাঙা তোর গালের মতো দে গোলাপি-রং শরাব,
মনে ব্যথার বিনুনি মোর খোঁপায় যেমন তোর চুনোট।

৫

প্রভাত হল। শরাব দিয়ে করব সতেজ হৃদয়-পুর,
যশোখ্যাতির ঠুনকো এ কাচ করব ভেঙে চাখনাচুর।
অনেক দিনের সাধ আশা এক নিমেষে করব ত্যাগ,
পরব প্রিয়ার বেণি বাঁধন, ধরব বেণুর বিধুর সুর।

১ ফুল। ২ মিষ্টি, মধুর।

৬

ওঠো, নাচো! আমরা প্রচুর করব তারিফ মদ-অলস
ওই নার্গিস আঁখির তোমার, ঢালবে তুমি আঙুর-রস!
এমন কী আর — যদিই তাহা পান করি দশ বিশ গেলাস,
ছয় দশে ষাট পাত্র পড়লে খানিকটা হয় দিল্ সরস!

৭

তোমার রাঙা ঠোঁটে আছে অমৃত-কূপ প্রাণ-সুধার,
ওই পিয়ালার ঠোঁট যেন গো ছোঁয় না, প্রিয়া, ঠোঁট তোমার।
ওই পিয়ালার রক্ত যদি পান না করি, শাপ দিয়ো;
তোমার অধর স্পর্শ করে এত বড়ো স্পর্ধা তার!

৮

আজকে তোমার গোলাপ-বাগে ফুটল যখন রঙিন গুল
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল[১]।
পান করে নে, সময় ভীষণ অবিশ্বাসী, শত্রু ঘোর,
হয়তো এমন ফুল-মাখানো দিন পাবি না আজের তুল!

৯

শরাব আনো! বক্ষে আমার খুশির তুফান দেয় যে দোল।
স্বপ্ন-চপল ভাগ্যলক্ষ্মী জাগল জাগো ঘুম-বিভোল!
মোদের শুভদিন চলে যায় পারদ-সম ব্যস্ত পায়
যৌবনের এই বহ্নি নিভে খোঁজে নদীর শীতল কোল।

১০

আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন,
লাভের অঙ্ক হিসাব করে পাই শুধু দুখ, মুখ মলিন।
খুঁজতে গিয়ে এই জীবনে রহস্যেরই কূল বৃথাই
অপূর্ণ সাধ আশা লয়ে হবই মৃত্যুর অঙ্কলীন।

১১

ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতূহল,
তারপর — এ জীবন দেখি কল্পনা, আঁধার অতল।

---

১ অতিরিক্ত।

ইচ্ছা থাক কি না থাক, শেষে যেতেই হবে, তাই বলি—
এই যে জীবন আসা-যাওয়া আঁধার ধাঁধার জট কেবল!

১২

রহস্য শোন সেই সে লোকের আত্মা যথায় বিরাজে,
ওরে মানব! নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।
তুই-ই মানুষ, তুই-ই পশু, দেব্তা দানব স্বর্গদূত,
যখন হতে চাইবি রে যা হতে পারিস তুই তা যে।

১৩

স্রষ্টা যদি মত নিত মোর — আসতাম না প্রাণান্তেও,
এই ধরাতে এসে আবার যাবার ইচ্ছা নেই মোটেও।
সংক্ষেপে কই, চিরতরে নাশ করতাম সমূলে
যাওয়া-আসা জন্ম আমার, সে-ও শূন্য শূন্য এ-ও!

১৪

আত্মা আমার! খুলতে যদি পারতিস এই অস্থিমাস
মুক্ত পাখায় দেব্তা-সম পালিয়ে যেতিস দূর আকাশ।
লজ্জা কি তোর হল না রে, ছেড়ে তোর ওই জ্যোতির্লোক
ভিনদেশি-প্রায় বাস করতে এলি ধরার এই আবাস?

১৫

সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ার
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না? নিত্য ভয়ের হও শিকার?
জানি স্বাধীন ইচ্ছামতো যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে, লও সুযোগ তার।

১৬

ব্যথায় শান্তি লাভের তরে থাকত যদি কোথাও স্থান
শ্রান্ত পথের পথিক মোরা সেথায় জুড়াতাম এ প্রাণ।
শীত-জর্জর হাজার বছর পরে নবীন বসন্তে
ফুলের মতো উঠত ফুটে মোদের জীবন-মুকুল ম্লান।

১৭

বুলবুলি এক হালকা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান[১],
দেখল হাসিখুশি-ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।
আনন্দে সে উঠল গাহি, 'মিটিয়ে নে সাধ এই বেলা,
ভোগ করতে এমন দিন আর পাবিনে তুই ফিরিয়ে প্রাণ!'

১৮

রূপ-মাধুরীর মায়ায় তোমার য-দিন পার, লো প্রিয়া,
তোমার প্রেমিক বধূর ব্যথা হরণ করো প্রেম দিয়া।
রূপ-লাবণির সম্ভার এই রইবে না সে চিরকাল,
ফিরবে না আর তোমার কাছে যায় যদি বিদায় নিয়া।

১৯

সাকি! আনো আমার হাতে মদ-পেয়ালা, ধরতে দাও!
প্রিয়ার মতন ও মদ-মদির সুরত[২]-ওয়ালি ধরতে দাও!
জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীরে বেঁধে যা দেয় গাঁট-ছড়ায়,
সেই শরাবের শিকল, সাকি, আমায় খালি পরতে দাও।

২০

নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল-অশ্রুজল ঝরে,
না পেলে আজ এই পানীয় ফুটত না ফুল বন ভরে।
চোখ জুড়াল আমার যেমন আজ এ ফোটা ফুলগুলি,
মোর কবরে ফুটবে যে ফুল — কে জানে হায় কার তরে!

২১

করব এতই শিরাজি[৩] পান পাত্র এবং পরান ভোর
তীব্র-মিঠে খোশবো[৪] তাহার উঠবে আমার ছাপিয়ে গোর।
থমকে যাবে চলতে পথিক আমার গোরের পাশ দিয়ে,
ঝিমিয়ে শেষে পড়বে নেশায় মাতাল-করা গন্ধে ওর।

২২

দেখতে পাবে যেথায় তুমি গোলাপ লালা ফুলের ভিড়,
জেনো, সেথায় ঝরেছিল কোনো শাহানশা-র রুধির।

১ ফুলের বাগান। ২ সৌন্দর্য। ৩ ইরানের শিরাজ নগরে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মদ-বিশেষ। ৪ সুগন্ধ।

নার্গিস আর গুল-বনোসাব[১] দেখবে যেথায় সুনীল দল,
ঘুমিয়ে আছে সেথায় — গালে তিল ছিল যে সুন্দরীর।

২৩

নিদ্রা যেতে হবে গোরে অনন্তকাল, মদ পিয়ো।
থাকবে নাকো সাথি সেথায় বন্ধু প্রিয় আত্মীয়।
আবার বলতে আসব না ভাই, বলছি যা তা রাখ শুনে —
ঝরেছে যে ফুলের মুকুল, ফুটতে পারে আর কি ও?

২৪

বিদায় নিয়ে আগে যারা গেছে চলে, হে সাকি,
চির-ঘুমে ঘুমায় তারা মাটির তলে, হে সাকি!
শরাব আনো, আসল সত্য আমার কাছে যাও শুনে,
তাদের যত তথ্য গেল হাওয়ায় গলে, হে সাকি!

২৫

তুমি আমি জন্মিনিকো — যখন শুধু বিরামহীন
নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরত হেথায় উজল দিন;
বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাজল-আঁখি সুন্দরীর
আঁখির তারা আছে হেথায় হয়তো ধূলির অঙ্কলীন!

২৬

প্রথম থেকেই আছে লেখা অদৃষ্টে তোর যা হবার,
তাঁর সে কলম দিয়ে — যিনি দুঃখে সুখে নির্বিকার।
স্রেফ বোকামি, কান্নাকাটি লড়তে যাওয়া তাঁর সাথে,
বিধির লিখন ললাট-লিপি টলবে না যা জন্মে আর!

২৭

ভালো করেই জানি আমি, আছে এক রহস্য-লোক,
যায় না বলা সকলকে তা ভালোই হোক কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারব না —
থাকি সে কোন গোপন-লোকে, দেখতে যাহা পায় না চোখ।

---

১ ফুল বিশেষ।

২৮

চলবে নাকো মেকি টাকার কারবার আর, মোল্লাজি[১] !
মোদের আবাস সাফ করে নেয় সেয়ান-ঝাড়ুর কারসাজি।
বেরিয়ে ভাঁটি-খানার থেকে বলল হেঁকে বৃদ্ধ পির —
'অনন্ত ঘুম ঘুমাবি কাল পান করে নে মদ আজি!'

২৯

সবকে পারি ফাঁকি দিতে মনকে পারি ঠারতে চোখ,
খোদার উপর খোদকারিতে ব্যর্থ হয় এ মিছে স্তোক।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে জাল বুনিলাম চাতুর্যের,
মুহূর্তে তা দিল ছিঁড়ে হিংস্র নিয়তির সে নোখ!

৩০

মৃত্তিকা-লীন হবার আগে নিয়তির নিঠুর করে
বেঁচে নে তুই, মৃত্যু-পাত্র আসছে রে ওই তোর তরে!
হেথায় কিছু জোগাড় করে নে রে, হোথায় কেউ সে নাই
তাদের তরে — শূন্য হাতে যায় যাহারা সেই ঘরে।

৩১

বলতে পার, অসার-শূন্য ভবের হাটের এই ঘরে
জ্ঞান-বিলাসী সুধীজনের হৃদয় কেন রয় পড়ে?
যেই তাহারা শ্রান্ত হয়ে এই সে ঘরের শান্তি চায়,
'সময় হল, চল ওরে', কয় অমনি মরণ হাত ধরে!

৩২

খাজা[২]! তোমার দরবারে মোর একটি শুধু আর্জি[৩] এই—
থামাও উপদেশের ঘটা, মুক্তি আমার এই পথেই।
দৃষ্টি-দোষে দেখছ বাঁকা আমার সোজা সরল পথ,
আমায় ছেড়ে ভালো করো ঝাপসা তোমার চক্ষুকেই।

৩৩

কাল কী হবে কেউ জানে না, দেখছ তো হায়, বন্ধু মোর!
নগদ মধু লুঠ করে লও, মোছো মোছো অশ্রু-লোর।

১ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে ব্যক্তি মদ্যপানাদি বারণ করেন। ২ গুরু, সম্মানিত ভদ্রলোক। ৩ নিবেদন।

চাঁদনি-তরল শরাব পিয়ো, হায়, সুন্দর এই সে চাঁদ
দীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ শূন্য ধরার ক্রোড়।

৩৪

প্রেমিকরা সব আমার মতো মাতুক প্রেমের মত্ততায়,
দ্রাক্ষা-রসের দীক্ষা নিয়ে আচার-নীতি দলুক পায়।
থাকি যখন সাদা চোখে, সব কথাতে রুষ্ট হই,
শরাব পিয়ে দিল-দরিয়া উড়িয়ে দি ভয়-ভাবনায়।

৩৫

মানব-দেহ — রঙে-রূপে এই অপরূপ ঘরখানি—
স্বর্গেরি সে শিল্পী কেন করল সৃজন কী জানি,
এই 'লাল-রুখ'[১] বল্লি-তনু ফুল্ল-কপোল তন্বীদের
সাজাতে হায় ভঙ্গুর এই মাটির ধরার ফুলদানি!

৩৬

তিন ভাগ জল এক ভাগ থল এই পৃথিবীর এও মায়া,
এই ধরাতে দেখছ যা তার সকল-কিছু সব মায়া,
এই যে তুমি বলছ যা সব, শুনছ কলরব — মায়া।
গোপন প্রকাশ সত্য মিথ্যা এ সব অবাস্তব মায়া।

৩৭

দোষ দেয় আর ভর্ৎসে সবাই আমার পাপের নাম নিয়া,
আমার দেবী-প্রতিমারে পূজি তবু প্রাণ দিয়া।
মরতে যদি হয় গো আমায় শরাব-পানের মজলিশে —
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শরাব আর প্রিয়া।

৩৮

মুসাফিরের এক রাত্রির পান্থ-বাস এ পৃথ্বীতল —
রাত্রি-দিবার চিত্র-লেখা চন্দ্রাতপ আঁধার-উজল।
বসল হাজার জামশেদ[২] ওই উৎসবেরই আঙিনায়
লাখ বাহ্‌রাম[৩] এই আসনে বসে হল বেদখল।

১ ফুলের মতো গাল বিশিষ্ট। ২,৩ বিখ্যাত রাজা ও শিকারি।

৩৯

কারুর প্রাণে দুখ দিয়ো না, করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িয়ো না তার মনস্তাপ।
অমর-আশিস লাভের আশা রয় যদি, হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছাপ।

৪০

ছেড়ে দে তুই নীরস বাজে দর্শন আর শাস্ত্রপাঠ,
তার চেয়ে তুই দর্শন কর প্রিয়ার বিনোদ বেণির ঠাট ;
ওই সোরাহির হৃদয়-রুধির নিষ্কাশিয়া পাত্রে ঢাল,
কে জানে তোর রুধির পিয়ে কখন মৃত্যু হয় লোপাট।

৪১

অজ্ঞানেরই তিমির-তলের মানুষ ওরে বে-খবর !
শূন্য তোরা, বুনিয়াদ তোর গাঁথা শূন্য হাওয়ার পর।
ঘুরিস অতল অগাধ খাদে, শূন্য মায়ার শূন্যতায়,
পশ্চাতে তোর অতল শূন্য, অগ্রে শূন্য অসীম চর।

৪২

লয়ে শরাব-পাত্র হাতে পিই যবে তা মস্ত[১] হয়ে
জ্ঞানহারা হই সেই পুলকের তীব্র-ঘোর বেদন সয়ে,
কী যেন এক মন্ত্রবলে যায় ঘটে কী অলৌকিক,
প্রোজ্জ্বল মোর জ্ঞান গলে, যায় ঝরনা-সম গান বয়ে।

৪৩

'শরাব ভীষণ খারাপ জিনিস মদ্যপায়ীর নেইকো ত্রাণ।'
ডাইনে বাঁয়ে দোষদর্শী সমালোচক ভয় দেখান —
সত্য কথাই ! যে আঙুরে নষ্ট করে ধর্মমত,
সবার উচিত — নিঙড়ে ওরে করে উহার রক্ত পান !

৪৪

আমার কাছে শোন উপদেশ — কাউকে কভু বলিসনে—
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিসনে !

১ নেশায় সংজ্ঞাহীন।

দুঃখ ব্যথায় টলিসনে তুই, খুঁজিসনে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ ঢলিসনে!

৪৫

মউজ চলুক! লেখার যা তা লিখল ভাগ্য কালকে তোর,
ভুলেও কেহ পুঁছল নাকি থাকতে পারে তোর ওজর[১]!
ভদ্রতারও অনুমতি কেউ নিল না অমনি ব্যস
ঠিক ঠাক সব হয়ে গেল ভুগবি কেমন জীবন-ভোর!

৪৬

সেই সাথে চাই — সৃষ্টি-খাতায় দিক কেটে সে আমার নাম,
আমি চাহি স্রষ্টা আবার সৃজন করুন শ্রেষ্ঠতর
আকাশ ভুবন এই এখনই, এই সে আমার আঁখির পর।
কিংবা আমার যা প্রয়োজন তা মিটাবার দিক সে বর।

৪৭

নাস্তিক আর কাফের বলো তোমরা লয়ে আমার নাম,
কুৎসা গ্লানির পঙ্কিল স্রোত বহাও হেথা অবিশ্রাম।
অস্বীকার তা করব না যা ভুল করে যাই, কিন্তু ভাই,
কুৎসিত এই গালি দিয়েই তোমরা যাবে স্বর্গধাম?

৪৮

বদখশানী[২] রক্ত-চুনির মতন সুরা চুঁইয়ে আন
তপ্তহিয়ার আনন্দ যা, শান্ত যাহে দগ্ধ প্রাণ।
মুসলমানের তরে শরাব হারাম নাকি, সবাই কয়,
বলতে পারে তাদের কেহ — আছে কি আর মুসলমান?

৪৯

মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ-খানায়[৩] মাদ্রাসায়
রাত্রি-দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।
ভেদ জানে আর খোঁজ রাখে ভাই খোদার যারা রহস্যের
ভোলে না এই খোশ-গল্পের ঘুম-পাড়ানো কল্পনায়।

১ অজুহাত, আপত্তি। ২ চুনির জন্য বিখ্যাত প্রদেশ। ৩ ইহুদিদের প্রার্থনাগার, সিনাগগ।

৫০

এক হাতে মোর তসবি[1] খোদার, আর-হাতে মোর লাল গেলাস,
অর্ধেক মোর পুণ্য-স্নাত, আধেক পাপে করল গ্রাস।
পুরোপুরি কাফের নহি, নহি খাঁটি মুসলিমও—
করুণ চোখে হেরে আমায় তাই ফিরোজা নীল আকাশ।

৫১

একমনি ওই মদের জালা গিলব, যদি পাই তাকে,
যে জালাতে প্রাণের জ্বালা নেভাবার ওষুধ থাকে!
পুরানো ওই যুক্তি তর্কে দিয়ে আমি তিন তালাক,
নতুন করে করব নিকাহ্ আঙুর-লতার কন্যাকে।

৫২

বিষাদের ওই সওদা নিয়ে বেড়িয়ো না ভাই শিরোপরি,
আঙুর-কন্যা সুরার সাথে প্রেম করে যাও প্রাণ ভরি!
নিষিদ্ধা ওই কন্যা, তবু হোক সে যতই অ-সতী,
তাহার সতী মায়ের চেয়ে ঢের বেশি সে সুন্দরী!

৫৩

স্বর্গে পাব শরাব-সুধা, এ যে কড়ার[2] খোদ খোদার,
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয়, এ কোন বিচার?
'হামজা'[3] সাথে বেয়াদবি করল মাতাল এক আরব—
তুচ্ছ কারণ — শরাব হারাম তাই হুকুমে 'মোস্তফার'[3]।

৫৪

'রজব শাবান[4] পবিত্র মাস' বলে গোঁড়া মুসলমান,
'সাবধান, এই দু-মাস ভাই কেউ করো না শারাব পান।'
খোদা এবং তার রসুলের 'রজব' 'শাবান' এই দু-মাস
পান-পিয়াসীর তরে তবে সৃষ্ট বুঝি এ 'রমজান'?

৫৫

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শরাব চলুক আজ দেদার।

---

১ মুসলিমদের জপমালা। ২ অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। ৩ হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য। ৪ নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তি। ৪ মুসলমানের চান্দ্রমাস।

এক পেযালি শরাব যদি পান করো ভাই অন্যদিন,
দু-পেয়ালি পান করো আজ বারের বাদশা জুম্মা বার!

৫৬

মসজিদের অযোগ্য আমি, গির্জার আমি শত্রু-প্রায়,
ওগো প্রভু, কোন মাটিতে করলে সৃজন এই আমায়?
সংশযাত্মা সাধু কিংবা ঘৃণ্য নগর-নারীর তুল
নাই স্বর্গের আশা আমার, শান্তি নাহি এই ধরায।

৫৭

মুগ্ধ করো নিখিল-হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে
হৃদয়জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ ম-জিদ আর 'কাবা'[1];
কী হবে তোর তীর্থে 'কাবা'র শান্তি খোঁজ হৃদয তলে।

৫৮

বিধর্মীদের ধর্মপথে আসতে লাগে এক নিমেষ,
সন্দেহেরই বিপথ-ফেরত বিবেক জাগে এক নিমেষ।
দুর্লভ এই নিমেষটুকু ভোগ করে নাও প্রাণ ভরে,
এই ক্ষণিকের আয়েস দিয়ে জীবন ভাসে এক নিমেষ।

৫৯

হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ মন্দির গির্জা, যথাই করুক অর্ঘ্য দান—
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ ও নরক-ভীতির ঊর্ধ্বে তারা মুক্ত-প্রাণ।

৬০

মদ পিয়ো আর ফূর্তি করো — আমার সত্য আইন এই!
পাপ পুণ্যের খোঁজ রাখি না — স্বতন্ত্র মোর ধর্ম সেই।
ভাগ্য সাথে বিয়ের দিনে কইনু, 'দিব কি যৌতুক?'
কইল বধূ, 'খুশি থাকো, তার বড়ো যৌতুক সে নেই!'

১ মক্কাশরিফে অবস্থিত মুসলিম-বিশ্বের উপাসনা-গৃহ।

৬১

এক সোরাহি সুরা দিয়ো, একটু রুটির ছিলকে আর
প্রিয়া সাকি, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখ্‌ত[১] আমি শাহানশার!

৬২

হুরি বলে থাকলে কিছু— একটি হুরি, মদ খানিক,
ঘাস-বিছানো ঝরনাতীরে, অল্প-বয়েস বৈতালিক—
এই যদি পাস, স্বর্গ নামক পুরনো সেই নরকটায়
চাসনে যেতে, স্বর্গ ইহাই স্বর্গ যদি থাকেই ঠিক।

৬৩

যতক্ষণ এ হাতের কাছে আছে অঢেল লাল শরাব
গেহুঁর রুটি, গরম কোরমা, কালিয়া আর শিক-কাবাব,
আর লাল-রুখ প্রিয়া আমার কুটির-শয়ন-সঙ্গিনী, —
কোথায় লাগে শাহানশাহের দৌলত ওই বে-হিসাব!

৬৪

দোষ দিয়ো না মদ্যপায়ীর তোমরা, যারা খাও না মদ;
ভালো করার থাকলে কিছু, মদ খাওয়া মোর হত রদ।
মদ না পিয়েও, হে নীতিবিদ, তোমরা যেসব কর পাপ,
তাহার কাছে আমরাও শিশু, হই না যতই মাতাল-বদ!

৬৫

খুশি-মাখা পেয়ালাতে ওই গোলাপ-রক্ত মদ-মধুর!
মধুরতর পাখির গীতি, বেণুর ধ্বনি, বীণার সুর।
কিন্তু ওই যে ধর্মগোঁড়া — বুঝল না যে মদের স্বাদ,
মধুরতম — রয় সে যখন অন্তত পাঁচ যোজন দূর!

৬৬

চৈতি-রাতে খুঁজে নিলাম তৃণাস্তৃত ঝরনা-তীর,
সুন্দরী এক হুরি নিলাম, পেয়ালা নিলাম লাল পানির।

---

১ সিংহাসন।

আমার নামে বইল হাজার কুৎসা গ্লানির ঝড় তুফান,
ভুলেও মনে হল না মোর স্বর্গ নরকের নজির।

৬৭

সাকি-হীন ও শরাব-হীনের জীবনে হায় সুখ কী বলো?
নাই ইরাকি-বেণুর ধ্বনির জমজমাটি সুর-উছল
সুখ নাই ভাই সেথায় থেকে, এই জগতের তত্ত্ব শোনো,
আনন্দহীন জীবন-বাগে ফলে শুধু তিক্ত ফল।

৬৮

মরুর বুকে বসাও মেলা, উপনিবেশ আনন্দের,
একটি হৃদয় খুশি করা তাহার চেয়ে মহৎ ঢের।
প্রেমের শিকল পরিয়ে যদি বাঁধতে পার একটি প্রাণ —
হাজার বন্দি মুক্ত করার চেয়েও অধিক পুণ্য এর।

৬৯

শরাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকি, হেথায় এলাম ফের!
তৌবা[১] করেও পাইনে রেহাই হাত হতে ভাই এই পাপের।
'নূহ'[২] আর তাঁর প্লাবন-কথা শুনিয়ো নাকো আর, সাকি,
তার চেয়ে মদ-প্লাবন এনে ডুবাও ব্যথা মোর বুকের!

৭০

নৃত্য-পাগল ঝরনাতীরে সবুজ ঘাসের ওই ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেবকুমারের ঠোঁটের পর —
হেলায় পায়ে দলো না কেউ — এই যে সবুজ তৃণের ভিড়
হয়তো কোনো গুল-বদনীর[৩] কবর-ঢাকা নীল চাদর।

৭১

আমার ক্ষণিক জীবন হেথায় যায় চলে ওই ত্রস্ত পায়
খরস্রোতা স্রোতস্বতী কিংবা মরুঝঞ্ঝা-প্রায়।
তারই মাঝে এই দু-দিনের খোঁজ রাখি না — ভাবনা নাই,
যে গতকাল গত, আর যে আগামীকাল আসতে চায়।

১ কোনো পাপ পুনরায় না করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া আল্লার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করা। ২ পয়গম্বর বিশেষ তু. নোয়া। ৩ ফুলের মতো কোমল দেহ এবং মুখ যে নারীর।

৭২

আর কতদিন সাগরবেলায় খামকা বসে তুলব ইঁট !
গড় করি পায়, দিক লেগেছে গড়ে গড়ে মূর্তি পীঠ।
ভেবো নাকো — খৈয়াম ওই জাহান্নমের বাসিন্দা,
ভিতরে সে স্বর্গ-চারী, বাহিরে সে নরক-কীট।

৭৩

মধুর, গোলাপ-বালার গালে দখিন হাওয়ার মদির শ্বাস,
মধুর তোমার রূপের কুহক মাতায় যা এই পুষ্প-বাস।
যে গেছে কাল গেছে চলে এল না তার ম্লান স্মৃতি,
মধুর আজের কথা বলো, ভোগ করে নাও এই বিলাস।

৭৪

শীত ঋতু ওই হল গত বইছে বায় বসন্তেরই,
জীবন-পুথির পাতাগুলি পড়বে ঝরে, নাই দেরি।
ঠিক বলেছেন দরবেশ এক, 'দূষিত বিষ এই জীবন,
দ্রাক্ষার রস বিনা ইহার প্রতিষেধক নাই, হেরি।'

৭৫

'সরো'র'[১] মতন সরল-তনু টাটকা-তোলা গোলাপ-তুল,
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ মশগুল !
মৃত্যুর ঝড় উঠবে কখন, আয়ুর পিরান ছিঁড়বে তোর –
পড়ে আছে ধুলায় যেমন ওই বিদীর্ণ-দল মুকুল !

৭৬

পল্লবিত তরুলতা কতই আছে কাননময়,
দেওদার আর থলকমলে, জান কেন মুক্ত কয় ?
দেবদারু তরুর শত কর, তবু কিছু চায় না সে
থলকমলীর দশ রসনা তবু সদা নীরব রয়।

৭৭

আমার সাথি সাকি জানে মানুষ আমি কোন জাতের ;
চাবি আছে তার আঁচলে আমার বুকের সুখ দুখের।

১ সাইপ্রেস গাছ।

যেমনি মেজাজ মিইয়ে আসে গেলাস ভরে দেয় সে মদ,
এক লহমায় বদলে গিয়ে দূত হয়ে যাই দেবলোকের।

৭৮

আরাম করে ছিলাম শুয়ে নদীর তীরে কাল রাতে,
পার্শ্বে ছিল কুমারী এক, শরাব ছিল পিয়ালাতে ;
স্বচ্ছ তাহার দীপ্তি হেরি শুক্তি-বুকে মুক্তাপ্রায়
উঠল হেঁকে প্রাসাদরক্ষী, 'ভোর হল কি আধ-রাতে ?'

৭৯

মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ওই গোলাপ গুল
শরিয়তের[১] আজ খেলাফ[২] করে বেদম আমি করব ভুল
গুল-লালা-রুখ[৩] কুমারীদের প্রস্ফুটিত যৌবনে
উঠল রেঙে কানন-ভূমি লালা ফুলের কেয়ারি[৪]-তুল।

৮০

হায় রে, আজি জীর্ণ আমার কাব্য পুথি যৌবনের !
ধুলায় লুটায় ছিন্ন ফুলের পাপড়িগুলি বসন্তের।
কখন এসে গেলি উড়ে, রে যৌবনের বিহঙ্গাম !
জানতে পেরে কাঁদছি যখন হয়ে গেছে অনেক দের।

৮১

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর।
স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন — করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি — নিশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার !

৮২

হায় রে হৃদয়, ব্যথায় যে তোর ঝরিছে নিতুই রক্তধার,
অন্ত যে নেই তোর এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের, যন্ত্রণার !
মায়ায় ভুলে এই সে কায়ায় আসলি কেন, রে অবোধ !
আখেরে যে ছেড়ে যেতে হবেই এ আশ্রয় আবার !

---

১ ধর্মের বিধি-বিধান। ২ অমান্য। ৩ ফুলের মতো গন্ধ বিশিষ্ট। ৪ সযত্নে বিন্যস্ত উদ্যান।

৮৩

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব রিক্ত করে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর ;—
মৃত্যুলোকের চোখ এড়িয়ে ফেরত কেহ আসল না,
যেসব পথিক গেল সেথায় নিয়ে তাদের খোশখবর[১]

৮৪

পান করে যাই মদিরা তাই, শুনছি প্রাণে বেণুর রব,
শুনছি আমার তনুর তীরে যৌবনেরই মদির স্তব,
তিক্ত স্বাদের তরে সুরার করো না কেউ তিরস্কার,
ত্যক্ত মানব-জীবন সাথে মানায় ভালো তিক্তাসব।

৮৫

ব্যথার দারু শরাব পিয়ো, ইহাই জীবন চিরন্তন,
জরায় স্বর্গ-অমৃত এ, যৌবনের এ সুখ-স্বপন।
গোলাপ, শরাব, বন্ধু লাভের মরশুম এই আনন্দের—
যদিন বাঁচ শরাব পিয়ো, সত্যিকারের এই জীবন।

৮৬

সুরা দ্রবীভূত চুনি, সোরাহি[২] সে খনি তার,
এই পিয়ালা কায়া যেন, প্রাণ তার এই দ্রাক্ষাসার।
বেলোয়ারির এই পিয়ালা-ভরা তরল হাসির রক্তিমা,
কিংবা ওরা ব্যথায়-ক্ষত হিয়ার যেন রক্তাধার।

৮৭

সুরার সোরাহি এই মানুষ, আত্মা শরাব তার ভিতর,
দেহ তাহার বাঁশরি আর তেজ যেন সেই বাঁশির স্বর।
খৈয়াম ! তুই জানিস কি এই মাটির মানুষ কোন জিনিস ?
খেয়াল-খুশির ফানুস এ ভাই, ভিতরে তার প্রদীপ-কর।

৮৮

ব্যর্থ মোদের জীবনঘেরা কুগ্রহ সব মেঘলা প্রায়,
'জিহুন'[৩] সম স্রোত বয়ে যায় অশ্রুসিক্ত চক্ষে হায় !

১ সুসংবাদ। ২ পেট-মোটা, সরু-গলা জলপাত্র। ৩ নদী বিশেষ।

বুকের কুণ্ডে দুখের দাহ — তারেই আমি নরক কই,
মুহূর্তের যে মনের শান্তি — আমি বলি স্বর্গ তায়।

৮৯

মদের নেশার গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই প্রসাদ পেতে তার হাসির।
শরাব-ভরা কুঁজোর টুঁটি জাপটে সাকি হস্তে তার
পাত্রে ঢালে, নিঠুর হাতে নিঙড়ে তাহার লাল রুধির!

৯০

পেতে যে চায় সুন্দরীদের ফুল্ল-কপোল গোলাপ ফুল
কাঁটার সাথে সইতে হবে তায় নিয়তির তীক্ষ্ণ হুল।
নিঠুর করাত চিরুনিরে কেটে কেটে তুলল দাঁত
তাই সে ছুঁয়ে ধন্য হল আমার প্রিয়ার কেশ আকুল।

৯১

শরাব নিয়ে বসো, ইহাই মহ্‌মুদেরই[১] সুলতানৎ[২],
'দাউদ' নবির শিরীন-স্বর ওই বেণু-বীণার মধুর গত।
লুট করে নে আজের মধু, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
আজকে পেয়ে ভুলে যা তুই অতীত আর ভবিষ্যৎ।

৯২

ওগো সাকি! তত্ত্বকথা চার ও পাঁচের তর্ক থাক,
উত্তর ওই সমস্যার গো এক হোক কী একশো লাখ!
আমরা মাটির, সত্য ইহাই, বেণু আনো, শোনাও সুর!
আমরা হাওয়া, শরাব আনো! বাকি যা সব চুলোয় যাক।

৯৩

এক নিশ্বাস প্রশ্বাসের এই দুনিয়া রে ভাই, মদ চালাও!
কালকে তুমি দেখবে না আর আজ যে জীবন দেখতে পাও।
খামখেয়ালির সৃষ্টি এ ভাই কালের হাতে লুঠের মাল,
তুমিও তোমার আপনাকে এই মদের নামে লুটিয়ে দাও!

১ গজনির রাজা। ২ রাজত্ব।

৯৪

কায়কোবাদের[১] সিংহাসন আর কায়কাউসের রাজমুকুট,
তুসের[২] রাজ্য একছিটে এই মদের কাছে সব যে ঝুট!
ধর্ম-গোঁড়ার উপাসনার কর্কশ যে প্রভাত-স্তব
তাহার চেয়ে অনেক মধুর প্রেমিক-জনের শ্বাস অস্ফুট।

৯৫

এই সে প্রমোদ-ভবন যেথায় জলসা ছিল বাহরামের,
হরিণ সেথায় বিহার করে, আরাম করে ঘুমায় শের!
চিরজীবন করল শিকার রাজশিকারি যে বাহ্‌রাম,
মৃত্যু-শিকারির হাতে সে শিকার হল হায় আখের।

৯৬

ঘরে যদি বসিস গিয়ে 'জমহুর'[৩] আর 'আরাস্তু'[৪]র,
কিংবা রুমের[৫] সিংহাসনে কায়সর[৬] হস শক্তি-শূর—
জামশেদিয়া[৭] জামবাটি ওই যে শুষে রে, সময় নাই,
বাহ্‌রামও[৮] তুই হস যদি, তোর শেষ তো গোর আঁধারপুর!

৯৭

প্রেমের চোখে সুন্দর সেই হোক কালো কি গৌর-বরন,
পরুক ওড়না রেশমি কিংবা পরুক জীর্ণ দীন বসন।
থাকুক শুয়ে ধুলোয় সে কি থাকুক সোনার পালঙ্কে,
নরকে সে গেলেও প্রেমিক করবে সেথায় অন্বেষণ।

৯৮

খৈয়াম[৯] — যে জ্ঞানের তাঁবু করল সেলাই আজীবন,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ে সে আজ সইছে দহন অসহন।
তার জীবনের সূত্রগুলি মৃত্যু-কাঁচি কাটল, হায়!
ঘৃণার সাথে বিকায় তারে তাই নিয়তির দালালগণ!

৯৯

সাত-ভাঁজ ওই আকাশ এবং চার উপাদন-সৃষ্ট জীবন!
ওই এগারোর মারপ্যাঁচে সব ধোয়াস গলিস[১০], বদ-নসিব।

১ ইরানের প্রখ্যাত দুই রাজা। ২ বিখ্যাত শহর। ৩ ভারতীয় রাজার নাম। ৪ অ্যারিস্টট্‌ল। ৫ ইটালির রাজধানী। ৬ সিজার। ৭ জামশেদ রাজার। ৮ বিখ্যাত রাজা। ৯ তাঁবু নির্মাতা। ১০ নোংরা।

যে যায় সে যায় চিরতরে, ফেরত সে আর আসবে না,
পান করে নে বলব কত, বলে বলে ক্লান্ত জিভ!

১০০

খরাব হওয়ার শরাব-খানায় ছুটছি আমি আবার আজ,
রোজ পাঁচবার আজান শুনি, পড়তে নাহি যাই নামাজ!
যেমনি দেখি উদগ্রীব ওই মদের কুঁজো, অমনি ভাই—
কুঁজোর মতোই উদগ্রীব হই, কণ্ঠ সটান হয় দরাজ।

১০১

এই কুঁজো — যা আমার মতো ভোগ করেছে প্রেম-দাহন,
সুন্দরীদের মাথায় থাকি পেল খোঁপার পরশন।
এই সোরাহির পার্শ্বদেশে এই যে হাতল দেখতে পাও,
পেল কতই তন্বঙ্গীর ক্ষীণ কাঁকালের আলিঙ্গান!

১০২

দ্রাক্ষা সাথে ঢলাঢলির এই তো কাঁচা বয়স তোর,
বৎস, শরাব-পাত্র নিয়ে ঠায় বসে দাও আড্ডা জোর।
একবার তো নূহের বন্যা[১] ভাসিয়েছিল জগৎখান,
তুইও না হয় ভাসিয়ে দিলি মদের স্রোতে জীবন তোর!

১০৩

সাবধান! তুই বসবি যখন শরাব পানের জলসাতে,
মদ খাসনে বদমেজাজি নীচ কুৎসিত লোক সাথে।
রাত্তির ভর করবে সে নীচ চিৎকার আর গণ্ডগোল,
ইতর সম চেঁচিয়ে কারণ দর্শাবে ফের সে প্রাতে।

১০৪

যদিও মদ নিষিদ্ধ ভাই, যত পার মদ চালাও,
তিনটি কথা স্মরণে রেখে; কাহার সাথে মদ্য খাও?
মদ-পানের কি যোগ্য তুমি? কী মদই বা করছ পান?
জ্ঞান পেকে না ঝুনো হলে মদ খেয়ো না এক ফোঁটাও!

১ পয়গাম্বর নূহের সময়ে একবার বিশ্বব্যাপী বন্যা হয়।

১০৫

তোমরা — যারা পান কর মদ আর সব দিন, কিন্তু যা
পান কর না শুক্রবারে, ছোঁও না শরাবের কুঁজা—
তাদের বলি — আমার মতো সব বারকে সমান জান,
খোদার তোরা পূজারি হ, করিস নাকো বার পূজা।

১০৬

করছে ওরা প্রচার — পাবি স্বর্গে গিয়ে হুরপরি,
আমার স্বর্গ এই মদিরা, হাতের কাছের সুন্দরী।
নগদা যা পাস তাই ধরে থাক, ধারের পণ্য করিসনে,
দূরের বাদ্য মধুর শোনায় শূন্য হাওয়ায় সঞ্চরি।

১০৭

এই সে আঁধার প্রহেলিকা পারবিনে তুই পড়তে মন!
তুই কি সফল হবি যথায় হার মেনেছে বিজ্ঞজন?
শরাব এবং পেয়ালা নিয়ে খুশির স্বর্গ রচ হেথাই—
পাবি কি না পাবি বেহেশত, বলতে পারে কেউ কখন?

১০৮

দোহাই! ঘৃণায় ফিরিয়ো না মুখ দেখে শরাব-খোর গোঁয়ার
যদিও সাধু সজ্জনেরই সঙ্গে কাটে কাল তোমার।
শরাব পিয়ো, কারণ শরাব পান কর আর না-ই কর,
ভাগ্যে ধার্য থাকলে নরক যায় না পাওয়া স্বর্গ আর।

১০৯

জীবন যখন কণ্ঠাগত — সমান বলখ[১] নিশাপুর[২],
পেয়ালা যখন পূর্ণ হল — তিক্ত হোক কি হোক মধুর!
ফুর্তি চালাও, নিভে যাবে হাজার তপন লক্ষ চাঁদ,
আমরা ফিরে আসব না আর এই ধরণির পথ সুদূর!

১১০

আয় ব্যয় তোর পরীক্ষা কর ঠিক সে হিসাব করতে পেশ,
আসার বেলায় আনলি কী আর নিয়েই বা কী যাস সে দেশ।
'আনব নাকো বিপদ ডেকে শরাব পিয়ে' কস যে তুই,
মদ খাও আর না খাও তবু মরতে তোমায় হবেই শেষ।

১ শহর। ২ খৈয়ামের জন্মভূমি।

১১১

হঠাৎ সেদিন দেখলাম, এক কর্মরত কুম্ভকার,
করছে চূর্ণ মাটির ঢেলা, ঘট তৈরির মাল দেদার।
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এসব যেই দেখলাম, কইল মন,
নূতন ঘট এ করছে সৃজন মাটিতে মোর বাপ দাদার।

১১২

একী আজব করছ সৃষ্টি, কুম্ভকার হে, হাত থামাও!
চূর্ণ নরের মাটি নিয়ে করছ কী তা দেখতে পাও?
কায়খসরুর[১] হৃদয় এবং ফরীদুনের[২] অঙ্গুলি
বে-পরোয়া হয়ে তোমার নিঠুর চাকায় মিশিয়ে যাও!

১১৩

চূর্ণ করে তোমায় আমায় গড়বে কুঁজো কুম্ভকার,
ওগো প্রিয়া! পার হবার সে আগেই মৃত্যু-খিড়কি-দ্বার—
পাত্রে ব্যথার শান্তি ঢালো — এই সোরাহির লাল সুরা,
এক পেয়ালা তুমি পিয়ো, আমায় দিয়ো পেয়ালা আর।

১১৪

এই যে রঙিন পেয়ালাগুলি নিজ হাতে যে গড়ল সে
ফেলবে ভেঙে খেয়াল-খুশির লীলায় এদের বিন-দোষে?
এতগুলি সুষ্ঠু শোভন চটুল আঁখি চন্দ্রমুখ
প্রীতির ভরে সৃষ্টি করে করবে ধ্বংস ক্রোধবশে?

১১৫

পিয়ালাগুলি তুলে ধরো চৈত্রী লালা ফুলের প্রায়
ফুরসুত তোর থাকলে, নিয়ে বস লালা-রুখদিল[৩] প্রিয়ায়।
মউজ করে শরাব পিয়ো, গ্রহের ফেরে হয়তো ভাই
উলটে দেবে পেয়ালা সুখের হঠাৎ-আসা ঝঞ্ঝাবায়।

১১৬

মসজিদ আর নামাজ রোজার থামাও থামাও গুণ গাওয়া,
যাও, গিয়ে খুব শরাব পিয়ো, যেমন করেই যাক পাওয়া!

---

১ ও ২ ইরানের রাজা। ৩ ফুলের মতো গাল।

খৈয়াম, তুই পান করে যা, তোর ধূলিতে কোন একদিন
তৈরি হবে পিয়ালা, কুঁজো, গাগরি, গেলাস মদ-খাওয়া।

১১৭

মৃত্যু যেদিন নিঠুর পায়ে দলবে আমার এই পরান,
আয়ুর পালক ছিন্ন করি করবে হৃদয়-রক্ত পান,
আমায় মাটির ছাঁচে ঢেলে পেয়ালা করে ঢালবে মদ,
হয়তো গন্ধে সেই শরাবের আবার হব আয়ুষ্মান!

১১৮

রে নির্বোধ! এ ছাঁচে-ঢালা মাটির ধরা শূন্য সব,
রং-বেরং-এর খিলান-করা এই যে আকাশ — অবাস্তব।
এই যে মোদের আসা-যাওয়া জীবন-মৃত্যু-পথ দিয়ে,
একটি নিশ্বাস ইহার আয়ু, আকাশ-কুসুমের এ টব।

১১৯

তিরস্কার আর করবে কত জ্ঞান-দাম্ভিক অর্বাচীন?
লম্পট নই, পান যদিও করি শরাব রাত্রিদিন!
তোমার কাছে তসবি[১] দাড়ি, তাপস সাজার নানান মাল,
আমার পুঁজি দিল্-প্রিয়া আর লাল পেয়ালি মদ-রঙিন!

১২০

মসজিদের ওই পথে ছুটি প্রায়ই আমি ব্যাকুল প্রাণ,
নামাজ পড়তে নয় তা বলে, খোদার কসম! সত্যি মান
নামাজ পড়ার ভান করে যাই করতে চুরি জায়নামাজ[২],
যেই ছিঁড়ে যায় সেখানা, যাই করতে চুরি আরেকখান।

১২১

নিত্য দিনে শপথ করি — করব তৌবা[৩] আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।
অমনি আঁখির আগে দাঁড়ায়ে গোলাপ-ব্যাকুল বসন্ত
সকল শপথ ভুল হয়ে যায়, কুলোয় না আর তৌবাতে।

১ মুসলিমদের জপমালা। ২ যে-আসনে নামাজ পড়া হয়। ৩ আর কোনো পাপকার্য না করার সংকল্প করে ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন।

১২২

আগে যে সব সুখ ছিল, আজ শুনি তাদের নাম কেবল,
মদ ছাড়া সব গেছে ছেড়ে আগের ইয়ার বন্ধুদল।
কেমন করে ছাড়ব — যে মদ আমায় কভু ছাড়ল না,
এক পেয়ালা আনন্দ, তাও ছাড়লে কীসে বাঁচব বল!

১২৩

আমরা শরাব পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি ওই পানশালার,
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার।
আমরা যদি পাপ না করি ব্যর্থ হবে তাঁর দয়া,
পাপ করি তাই ক্ষমা করে করুণাময় নাম খোদার!

১২৪

তোমার দয়ার পিয়ালা প্রভু উপচে পড়ুক আমার পর,
নিত্য ক্ষুধার অন্ন পেতে না যেন হয় পাততে কর।
তোমার মদে মস্ত করো আমার 'আমি'র পাই সীমা,
দুঃখে যেন শির না দুখায়, হে দুখ-হর অতঃপর!

১২৫

আমায় সৃজন করার দিনে জানত খোদা বেশ করেই,
ভাবীকালের কর্ম আমার, বলতে পারত মুহূর্তেই।
আমি যেসব পাপ করি — তা ললাট-লেখা, তাঁর নির্দেশ,
সেই সে পাপের শাস্তি নরক — কে বলবে ন্যায় বিচার এই!

১২৬

দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু, দুয়ার খোলো করুণার!
আমায় করো তোমার জ্যোতি, অন্তর মোর অন্ধকার।
স্বর্গ যদি অর্জিতে হয় এতই পরিশ্রম করে —
সে তো আমার পারিশ্রমিক নয় সে দয়ার দান তোমার।

১২৭

দয়ার তরেই দয়া যদি, করুণাময় স্রষ্টা হন,
আদমেরে স্বর্গ হতে দিলেন কেন নির্বাসন?
পাপীর তরে করুণা যে — করুণা সে-ই সত্যিকার,
তারে আবার প্রসাদ কে কয় পুণ্য করে যা অর্জন!

১২৮

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা-হৃদয় করি হেথায় শরাব পান।
আরাম-সুখের কাঙাল নহি, ভয় করি না দুর্দশায়,
এই ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুতের ঊর্ধ্বে ফিরি মুক্ত-প্রাণ।

১২৯

দেখে দেখে ভণ্ডামি সব হৃদয় বড়ো ক্লান্ত ভাই!
তুরন্ত শরাব আনো সাকি, ভণ্ডের মুখ ভুলতে চাই!
শরাব আনো বাঁধা রেখে এই টুপি এই জায়নামাজ,
হব বক-ধার্মিক কাল, আজ তো এখন মদ চালাই।

১৩০

স্যাঙাৎ ওগো, আজ যে হঠাৎ মোল্লা হয়ে সাজলে সং!
ছাড়ো কপট তপের এ ভান, সাধুর মুখোশ এই ভড়ং।
দেবেন 'আলী-মুর্তজা'[১] যা সাকি হয়ে বেহেশতে
পান কর সে শরাব হেথাও হুরি নিয়ে রং-বেরং।

১৩১

পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক শেখজি কন —
'দুরাচার আর সুরার করো দাসীপনা সর্বক্ষণ!'
'আমায় দেখে যা মনে হয়, তাই আমি' — কয় বারনারী,
'কিন্তু শেখজি, তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?'

১৩২

হাতে নিয়ে পান-পিয়ালা নামাজ পড়ার মাদুরখান—
দেখতে পেলাম ভাঁটি-খানার পথ ধরে শেখ সাহেব যান!
কইনু দেখে, 'ব্যাপার কী এ, এ-পথে যে শেখ সাহেব!'
কইলেন পির, 'ফক্কিকার এ-দুনিয়া, করো শরাব পান!'

১৩৩

কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাঁটিখানার পাঁড় মাতাল,
পির সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল-ভরা মাল।

---

১ হজরত মোহাম্মদের জামাতা; শিয়াদের প্রথম ইমাম।

কইনু, 'হে পির, শরম তোমার নেই কি?' হেসে কইল পির,
'খোদার দয়ার ভাণ্ডার সে অফুরন্ত, রে বাচাল!"

১৩৪

হে শহরের মুফতি[১]! তুমি বিপথ-গামী কম তো নও,
পানোন্মত্ত আমার চেয়ে তুমিই বেশি বেহুঁশ হও।
মানব-রক্ত শোষ তুমি, আমি শুষি আঙুর-খুন,
রক্ত-পিপাসু কে বেশি এই দু-জনের, তুমিই কও!

১৩৫

ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,
চায় না খোদায় — লোকের তারা প্রশংসা চায় ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোশ পরে সাধু ফকির ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের[২] ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ!

১৩৬

ধূলি-ম্লান এ উপত্যকায় এলি, এসেই হলি গুম,
করল তোরে জরদ্গাব এই সে যাওয়া আসার ধুম।
নখগুলো তোর পুরু হয়ে হয়েছে আজ ঘোড়ার খুর,
দাড়ির বোঝা জড়িয়ে গিয়ে হল যেন গাধার দুম।

১৩৭

সুন্দরীদের তনুর তীর্থে এই যে ভ্রমণ, শরাব পান,
ভণ্ডদের ওই বুজরুকি কি হয় কখনও তার সমান?
প্রেমিক এবং পান-পিয়াসি এরাই যদি যায় নরক,
স্বর্গ হবে মোল্লা পাদরি আচার্যদের 'দাড়ি-স্থান'!

১৩৮

এই মূঢ়দল — স্থূল তাহাদের অজ্ঞানতার ঘোর মায়ায়,
ভাবে — মানবজাতির নেতা তারাই জ্ঞান ও গরিমায়।
ফতোয়া দিয়ে কাফের করে তাদের তারা এক কথায়
শুভ্র-মুক্ত বুদ্ধি যারা, নয় গর্দভ তাদের ন্যায়।

১ যিনি ধর্মানুশাসন (ফতোয়া) প্রচার করেন। ২ ধর্মে অবিশ্বাসী।

১৩৯

মার্কা-মারা রইস যত — ঈষৎ দুখের বোঝার ভার
বইতে যাঁরা পড়েন ভেঙে, বিস্ময়ের নাই অন্ত আর,
তাঁরাই যখন দীন দরিদ্রে দেখেন দ্বারে পাততে হাত
তাদের তখন চিনতে নারেন মানুষ বলে এই ধরার।

১৪০

দরিদ্রেরে যদি তুমি প্রাপ্য তাহার অংশ দাও,
প্রাণে কারুর না দাও ব্যথা, মন্দ কারুর নাহি চাও
তখন তুমি শাস্ত্র মেনে না-ই চললে তায় বা কি!
আমি তোমায় স্বর্গ দিব, আপাতত শরাব নাও!

১৪১

জ্ঞান যদি তোর থাকে কিছু — জ্ঞানহারা হ সত্যিকার,
পান করে নে শাশ্বতী সে সাকির পাত্রে সুরার সার!
সেয়ান-জ্ঞানী! তোর তরে নয় গভীর আত্মবিস্মৃতি,
সব বোকারা জ্ঞান লভে না সত্যিকারের জ্ঞানহারার।

১৪২

যার পরে তোর আস্থা গভীর, এই যে বুকের বন্ধু তোর
মার্জিত জ্ঞান-চক্ষু নিয়ে দেখ এই তোর শত্রু ঘোর।
বন্ধু বেছে নিসনে রে তোর অমার্জিতের ভিড় থেকে,
ভেজিয়ে দে ভাই অন্তরহীন অন্তরঙ্গতার এ দোর।

১৪৩

দাস হোয়ো না মাৎসর্যের, হোয়ো নাকো অর্থ-যখ,
ঘাড়ে যেন ভর করে না ঠুনকো যশোখ্যাতির শখ,
অগ্নিসম প্রদীপ্ত হও, বন্যাসম প্রাণোদ্বেল,
হোয়ো নাকো পথের ধূলি, হাওয়ার হাতের ক্রীড়নক!

১৪৪

যোগ্য হাতে জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত করো এই জীবন,
নির্বোধদের কাছ থেকে ভাই থাকবে তফাত দশ যোজন!

জ্ঞানী হাকিম বিষ যদি দেয় বরং তাহাই করবে পান,
সুধাও যদি দেয় আনাড়ি — করবে তাহা বিসর্জন!

১৪৫

সেরেফ খেয়াল-খুশির বশে আপন জনের বক্ষে তুই,
এই যে তীব্র যন্ত্রণারই ক্ষত এঁকে দিস নিতুই —
শোক কর, কাঁদ, অশান্ত তোর মনও মৃত বীর তরে,
আপন হাতে বধ করেছিস, রে অবোধ, এ শক্তি দুই।

১৪৬

ধীর চিত্তে সহ্য করো, দুঃখ শোকের এই দাওয়াই,
দুঃখ পেয়ে রুক্ষ-মেজাজ হসনে, দেখবি দুঃখ নাই!
অভাবে ক্ষয় হয় না যেন তোর স্বভাবের প্রশান্তি,
ষড়ৈশ্বর্য লাভের উপায়, আমার মতে, এই সে ভাই!

১৪৭

আকাশ পানে হতাশ আঁখি চেয়ে থাকি নির্নিমিখ
'লওহ'[১] 'কলম'[২] বেহেশত-দোজখ[৩] কোথায় থাকে কোন সেদিক
অন্ধকারে পেলাম আলো, দরবেশ এক কইল শেষ —
'লওহ' 'কলম' বেহেশ্ত-দোজখ তোরই মাঝে— নয় অলীক।

১৪৮

দশ বিদ্যা, আট স্বর্গ, সাত গ্রহ আর নয় গগন
করল স্রষ্টা সৃষ্টি রে ভাই, দেখছে যাহা জ্ঞান-নয়ন।
চার উপাদান, ইন্দ্রিয় পাঁচ, আত্মা তিন, ও দুই জগৎ —
পারল না সে সৃষ্টি করতে আরেকটি লোক মোর মতন।

১৪৯

কী হই আর কী নই আমি — মোর চেয়ে তা কে জানে?
ঊর্ধ্বে নিম্নে যাহা কিছু ভেদ আছে তার মোর প্রাণে।
একদিনে মোর এসব বিদ্যা করব জলে বিসর্জন,
শরাব পানের অধিক মহৎ — কেউ যদি তার খোঁজ আনে!

১,২ ভাগ্যের লিখন। ৩ স্বর্গ-নরক।

১৫০

একদা মোর ছিল যখন যৌবনেরই অহংকার
ভেবেছিলাম— গিঁঠ খুলেছি জীবনের সব সমস্যার।
আজকে হয়ে বৃদ্ধ জ্ঞানী বুঝেছি ঢের বিলম্বে,
শূন্য হাতড়ে শূন্য পেলাম — যে আঁধারকে সে আঁধার!

১৫১

আসিনি তো হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে,
যাবও না নিজ ইচ্ছামতো, খেলার পুতুল তাঁর হাতে।
ক্ষীণ কাঁকালে জড়িয়ে আঁচল, ঢালো সাকি বিলাও মদ,
পিয়ালা ভরো সেই পানিতে — ধরার কালি ধোয় যাতে।

১৫২

ঘেরাটোপের পর্দা-ঘেরা দৃষ্টি-সীমা মোদের ভাই,
বাইরে ইহার দেখতে গেলে শূন্য শুধু দেখতে পাই।
এই পৃথিবীর আঁধার বুকে মোদের সবার শেষ আবাস —
বলতে গেলে ফুরোয় না আর বিষাদ-করুণ সেই কথাই।

১৫৩

আমার রোগের এলাজ[১] করো পিইয়ে দাওয়াই লাল সুরা,
পাংশু মুখে ফুটবে আমার চুনির লালি, বন্ধুরা!
মরব যেদিন — লাল পানিতে ধুয়ো সেদিন লাশ আমার,
আঙুর-কাঠের 'তাবুত'[২] করো, কবর দ্রাক্ষাদল-ঝুরা।

১৫৪

পেয়ালার প্রেম যাচ্ঞা করো, থেমো না এক মুহূর্তও
থাকবে হৃদয় মগজ তাজা মদ দিয়ে তায় ভিজিয়ে থোও!
আদমেরে করতে প্রণাম শয়তান দু-হাজার বার —
হায় যদি সে গিলতে পেত বিন্দু-প্রমাণ আঙুর-মউ।

১৫৫

অঙ্গো রক্ত-মাংসের এই পোশাক আছে যতক্ষণ
তকদিরের[৩] ওই সীমার বাইরে করিসনে তুই পদার্পণ।

১ চিকিৎসা। ২ কফিন। ৩ ভাগ্য।

নোয়াসনে শির, 'রুস্তম জাল'[১] শত্রু যদি হয় রে তোর,
দোস্ত যদি হয় 'হাতেম-তাই'[২] তাহারও দান নিসনে শোন।

১৫৬

কইল গোলাপ, "মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি, রং সোনার,
গুলবাগিচার মিশর দেশে যুসোফ আমি রূপকুমার।"
কইনু, 'প্রমাণ আর কিছু কি দিতে পারো?' কইল সে,
'রক্তমাখা এই যে পিরান পরে আছি, প্রমাণ তার!'

১৫৭

হৃদয় ছিল পূর্ণ প্রেমে, পেয়েছিলাম তায় একাও,
বক্ষে ছিল কথার সাগর, একটি কথা কইনি তাও।
দাঁড়িয়ে ভরা নদীর তীরে মরলাম আমি তৃষ্ণাতুর,
বিস্ময়কর এমন শহিদ দেখেছ আর কেউ কোথাও?

১৫৮

'ইয়াসিন'[৩] আর 'বরাত'[৫] নিয়ে, সাকি রে, রাখ, তর্ক তোর!
আমায় সুরার হাত-চিঠে দাও, সেই সে 'সুরা বরাত' মোর।
যে রাতে মোর শ্রান্তি ব্যথা ডুবিয়ে দেবে মদের স্রোত,—
সেই সে 'শবে-বরাত'[৪] আমার, সেই তো আমার বরাত জোর।

১৫৯

ভূলোক আর দ্যুলোকেরই মন্দ ভালোর ভাবনাতে,
বে-পরোয়া ঘুরে বেড়াই ভাটিখানার আড্ডাতে।
গোলোক হয়ে পড়ত যদি মোর ঘরে ওই যুগল লোক,
মদের নেশায় বিকিয়ে দিতাম ওদের একটা আধলাতে।

১৬০

এই নেহারি — নিবিড় মেঘে মগ্ন আছে মুখ তোমার,
একটু পরেই ঠিকরে পড়ে ভুবন-মোহন দীপ্তি তার।
মহলা দাও নিজ মহিমার নিজের কাছেই, হে বিরাট,
দ্রষ্টা তুমি, দৃশ্য তুমি তোমার অভিনয়-লীলার!

---

১ বড়ো বড়ো বীর। ২ আরবের দাতা কর্ণ। ৩,৪ কোরানের রহস্যার্থে। ৫ যে 'ভাগ্যরজনিতে' আগামী বছরের ভাগ্যলিপি লেখা হয়।

১৬১

আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাই রে এতে সন্দ নাই!
আশমানি সেই রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু-বাক্সে ভাই!

১৬২

আশমানি হাত[১] হতে যেমন পড়বে ঘুঁটি ভাগ্যে তোর।
পণ্ডশ্রম করিসনে তুই হাতড়ে ফিরে সকল দোর!
এই জীবনের জুয়াখেলায় হবেই হবে খেলতে ভাই
সৌভাগ্যের সাথে বরণ করে নে দুর্ভাগ্য তোর।

১৬৩

চাল ভুলিয়ে দেয় রানি মোর, খঞ্জন ওই চোখ খর,
বোড়ে দিয়ে বন্দী করে আমার ঘোড়া গজ হরো!
তোমার সকল বল আগিয়ে কিস্তির পর কিস্তি দাও,
শেষে লালা-রুখ দেখিয়ে 'রুখ'[২] নিয়ে মোর, মাত করো!

১৬৪

আশমানে এক বলীবর্দ রয় 'পর্বিণ'[৩] নাম তাহার,
আছে আরেক বৃষভ নীচে বইতে মোদের ধরার ভার।
কাজেই, এই যে মানবজাতি — জ্ঞানীর চক্ষে হয় মালুম -
ওই সে ভীষণ ষাঁড় যুগলের মধ্যে যেন ঝাঁক গাধার!

১৬৫

শ্রেষ্ঠ শরাব পান করে নেয় বদরসিকে, হায় রে হায়!
স্থূল-আত্মা মূর্খ ধনিক শ্রেষ্ঠ বিলাস বিভব পায়।
হায় রে যত চিত্তহারী রূপকুমারী জর্জিয়ার
শুকায় কিনা গুম্ফবিহীন বালক-সাথে মাদ্রাসায়!

১ ভাগ্য-লিখন। ২ ইংরেজিতে রুক বা কাস্‌ল, বাংলার নৌকা (দাবা খেলায়)। এখানে সুন্দরী ও ঘুঁটি উভয়ার্থে। ৩ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রের কক্ষ।

১৬৬

রূপ লোপ এর হয় অরূপে, অস্থি ইহার হয় না নাশ।
এই মদিরা — হাজার রূপে অরূপে এর হয় প্রকাশ,
ভেবো না কেউ সুরার সাথে সুরার সারও যায় উবে,
কভু এ হয় প্রাণী কভু তরুলতা, ফুল-সুবাস।

১৬৭

লাল গোলাপে কিস্তি দিয়ে তোমার ও গাল করে মাত,
খেলতে গিয়ে চীনকুমারী হারে প্রিয়া তোমার সাথ।
খেলতে বাবিল-রাজার সাথে হানলে চাউনি একটিবার
মন্ত্রী ঘোড়া গজ নিলে তার হেনে ওই এক নয়নপাত!

১৬৮

তোমার-আমার কী হবে ভাই তাই ভেবে মোর ব্যাকুল মন!
মীনকুমারী হংসীরে কয়, 'শুকাবে এই বিল যখন!'
মরালী কয়, 'কাবাব যদি হই দু-জনাই তুই-আমি,
ভাসলে এ বিল মদের স্রোতে মোদের কি তায় লাভ তখন!'

১৬৯

ঘূর্ণমান ওই কুগ্রহ-দল — সদাই যারা ভয় দেখায় —
ঘুরছে ওরা ভোজবাজির ওই লন্ঠনেরই ছায়ার প্রায়
সূর্য যেন মোমবাতি আর ছায়া যেন পৃথ্বী এই,
কাঁপছি মোরা মানুষ যেন প্রতিকৃতি আঁকা তায়।

১৭০

ফিরনু পথিক সাগর মরু ঘোর বনে পর্বতশিরে
এই পৃথিবীর সকল দেশে গুহায় ঘরে মন্দিরে,
শুনলাম না — ফিরছে কেউ তীর্থ-পথিক এই পথের,
আজ এ পথে যাত্রা যাহার, আসল না সে কাল ফিরে!

১৭১

দুই জনাতেই সইছি সাকি নিয়তির ভ্রূভঙ্গি ঢের,
এই ধরাতে তোমার আমার নাই অবসর আনন্দের।
তবুও মোদের মাঝে আছে মদ-পিয়ালা যতক্ষণ
সেই তো ধ্রুব সত্য, সখী, পথ দেখাবে সেই মোদের!

১৭২

স্রষ্টা মোরে করল সৃজন জাহান্নমে জ্বলতে সে,
কিংবা স্বর্গে করবে চালান — তাই বা পারে বলতে কে!
করব না ত্যাগ সেই লোভে এই শরাব সাকি দিলরুবা,
নগদার এ ব্যবসা খুইয়ে ধারে স্বর্গ কিনবে কে?

১৭৩

দুর্ভাগ্যের বিরক্তি পান করতে যেন না হয় আর,
পানই যদি করি, পানি পান করব পানশালার।
এই সংসার হত্যাকারী, রক্ত তাহার লাল শরাব,
আমাদের যে খুন করে, কি? করব না পান খুন তাহার?

১৭৪

ওমর রে, তোর জ্বলছে হৃদয় হয়তো নরকেই জ্বলি,
তাহার বহ্নি-মহোৎসবে হয়তো হবি অঞ্জলি।
খোদায় দয়া শিখাতে যাস সেই সে তুই, কী দুঃসাহস।
তুই শিখাবার কে, তাঁহারে শিখাতে যাস কী বলি?

১৭৫

কুগ্রহ মোর! বলতে পারিস, করেছি তোর ক্ষতি কোন
সত্যি বলিস, মোর পরে তুই বিরূপ এত কী কারণ।
একটু মদের তরে এত উঞ্ছবৃত্তি তোষামোদ
এক টুকরো রুটির তরে, ভিক্ষা করাস অনুক্ষণ।

১৭৬

জন্মাদিনি ভাগ্যলক্ষ্মী, ওর্ফে ওগো গ্রহের ফের!
স্বভাব-দোষে চিরটা কাল নিষ্ঠুরতার টানছ জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখতে যদি এই ধরা
খুঁজে পেত ওই বুকে তার হারা-মণি-মানিক ঢের।

১৭৭

ভাগ্যদেবী! তোমার যত লীলাখেলায় সুপ্রকাশ
অত্যাচারী উৎপীড়কের দাসী তুমি বারো মাস।
মন্দকে দাও লাখ নিয়ামত[১] ভালোকে দাও দুঃখ শোক,
বাহাত্তুরে ধরল শেষে? না এ বুদ্ধিভ্রম বিলাস?

১৭৮

সইতে জুলুম খল নিয়তির চাও বা না চাও শির নোওয়াও!
বাঁচতে হলে হাত হতে তার প্রচুরভাবে মদ্য খাও।
তোমার আদি অন্ত উভয় এই সে ধুলামাটির কোল,
নিম্নে নয় আর এখন তুমি ধরার ধূলির উর্ধ্বে ধাও।

১৭৯

মোক্কম বাঁধ বেঁধেছে যে মোদের স্বভাব-শৃঙ্খলে,
স্বভাব-জয়ী হতে আবার আমাদেরে সেই বলে!
দাঁড়িয়ে আছি বুদ্ধিহত তাই এ দুয়ের মাঝখানে—
উলটে ধরবে কুঁজো কিন্তু জল যেন তার না টলে!

১৮০

মানুষ খেলার গোলক প্রায় ফিরছে ছুটে ডাইনে বাঁয়,
যেদিক পানে চলতে বলে ক্রূর নিয়তির হাতা তায়।
কেন হলি ভাগ্যদেবীর নিঠুর খেলার পুতুল তুই,
সে-ই জানে — এক সে-ই জানে রে, আমরা পুতুল অসহায়।

১৮১

খামকা ব্যথার বিষ খাসনে, মুষড়ে যাসনে নিরাশায়,
ফেরেব-বাজির এই দুনিয়ার তুই ধরে থাক সত্য ন্যায়
আখেরে তো দেখলি বিশ্ব শূন্য ফাঁস ফক্কিকার,
তুইও মায়ার পুতুল যখন — ভয় ভাবনা যাক চুলায়!

১৮২

সিন্ধু হতে বিচ্ছেদেরই দুঃখে কাঁদে বিন্দুজল,
'পূর্ণ আমি', কইল হেসে বিন্দুরে সিন্ধু অতল।
সত্য শুধু পূর্ণ, বাকি অন্য যা তা নাস্তি সব,
ঘূর্ণ্যমান ওই এক সে বিন্দু বহুর রূপে করছে ছল।

১৮৩

আমার রানি (দীর্ঘায়ু হন দণ্ডে মারতে দাসকে তাঁর!)
হঠাৎ খেয়াল হল, দিলেন সস্নেহ এক উপহার!
গেলেন চলে অনুগ্রহের চাউনি হেনে! তার মানে —
'তার চেয়ে ওই নালার জলে দাও ভাসিয়ে প্রেম তোমার!'

১৮৪

তোমার আদরিণী বধূ ছিল, প্রভু আত্মা মোর,
কাজ হতে তায় তাড়িয়ে দিলে কোন দোষে হায়, হে মনোচোর!
পূর্বে কভু ছিলে না তো এমন কঠোর, হে স্বামী!
বিরহিণী বাস করিব প্রবাসে কি জীবনভর?

১৮৫

যেমনি পাবি মন দুই মদ — যেখানে হোক যদিই পাস—
অমনি পানোন্মত্ত ওরে, সে মদ-স্রোতে ডুবে যাস!
যেমনি খাওয়া অমনি হবি আমার মতো মুক্ত-প্রাণ,
ভেসে যাবে রাশভারি তোর ঋষির মতো দাড়ির রাশ।

১৮৬

মানব-স্বভাব জড়িয়ে বহে মন্দ ভালোর দুই ধারা,
শুভাশুভ দুঃখ ও সুখ দান নিয়তির — কয় যারা,
তাদের বলি — অপরাধী করছে খামকা কুগ্রহে,
তোমার চেয়ে হাজার গুণ যে অসহায় সে বেচারা!

১৮৭

তোমার নিন্দা করতে সাহস করবে না আর কেউ কোথাও!
এক সে উপায় আছে যদি বিশ্বে খুশি করতে চাও
এন্তার সব শ্রদ্ধা পাবে বড়ো ছোটো সকলকার
মুসলিম খ্রিস্টান ইহুদি সবার যশোগাথা গাও।

১৮৮

বলতে পার! টক সে কেন আঙুর যখন কাঁচা রয়?
পাকলে ভরে মিষ্টি রসে, তারই শরাব তিক্ত হয়।
কাঠকে কুঁদে কুঁদে যখন শিল্পী গড়ে রবাব বীণ
সেই কাঠে সেই শিল্পী বেণু গড়তে পারে? নয় গো নয়!

১৮৯

খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা-গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী রোস যদি তুই গোরস্থানে।

'খিজির'[1] হও আর 'ইলিয়াস'[2] হও ; সব-সে-আচ্ছা এই ধরায়
জানতে চাসনে কারেও আর তোরেও কেহ না জানে।

১৯০

খৈয়াম! তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা?
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা?
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবি তার তাঁর দয়ায়
পাপীর তরেই দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা।

১৯১

আবার যখন মিলবে হেথায় শরাব সাকির আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল, একটি ফোঁটা অশ্রু ফেলো মোর নামে!
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন, সাকির পাশ,
পেয়ালা একটি উলটে দিয়ো স্মরণ করে খৈয়ামে!

১৯২

বিশ্ব-দেখা জামশেদিয়া পেয়ালা খুঁজি জীবন-ভর
ফিরনু বৃথাই সাগর গিরি কান্তার বন আকাশ-ক্রোড়।
জানলাম শেষ জিজ্ঞাসিয়া দরবেশ এক মুরশিদে—
জামশেদের সে জামবাটি এই আমার দেহ আত্মা মোর!

১৯৩

আকাশ যেদিন দীর্ণ হবে, আসবে যেদিন ভীম প্রলয়,
অন্ধকারে বিলীন হবে গ্রহ তারা জ্যোতির্ময়,
প্রভু আমার দামন[3] ধরে বলব কেঁদে, 'হে নিঠুর,
নিরপরাধ মোদের কেন জন্মে আবার মরতে হয়?'

১৯০

হৃদয় যদি জীবনে হয় জীবনের রহস্যজয়ী,
খোদা কী, তা জানতে পারে মৃত্যুতে সে অবশ্যই।
কিন্তু তুমি থেকেই যদি শূন্য ঠেকে সব কিছুই,
তুমি যখন রইবে না কাল জানবে কী আর শূন্য বই?

১,২ অমৃতকবির আবিষ্কর্তা। ৩ অঞ্চল, কুর্তার অগ্রভাগ।

১৯৫

খৈয়াম! তোর দিন দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা —
আত্মা নামক শাহনশাহের[১] হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।
তাম্বুওয়ালা মৃত্যু আসে আত্মা যখন লন বিদায়,
উঠিয়ে তাঁবু অগ্রে চলে; কোথায় সে যায় অ-জানা।

১৯৬

পৌঁছে দিয়ো হজরতেরে খৈয়ামের হাজার সালাম,
শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসিয়ো তাঁরে লয়ে আমার নাম—
'বাদশানবি! কাঁজি খেতে নাই তো নিষেধ শরিয়তে,
কী দোষ করল আঙুর-পানি? করলে কেন তার হারাম?'

১৯৭

তত্ত্ব-গুরু খৈয়ামেরে পৌঁছে দিয়ো মোর আশিস
ওর মতো লোক বুঝল কিনা উলটো করে মোর হদিস!
কোথায় আমি বলেছি যে, সবার তরেই মদ হারাম?
জ্ঞানীর তরে অমৃত এ, বোকার তরে উহাই বিষ!



১ রাজার রাজা।

অগ্রন্থিত কবিতা

১

উর্ধ্বে তুলিয়া বৈজয়ন্তী উন্নত করি শির,
লাঞ্ছিতা এই ভারতবর্ষ — দাঁড়ারে বন্দি বীর।
যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছি ভরি
মায়ের পূজার ডালা
অস্থি-সমিধে জ্বালিয়ো অনল
ভুলি কলঙ্ক-জ্বালা।

প্রাণ বলি দিতে পূজার বেদিতে যারা সবে আগুয়ান,
গৈরিক ধ্বজা তাদেরই গরব শহিদের সম্মান।
তাদের চরণ করিয়া স্মরণ
ভরা দুর্জয় মাথে,
মুক্তি আশায় আয় ছুটে আয়
মরণ পাথেয় হাতে
আপনার গৃহ যদি কারাগার
স্বদেশ বন্দিশালা
অগ্নি-শিখায় বন্দিনি মায়
আরতির দীপ জ্বালা।

দাঁড়া দেখি তোরা মানুষের মতো অবনত শির তুলি
পাপের ভারেতে বাসুকির ফণা গর্জি উঠিবে দুলি!
প্রলয় নবীন সৃষ্টি-সূচনা
কর তারই আয়োজন,
প্রাণ দিতে পারি দিব না নিশান
হোক জীবনের পণ॥

আরতির দীপ জ্বালা

২

সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা
শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্যগগন বিষাদ মগন
সে তিলক মুছি দিল কে॥

অবমাননার অতল গহ্বরে যে মানুষ ছিল লুকায়ে,
শরৎ-চাঁদের জ্যোৎস্না তাদের দিল রাজপথ দেখায়ে,
জগতে আজিকে চলে অভিযান তাদেরই তীব্র আলোকে॥
ভীরু গুণ্ঠনতলে যে নারীর প্রাণশিখা ছিল নিভিয়া
স্তিমিত সে প্রাণ উঠিল জ্বলিয়া সে চাঁদের জ্যোতিঃ লভিয়া
সে চাঁদ কোথায়, কোটি আঁখিদীপ খুঁজিয়া ফিরিছে ত্রিলোকে।
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তার প্রতি ভবনে
তেজ প্রদীপ্ত তেমনই জ্বলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে
ঝরিবে তাহার রসধারা চির-অমরাতীর শ্রীলোকে॥

শরৎ প্রণাম

৩

রবীন্দ্রনাথ তোমাদের তরে নিত্য আছেন জাগি,
তরুণ, কিশোর, শিশুরা দুঃখ কোরো না তাঁহার লাগি।
দেহ শুধু তাঁর গিয়াছে, যায়নি তাঁর স্নেহ ভালোবাসা,
যখনই পড়িবে ভাষা তাঁর, প্রাণে জাগিবে বিপুল আশা।
নীরস জীবন রসায়িত হবে তাঁর কবিতায় সুরে
তাঁহার অভয় বাণীতে সর্ব ভয় চলে যাবে দূরে।
যখন শক্তি পাবে না, নিজেরে দুর্বল মনে হবে,
তাঁর লেখা পড়ো, শক্তি সাহসে নূতন জন্ম লবে।
যখনই পৃথিবী ভালো লাগিবে না দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুখে
পড়িয়ো রবির 'গীতালী' 'গীতাঞ্জলি', বল পাবে বুকে।
রবির বিপুল যশ শুনে শুধু শ্রদ্ধা কোরো না তাঁরে,
হবে যশস্বী বিদ্বান তাঁর লেখা পড়ো বারেবারে।
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর লেখায়, কিশোর, শোনো,
— সেই থাকে ছোটো, বড়ো হইবার তৃষা নাই যার কোনো।
নিত্য ভাবিয়ো শয়নে স্বপনে, ক্ষুদ্র হব না আমি,
মোর স্রষ্টা যে নিত্য পূর্ণ সর্বজগত-স্বামী।
তাঁরই বরে কোনো অভাব রবে না, আমি পূর্ণতা পাব,
পূর্ণজ্ঞান ও শক্তি লভিব, ধ্যানে তাঁর কাছে যাব।
এই বৃহতের স্বপ্ন যে দেখে, তাহারই কল্পনাতে
রূপ ধরে আসে ভগবৎ-কৃপা, থাকে তার সাথে সাথে।
সেই হয় এই জগতে ধন্য, মহামানব ও বীর
মরিয়াও সে-ই নিত্য অমর, পূজ্য সব জাতির।
বড়ো হইবার তৃষ্ণা রাখিয়ো, নিশ্চয় বড়ো হবে,

রবীন্দ্রনাথ না-ই হলে, আরও কত দিকে নাম রবে।
হবে নেপোলিয়াঁ হিটলার, হবে গান্ধি ভারত-নেতা,
তুমিই জান না, হয়তো তোমাতে আছে বিশ্ব-বিজেতা।
'দাস হব নাকো, হইব স্বাধীন অমৃতেব সন্তান'
প্রার্থনা করো, আমি বলিতেছি, শুনিবেন ভগবান!
পেয়ে ভগবৎ-শক্তি নামিবে কর্মক্ষেত্রে সবে,
কখনও ভেবো না স্বপ্নেও যেন, কখন চাকরি হবে!
এই ছিল কবি-গুরুর মন্ত্র, সে মন্ত্র যদি লহ,
ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার আশীর্বাদ পাবে অহরহ।

মৃত্যুহীন রবীন্দ্র

"সওগাত"

সওগাত শেষ-বসন্ত-রানী দুলিয়ে চলেন নৃত্যের রানী।

মঞ্জুল ঝিঙুর নোলক-ছন্দে সেই ও চরণ-নূপুর-বন্ধে।

মন্দিরা মুরলি-শোণিত হস্তে এল সে বিরহ-নীরস-বাটে

এ হিয়া শিরে- ভ্রান্ত অর্পি॥

'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা

শিউলিমালা

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৩৮
১৬অক্টোবর ১৯৩১

প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থভুক্ত ছোটো গল্পের তালিকা

পদ্ম-গোখরো
জিনের বাদশা
অগ্নিগিরি
শিউলিমালা

পদ্ম-গোখরো

রসুলপুরের মির সাহেবদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া ফাঁপাইয়া উঠিল। লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল, তাহারা জিনের বা যক্ষের ধন পাইযাছে। নতুবা এই দুই বৎসরের মধ্যে আলাদিনের প্রদীপ ব্যতীত কেহ এরূপ বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারে না।

দশ বৎসর পূর্বেও মির সাহেবদের অবস্থা দেশের কোনো জমিদারের অপেক্ষা হীন ছিল না সত্য, কিন্তু সে জমিদারি কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাটতে কাটতে নির্মূল' অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের নওয়াবের সহিত টেক্কা দিয়া বিলাসিতা করিতে গিযাই নাকি তাঁদের এই দূরবস্থার সূত্রপাত।

লোকে বলে, তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমান মির সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতি সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধলঙ্কায় পরিণত হইল। এমনকী তাঁহার পুত্রকে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র মক্তব চালাইয়া অর্ধ-অনশনে দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে।

এমন পিতামহের পৌত্রের কোনো খানদানি জমিদার বংশে বিবাহ হইল না। কিন্তু যে বাড়ির মেয়ের সহিত বিবাহ হইল, সে বাড়ির বংশমর্যাদা মির সাহেবদের অপেক্ষা কম তো নয়ই বরং অনেক বেশি।

বিলাসী মির সাহেবের পৌত্রের নাম আরিফ। বধূর নাম জোহরা। জোহরার রূপের খ্যাতি চারিপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু অত রূপ, আন বংশ-মর্যাদা সত্ত্বেও দরিদ্র সৈয়দ সাহেবের কন্যাকে গ্রহণ করিতে কোনো নওয়াব-পুত্রের কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মেয়ে গোঁজে বাঁধা থাকিয়া বুড়ি হইবে — ইহাও পিতামাতা সহ্য করিতে পারিলেন না। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমানে দরিদ্র মক্তব-শিক্ষক মির সাহেবের পুত্র আরিফের হাতেই তাহাকে সমর্পণ করিয়া বাঁচিলেন।

মির সাহেবদের আর সমস্ত ঐশ্বর্য উঠিয়া গেলেও রূপের ঐশ্বর্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নাই। এবং এ রূপের জ্যোতি কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবদের রূপখ্যাতিকেও লজ্জা দিয়া আসিয়াছে।

কাজেই আরিফ ও জোহরা যখন বর-বধূ বেশে পাশাপাশি দাঁড়াইল, তখন সকলেরই চক্ষু জুড়াইয়া গেল। যেন চাঁদে চাঁদে প্রতিযোগিতা।

পিতার মন খুঁত খুঁত করিলেও জোহরার মাতার মন জামাতা ও কন্যার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া গভীর প্রশান্তিতে পুরিয়া উঠিল।

আনন্দে-প্রেমে-আবেশে শুভদৃষ্টির সময় উভয়ের ডাগর চক্ষু ডাগরতর হইল।

আরিফের মাতা কিছুদিন হইতে চির-রুগ্‌ণা হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। বধূমাতা

আসিবার পর হইতেই তিনি সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। আনন্দে গদগদ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'বউমার পয়েই আমি সেরে উঠলাম, আমার ঘর আবার সোনা-দানায় ভরে উঠবে।'

গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মির সাহেবদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মানুষের 'পয়' বলিয়া কোনো জিনিস আছে কিনা জানি না, কিন্তু জোহরার মির-বাড়িতে পদার্পণের পর হইতে মির সাহেবদের অবস্থা অভাবনীয় রূপে ভালো হইতে অধিকতর ভালোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গ্রামে প্রথমে রাষ্ট্র হইল, মির সাহেবদের নববধূ আসিয়াই তাহাদের পূর্বপুরুষের প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়া উদ্ধার করিয়াছে, তাহাতেই মির-বাড়ির এই অপূর্ব পরিবর্তন।

গুজবটা একেবারে মিথ্যা নয়। জোহরা একদিন তাহার শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের একটা দেয়ালে একটা অস্বাভাবিক ফাটল দেখিয়া কৌতূহলবশেই সেটা পরীক্ষা করিতেছিল। হয়তো বা তাহার মন গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধানী হইয়াই এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। তাহার কী মনে হইল, সে একটা লাঠি দিয়া সেই ফাটলে খোঁচা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে ক্রুদ্ধ সর্পের গর্জনের মতো একটা শব্দ আসিতে সে ভয়ে পলাইয়া আসিয়া স্বামীকে খবর দিল।

বলাবাহুল্য, আরিফ নববধূকে অতিরিক্ত ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল। শুধু আরিফ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত জোহরাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখিয়াছিলেন।

জোহরার এই হঠকারিতায় আরিফ তাহাকে প্রথমে বকিল, তাহার পর সেইখানে গিয়া দেখিল সত্যসত্যই ফাটলের ভিতর হইতে সর্প-গর্জন শ্রুত হইতেছে। সে তাহার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আনিল।

পুত্র অপেক্ষা পিতা একটু বেশি দুঃসাহী ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'ও সাপটাকে মারতেই হবে, নইলে কখন বেরিয়ে কাউকে কামড়িয়ে বসবে। ওর গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, ও নিশ্চয়ই জাত সাপ!' বলিয়াই বধূমাতাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন।

স্থানটা জঙ্গালাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি সন্তর্পণে তাহার খানিকটা পরিষ্কার করিয়া বার কতক খোঁচা দিতেই একটা বৃহৎ দুগ্ধ ধবল গোখরো সাপ বাহির হইয়া আসিল, মস্তকে তাহার সিন্দূর বর্ণ চক্র বা খড়মের চিহ্ন। আরিফ সাপটাকে মারিতে উদ্যত হইতেই পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'মারিসনে মারিসনে, ও বাস্তু সাপ। দেখছিসনে, ও যে পদ্ম-গোখরো।'

আরিফের উদ্যত যষ্টি হাতেই রহিয়া গেল। জঙ্গালের মধ্যে পদ্ম-গোখরোরূপী বাস্তু সাপ অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলে চলিয়া আসিতেছিল। জোহরা আরিফকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা যখন সাপটাকে খোঁচাচ্ছিলে, তখন কেমন একরকম শব্দ হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই কাঁসা বা পিতলের কোনো কিছু আছে।' আরিফের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে আসিয়া তাহার পিতাকে বলিতে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, 'কই রে, সেরকম কোনো শব্দ তো শুনিনি।'

আরিফ বলিল, 'আমরা তো সাপের ভয়েই অস্থির, কাজেই শব্দটা হয়তো শুনতে পাইনি।'

পিতা-পুত্রে সন্তর্পণে দেয়ালের দুই চারটি ইট সরাতেই দেখিতে পাইলেন, সত্যই ভিতরে কী চকচক করিতেছে।

পিতা-পুত্র তখন পরম উৎসাহে ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর যাহা উদ্ধার করিলেন, তাহাকে যক্ষের ধন বলা চলে না, কিন্তু তাহা সামান্যও নয়। বিশেষ করিয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থায়।

একটি নাতিবৃহৎ পিতলের কলসি বাদশাহি আশরফিতে[১] পূর্ণ। কিন্তু এই কলসি উদ্ধার করিতে তাহাদের জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

কলসি উদ্ধার করিতে গিয়া আরিফ দেখিল, সেই কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া আর একটা পদ্ম-গোখরো। আরিফ ভয়ে দশ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে! সাপটা আবার এসেছে ওইখানে।'

জোহরা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না, ওটা আর একটা। ওটারই জোড়া হবে বোধ হয়। প্রথমটা ওই দিকে চলে গেছে, আমি দেখেছি।'

কিন্তু, এ সাপটা প্রথমই হোক বা অন্য একটা হোক, কিছুতেই কলসি ছাড়িয়া যাইতে চায় না। অথচ পদ্ম-গোখরো মারিতেও নাই।

কলসির কণ্ঠ জড়াইয়া থাকিয়াই পদ্ম-গোখরো তখন মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করিয়া ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জোহরার মাথায় কী খেয়াল চাপিল, সে তাড়াতাড়ি এক বাটি দুধ আনিয়া নির্ভয়ে কলসির একটু দূরে রাখিতেই সাপটা কলসি ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা সেই অবসরে পিতলের কলসি তুলিয়া লইল। সাপটা অনায়াসে তাহার হাতে ছোবল মারিতে পারিত, কিন্তু সে কিছু করিল না। এক মনে দুগ্ধ পান করিতে করিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো এক প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। একটু পরেই আর একটা পদ্ম-গোখরা আসিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

জোহরা বলিয়া উঠিল, 'ওই আগের সাপটা! এখনও গায়ে খোঁচার দাগ রয়েছে! আহা, দেখেছ কী রকম নীল হয়ে গেছে!"

আরিফ ও তাহার পিতামাতা অপার বিস্ময়ে জোহরার কীর্তি দেখিতেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহাদেরও মনে ছিল না যে, তাহাকে এখনই সাপে কামড়াইতে পারে! এইবার তাহারা জোর করিয়া জোহরাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা জোহরাকে লইয়া যে কী করিবে, কোথায় রাখিবে — ভাবিয়া পাইল না।

শ্বশুর শাশুড়ি অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মির-বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এল!'

কিন্তু এই সংবাদ এই চারিটি প্রাণী ছাড়া গ্রামের আর কেহ জানিতে পারিল না।

১ সোনার মোহর।

সেই মোহর গোপনে কলিকাতায় গলাইয়া বিক্রয় করিয়া সে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে বর্তমান ক্ষুদ্র মির-পরিবারের সহজ জীবনযাপন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। কিন্তু বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয় — আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যাবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায় আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।

বৎসর দুয়েকের মধ্যে মির-বাড়ির পুরাতন প্রাসাদের পরিপূর্ণ রূপে সংস্কার হইল। বাড়ি-ঘর আবার চাকর-দাসীতে ভরিয়া উঠিল।

পরে কর্পোরেশনের কনট্রাক্টরি হস্তগত করিয়া আরিফ বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল।

কোনো কিছুরই অভাব থাকিল না, কিন্তু জোহরাকে লইয়া তাহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িল।

২

এই অর্থ-প্রাপ্তির পর হইতেই জোহরা যেমন পদ্ম-গোখরো-যুগলের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-প্রবণ হইয়া উঠিল, সাপ দুইটিও জোহরার তেমনই অনুরাগী হইয়া পড়িল। অথবা হয়তো দুধ-কলার লোভেই তাহারা জোহরার পিছু পিছু ফিরিতে লাগিল।

জোহরার শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামী সাপের ভয়ে যেন প্রাণ হাতে করিয়া সর্বদা মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। বাস্তু সর্প — মারিতেও পারেন না, পাছে আবার এই দৈব অর্জিত অর্থ সহসা উবিয়া যায়।

অবশ্য সর্প-যুগল যেরূপ শান্ত ধীরভাবে বাড়ির সর্বত্র চলাফেরা করিতে লাগিল, তাহাতে ভয়ের কিছু ছিল না। তবু জাত সাপ তো! একবার ক্রুদ্ধ হইয়া ছোবল মারিলেই মৃত্যু যে অবধারিত।

পিতৃ-পিতামহের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাওয়াও এক প্রকার অসম্ভব। তাহারা কী যে করিবে ভাবিয়া পাইল না।

জোহরা হয়তো রান্না করিতেছে, হঠাৎ দেখা গেল সর্প-যুগল তাহার পায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শাশুড়ি দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। বধূ তাহাদের তিরস্কার করিতেই তাহারা আবার নিঃশব্দে সরিয়া যায়।

বধূ শাশুড়ি খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ বাস্তু সর্পদ্বয় আসিয়াই বধূর ডালের বাটিতে চুমুক দিল! দুগ্ধ নয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ গর্জন করিয়া উঠিতেই বধূ আসিয়া অপেক্ষা করিতে বলিতেই তাহারা ফণা নামাইয়া শুইয়া পড়ে, বধূ দুগ্ধ আনিয়া দেয়, খাইয়া তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

ভয়ে শাশুড়ির পেটের ভাত চাল হইয়া যায়।

ইহাও সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু সাপ দুইটি এইবার যে উৎপাত আরম্ভ করিল তাহাতে জোহরার স্বামী বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পলাইয়া বাঁচিল।

গভীর রাত্রে কাহার হিম-স্পর্শে আরিফের ঘুম ভাঙিয়া যায়। উঠিয়া দেখে, তাহারই শয্যাপার্শ্বে পদ্ম-গোখরোদ্বয় তাহার বধূর বক্ষে আশ্রয় খুঁজিতেছে। সে চিৎকার করিয়া পলাইয়া আসিয়া বাহিরবাটীতে শয়ন করে!

জোহরা তিরস্কার করিলে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে

ভীত সন্তানের মতো তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া লুটাইয়া যেন কী মিনতি জানায়।

জোহরার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। আর তিরস্কার করিতে পারে না। বেদেনিদের মতো নির্বিকার নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের আদর করে, পার্শ্বে ঘুমাইতে দেয়।

জোহরার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে তাহার দুইটি যমজ সন্তান হইয়াই আঁতুড়ে মারা যায়। জোহরার স্মৃতিপটে সেই শিশুদের ছবি জাগিয়া উঠে। তাহার ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত মনে করে, তাহার সেই দুরন্ত শিশু-যুগলই যেন অন্য রূপ ধরিয়া তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে! তাহাদের মৃত্যুতে যে দংশন-জ্বালা সহ্য করিয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে, ইহারা যদি দংশনই করে তবুও তাহার অপেক্ষা ইহাদের দংশন-জ্বালা বুঝি তীব্র নয়। স্নেহ-বুভুক্ষু তরুণী মাতার সমস্ত হৃদয়-মন করুণায় স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে, ভয় ডর কোথায় চলিয়া যায়, আবিষ্টের মতো সে ওই সর্প-শিশুদের লইয়া আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে।

স্বামী অসহায় ক্রোধে ফুলিতে থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ও নাই! তাহার ও তাহার প্রাণের অধিক প্রিয় বধূর মধ্যে এই উদ্যত-ফণার ব্যবধান সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিষ্ফল আক্রোশে অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া মরে।

পয়মন্ত বধূ — তাহার উপরে রাগও করিতে পারে না! রাগ করিয়াই বা করিবে কী, তাহার তো কোনো অপরাধ নাই।

একদিন সে ক্রোধবশে বলিয়াছিল, 'জোহরা তোমাকে ছেড়ে চাই না এই ঐশ্বর্য! মেরে ফেলি ও দুটোকে। এর চেয়ে আমার দারিদ্র্য ঢের বেশি শান্তিময় ছিল।'

জোহরা দুই চক্ষুতে অশ্রুভরা আবেদন লইয়া নিষেধ করে। বলে, 'ওরা আমার ছেলে! ওরা তো কোনো ক্ষতি করে না। কাউকে কামড়াতে জানে না তো ওরা!'

আরিফ ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, 'তোমায় দংশন করে না ওরা, কিন্তু ওদের বিষের জ্বালায় আমি পুড়ে মলুম! আমার কী ক্ষতি যে ওরা করেছে, তা তুমি বুঝবে না! এর চেয়ে যদি ওরা সত্যিসত্যিই দংশন করত, তাও আমার পক্ষে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে ঢের বেশি সুখের হত।'

জোহরা উত্তর দেয় না, নীরবে অশ্রু মোচন করে। ইহারা যে তাহারই মৃত খোকাদের অন্যরূপী আবির্ভাব বলিয়া সে মনে করে, তাহাও সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, সংস্কারে বাধে।

পিতা, পুত্র ও মাতা শেষে স্থির করিলেন, জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। হয়তো সেখানে গিয়া সে ইহাদের ভুলিয়া যাইবে। এবং সর্প-যুগলও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে।

একদিন প্রত্যূষে সহসা আরিফের পিতা জোহরাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মা, বহুদিন বাপের বাড়ি যাওনি, তোমার বাবাকে দু-তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি, আজ আরিফ নিয়ে যাবে, তুমি কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে এসো।'

জোহরা সব বুঝিল, বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিল না। নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিন্তু সাপ দুইটিকে কোথাও দেখিতে পাইল না।

আরিফ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া ব্যাবসা দেখিতে কলিকাতা চলিয়া গেল।

জোহরার পিতা-মাতা কন্যার নিরাভরণ রূপই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজ সে যখন সালংকারা বেশে স্বর্ণকান্তি স্বর্ণভূষণে ঢাকিয়া গৃহে পদার্পণ করিল, দরিদ্র পিতা-মাতা তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কন্যা-জামাতাকে যে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

দু-একদিন যাইতে না যাইতে পিতা-মাতা দেখিলেন, কন্যার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। সে সর্বদা যেন কাহার চিন্তা করে। সকল কথায় কাজে তাহার অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে।

মাতা একদিন কন্যাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, 'হাঁরে আরিফকে চিঠি লিখব আসতে?'

কন্যা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিল, 'না মা, উনি তো শনিবারেই আসবেন!'

জামাই আসিল, তবু কন্যার চোখে মুখে পূর্বের মতো সে দীপ্তি দেখা গেল না।

মাতা কন্যাকে বলিলেন, 'সত্যি বল তো জোহরা, তোর কি জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?'

জোহরা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'না মা! উনি তো আগের মতোই আমায় ভালোবাসেন! বাড়িতে আমার দুটি খোকাকে ফেলে এসেছি, তাই মন কেমন করে।'

জোহরার মাতা আরিফের এই হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তির রহস্য কিছু জানিতেন না। কন্যার যমজ সন্তান হইয়া মারা গিয়াছে এবং ওই বাড়ির প্রথা মতো সেই সন্তান দুইটিকে বাড়িরই সম্মুখের মাঠে গোর দেওয়া হইয়াছে জানিতেন। মনে করিলেন, কন্যা তাহাদেরই স্মরণ করিয়া একথা বলিল। গোপনে অশ্রু মুছিয়া তিনি কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয় মাস চলিয়া গেল। জোহরাকে লইয়া যাইবার কেহ কোনো কথা বলে না। জোহরার পিতা-মাতা অপেক্ষাও জোহরা বেশি ক্রুদ্ধ হইল। কী তাহার অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামী প্রতি শনিবার আসে, কিন্তু অভিমান করিয়াই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে না।

মাতা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না। একদিন জামাতাকে বলিলেন, 'বাবা! জোহরা তো একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। ওর কি কোনো রোগ বেরামই হল, তাও তো বুঝতে পারছিনে — দিন দিন শুকিয়ে মেয়ে যে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

আরিফের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। বিষাক্ত সাপকে যে-মানুষ এমন করিয়া ভালোবাসিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভাবিতে লাগিল জোহরা কি উন্মাদিনী? হঠাৎ তাহার মনে হইল, জোহরার মাতামহ বিখ্যাত সর্প-তত্ত্ববিদ ছিলেন। ইহার মাঝে হয়তো সে সাধনাই পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে!

ইহার মধ্যে সে বহুবার রসুলপুর গিয়াছে, কিন্তু সাপ দুটিকে জোহরা চলিয়া যাইবার পর দুই একদিন ছাড়া আর দেখিতে পায় নাই। কিন্তু সেই দুই এক দিনই তাহারা কী উৎপাতই না করিয়াছে! তাহা দেখিয়া বাড়ির কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, উহারা জোহরাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে!

উদ্যত-ফণা আশীবিষ! তবু সে কী তাহাদের কাতরতা মিনতি! একবার আরিফ, একবার তাহার পিতা — একবার তাহার মাতার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে চায়, আর তাহারা প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়!

আরিফ একথা বধূর কাছে প্রকাশ করে নাই, জোহরাও অভিমানভরে তাহাদের কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই।

জামাতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য কোনোরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না দেখিয়া জোহরার পিতা একদিন আরিফকে বলিলেন, 'বাবা, জান তো আমরা কত গরিব! মেয়ে তো শয্যা নিয়েছে! দেশে যা দুর্দিন পড়েছে, তাতে আমরা খেতেই পাচ্ছিনে, মেয়ের চিকিৎসা তো দূরের কথা! মেয়েটা এখানে থেকে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, তার চেয়ে তুমি কিছুদিনের জন্য ওকে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যাও। তার পর ভালো হলে ওকে আবার রেখে যেয়ো!' বলিতে বলিতে চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্থির হইল, আগামীকল্য সে প্রথমে জোহরাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে, সেখানে ডাক্তার দেখাইয়া একটু সুস্থ হইলে তাহাকে রসুলপুরে লইয়া যাইবে।

৩

রাত্রে আরিফের কীসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিতেই দেখিল, তাহার শিয়রে একজন কে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া এবং পার্শ্বেই কামরায় আর একজন লোক, বোধ হয় স্ত্রীলোক জোহরার বাক্স ভাঙিয়া তাহার অলংকার অপহরণ করিতেছে! ভয়ে সে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল; তাহার চিৎকার করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়া লইয়াছে!

কিন্তু ভয় পাইলেও তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। স্ত্রীলোক ডাকাত! সে ঈষৎ চক্ষু খুলিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে এমন ভান করিয়া পড়িয়া থাকিল, যেন সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

যে ঘরে সে ও জোহরা শয়ন করিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে আর একটি কামরা — স্বল্পায়তন। সেই কামরায় একটা স্টিলের ট্রাংকে জোহরার গহনাপত্র থাকিত। প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা!

জোহরা বহু অনুনয় করিয়া আরিফকে ওই গহনাপত্র রসুলপুরে রাখিয়া আসিবার জন্য বহুবার বলিয়াছে, আরিফ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। সে বলিত, 'তোমার কপালেই আজ আমাদের ওই অর্থ অলংকার, ও কয়টা টাকার অলংকার যদি চুরি যায় যাক, তোমাকে তো চুরি করতে পারবে না। ও তোমার জিনিস তোমার কাছে থাক। আর তা ছাড়া তোমার বাবা এ অঞ্চলের পির, ওঁর ঘরে কেউ চুরি করতে সাহস করবে না।'

আরিফ নিজের চক্ষুকে নিজে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দেখিল, ওই মেয়ে ডাকাত আর কেন নয় সে তাহার শাশুড়ি — জোহরার মাতা!

দু-দিন আগের ঝড়ে ঘরের কতকগুলো খড় উড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অবকাশ পথে শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র-কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। শাশুড়ি সমস্ত অলংকারগুলি পোঁটলায় বাঁধিয়া চলিয়া আসিবার জন্য মুখ ফিরাইতেই তাহার মুখে চন্দ্রের কিরণ পড়িল এবং সেই আলোকে আরিফ যাহার মুখ দেখিল, তাহাকে সে মাতার অপেক্ষাও ভক্তি করে। তাহার মুখে চোখে মনে অমাবস্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

এত কুৎসিত এ পৃথিবী!

সে আর উচ্চবাচ্য করিল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিল। সে দেখিল, তাহার শাশুড়ির পিছু পিছু তরবারিধারী ডাকাতও বাহির হইয়া গেল। তাহারা উঠানে আসিয়া নামিতেই সে উঠিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পাইল ওই ডাকাতও আর কেউ নয় — তাহারই শ্বশুর।

আরিফ জানিত, কিছুদিন ধরিয়া তাহার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশেও প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। মাঝে মাঝে তাহার শ্বশুর ঘটি বাটি বাঁধা দিয়া অন্নের সংস্থান করিতেছিলেন, ইহারও সে আভাস পাইয়াছিল। ইহা বুঝিয়াই সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সাহায্য করিত চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। জোহরার হাতে দিয়াও সে দেখিয়াছে, তাঁহারা জামাতার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে নারাজ।

হীনস্বাস্থ্য জোহরা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, আরিফ তাহাকে জাগাইল না। ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার আর ঘুম হইল না।

সকালের দিকে একটু ঘুমাইতেই কাহার ক্রন্দনে সে জাগিয়া উঠিল। তাহার শাশুড়ি তখন চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, চোরে তাহাদের সর্বনাশ করিয়াছে।

জোহরাও তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া বিস্ময়বিমূঢ়ার মতো চাহিয়া রহিল।

আরিফের আর সহ্য হইল না। দিনের আলোকের সাথে সাথে তাহার ভয়ও কাটিয়া গিয়াছিল।

সে বাহিরে আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "আর কাঁদবেন না মা, ও অলংকার যে চুরি করেছে তা আমি জানি, আমি ইচ্ছা করলে এখনই তাদের ধরিয়ে দিতে পারি।'

বলাবহুল্য, এক মুহূর্তে শাশুড়ির ক্রন্দন থামিয়া গেল! শ্বশুর-শাশুড়ি দুই জন পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

আরিফ বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার শ্বশুর জামাতার হাত ধরিয়া বলিল, 'কে বাবা সে চোর? দেখেছ? সত্যিই দেখেছ তাকে?'

আরিফ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, 'জি হাঁ দেখেছি! কলিকাল কি না, তাই সব কিছু উলটে গেছে। যার চুরি গেছে, তারই চোরের হাত চেপে ধরার কথা, এখন কিন্তু চোরই যার চুরি গেছে তার হাত চেপে ধরে!'

শ্বশুর যেন আহত হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

আরিফ জোহরাকে ডাকিয়া রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বলিল ও ইঙ্গিতে ইহাও জানাইল যে হয়তো এ ব্যাপারে তাহারও হাত আছে।

জোহরা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মূর্ছা ভাঙিবার পর আরিফ বলিল, 'সে এখনই এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে! এ নরক-পুরীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না।'

শ্বশুর-শাশুড়ি যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল; এমনকী জোহরার মূর্ছাও আরিফই ভাঙাইল, পিতা-মাতা কেহ আসিয়া সাহায্য করিল না।

আরিফ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই জোহরা তাহার পায়ে লুটাইয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে এখানে রেখে যেয়ো না। খোদা জানেন, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কোনো অপরাধ করিনি।'

আরিফ জোহরার কান্নাকাটিতে রাজি হইল তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে। স্বামীর নির্দেশ মতো জোহরা পিতা-মাতাকে আর কিছুই প্রশ্ন করিল না।

৪

চলিয়া যাইবার সময় জোহরার পিতা-মাতা ছুটিয়া আসিয়া কন্যা-জামাতার হাত ধরিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহারা বাসিমুখে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে না। অন্তত সামান্য কিছু খাইয়া লইয়া তবে তাহারা যেন যায়!

আরিফ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, এ বাড়ির বায়ুতেও যেন কীসের পূতিগন্ধ! তবু সে খাইয়া যাইতে রাজি হইল, সে আজ দেখিবে — মানুষের ভণ্ডামির সীমা কতদূর।

জোহরা যত জিদ করিতে লাগিল, সে এ বাড়িতে আর জল স্পর্শও করিবে না, আরিফ ততই জিদ ধরিল, না, সে খাইয়াই যাইবে।

জোহরা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল, সে কিছু খাইল না। আরিফ কিন্তু খাইবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বমির পর বমি করিতে লাগিল।

জোহরা আবার মূর্ছিতা হইয়া পড়িল! সে মূর্ছার পূর্বে মায়ের দিকে তাকাইয়া একটি কথা বলিয়াছিল — 'রাক্ষুসি!'

আরিফের বুঝিতে বাকি রহিল না সে কী খাইয়াছে!

কিন্তু এখানে থাকিয়া মরিলে চলিবে না! এই মৃত্যুর ইতিহাস সে তাহার পিতা-মাতাকে বলিয়া যাইবে। সে উর্ধ্বশ্বাসে স্টেশন অভিমুখে ছুটিল।

স্টেশনে পৌঁছিয়াই সে ভীষণ রক্ত-বমন করিতে লাগিল। রক্ত-বমন করিতে করিতেই সে প্রায় চলন্ত ট্রেনে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

ট্রেন তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার চিৎকার করিতে করিতে সে তখন ট্রেনে গিয়া উঠিয়া বসিয়াছে।

কামরা হইতে একজন সাহেবি পোশাক-পরা বাঙালি চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'এটা ফার্স্ট ক্লাস, নেমে যাও, নেমে যাও!'

আরিফ কোনো কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার রক্ত-বমন করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে যে বাঙালি সাহেবটি ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তার।

আরিফ অস্ফুট স্বরে একবার মাত্র বলিল, 'আমায় বিষ খাইয়েছে, আমার—'

বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার সাহেব মফস্সলের এক বড়ো জমিদার বাড়ির 'কলে' গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই ঔষধপত্রের বাক্স ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি 'সার্ভেন্ট' কামরা হইতে চাকরকে ডাকিয়া, তাহার সাহায্যে আরিফকে ভালো করিয়া শোয়াইয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া ইনজেকশন দিলেন। দুই তিনটা ইনজেকশন দিতেই রোগীকে অনেকটা সুস্থ মনে হইতে লাগিল। বমি বন্ধ হইয়া গেল।

ইচ্ছা করিয়াই ডাক্তার সাহেব গাড়ি থামান নাই। কারণ গাড়ি কলিকাতা পঁহুছিতে দেরি হইলে হয়তো এ হতভাগ্যকে আর বাঁচানো যাইবে না।

ট্রেন কলিকাতায় পঁহুছিলে, ডাক্তার সাহেব অ্যাম্বুলেন্স করিয়া আরিফকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরা সত্যসত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

এদিকে জোহরা চৈতন্য লাভ করিতেই যেই সে শুনিল, তাহার স্বামী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে উন্মাদিনীর মতো ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পিতার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, তাহাকে এখনই তাহার শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

প্রতিবেশীরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

জোহরার পিতা-মাতা সকলকে বুঝাইলেন, কন্যার সমস্ত অলংকার গত রাত্রে চুরি যাওয়ায় জামাতা পুলিশে খবর দিতে গিয়াছে, মেয়েও সেই শোকে প্রায় উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে।

পির সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না, কৌতূহল দমন করিয়া সরিয়া গেল।

৫

তিন দিন তিন রাত্রি যখন কন্যা জলস্পর্শও করিল না, তখন পিতা পালকি করিয়া কন্যাকে রসুলপুরে পাঠাইয়া দিয়া পুণ্য করিবার মানসে মক্কা যাত্রা করিলেন।

আরিফও সেই দিন সকালে কলিকাতা হাসপাতাল হইতে মোটরযোগে বাড়ি ফিরিয়াছে!

আশ্চর্য! সে বাড়ি ফিরিয়া কিন্তু পিতা-মাতাকে কিছু বলিল না। এই তিন দিন ধরিয়া সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পিতা শুনিলে, তাহাদের খুন করিতে ছুটিবেন। তাহারা তো মরিবেই, তাহার পিতাকেও সে সেই সাথে হারাইবে। জোহরাও আত্মহত্যা করিবে!

জোহরা! জোহরা! ওই তিনটি অক্ষরে যেন বিশ্বের মধু সঞ্চিত! সে মৃত্যুকে স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, দৈবকে ভিন্ন কাহাকেও সে দোষী করিবে না। বাহিরেও না, অন্তরেও না।

সে তখনও জানে না যে, সে আবার বাঁচিয়া ফিরিয়াছে! আর কাহাকে সে অপরাধী করিবে? তাহারা যে তাহারই প্রিয়তমার পরমাত্মীয়! বাঁচিয়া উঠিয়া সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এ যেন তার আর এক জন্ম! মৃত্যুর স্পর্শ তাহাকে সোনা করিয়া দিয়াছে।

পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতা চমকিয়া উঠিলেন, 'একী, এমন নীল হয়ে গেছিস কেন? একী চেহারা হয়েছে তোর?'

আরিফ শান্তস্বরে 'কলেরা হয়েছিল, এশিয়াটিক কলেরা। বেঁচে এসেছি এই যথেষ্ট।'

পিতা-মাতা পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত দরিদ্রকে ডাকাইয়া দান খয়রাত করিলেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মউলুদ[১] শরিফের ব্যবস্থা করিলেন।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নাই, এমন সময় বাড়ির দ্বারে আসিয়া জোহরার পালকি থামিল।

১ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত।

জোহরা পালকি হইতে মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে নামিতেই সম্মুখে আরিফকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'তুমি এসেছ — বেঁচে ফিরে এসেছ ?'

বলিতে বলিতে সে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মূর্ছা ভাঙিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আরিফের পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'তোরা দু-জনই কি মরতে মরতে ফিরে এলি ?'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, 'আমার সোনার প্রতিমার কে এমন অবস্থা করলে !'

আরিফ জোহরাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। জোহরা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, 'না, না, তুমি শাস্তি দাও। তোমরা আমায় ঘৃণা করো, মারো !'

আরিফ জোহরার অধর দংশন করিয়া বলিল, 'এই নাও শাস্তি !'

৬

দুঃখ বিপদের এই ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও জোহরা তাহার পদ্ম-গোখরোর কথা ভোলে নাই। এতদিন সে তেমনই নীরবে তাহাদের কথা ভুলিয়া আছে, যেমন করিয়া সে তাহার মৃত খোকাদের ভুলিয়াছে ! কিন্তু সে কি ভুলিয়া থাকা ! এই নীরব অন্তর্দাহের বিষ-জ্বালা তাহাকে আজ মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত ঠেলিয়া আনিয়াছে। সে সর্বদা মনে করে, সে বেদেনি, সে সাপুড়ের মেয়ে ! সে ঘুমে জাগরণে শুধু সর্পের স্বপ্ন দেখে। সে কল্পনা করে, তাহার স্বামী নাগলোকের অধীশ্বর, সে নাগমাতা, নাগ-রাজেশ্বরী !

বাড়িতে আসিয়া অবধি কাহাকেও পদ্ম-গোখরোর কথা জিজ্ঞাসা না করায়, শ্বশুর-শাশুড়ি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, বউ ওদের কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে।

গভীর রাত্রে জোহরা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মৃত খোকা দুইজন যেন আসিয়া বলিতেছে, 'মা গো, বড়ো খিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাওনি। আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারিনে ! একটু দুধ ! মা ! একটু দুধ ! বড়ো খিদে ! 'খোকা' 'খোকা' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া জোহরা জাগিয়া উঠিল। দেখিল, স্বামী ঘুমাইতেছে। প্রদীপ জ্বালিয়া কী যেন অন্বেষণ করিল, কেহ কোথাও নাই।

সে আজ উন্মাদিনী। সে আজ শোকাতুরা মা, সে পুত্রহারা জননী ! তাহার হারা-খোকা ডাক দিয়াছে, তাহারা ছয় মাস না খাইয়া আছে।

পাগলের মতো সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ির সম্মুখেই মির পরিবারের গোরস্থান। ক্ষীণ শিখা প্রদীপ লইয়া উন্মাদিনী মাতা দুইটি ছোট্ট কবরের পার্শ্বে আসিয়া থামিল। পাশাপাশি দুইটি ছোট্ট কবর, যেন দুটি যমজ ভাই — গলাগলি করিয়া শুইয়া আছে।

শিয়রে দুইটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ, জোহরাই স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। এইবার তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। রক্তবর্ণের ফুলে ফুলে কবর দুইটি ছাইয়া গিয়াছে।

মাতা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'খোকা ! খোকা ! কে তোদের এত ফুল দিয়াছে বাবা ! খোকা !'

মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল, না ওই কবর ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—

জানে না, জাগিয়া উঠিয়াই জোহরা দেখিল, তাহার বুকে কুণ্ডলী পাকাইয়া সেই পদ্ম-গোখরো-যুগল।

জোহরা উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিস, তোদের মাকে মনে পড়ল?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মতো তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।

তখন ভোর হইয়া গিয়াছে।

জোহরা দেখিল পদ্ম-গোখরোদ্বয়ের সে দুগ্ধ-ধবল কান্তি আর নাই, কেমন যেন শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহারা বারেবারে জিভ বাহির করিয়া যেন তাহাদের তৃষ্ণার কথা, ক্ষুধার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, 'মা গো বড়ো খিদে! তুমি তো ছিলে না, কে খেতে দেবে? একটু দুধ! বড়ো খিদে মা, বড়ো খিদে!'

জোহরা তাহাদের বুকে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তখনও কেহ জাগিয়া উঠে নাই।

সে হেঁশেলে ঢুকিয়া দেখিল, কড়া-ভরা দুগ্ধ।

বাটিতে করিয়া দিতেই সাপ দুইটি বুভুক্ষের মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। যেন কত যুগযুগান্তরের ক্ষুধাতুর ওরা।

জোহরার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

শাশুড়ি উঠিয়া বধূর কীর্তি দেখিয়া মূক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; বধূ তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ও মা, কী হবে, এ বালাইরা এ ছয় মাস কোথায় ছিল? যেমনই তুমি এসেছ, আর অমনই গায়ের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে!'

জোহরা আহত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'ষাট, ওরা বালাই হবে কেন মা? ওরা যে আমার খোকা!'

শাশুড়ি বুঝিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যিই ওরা তোমার খোকা বউমা। তুমি চলে যাবার পর আমরা দু একদিন ওদের দুধ দিয়েছিলাম। ও মা শুনলে অবাক হবে, ওরা দুধ ছুঁলেই না! চলে গেল! সাপও মানুষ চেনে। কলিকালে আরও কত কী দেখব!'

সাপ দুইটি তখন বোধ হয় অতিরিক্ত দুগ্ধপানবশতই নির্জীবের মতো বধূর পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়াছিল।

৭

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরলে গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!'

বলিয়াই সে প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বাড়িময় ভীষণ হই চই পড়িয়া গেল।

আরিফের মাতা তখন আরিফকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'হাঁ রে, বউমা যে আবার পোয়াতি, তা তো বলিসনি। ওর যে ব্যথা উঠেছে।'

আরিফ বলিতেছিল, 'কিন্তু এখন তো ব্যথা ওঠার কথা নয় মা, মোটে তো সাত মাস!'

এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল, 'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত!'

বাড়ির চাকর-চাকরানি সকলে বলিল, তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে — জ্যান্ত ভূত! আকাশে গিয়া তাহার মাথা ঠেকিয়াছে! বাড়ির মধ্যে আমগাছ-তলায় দাঁড়াইয়া আছে!

আরিফ, আরিফের মাতা লন্ঠন লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যই তো কে যেন গাছতলায় প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়াইযা!

তাঁহাদের পিছনে পিছনে যে ভূত দেখিতে জোহরাও বাহির হইয়া আসিযাছিল, তাহা কেহ দেখে নাই।

হঠাৎ ভূত চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে বাপরে, সাপে খেলে রে!'

জোহরা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাবা তুমি!' আরিফের মাতাও বলিয়া উঠিল, 'য়্যাঁ বেয়াই?'

জোহরা তখন চিৎকার করিতেছে, 'ও সত্যই ভূত। বাবা নয়, বাবা নয়, ও ভূত! ওকে মারো! মেরে বের করে দাও!'

হঠাৎ শুনিতে পাইল, ভূত যেন যষ্টি দ্বারা নির্দয়ভাবে কাহাকে প্রহার করিতে করিতে চিৎকার করিতেছে — 'ওরে বাপরে সাপে খেয়ে ফেললে! আমায় সাপে খেয়ে ফেলল!'

জোহরা উন্মাদিনীর মতো তাহার শাশুড়ির হাতের লন্ঠন কাড়িয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল — 'ওগো আমার খোকাদের মেরে ফেললে! ওকে ধরো! ওকে ধরো!'

জোহরার সাথে সাথে সকলে আমগাছতলায় গিয়া দেখিল, ভূত সত্যই আর কেহ নয়, সে জোহরার পিতা। তাহাকে তাহাদের বাস্তু সাপ পদ্ম-গোখরোদ্বয় নির্মমভাবে দংশন করিতেছে এবং ততোধিক নির্মমভাবে সে সর্পদ্বয়কে প্রহার করিতেছে।

জোহরা একবার 'খোকা' এবং একবার 'বাবা' বলিয়াই মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে জোহরা আরিফকে ডাকিল। সকলে সরিয়া গেলে, সে জিজ্ঞাসা করিল— 'আমার খোকারা কই? আমার পদ্ম-গোখরো? আমার বাবা?'

আরিফ কাঁদিয়া বলিল; 'জোহরা! জোহরা। কেউ নেই! সব গেছে! সকলে গেছে! তোমার বাবা মরেছেন পদ্ম-গোখরোর কামড়ে!'

'তোমার মা মারা গেছেন কলেরা হয়ে। ওঁরা মক্কা যাচ্ছিলেন। তোমার মা রাস্তায় মারা গেলে, তোমার বাবা অনুতপ্ত হয়ে তোমায় শেষ দেখা দেখতে আসেন লুকিয়ে। লুকিয়েই হয়তো তোমায় দেখে চলে যেতেন। এমন সময় চাকরানি দেখতে পেয়ে ভূত বলে চিৎকার করে! ঠিক সেই সময় তোমার পদ্ম-গোখরো তাঁকে তাড়া করে!'

জোহরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'বেশ হয়েছে, জাহান্নামে গেছে ওরা! যাক। আমার পদ্ম-গোখরো — আমার খোকারা কোথায় বলো!'

আরিফ বলিল, 'তোমার বাবা তাদের মেরে ফেলেছেন!'

জোহরা, 'এ্যাঁ খোকারা নাই?' বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মির সাহেবদের সোনার বউ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।

জিনের বাদশা

ফরিদপুর জেলায় 'আরিয়ল খাঁ' নদীর ধারে ছোট্ট গ্রাম। নাম মোহনপুর। অধিকাংশ অধিবাসীই চাষি মুসলমান। গ্রামের একটেরে ঘরকতক কায়স্থ। যেন ছোঁয়াচের ভয়েই ওরা একটেরে গিয়ে ঘর তুলেছে।

তুর্কি ফেজের উপরের কালো ঝান্ডিটা যেমন হিন্দুত্বের টিকির সাথে আপস করতে চায়, অথচ হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, তেমনই গ্রামের মুসলমানেরা কায়স্থপাড়ার সঙ্গে ভাব করতে গেলেও কায়স্থ-পাড়া কিন্তু ওটাকে ভূতের বন্ধুত্বের মতোই ভয় করে।

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে চুন্নু ব্যাপারী মাতব্বর লোক। কিন্তু মাতব্বর হলেও সে নিজে হাতেই চাষ করে। সাহায্য করে তার সাতটি ছেলে এবং তিনটি বউ। কেন যে সে আর একটি বউ এনে সুন্নত আদায় করেনি, তা সে-ই জানে। লোকে কিন্তু বলে, তার তৃতীয় পক্ষটি একেবারে 'খরে-দজ্জাল' মেয়ে। এরই শতমুখী অস্ত্রের ভয়ে চতুর্থ পক্ষ নাকি ও-বাড়ি মুখো হতে পারেনি। এর জন্য চুন্নু ব্যাপারীর আপশোশের আর অন্ত ছিল না। সে প্রায়ই লোকের কাছে দুঃখ করে বলত, 'আরে, এরেই কয় — খোদায় দেয় তো জোলায় দেয় না! আল্লা মিয়াঁ তো হুকুমই দিছেন চারড্যা বিবি আনবার, তা কপালে নাই, ওইব কোহান থ্যা!' বলেই একটু ঢোক গিলে আবার বলে, 'ওই বিজাত্যার বেডিরে আন্যাই না এমনডা ওইল!' বলেই আবার কিন্তু সাবধান করে দেয়, 'দেহিয়ো বাপু, বারিত গিয়া কইয়্যা দিয়ো না। হে বেডি হুনল্যা এক্কেরে দুপুর্‌্যা মাতম লাগাইয়া দিব!'

এই তৃতীয় পক্ষেরই তৃতীয় সন্তান 'আল্লারাখা' আমাদের গল্পের নায়ক। গল্পের নায়কের মতোই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে। গ্রামে কিন্তু এর নাম 'কেশরঞ্জন বাবু'। এ নাম এর প্রথম দেয় ওই গ্রামেরই একটি মেয়ে। নাম তার 'চান ভানু' অর্থাৎ অর্থাৎ চাঁদ বানু। সে কথা পরে বলছি।

চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লারাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হল যে ছেলে, অন্তত তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে — আর কেউ না হোক মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। আল্লা হয়তো সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলেন। অমন বহু 'আল্লারাখা'কে আল্লা 'গোরস্থান-রাখা' করেছেন, কিন্তু এর বেলায় যেন রসিকতা করেই একে সত্যিসত্যিই জ্যান্ত রাখলেন! মনে মনে বললেন, 'দাঁড়া, ওকে বাঁচিয়ে রাখব, কিন্তু তোদের জ্বালিয়ে মেরে ছাড়ব!' সে পরে মরবে কিনা জানি না, কিন্তু এই বিশটে বছর যে সে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ গাঁয়ের লোক হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। তার বেঁচে থাকাটা প্রমাণ করার বহর দেখে গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও গুয়োটা আল্লারাখা না হয়ে যদি মামদোভূত হত, তা হলেও বরং ছিল ভালো। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না!

ওকে মুসলমানরা বলত, 'ইবলিশের[১] পোলা,' কাযেতরা বলত, 'অমাবস্যার জম্মিৎ[২]!' বাপ বলত, 'হালার পো,' মা আদর করে বলত — 'আফলাতুন[৩]!'

এইবার যে মেয়েটির কল্যাণে ওর নাম কেশরঞ্জন বাবু হয়, সেই চানভানুর একটু পরিচয় দিই।

মেয়েটি ওই গাঁয়েরই নারদ আলি শেখের। নারদ আলি নামটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য রাখা নয়। নারদ আলি অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগের মানুষ। অসহযোগ আন্দোলন যদ্দিনের, তা ওর হাঁটুর বযেস! বাম পায়ের হাঁটুর বয়েস! বাম পায়ের হাঁটু আর বললাম না, ওটা অতিরঞ্জন হবে!

নারদ আলি, শেষ রামচন্দ্র, সীতা বিবি প্রভৃতি নাম এখনও গাঁয়ে দশ-বিশটে পাওয়া যায়। অবশ্য হনুমানুল্লা, বিষ্ণু হোসেন প্রভৃতি নামও আছে কি জানিনে।

নারদ আলি গাঁয়ের মাতব্বর না হলেও অবস্থা ওর মন্দ নয। যা জমি-জায়গা আছে তার, তারই উৎপন্ন ফসলে দিব্যি বছর কেটে যায়। ও কারুর ধারও ধারে না, কাউকে ধার দেযও না।

দিব্যি শান্তশিষ্ট মানুষটি! কিন্তু ওর বউটি ঝগড়া-কাজিযা না করলেও কাজিয়ার ভান করে যে মজা করে, তা অন্তত নারদ আলির কাছে একটু অশান্তিকর বলেই মনে হয়। লোক খ্যাপানো বউটার স্বভাব। কিন্তু সে রসিকতা বুঝতে না পেরে অপর পক্ষ যখন খেপে ওঠে, তখন সে বেশ কিছুক্ষণ কোঁদল করার ভান করে হঠাৎ মাঝ উঠানে ধামাচাপা দিয়ে বলে ওঠে, 'আজ রইল কাজিয়া ধামাচাপা, খাইয়া লইয়া আই, তার পর তোরে, দেখাইব মজাডা! এই ধামারে যে খুলব, তার লল্লাটে আল্লা ভাসুরের সাথে নিকা লিখছে!' বলেই এমন ভঙ্গির সাথে সে ধামাটা চাপা দেয়, এবং কথাগুলো বলে যে, অন্য লোকের সাথে— যে ঝগড়া করছিল সেও হেসে ফেলে! অবশ্য, রাগ তাতে তার কমে না।

এদেরই একটি মাত্র সন্তান চানভানু। পুথির কেসসা শুনে মায়ের আদর করে রাখা নাম!

চানভানু যেন তার মায়েরই ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ! চোখে মুখে কথা কয়, ঘাটে মাঠে ছুটোছুটি করে, আরিয়ল খাঁর দল ওর ভয়ে ছুটে পালিয়ে 'যেতে চায়!

চোদ্দো বছর বয়স হয়ে গেল, অথচ বাপে বললেও মায়ে বিয়ের নাম করতে দেয় না। বলে, চান চলে গেলে থাকবে কি করে আঁধার পুরীতে। নারদ আলি বেশি কিছু বললে বউ তার তাড়া দিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার খ্যাচ-খ্যাচাইবার ওইব না, আমার মাইয়্যা বিয়া বসব না — জৈগুন বিবির লাহান উয়ার হানিপ যদ্দিন না আয়ে!'

মোহনপুরের জৈগুন বিবি — চানভানুর 'হানিফ' বীরের কিন্তু আসতে দেরি হল না এবং সে হানিফ আমাদের আল্লারাখা।

একদিন হঠাৎ আল্লারাখার 'সোনাভানে'র পুথি পড়তে পড়তে মনে হল, চানভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজি হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে

---

১ শয়তান। ২ জন্মগ্রহণ করেছে যে, লৌকিক প্রয়োগ। ৩ দুর্দান্ত।

ছিল না। সে সোনাভান বিজয়ের জন্য জয়-যাত্রার চিন্তা করতে করতে পড়ে যেতে লাগল—

'হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,
নাশতা করিয়া নিল থোড়া আশি মন।
লক্ষ মনের গোর্জ[১] বিবির হাজার মনের ঢাল,
বারো ঘোড়ায় চড়ে বলে তুলব পিঠের খাল!'

বাপপুরে! এ যে হানিফার বাবা! এ আবার আশি মন নাশতা করে, বারোটা ঘোড়ায় এক সাথে চড়ে! চানভানুও ওই রকম কিছু করবে নাকি? আল্লারাখা রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। কিন্তু হেরে হেরেও তো হানিফাই শেষে কেল্লা-ফতে করেছিলেন! যা থাকে কপালে! আল্লারাখা তার বাবরি চুলের মাঝে একটা এবং দু-দিকে দুটো — এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, মায় জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওরফে চানভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

এইখানে বলে রাখি, আমাদের আল্লারাখা পুথি পড়ে যতদূর আধুনিক হবার — তা হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক চাষার ছেলের মতো থাকত না, পরিষ্কার ধুতি-জামা-জুতো পরে লম্বা চুলে তেড়ি কেটে, পান সিগারেট খেতে খেতে গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত এবং কার কি অনিষ্ট করবে তারই মতলব আঁটত। কিন্তু বয়স তার যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস করলেও মেয়েদের ওপর কোনো অত্যাচার কোনোদিন করেনি। তার টার্গেট ছিল বেশিরভাগ বুড়ো-বুড়ির দল ; বাড়ির, মাঠের ফল-ফসল ; গাছের আগা, ঘরের মটকা এবং রাত্রে বাঁশঝাড়, তেঁতুলগাছ, তালগাছ ইত্যাদি।

অকারণে বলদ ঠ্যাঙানো বা তাদের দড়ি খুলে দিয়ে বাবাকে লোকের গাল খাওয়ানো ছাড়া বাবার চাষবাসে অন্য বিশেষ সহায়তা সে করেনি। দু-বার সে মাঠ তদারক করতে গেছিল, তাতে একবার মাঠের পাকা ধানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সমস্ত ধান কেটে অন্যের খেতে রেখে এসেছিল। এর পর তার বাবা আর তাকে সাহায্য করতে ডাকেনি।

তার বিলাসিতার টাকা যখন তার মা একদিন বন্ধ করলে এবং বাবার কাছে চেয়েও তার বাবা যখন ওরই বদলে গড়পড়তা হিসেব করে তার পৃষ্ঠে বেশ কিছু কষে দিলে পাঁচনী দিয়ে, তখন সে বাড়ি থেকে পালিয়েও গেল না, কাঁদলেও না, কারুর কাছে কোনো অনুযোগও করলে না। সেইদিন রাত্রে চুনু ব্যাপারীর বাড়িতে আগুন লেগে গেল। আল্লারাখা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ধূম্র উদগিরণ করতে করতে যা বলে উঠল, তার মানে — আজ দিয়াশলাই কিনবার পয়সা ছিল না, ভাগ্যিস ঘরে তাদের আগুন লেগেছিল তাই সিগারেটটা ধরানো গেল!

তার বাবা যখন আল্লারাখাকে ধরে দুরমুশ-পেটা করে পিটোতে লাগল, সে তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে খেতে বলতে লাগল, সে, সকালে মার খেয়ে বড্ডো পিঠ ব্যথা করতেই তো সে পিঠে সেঁক দেবার জন্য ঘরে আগুন লাগিয়েছে! আজ

১ লোহার গদা।

আবার যদি পিঠে বেশি ব্যথা করে, পাড়ার কারুর ঘরে আগুন লাগিয়ে ও-ব্যথায় সেঁক দিতে হবে।

এই কবুল জবাব শুনে ওর বাবার যেটুকু মারবার হাত ছিল, তাও গেল ফুরিয়ে। সে ছেলের পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলতে লাগল, 'তোর পায়ে পড়ি পোড়াকপ্যালা, হালার পো, ও-কম্মডা আর করিস না, হক্কলেরে জেলে যাইবার অইবো যে!' যাক, সেদিন গ্রামের লোকের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয়ে গেল যে, অন্তত গ্রামের কল্যাণের জন্য ওর বাবা ওর বাবুয়ানার খরচটা চালাবে। আল্লারাখা গম্ভীর হয়ে সেদিন বলেছিল, 'আমি বাপকা বেটা, যা কইবাম, তা না কইর‍্যা ছারতাম না!' সকলে হেসে উঠল, এবং যে বাপের বেটা সে, সেই বাপ তখন ক্রোধে দুঃখে কেঁদে ফেলে ছেলেকে এক লাথিতে ভূমিসাৎ করে চিৎকাব করে উঠল — 'হুনছ নি হালার পোর কতা! হালার পো কয়, বাপকা বেডা! তোর বাপের মুহে মুতি!' এবার আল্লারাখাও হেসে ফেললে।

যাক — যা বলছিলাম। ধোপ-দোরস্ত হয়ে আল্লারাখা অবলীলাক্রমে নারদ আলির উঠোনে গিয়ে ঠেলে উঠে ডাকতে লাগল — নারদ ফুফা, বারিত আছনি গো!' এই চির পরিচিত গলার আওয়াজে বাড়ির তিনটি প্রাণী এক সাথে চমকে উঠল! চানের মা বলে উঠল, 'উই শয়তানের বাচ্চাডা আইছে!'

চানভানু তখন দাওয়ায় বসে একরাশ পাকা করমচা নিয়ে বেশ করে নুন আর কাঁচা লঙ্কা ডলে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে টাকরায় টোকার দিতে দিতে তার সদ্ব্যবহার করছিল। সে তারা টানা টানা চোখ দুটো বার দুয়েক পাকিয়ে আল্লারাখার তিন তেড়িকাটা চুলের দিকে কটাক্ষ করে বলে উঠল, 'কেশরঞ্জন বাবু আইছেন গো, খাড়ুলিডা লইয়া আইও!' বলেই সুর করে বলে উঠল —

'এসো-কুডুম বইয়ো খাটে,
পা ধোও গ্যা নদীর ঘাটে,
পিঠ ভাঙবাম চেলা কাঠে!'

বলেই হি হি করে হেসে দৌড়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

আল্লারাখা এ অভিনব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রণে ভঙ্গ দিল। মোহনপুরের হানিফার এই প্রথম পরাজয়!

এ কথাটা চানভানুর মায়ের মুখ হতে মুখান্তরে ফিরে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এর পর থেকেই আল্লারাখাকে দেখলে, সকলে, বিশেষ করে মেয়েরা বলে উঠত — 'উ-ই কেশরঞ্জন বাবু আইত্যাছেন!'

অপমান করলে চানভানু এবং আল্লারাখা তার শোধ তুললে সারা গাঁয়ের লোকের উপর। আল্লারাখা পান-সিগারেট খাইয়ে গাঁয়ের কয়েকটি ছেলেকে তালিম দিয়ে দিয়ে প্রায় তৈরি করে এনেছিল। তাদেরই সাহায্যে সে রাত্রে সে গ্রামের প্রায় সকল ঘরের দোরের সামনে সে সামগ্রী পরিবেশন করে এল, তা দেখলেই বমি আসে — শুঁকলে তো কথাই নেই!

গ্রামের লোক বহু গবেষণাতেও স্থির করতে পারলে না, অত কলেরার রুগি কোত্থেকে সে রাত্রে গ্রামে এসেছিল! তা ছাড়া তেঁতুলপাতা খেয়ে যে মানুষের বদহজম হয়, এও তাদের জানা ছিল না। গো-বর, নর-বর ও পচানী ঘাঁটার সাথে গাঁদাল

পাতার সংমিশ্রণের হেতু না হয বোঝা গেল ; কিন্তু ও মিকশচারের সাথে তেঁতুল-পাতার সম্পর্ক কী ? কিন্তু এ-রহস্য ভেদ করতে তাদের দেরি হল না, যখন তারা দেখলে — আর সব দ্রব্য অল্প আয়াসে উঠে গেলেও তেঁতুলপাতা কিছুতেই দোর ছেড়ে উঠতে চাইল না ! বহু সাধ্যসাধনায় বিফলকাম হয়ে দোরের মাটি শুদ্ধ কুপিয়ে তুলে যখন তিন্তিড়ি পত্রের হাত এড়ানো গেল, তখন সকলে একবাক্যে বললে — না ; ছেলের বুদ্ধি আছে বটে ! তেঁতুলপাতার যে এত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তা সেদিন প্রথম গ্রামের লোক অবগত হল !

সারা গ্রামে মাত্র একটি বাড়ি সেদিন এই অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেল। সে চানভানুদের বাড়ি। নিজের বাড়িকেও যে রেহাই দেয়নি, সে-যে কেন বিশেষ করে চানভানুরই বাড়িকে — যার ওপর আক্রোশে ওর এই অপকর্ম — উপেক্ষা করলে, এর অর্থ বুঝতে অন্তত চানভানুর আর তার মা-র বাকি রইল না !

সে যেন বলতে চায় — দেখলে তো আমার প্রতাপ ! ইচ্ছে করলেই তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারতাম, কিন্তু নিলাম না ! তোমাকে ক্ষমা করলাম।

এই কথা ভাবতে ভাবতে পরদিন সকলে চানভানু হঠাৎ কেঁদে ফেললে ! ক্রোধে অপমানে তার শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো মুখ — কৃষ্ণপক্ষের উদয়-মুহূর্তের চাঁদের মতো রক্তাভ হয়ে উঠল। তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'চান, কাঁদছিস কিয়ের ল্যাইগ্যা রে ! তোর বাপে বকছে ?' চানভানুর বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান বলে যেমন আদুরে, তেমনই অভিমানী। তার মা মনে করলে ওর বাবা বুঝি মাঠে যাবার আগে মেয়েকে কোনো কারণে বকে গেছে।

চান আরো কেঁদে উঠে যা বলে উঠল তার মানে — কেন আল্লারাখা তাদের এ অপমান করবে। সকলের বাড়িতে অপকর্মের কীর্তি রেখে ওদেরে বাদ দিয়ে ও গ্রামবাসীকে জানাতে চায় সে ওদের উপেক্ষা করে — ক্ষমার্হ ওরা ! এর চেয়ে ওর অপমান যে ঢের ভালো ছিল !

মা মেয়েকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝাল। কাল অমন করে ওকে অভ্যর্থনা করার দরুনই যে সে এসব করেছে তাও বললে। চানভানুর মন কিন্তু কিছুতেই আর প্রসন্ন হয়ে উঠল না। আল্লারাখা কাঁটার মতো তার মনে এসে বিঁধতে লাগল।

আল্লরাখা হানিফার মতোই তিরন্দাজ। তার প্রথম তির ঠিক জায়গায় গিয়ে বিঁধেছে।

সেদিন দুপুরে যখন চানভানু আরিয়লখাঁতে স্নান করতে যাচ্ছিল, তখন তার ম্লান মুখ দেখে আল্লারাখা যেমন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল, তেমনই তার বুকে কাঁটার মতো কী একটা ব্যথা যেন খচ করে উঠল। আহা ! ওর মুখ মলিন ! নাঃ, চানভানুও সোনাভানের মতোই তির ছুঁড়তে জানে ! তারও অলক্ষ্য লক্ষ্য ঠিক জায়গায় এসে বিঁধল !

আল্লারাখার চোখে চোখ পড়তেই ম্লানমুখী চানভানুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। এ-হাসির জন্য সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না। এত বড়ো শয়তানের এমন চুনিবিল্লির মতো মুখ। এতে যে মরা মানুষেরও হাসি পায়।

কিন্তু হেসেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। এ-হাসির যদি আল্লারাখা অন্য মানে করে বসে। ছি ছি ছি ছি !

কিন্তু চানভানুকে এ-লজ্জার দায় বেশিক্ষণ পোহাতে হল না। ওর হাসির ছুরি একটু চিক চিকিয়ে উঠতেই আল্লারাখা রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সে মনে করলে, এ-হাসির বিজলির পরেই বুঝি ভীষণ বজ্রপাত হবে! চান দেখতে পেল, অদূরে বিরাট বহুকালের পুরানো অশ্বত্থ গাছে আল্লারাখা তর তর করে উঠে একেবারে আগডালে গিয়ে বসল। কী ভীষণ ছেলে বাবা! ও গাছে যে সাপ আছে সবাই বলে! যদি সাপে কামড়ে দেয়, যদি ডাল ভেঙে পড়ে যায়! চান ভানু খানিক দাঁড়িয়ে ওর কীর্তিকলাপ দেখে এই ভাবতে ভাবতে নদীর জলে স্নান করতে নামল।

নদীতে নেমেই তার মনে হল, ছি ছি, সে করেছে কী! কেন সে ওই বাঁদরটাকে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে! ও যে আস্কারা পেয়ে মাথায় চড়ে বসবে! না জানি সে এতক্ষণ কী মনে করছে!

তার আর সেদিন সাঁতার কাটা হল না। আরিয়লখাঁর জল আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! চানভানু চুপ করে গলাজলে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আজ তার এই প্রশ্নই মনে বারে বারে উদয় হয়েছে — কেন আল্লারাখা ওদের বাড়ি কাল এমন করে গিয়েছিল! ও তো কারুর বাড়ির ভিতর সহজে যায় না। কেন সে ওকে দেখে অমন করে তাকিয়ে ছিল। তার পর সারা গাঁয়ের লোকের উপর অত্যাচার করে কেনই বা তার অপমানের প্রতিশোধ নিলে, ওকেই বা কিছু বললে না কেন! ও শুধু বাঁদর নয়, ও বুঝি পাগলও!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হল, সে বুঝি অশ্বত্থ গাছ থেকে তাকে দেখছে। অনেকটা দূরে অশ্বত্থ গাছটা। তবু সে স্পষ্ট দেখতে পেল, অশ্বত্থ গাছটার ও ধারের ডাল থেকে কখন সে এ ধারের ডালে এসে ওরই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কী বালাই! চানভানুর মনে হতে লাগল, ও বুঝি আর কিছুতেই জল ছেড়ে উঠতে পারবে না! ওকে তো আরও কতবার দেখেছে, ওরই সামনে সাঁতরেওছে এই নদীতে ; কিন্তু এ লজ্জা — এ সংকোচ তো ছিল না ওর। কী কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়িতে পা দিয়েছিল!

ও যেন কালবোশেখির মেঘের মতো, যত ভয় করে, তত দেখতেও ইচ্ছে করে!

এবারেও তাকে আল্লারাখা মুক্তি দিল। চানভানু দেখলে, আল্লারাখা গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে।

এইবার তার ভীষণ রাগ হল ওই হতচ্ছাড়ার উপর। সে মনে করে কী। সে কি মনে করে, সে গাছে বসে থাকলে ও স্নান করে উঠে যেতে পারে না? তাই সে দয়া করে নেমে গেল! ও কি মনে করেছিল, পথে দাঁড়িয়ে থাকলে চানভানু আর নদীতে যেতেই পারবে না, ভয়ে লজ্জায়? তাই সে পথ ছেড়ে চলে গেছিল? চান নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগল। আজ সে দেখিয়ে দেবে যে, যত বড়ো শয়তান হোক সে, তাকে চানভানু থোড়াই কেয়ার করে! জলের মধ্যেও তার শরীর যেন জ্বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে সে জোরে জোরে পথ চলতে লাগল। এঁবার যদি পথে দেখা পায় তার, তা হলে দেখিয়ে দেবে কেমন করে ওর নাকের তলা দিয়ে চান হনহনিয়ে চলে যেতে পারে। ওকে সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না!

কিন্তু কোথাও কেশরঞ্জনবাবুর কেশাগ্রও সে দেখতে পেল না। এবারেও সেই

অপমান, সেই দয়া? ওকে চান ঘৃণা করে — সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে! কিন্তু এ কী, ওকে একটু অপমান করতে পারল না বলেই কি মনটা এমন হঠাৎ মলিন হয়ে উঠল? ওকে পথে দেখতে পেল না বলে মনটা ক্রমে অপ্রসন্ন হয়ে উঠল কেন? যে জোরে সে নদী থেকে আসছিল, পায়ের সে জোর গেল কোথায়? এ কী হল আজ চানের? ওর ঘাড়ে কি তবে ভূত চাপল?

পঞ্চশরের ঠাকুরটির শরে কেউটে সাপের মতোই হয়তো তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিঁধবা মাত্র এ বিষ সঙ্গো সঙ্গো সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে! নইলে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙিন হয়ে উঠত না। ওকে ভুলতেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ প্রথম চানভানুর আহারে অরুচি হল। মা প্রমাদ গুনলে। আইবুড়ো মেয়ে বেশি বড়ো হলে কেন যে ভূতগ্রস্ত হয় — মা যেন আজ তা বুঝতে পারল। গোপনে চোখ মুছে মনে মনে বললে, ভূতে নজর দিয়েছে মা! — আর তোকে রাখা যাবে না, এইবার তোর মায়া কাটাতে হবে!

নারদ আলি আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন তার বউ মেয়ের পাত্র-সন্ধানের জন্য বলল তাকে। কোনো কথা হল না, দুই জনারই চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

২

চানভানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। আর মাসখানেক মাত্র বাকি। পাশের গাঁয়ের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে বিয়ে।

মোহনপুরের হানিফা, আল্লারাখা চানভানুর কেশরঞ্জনবাবু — এ-সংবাদে একেবারে 'মরিয়া হইয়া' উঠল। ইসপার কী উসপার! তার চানভানুকে চাই-ই-চাই। সে জানত, চানভানুর বাপ-মা কিছুতেই তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে না। কাজেই বিয়ের প্রস্তাব করা নিরর্থক। তার মাথায় তখন জৈগুন সোনাভানের কাহিনি হরদম ঘুরপাক খাচ্ছে। সে চানভানুকে হরণ করে দেশান্তরী হয়ে যাবে! কিন্তু ও পথের একটা মুশকিল এই যে, ওতে চানভানুর সম্মতি থাকা দরকার। কী করে ওর সম্মতি নেওয়া যায়?

দেখতে দেখতে দশটা দিন কেটে গেল, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটল না. এগারো দিনের দিন আল্লা আল্লারাখার পানে যেন মুখ তুলে চাইলেন।

এর মধ্যে কতদিন দেখা হয়েছে চানভানুর সাথে তার, কিন্তু কিছুতেই একবারের বেশি দু-বার ওর চোখের দিকে সে তাকাতে পারেনি। যার ভয়ে সারা গ্রাম থরহরি কম্পমান, তার কেন এত ভয় করে এইটুকু মেয়েকে — আল্লারাখা ভেবে তার কূল-কিনারা পায় না। কিন্তু আর তো সময় নাই, আর তো লজ্জা করলে চলে না। কত মতলবই সে ঠাউরালে। কিন্তু কিছুতেই কোনোটা কাজে লাগাবার সুযোগ পেলে না।

আজ বুঝি আল্লা মুখ তুলে চাইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় চানভানু যখন জল নিতে গেল নদীতে, তখন নদীর ঘাট জনমানবশূন্য।

চানভানু নদীর জলে যেই ঘড়া ডুবিয়েছে — অমনি একটু দূরে ভুস করে একটা জল দানোর মুখ মালসার মতো ভেসে উঠল এবং সেই মুখ থেকে আনুনাসিক স্বরে শব্দ বেরিয়ে এল — 'তুই যদি আল্লারাখারে ছাইর‍্যা আর কারেও শাদি করিস, হেই

রাত্রেই তোদের ঘাড় মটকাইয়া আমি রক্ত খাইয়া আইমু!' চানভানু ওই স্বর এবং ওই ভীষণ মুখ দেখে একবার মাত্র 'মা গো' বলে জলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল! এই শুভ অবসর মনে করে জলদানো নদী হতে উঠে এল এবং তার মাথা থেকে নানা রঙের বিচিত্র মালসাটা খুলে নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে চানভানুকে কোলে করে ডাঙায় তুলে আনলে। এ জলদানো আর কেউ নয়, এ আমাদের সেই বিচিত্রবুদ্ধি আল্লারাখা ওরফে কেশরঞ্জনবাবু!

মিনিট কয়েকের মধ্যেই চানভানুর চৈতন্য হল। চৈতন্য হতেই সে নিজেকে আল্লারাখার কোলে দেখে — লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'তুমি কোহান থ্যা আইলে।' ঝরবার সময় বাঁশপাতা যেমন করে কাঁপে, তেমনি করে সে কাঁপতে লাগল। আল্লারাখা বললে, 'এই দিক দিয়া যাইতেছিলাম, দেহি কেডা জলে ভাসতে আছে, দেইহ্যা ছুড্যা জলে লাফ দিয়া পরলাম, তুইল্যা দেহি তুমি! আল্লারে আল্লা, খোদায় আনছিল আমারে এই পথে, নইলে কি অইত! কী অইছিল তোমার?'

দু চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে চানভানু আল্লারাখার মুখের দিকে চেয়ে রইল! তার পর জলদানোর বাণীগুলি বাদ দিয়ে বাকি সব ঘটনা বললে...।

আল্লারাখা যখন চানভানুকে নিয়ে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সব কথা বললে— তখন তাদের বাড়িতে হই চই পড়ে গেল। চানভানুর বাপ-মা কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ ভরে আল্লারাখাকে আশীর্বাদ করল। আল্লারাখা তার উত্তরে শুধু চানভানুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'কেমন! তোমার কেশরঞ্জনবাবুর পিঠ ভাঙবানি চেলা কাঠ দিয়া?'

আজ হঠাৎ যেন খুশির উথলে উঠেছিল চানভানুর মনে। এই খুশির মুখে হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'খোদায় যদি হেই দিন দেয়, ভাঙবাম পিঠ!' বলেই কিন্তু লজ্জায় তার মাটির ভিতরে মুখ লুকিয়ে মরতে ইচ্ছা করতে লাগল। ও কথার অর্থ তো আল্লারাখার কাছে অবোধ্য নয়! কিন্তু সেদিন তো খোদা দেবেন না। কুড়ি দিন পরে যে সে হালদার বাড়ির বউ হয়ে চলে যাচ্ছে! এ কী করল সে! সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল! তার কেবলই ডুকরে ডুকরে কান্না পেতে লাগল।

আল্লারাখাও সেই মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। চান ভানুর বাপ-মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ কী হল! কী এর মানে?

আল্লারাখা আনন্দে প্রায় উন্মাদ হয়ে নদীর ধারে ছুটে গেল। তখন চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে আকাশের সীমানা আলো করে। আল্লারাখার মনে হল ও চাঁদ নয়, ও চানভানু— ওরই মনের আকাশ আলো করে উঠেছে আজ সে!

রাত্রি দশটা পর্যন্ত নদীর ধারে বসে বসে তারস্বরে চীৎকার করে সে গান করলে। তার পর বাড়ি ফিরে সে ভাবতে লাগল — শুধু জলদানোর কথা নয়, জল-দানো যা যা বলেছে, সে কথাগুলো চান নিশ্চয় তার বাপ-মাকে বলেছে। কালই হয়তো ও সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে ওর বাপ-মা আমাদের বাড়িতে এসে বিয়ের কথা পাড়বে। আর তা যদি না করে, নদীতে যদি আর না যায়, ডাঙার ভূত তো বেঁচে আছে।

কিন্তু আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেলেও যখন সেরকম কোনো কিছু ঘটল না,

তখন আল্লারাখার বুঝতে বাকি রইল না যে, চানভানু লজ্জায় বা কোনো কারণে জলদানোর উপদেশগুলো তার বাপ-মাকে জানায়নি। তা হলে ওর বাপ-মা অমন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠোনে বিয়ের ছানলা তুলতে পারত না। বিফলতার আক্রোশ ক্রোধে সে পাগলের মতো হয়ে উঠল। আর দেরি করলে সব হারাবে সে, এইবার ভূতেদের মুখ দিয়ে সোজা ওর বাপ-মাকেই সব কথা জানাতে হবে!

সেদিন গভীর রাত্রে একটা অদ্ভুত রকম কান্নার শব্দে নারদ আলিদের ঘুম ভেঙে গেল! মনে হল — ওদেরই উঠোনে বসে কে যেন বিনিয়ে বিনিযে কাঁদছে। নারদ আলি মনে করলে আজও বুঝি পাশের বাড়ির শোভন তার বউকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সেই বউটা ওদের বাড়ি এসে কাঁদছে। তবু সে একবার জিজ্ঞাসা করলে — 'কেডা কাঁদে গো, বদনার মা নাকি' কোনো উত্তর এল না। তেমনি কান্না।

কেরোসিনের ডিবাটা হাতে নিয়ে নারদ আলি বাইরে বেরিয়েই 'আল্লাগো' বলে, চিৎকার করে, ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিল। চানের মা কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল — 'কি গো, কি অইলো! কেডা?' নারদ আলি আর উত্তর না দিয়ে ১০৫ ডিগ্রি জ্বরের ম্যালেরিয়া রুগির মতো ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কেবলই 'কূলহুআল্লাহ' পড়ে বুকে ফুঁ দিতে লাগল। তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তখন ভয়ে শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। যত হি-হি-হি-হি করে, তত 'তৌবাআস্তাগফার' পড়ে, তত সে আল্লার নাম নিতে যায় — কিন্তু আল্লার 'ল' পর্যন্ত এসে ভয়ে জিভে জড়িয়ে যায়।

চানভানুর ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে, কিন্তু ভূতের নাম শুনে সে বিছানা কামড়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে!

অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নারদ আলি বলতে লাগল, — 'আল্লারে আল্লা'! (নাকে কানে হাত দিয়ে) তৌবা আস্তা ফারুল্লা! তৌবা তৌবা! আউজবিল্লা (নাউজবিল্লা নয়!) বিসমিল্লা। আরে আমি বারাইয়া দেহি তাল গাছের লাহান একডা বুইর‍্যা মাথায় পগ্‌গ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে! দশ-হাত-লম্বা তার দাড়ি! আল্লারে আল্লা! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত!'

শুনে চান এবং তার মা দুই জনেরই ভিরমি লাগবার মতো হল। উক্ত তালগাছ-প্রমাণ লম্বা বৃদ্ধ জিনের বাদশা তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে কিনা, তা দেখবারও সাহস হল না কারুর। পাড়ার কাউকে চিৎকার করে ডাকবার মতো স্বরও কণ্ঠে অবশিষ্ট ছিল না। গলা যেন কে চেপে ধরেছে ওদের! তার ওপরে লোক ডাকলে যদি জিনের বাদশা চটে যায়! ওরে বাপরে, তাহলে আর রক্ষে আছে! তিনজনে বাতি জ্বালিয়ে বসে বসে কাঁপতে কাঁপতে আল্লার নাম জপতে লাগল!

জিনের বাদশা সে-রাত্রে আর কোনো উপদ্রব করলে না। আস্তে আস্তে জিনের বাদশা সামনের আম বাগানে ঢুকে ইশারা করতেই তিন চারটি বিচিত্র আকৃতির ভূত বেরিয়ে এল। তারা জিনের বাদশার বেশ-বাস খুলে নিতে লাগল।

সে বেশ এইরূপ ছিল!—

প্রকাণ্ড দীর্ঘ একটা বাঁশের সাথে স্বল্প দীর্ঘ আর একটা বাঁশ আড়াআড়ি করে বাঁধা, দীর্ঘ বাঁশটার আগায় একটা মালসা বসিয়ে দেওয়া; সে মালসায় নানারকম কালি দিয়ে বীভৎসরকম একটা মুখ আঁকা, সেই মালসার ওপর একটা বিরাট পাগড়ি বাঁধা।

মালসার মুখে পাট দিয়ে তৈরি য়্যা লম্বা দাড়ি ঝুলানো, আড়াআড়ি বাঁশটা যেন ওর হাত, সেই হাতে দুটো কাপড় পিরানের ঝোলা হাতের মতো করে বেঁধে দেওয়া ; লম্বা বাঁশটার দুই দিকে দুটো সাদা ধুতি ঝুলিয়ে দেওয়া ; সেই ধুতি দুটোর মাঝে দাঁড়িয়ে সেই বাঁশটা ধরে চলা। এত বড়ো লম্বা একটা লোককে রাত্রিবেলায় ওইরকমভাবে চলে যেতে দেখলে ভূতেরই ভয় পায়, মানুষের তো কথাই নাই!

জিনের বাদশার পোশাক খুলে নেবার পর দেখা গেল — সে আমাদের আল্লারাখা!

ভূতের সর্দার আল্লারাখা তার চেলাচামুণ্ডা আসবাবপত্র নিয়ে সরে পড়ল। যেতে যেতে বলল, 'আজ আর না, আজ জিন দেখল, কাল গায়েবি খবর হুনবো!'

সকালে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে গেল — কাল রাত্রে চানভানুদের বাড়ি জিনের বাদশা এসেছিলেন। নারদ আলি বলেছিল, তালগাছের মতো লম্বা, কিন্তু গাঁয়ের লোক সেটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আশমান-ঠেকা করে ছাড়লে। মেয়েরা বলতে লাগল, 'আইবো না, এত বড়ো মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?'

কেউ কেউ বলল চানভানুর এত রূপ দেখে ওর ওপর জিনের আশক[১] হয়েছে, ওর ওপর জিনের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়তো বাসরঘরেই মটকে মারবে!

সেদিন সারাদিন মোল্লাজি এসে চানভানুর বাড়িতে কোরান পড়লেন। রাত্রে মউলুদ শরিফ হল। বলাবাহুল্য ভূতেরাও এসে মউলুদ শরিফে শরিক হয়ে শিন্নি খেয়ে গেল। সেদিন রাত্রে সোভান এবং আরও দু-একজন ওদের বাড়িতে এসে শুয়ে থাকল।

গভীর রাত্রে বাড়ির পেছনের তালগাছটায় একটা বাঁশি বেজে উঠল। ঘুম কারুরই হয়নি ভয়ে। সকলে জানলা দিয়ে দেখতে পেল, তালগাছের ওপর থেকে প্রায় বিশ হাত লম্বা কালো কুচকুচে একটা পা নিচের দিকে নামছে। খড়খড় খড়খড় করে তালগাছের পাতাগুলো নড়ে উঠল। সাথে সাথে ঝরঝর ঝরঝর করে এক রাশ ধুলোবালি তালগাছ থেকে নারদ আলির টিনের চালের উপর পড়ল। সঙ্গো সঙ্গো পাশের ছয়-সাতটা সুপারি গাছ একসঙ্গো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। যেন ভেঙে পড়বে! অথচ গাছে কিছু নেই! এর পরে কী হয়েছিল, তার পরদিন সকালে আর কেউ বলতে পারল না, তার কারণ ওইটুকু পর্যন্ত দেখার পর ওরা ভয়ে বোবা, কালা এবং অন্ধ হয়ে গেছিল!

এর পরেও যেটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তা লোপ পেয়ে গেল — যখন একটা কৃষ্ণকায় বেড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের জানালার কাছে এসে পড়ল!

সেইদিন রাত্রে ভূতেদের কমিটি এই সিন্ধান্তে উপনীত হল যে, আর ওদের ভয় দেখানো হবে না দু চারদিন, তা হলে ওরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তালগাছ থেকে আনা ভূতের পা বা কালো কাপড়-মোড়া বংশদণ্ডটা নাড়তে নাড়তে ভূতেদের সর্দার আল্লারাখা বললে, 'আমি এই বুদ্ধি ঠাওরাইছি।' ভূতের দল উদগ্রীব হয়ে উঠল শুনবার জন্য।

আল্লারাখা যা বলল তার মানে — সে ঠিক করেছে কলকাতা থেকে একটা চিঠি

ছাপিয়ে আনবে। আর সেই চিঠিটা আর একদিন স্বয়ং জিনের বাদশা নারদ আলির বাড়িতে দিয়ে আসবে। বাস, তাহলেই কেল্লা ফতে।

এইসব ব্যাপারে চানভানুর বিয়ের দিন গেল আরও মাসখানিক পিছিয়ে। নানান গ্রামের পিশাচ-সিদ্ধ মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীরা এসে নারদ আলির বাড়ির ভূতের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। চারপাশের গ্রামে একটা হই চই পড়ে গেল।

সাত আট দিন ধরে যখন আর কোনো উপদ্রব হল না, তখন সবাই বললে, এইসব তন্ত্রমন্ত্রের চোটেই ভূতের পোলারা ল্যাজ তুলে পালিয়েছে। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

এদিকে — দ্বিতীয় দিনের ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরদিন সকালে, আল্লারাখা কলকাতার পুথি-ছাপা এক প্রেসের ঠিকানা সংগ্রহ করে সেখানে বহু মুসাবিদার পর নিম্নলিখিত চিঠি ও তার যা ছাপা হবে তার কপি পাঠিয়ে দিল। প্রেসের ম্যানেজারকে লিখিত চিঠিটি এই :

শ্রীশ্রীহকনাম ভরসা

মহাশয়,

আমার ছালাম জানিবেন। আমার এই লেখাখানা ভালো ও উত্তমরূপে ছাপাইয়া দিবেন। আর জদি গরিবের পত্রখানা পাইয়া ৩/৪ দিনের মধ্যে ছাপাইয়া না দিবেন আর জদি গবিলতি করেন তবে ঈশ্বরের কাছে ঢেকা থাকিবেন। আর ছাপিবার কত খরচ হয় তাহা লিখিয়া দিবেন। হুজুর ও মহাশয় গবিলতি করিবেন না। আর এমন করিয়া ছাপিয়া দিবেন চারিদিক দিযা ফেসেং ও অতি উত্তম কাগজে ছাপিবেন। ইতি। সন ১৩৩৭ সাল ১০ বৈশাখ

আমাদের ঠিকানা
আল্লারাখা ব্যাপারী
উরফে কেশরঞ্জন বাবু। তাহার হাতে পঁহচে।
সাং মহনপুর,
পোং ড্যামুড্যা
জিং ফরিদপুর। (যেখানে আরিয়লখাঁ নদী সেইখানে পঁহচে।)

চিঠির সাথে জিনের বাদশার যে গৈবী বাণী ছাপতে দিল, তা এই :

বিসমিল্লা আল্লাহো আকবর
লা এলাহা এল্লেল্লা
গায়েব

হে নারদ আলি শেখ
তোরে ও তোর বিবিরে বলিতেছি।
তোর ম্যায়্যা চানভানুরে,

চুন্নু ব্যাপারীর পোলা আল্লারাখার কাছে বিবাহ দে। তার পর তোরা যদি না দেছ তবে বহুৎ ফেরেরে পরিবি। তোরা যদি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া চুন্নু ব্যাপারীর কাছে তোরা যদি প্রথম কছ তবে সে বলিবে কি এরে এইখানে বিবাহ দিবি। তোরা তবু ছারিছ না। তোরা একদিন আল্লারাখারে ডাকিয়া আনিয়া আর একজন মুনশি আনিয়া কলেমা পড়াইয়া দিবি।

খবরদার খবরদার

মাজগাঁয়ের ছেরাজ হালদার ইচ্ছা করিয়াছে তার পোলার জন্যে চানভানুরে নিব। ইহা এখনও মনে মনে ভাবে। খবরদার। খবরদার। খোদাতাল্লার হুকুম হইয়াছে আল্লারাখার কাছে বিবাহ দিতে। আর যদি খোদাতাল্লার হুকুম অমান্য করছ তবে শেষে তোর ম্যাইয়্যা ছেমরি দুস্কু ও জালার মধ্যে পরিবে।

খবরদার — হুঁশিয়ার — সাবধান আমার এই পত্রের উপর ইমান[১] না আনিলে কাফের[২] হইয়া যাইবি।

তোরা আল্লারাখার কাছে বিবাহ দেছ বিবাহের শেষে স্বপনে আমার দেখা পাইবি। চানভানু আমার ভইনের লাহান[৩]। আমি উহারে মালমাত্তা[৪] দিব। দেখ তোরে আমি বারবার বলিতেছি — তোর ম্যায়ার আল্লারাখা ছেমরার কাছে শাদি বহিবার একান্ত ইচ্ছা। তবে যদি এ-বিবাহ না দেছ, তবে শেষে আলামত[৫] দেখিবি। ইতি

জিনের বাদছা
গায়েবুল্লা।

এই কপির কোনাতেও বিশেষ করে সে অনুরোধ করে দিল যেন ছাপার চারি কিনারায় 'ফেসেং' হয়।...

কলকাতা শহর, টাকা দিলে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায়। এই গৈব[৬] বাণীও আট-দশ দিনের মধ্যে প্রেস থেকে ছাপা হয়ে এল। আল্লারাখার আর আনন্দ ধরে না।

আবার ভূতের কমিটি বসল। ঠিক হল সেই রাতেই ছাপানো গৈবী বাণী নারদ আলির বাড়িতে রেখে আসতে হবে। জিনের বাদশার সেই পোশাক পরে আল্লারাখা যাবে ওদের বাড়িতে। যদি কেউ জেগে উঠে, ওই চেহারা দেখে, তার দাঁতে দাঁত লাগতে দেরি হবে না।

সেদিন রাত্রে জিনের বাদশার গৈবী বাণী বিনা বাধায় চালের মটকা ভেদ করে চানভানুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে পড়ল। সকাল হতে না হতেই আবার গ্রামে হই চই পড়ে গেল।

নারদ আলি ভীষণ ফাঁপরে পড়লে। জিনের বাদশার হুকুম মতে বিয়ে না দিলেই নয় আল্লারাখার সাথে, ওদিকে কিন্তু ছেরাজ হালদারও ছাড়বার পাত্র নয়। ভূত, জিন, পরি এত রটনা সত্ত্বেও ছেরাজ তার ছেলেকে এই মেয়ের সাথেই বিয়ে দেবে দৃঢ় পণ করে বসেছিল। মাজগাঁ এবং মোহনপুরের কোনো লোকই তাকে টলাতে পারে নি। সে বলে, 'খোদায় যদি হায়াত[৭] দেয়, আমার পোলারে কোনো হালার ভূতের পো মারবার পারব না। একদিন তো ওরে মরবারই অইবো, অর কপালে যদি ভূতের হাতেই মরণ লেহা থায়ে তারে খণ্ডাইব কেডা?'

আসল কথা, ছেরাজ অতিমাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল চানভানু বাপ-মার একমাত্র সন্তান, তার ওপর সুন্দরী বলে কোনো বদমায়েশ লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, বা তাকে ভয় করত না — এমন নয়। তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে — সে

১ বিশ্বাস। ২ ইসলাম বিরোধী। ৩ সদৃশ মতো। ৪ ধনসম্পদ। ৫ নিদর্শন। ৬ অদৃশ্য বা গোপন। ৭ পরমায়ু

নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ-সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোন মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে!

ছেরাজের পুত্রও পিতার মতোই সাহসী, চতুর এবং সেয়ানা। সে মনে করেছিল, বিয়েটা হয়ে যাক — তার পর ভূতটুতগুলো ভালো করে গুণী দিয়ে ছাড়িয়ে পরে বউয়ের কাছ ঘেঁষবে।

তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ করে ঠিক করলে — শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভদৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভদৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়িতে আনবে। 'রুয়ৎ' না হওয়া পর্যন্ত চানভানু বাপের বাড়িতেই থাকবে।

নারদ আলি ছেরাজ হালদারকে একবার ডেকে পাঠাল তার কাছে। পাশেই গ্রাম। খবর শুনে তখনই ছেরাজ হালদার এসে হাজির হল। ছাপানো 'গৈবী বাণী' পড়ে সে অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। তার পর স্থির কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'তুমি যাই ভাব বেয়াই আমি কইতাছি — 'এ গায়েবের খবর না, এ ওই হালার পোলা আল্লারাখার কাজ। হালায় কোন ছাপাখানা থেইয়া ছাপাইয়া আনছে। জিনের বাদশা তোমারে ছাপাইয়া চিঠি দিব ক্যান? জিনের বাদশারে আমি সালাম করি। কিন্তু বেয়াই, এ জিনের বাদশার কাম না। ওই হালার পোলা হালার কাম যদি না অয়, আমি পঞ্চাশ জুতা খাইমু!'

সত্যই তো এ দিকটা ভেবে দেখেনি ওরা। কিন্তু জিনের বাদশাকে যে সে নিজে চোখে দেখেছে! ওরে বাপরে ঘর সমান উঁচু মাথা, এক কোমর দাড়ি, মাথায় পাগড়ি! সে অনেক অনুরোধ করল ছেরাজ হালদারকে — হাতে পায়ে পর্যন্ত পড়ল তার, তবু তাকে নিরস্ত করতে পারল না। ছেরাজ বলল, মরে যদি তারই ছেলে মরবে, এতে নারদ আলির ক্ষতিটা কী!

শেষে যখন ছেরাজ ক্ষতিপূরণের দাবি করে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করবে বলে ভয় দেখালে, তখন নারদ আলি হাল ছেড়ে দিলে।

চানুভানুর মা এতদিন কোনো কথা বলে নি। তার মুখে আর পূর্বের হাসি রসিকতা ছিল না। কী যেন অজানা আশঙ্কায় এবং এই সব উৎপাতে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। মা-মেয়ে ঘর ছেড়ে আর কোথাও বেরোত না। জল-দানো দেখার পর থেকে মেয়েকে জল তুলে এনে দিত মা, তাতেই চানভানু নাইত। আর সে নদীমুখো হয়নি। তাবিজে কবজে চানের হাতে কোমরে গলায় আর জায়গা ছিল না। শোলা বেঁধে যেন ডুবন্ত জাহাজকে ধরে রাখার চেষ্টা!

চানও দিন দিন শুকিয়ে ম্লান হয়ে উঠেছিল। সকলের কাছে শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গেছিল, তার উপর জিন বা 'আসেবের'[১] ভর হয়েছে। ভয়ে দুর্ভাবনায় তার চোখের ঘুম গেল উড়ে, মুখের হাসি গেল মুছে, খাওয়া-পরা কোনো কিছুতেই তার কোনো মন রইল না। কিন্তু এতো বড়ো মজার ভূত! ভূতই যদি তার ওপর ভর করবে —তবে সে ভূত আল্লারাখার কথা বলে কেন? ভূতে তো এমনটি করে না কখনও!

---

১ প্রেতাত্মা।

সে নিজেই আগলে থাকে তাকে — যার ওপর ভর করে। তবে কি এ ভূত আল্লারাখার পোষা? না, সে নিজেই এই ভূত?

এত অশান্তি দুশ্চিন্তার মাঝেও সে আল্লারাখাকে কেন যেন ভুলতে পারে না। ওর অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি যেন সর্বদা জোর করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যত মন্দই হোক, চানদের তো কোনো অনিষ্টই করেনি সে। অথচ কী দুর্ব্যবহারই না চান করেছে ওর সাথে। ওর মনে পড়ে গেল, এর মাঝে একদিন পাড়ার অন্য একটি বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি আসবার সময় আল্লারাখাকে সে পথে পড়ে ছটফট করতে দেখেছিল। রাস্তায় আর কেউ ছিল না তখন। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লারাখা বলেছিল, তাকে সাপে কামড়েছে! কোনখানে কামড়েছে জিজ্ঞাসা করায় আল্লারাখা তার বক্ষস্থল দেখিয়ে দিয়েছিল। সত্যই তার বুকে রক্ত পড়ছিল। চানভানুর তখন লজ্জার অবসর ছিল না। একদিন তো এই আল্লারাখাই তার প্রাণদান করেছিল নদী থেকে তুলে। সে আল্লারাখার বুকের ক্ষত-স্থান চুষে খানিকটা রক্ত বের করে ফেলে দিয়ে, আবার ক্ষতস্থানের মুখ দেবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিল — কী সাপে কামড়েছে? আল্লারাখা নীরবে চানভানুর চোখ দুটো দেখিয়ে দিয়েছিল। তার পর কেমন করে টলতে টলতে চানভানু বাড়ি এসে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল আজ আর চানের সে কথা মনে নাই। কিন্তু একথা চানভানু আর আল্লারাখা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ জানে না।

চানভানু বুঝেছিল -- প্রতারণা করে আল্লারাখা তার বুকে চানের মুখের ছোঁওয়া পেতে ছুরি বা কিছু দিয়ে বুক কেটে রক্ত বের করেছিল, সাপের কথা একেবারেই মিথ্যা, তবু সে কিছুতেই আল্লারাখার উপর রাগ করতে পারল না। যে ওর একটু ছোঁওয়া পাবার জন্য — হোক তা মুখের ছোঁওয়া — অমন করে বুক চিরে রক্ত বহাতে পারে, তার চেয়ে ওকে কে বেশি ভালোবাসে বা বাসবে! হয়তো তার হবু শ্বশুর ছেরাজ যা বলে গেল — তার সবই সত্য, তবু ওই গ্রামের লোকের চক্ষুশূল ছোঁড়াটার জন্য ওর কেন এমন করে মন কাঁদে! কেন ওকে দিনে একবার দেখতে না পেলে ওর পৃথিবী শূন্য বলে মনে হয়!

সত্যিসত্যিই তাকে জিনে পেয়েছে, ভূতে পেয়েছে — হোক সে ভূত, হোক সে জিন, তবু তো সে তাকে ভালোবাসে, তার জন্যই তো সে একবার হয় জিনের বাদশা, একবার হয় তালগাছের একানোড়ে ভূত! চানের মনে হতে লাগল, সাপে আল্লারাখাকে কামড়ায়নি, কামড়েছে তাকে, বিষে ওর মন জর্জরিত হয়ে উঠল।

মা-র মন অন্তর্যামী। সেই শুধু বুঝল মেয়ের যন্ত্রণা, তার এমন দিনে দিনে শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা। সেও এতদিনে সত্যকার ভূতকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আর ফেরবার উপায় নেই। মেয়েকে নিজে হাতে জবাই করতে হবে! দুর্দান্ত লোক ছেরাজ হালদার, এ সম্বন্ধ ভাঙলে সে কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না!

বাপ, মা মেয়ে তিনজনেই অসহায় হয়ে ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল।

৩

কিছুতেই কিছু হল না। জীবনে যে পরাজয় দেখেনি, সে আজ পরাজিত হল। জিনের বাদশা, তার গৈবী বাণী, যত রকম ভূত ছিল — একানোড়ে, মামদো, সতর চোখির মা, বেম্মদোত্তি, কন্ধকাটা — সব মিলেও তারা পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না! তা ছাড়া আল্লারাখার আর পূর্বের মতো সে উৎসাহও ছিল না। যে দিন চানভানু তার চাঁদমুখ দিয়ে ওর বুকের রক্ত স্পর্শ করেছিল সেই দিন থেকে তার রক্তের সমস্ত বিষ — সমস্ত হিংসা দ্বেষ লোভ ক্ষুধা — সব যেন অমৃত হয়ে উঠেছিল। তার মনের দুষ্ট শয়তান সেই একদিনের সোনার ছোঁওয়ায় যেন মানুষ হয়ে উঠেছিল। পরশমণির ছোঁওয়া লেগে ওর অন্তরলোক সোনার রং-এ রেঙে উঠেছিল। তার মনের ভূত সেই দিনই মরে গেল।

চানভানুর বিয়ে হয়ে গেল। বর তার কেমন হল, তা সে দেখতে পেলে না। দেখবার তার ইচ্ছাও ছিল না। বরও কনেকে দেখলে না ভয়ে — যদি তার ঘাড়ের জিন এসে তার ঘাড় মটকে দেয়। ভালো ভালো গুণীর সন্ধানে বর সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল।

চানভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লারাখার বাপ মা ভাই সকলে আল্লারাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোটো ছোটো করে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনি, কাঁধে লাঙ্গল! তার মা সব বুঝলে। তার ছেলে আর চানভানুকে নিয়ে গ্রামে যা সব রটেছে, সে তার সব জানে। মা নীরবে চোখ মুছে ঘরে চলে গেল। তার বাপ আর ভাইরা খোদার কাছে আল্লারাখার এই সুমতির জন্য হাজার শোকর[১] ভেজল।... ...

দূরে হিজল গাছের তলায় আরও দুটি চোখ আল্লারাখার কৃষাণ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেদিনকার প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতোই বাষ্পাকুল হয়ে উঠল -- সে চোখ চানভানুর। সে দৌড়ে গিয়ে আল্লারাখার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করল?' আল্লারাখা শান্ত হাসি হেসে বলে উঠল — 'জিনের বাদশা!'

১ কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ।

অগ্নিগিরি

বীররামপুর গ্রামের আলি নসিব মিয়াঁর সকল দিক দিয়েই আলি নসিব। বাড়ি, গাড়ি ও দাড়ির সমান প্রাচুর্য! ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারি তিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কাঁঠাল-কোয়ার মতো টকটকে রং। আমস্তক কপালে যেন টাকা ও টাকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাব ক্ষেত্র।

তাঁকে একমাত্র দুঃখ দিয়াছে — নিমকহারাম দাঁত ও চুল। প্রথমটা গেছে পড়ে, দ্বিতীয়টার কতক গেছে উঠে, আর কতক গেছে পেকে। এই বয়সে এই দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁর আপশোশের আর অন্ত নাই। মাথার চুলগুলোর অধঃপতন রক্ষা করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি ; কিন্তু কিছুতেই যখন তা রুখতে পারলেন না, তখন এই বলে সান্ত্বনা লাভ করলেন যে, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডেরও টাক ছিল। তাঁর টাকের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন যে, টাক বড়োলোকদের মাথাতেই পড়ে — কুলি-মজুরের মাথায় টাক পড়ে না! তা ছাড়া, হিসাব নিকেশ করবার জন্য নি-কেশ মাথারই প্রয়োজন বেশি। কিন্তু টাকের এত সুপারিশ করলেও তিনি মাথা থেকে সহজে টুপি নামাতে চাইতেন না। এ নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে তিনি বলতেন — টাক আর টাকা দুটোকেই লুকিয়ে রাখতে হয়, নইলে লোকে বড়ো নজর দেয়। টাক না হয় লুকোলেন, সাদা চুল-দাড়িকে তো লুকোবার আর উপায় নেই। আর উপায় থাকলেও তিনি আর তাতে রাজি নন। একবার কলপ লাগিয়ে তাঁর মুখ এত ভীষণ ফুলে গেছিল, এবং তার সাথে ডাক্তাররা এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে তিনি তৌবা[১] করে কলপ লাগানো ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু, সাদা চুল-দাড়িতে তাঁর এতটুকু সৌন্দর্যহানি হয়নি। তাঁর গায়ের রং-এর সঙ্গে মিশে তাতে বরং তাঁর চেহারা আরও খোলতাই হয়েছে। এক বুক শ্বেত শ্মশ্রু — যেন শ্বেত বালুচরে শ্বেত মরালী ডানা বিছিয়ে আছে!

এঁরই বাড়িতে থেকে ত্রিশালের মাদ্রাসায় পড়ে — সবুর আখন্দ। নামেও সবুর, কাজেও সবুর! শান্তশিষ্ট গো-বেচারা মানুষটি। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়স হবে না, গরিব শরিফ[২] ঘরের ছেলে দেখে আলি নসিব মিয়াঁ তাকে বাড়িতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ জোগান।

ছেলেটি অতি মাত্রায় বিনয়াবনত। যাকে বলে — সাত চড়ে রা বেরোয় না। তার হাবভাব যেন সর্বদাই বলছে — 'আই হ্যাভ দি অনার টু বি সার ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট'।

আলি নসিব মিয়াঁর পাড়ার ছেলেগুলি অতিমাত্রায় দুরন্ত। বেচারা সবুরকে নিয়ে দিনরাত তারা প্যাঁচা খ্যাঁচরা করে। পথে ঘাটে ঘরে বাইরে তারা সবুরকে সমানে হাসি ঠাট্টা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জল ছিঁচে উত্যক্ত করে। ছেঁচা জল আর মিছে কথা নাকি গায়ে

---

১ অনুতাপ। ২ অভিজাত।

বড়ো লাগে — কিন্তু সবুর নীরবে এ সব নির্যাতন সয়ে যায়, এক দিনের তরেও বে-সবুর হয়নি।

পাড়ার দুরন্ত ছেলের দলের সর্দার রুস্তম। সে-ই নিত্য নূতন ফন্দি বের করে সবুরকে খ্যাপানোর। ছেলে মহলে সবুরের নাম প্যাঁচা মিয়াঁ। তার কারণ, সবুর স্বভাবতঃই ভীরু নিরীহ ছেলে ; ছেলেদের দলের এই অসহ্য জ্বালাতনের ভয়ে সে পারতপক্ষে তার এঁদো কুঠরি থেকে বাইরে আসে না। বেরুলেই প্যাঁচার পিছনে যেমন করে কাক লাগে, তেমনই করে ছেলেরা লেগে যায়।

সবুর রাগে না বলে ছেলেদের দল ছেড়েও দেয় না। তাদের এই খ্যাপানোর নিত্য নূতন ফন্দি আবিষ্কার দেখে পাড়ার সকলে যে হাসি লুটিয়ে পড়ে, তাতেই তারা যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করে।

পাড়ার ছেলেদের অধিকাংশই স্কুলের পড়ুয়া। কাজেই তারা মাদ্রাসা-পড়ুয়া ছেলেদের বোকা মনে করে। তাদের পাড়াতে কোনো মাদ্রাসার 'তালবিলিম' (তালেবে এলম বা ছাত্র) জায়গির থাকত না পাড়ার ছেলেগুলির ভয়ে। সবুরের অসীম ধৈর্য ! সে এমনি করে তিনটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে। আর একটা বছর কাটিয়ে দিলেই তার মাদ্রাসার পড়া শেষ হয়ে যায়।

সবুর বেরোলেই ছেলেরা আরম্ভ করে — 'প্যাঁচারে, তুমি ডাহ ! হুই প্যাঁচা মিয়াঁগো, একডিবার খ্যাচখ্যাচাও গো !' রুস্তম রুস্তমি কণ্ঠে গান ধরে —

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায় —
যাইতে যাইতে খ্যাচখ্যাচায়।
কাওয়ারা সব লইল পাছ,
প্যাঁচা গিয়া উঠল গাছ।
প্যাঁচার ভাইশতা কোলা ব্যাং
কইল চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচা কয়, বাপ বারিত যাও,
পাস লইছে সব হাপের ছাও
ইঁদুর জবাই কইব্যা খায়,
বোচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায়।

ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বেচারা সবুর তাড়াতাড়ি তার কুঠরিতে ঢুকে দোর লাগিয়ে দেয়। বাইরে থেকে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে রুস্তম গায় —

প্যাঁচা, একবার খ্যাচখ্যাচাও
গর্ত থাইক্যা ফুচকি দাও।
মুচকি হাইস্যা কও কথা
প্যাঁচারে মোর খাও মাথা !

সবুর কথা কয় না। নীরবে বই নিয়ে পড়তে বসে। যেন কিছুই হয়নি। রুস্তমি দলও নাছোড়বান্দা। আবার গায় —

মেকুরের ছাও মক্কা যায়,
প্যাঁচায় পড়ে, দেইখ্যা আয়।

হঠাৎ আলি নসিব মিয়াঁকে দেখে ছেলের দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। আলি নসিব মিয়াঁ বসিক লোক। তিনি ছেলেদের হাত থেকে সবুরকে বাঁচালেও না হেসে থাকতে পারলেন না। হাসতে হাসতে বাড়ি ঢুকে দেখেন তাঁর একমাত্র সন্তান নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে নালিশ করছে — কেন পাড়ার ছেলেরা রোজ রোজ সবুরকে অমন করে জ্বালিয়ে মারবে? তাদের কেউ তো সবুরকে খেতে দেয় না!

তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বুন্তমিদল গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল —

প্যাঁচা মিয়াঁ কেতাব পড়ে
হাঁড়ি নড়ে দাড়ি নড়ে!

নূরজাহান রাগে তার বাবার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার যত রাগ পড়ল গিয়ে তার বাবার উপরে। তার বাবা তো ইচ্ছা করলেই ওদেরে ধমকে দিতে পারেন। বেচারা সবুর গরিব, স্কুলে পড়ে না, মাদ্রাসায় পড়ে — এই তো তার অপরাধ। মাদ্রাসায় না পড়ে সে যদি খানায় পড়ত ডোবায় পড়ত — তাতেই বা কার কী ক্ষতি হত! কেন ওরা আদা-জল খেয়ে ওর পিছনে এমন করে লাগবে?

আলি নসিব মিয়াঁ সব বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি হইছেরে বেডি? ছেমরাডা প্যাঁচার লাহান বাড়িতে বইয়্যা রইব, একডা কথা কইব না, তাইনাসেন উযারে প্যাঁচা কয়।' নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডায় ঘরে বইয়া কাঁদে আর আপনি হাসেন! আমি পোলা অইলে এইদুন একচটকনা দিতাম বুন্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ওই হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎকা মাইর‍্যা। উইঠ্যা আর দানাপানি খাইবার অইত না!' বলেই কেঁদে ফেললে।

আলি নসিব মিয়াঁ মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পাইর‍্যা লইয়া যাইব! মুনশি বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ওই বুন্তম্যারে ধইরা তার কান দুডা এক্কেরে মুতা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবো!'

নূরজাহান অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, 'আব্বাজান, চা খাইবেন নি?'

আলি নসিব মিয়াঁ হেসে ফেলে বললেন, 'বেডির বুঝি য়্যাহন চায়ের কথা মনে পল।'

নূরজাহান আলি নসিব মিয়াঁর একমাত্র সন্তান বলে অতিমাত্রায় আদুরে মেয়ে। বয়স পনেরো পেরিয়ে গেছে। অথচ বিয়ে দেবার নাম নেই বাপ-মায়ের। কথা উঠলে বলেন, মনের মতো জামাই না পেলে বিয়ে দেওয়া যায় কী করে! মেয়েকে তো হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া যায় না! আসল কথা তা নয়। নূরজাহানের বাপ-মা ভাবতেই পারেন না, ওঁদের ঘরের আলো নূরজাহান অন্য ঘরে চলে গেলে তাঁরা এই আঁধার পুরীতে থাকবেন কী করে! নইলে এত ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর বরের অভাব হয় না। সম্বন্ধও যে আসে না, এমনও নয়; কিন্তু আলি নসিব মিয়াঁ এমন উদাসীনভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তারা আর বেশি দূর না এগিয়ে সরে পড়ে।

নূরজাহান বাড়িতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। এখন সবুরের কাছে উর্দু পড়ে। শরিফ ঘরের এত বড়ো মেয়েকে অনাত্মীয় যুবকের কাছে পড়তে দেওয়া দূরের কথা, কাছেই আসতে দেয় না বাপ মা ; কিন্তু এদিক দিয়ে সবুরের এতই সুনাম ছিল যে, সে নূরজাহানকে পড়ায় জেনেও কোনো লোক এতটুকু কথা উত্থাপন করেনি।

সবুর যতক্ষণ নূরজাহানকে পড়ায় ততক্ষণ একভাবে ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে, একটিবারও নূরজাহানের মুখের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ি ঢোকে মাথা নিচু করে, বেরিয়ে যায় মাথা নিচু করে! নূরজাহান, তার বাবা মা সকলে প্রথম প্রথম হাসত — এখন সয়ে গেছে!

সত্যসত্যই, এই তিন বছর সবুর এই বাড়িতে আছে, এর মধ্যে সে একদিনের জন্যও নূরজাহানের হাত আর পা ছাড়া মুখ দেখেনি।

এ নূরজাহান জাহানের জ্যোতি না হলেও বীররামপুরের জ্যোতি — জোহরা[১] সেতারা,[২] এ সম্বন্ধে কারও মতদ্বৈধ নাই। নূরজাহানের নিজেরও যথেষ্ট গর্ব আছে, মনে মনে তার রূপের সম্বন্ধে।

আগে হত না — এখন কিন্তু নূরজাহানের সে অহংকারে আঘাত লাগে — দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তার রূপের কি তা হলে কোনো আকর্ষণই নেই? আজ তিন বছর সে সবুরের কাছে পড়ছে — এত কাছে তবু সে একদিন মুখ তুলে তাকে দেখল না? সবুর তাকে ভালোবাসুক — এমন কথা সে ভাবতেই পারে না, — কিন্তু ভালো না বাসলেও যার রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে — যাকে একটু দেখতে পেলে অন্য যে কোনো যুবক জন্মের জন্য ধন্য হয়ে যায় — তাকে একটিবার একটুক্ষণের জন্যেও চেয়েও দেখল না! তার সতীত্ব কি নারীর সতীত্বের চেয়েও ঠুনকো?

ভাবতে ভাবতে সবুরের উপর তার আক্রোশ বেড়ে ওঠে, মন বিষিয়ে যায়, ভাবে আর তার কাছে পড়বে না! কিন্তু যখন দেখে — নির্দোষ নির্বিরোধ নিরীহ সবুরের উপর রুস্তমি দল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাকতে পারে না। আহা, বেচারার হয়ে কথা কইবার যে কেউ নেই! সে নিজেও যে একটিবার মুখ ফুটে প্রতিবাদ করে না। এ কী পুরুষ মানুষ বাবা! মার, কাট, মুখ দিয়ে কথাটি নেই! এমন মানুষও থাকে দুনিয়াতে!

যত সে এইসব কথা ভাবতে থাকে, তত এই অসহায় মানুষটির ওপর করুণায় নূরজাহানের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে!

সবুর পুরুষ বলতে যে মর্দ-মিনসে বোঝায় — তা তো নয়ই, সুপুরুষও নয়। শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। রূপের মধ্যে তার চোখ দুটি। যেন দুটি ভীরু পাখি। একবার চেয়েই অমনি নত হয়। সে চোখ, তার চাউনি — যেমন ভীরু, তেমনই করুণ, তেমনই অপূর্ব। পুরুষের অত বড়ো অত সুন্দর চোখ সহজে চোখে পড়ে না।

এই তিন বছর সে এই বাড়িতে আছে, কিন্তু কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা না করলে — সে অন্য লোক তো দূরের কথা — এই বাড়িরই কারুর সাথে কথা কয়নি। নামাজ

১ অপরূপ সুন্দরী, মর্ত্যে আল্লাহ্ প্রেরিত হারুত ও মারুত তার প্রেমে পড়ে ন্যায় অন্যায় সব ভুলে গেছিল। ২ সুন্দরীশ্রেষ্ঠ। ৩ ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

পড়ে, কোরান তেলাওত[৩] করে, মাদ্রাসা যায়, আসে, পড়ে কিংবা ঘুমোয় — এই তার কাজ। কোনোদিন যদি ভুলক্রমে ভিতর থেকে খাবার না আসে, সে না খেয়েই মাদ্রাসা চলে যায় — চেয়ে খায় না। পেট না ভরলেও দ্বিতীয়বার খাবার চেয়ে নেয় না। তেষ্টা পেলে পুকুরঘাটে গিয়ে জল খেয়ে আসে, বাড়ির লোকের কাছে চায় না।

সবুর এত অসহায় বলেই নূরজাহানের অন্তরের সমস্ত মমতা সমস্ত করুণা ওকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে। সে না থাকলে, বোধ হয় সবুরের খাওয়াই হত না সময়ে। কিন্তু নূরজাহানের এত যে যত্ন, এত যে মমতা এর বিনিময়ে সবুর এতটুকু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে দেখেনি, কিছু বলা তো দূরের কথা। মারলে—কাটলেও অভিযোগ করে না, সোনা-দানা দিলেও কথা কয় না!

২

সেদিন আলি নসিব মিয়াঁর বাড়িতে একজন জবরদস্ত পশ্চিমে মউলবি সাহেব এসেছেন। রাত্রে মউলুদ শরিফ ও ওয়াজ নসিহৎ[১] হবে। মউলবি সাহেবের সেবা-যত্নের ভার পড়েছে সবুরের উপর। বেচারা জীবনে এত বেশি বিব্রত হয়নি। কী করে, সে তার সাধ্যমতো মউলবি সাহেবের খেদমত করতে লাগল।

সবুরকে বাইরে বেরুতে দেখে রুস্তমি দলের একটি দুটি করে ছেলে এসে জুটতে লাগল। তাদের দেখে সবুর বেচারার, ভাসুরকে দেখে ভাদ্র-বউর যেমন অবস্থা হয়, তেমনই অবস্থা হল।

মউলবি সাহেবের পাগড়ির ওজন কত, দাড়ির ওজন কত, শরীরটাই বা কয়টা বাঘে খেয়ে ফুরোতে পারবে না, তাঁর গোঁফ উই-এ না ইঁদুরে খেয়েছে — এইসব গবেষণা নিয়েই রুস্তমিদল মত্ত ছিল; রুস্তম তখন এসে পৌঁছেনি বলে সবুরকে জ্বালাতন করা শুরু করেনি।

হঠাৎ মউলবি সাহেব বিশুদ্ধ উর্দুতে সবুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কী করে। সবুর বিনীতভাবে বললে সে তালেবে এলম বা ছাত্র। আর যায় কোথায়! ইউসুফ বলে উঠল 'প্যাঁচা মিয়াঁ কী কইল, রে ফজল্যা?' ফজল হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, 'প্যাঁচা মিয়াঁ কইল, মুই তালবিলিম!' ততক্ষণে রুস্তম এসে পড়েছে! সে ফজলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, 'কেডা তালবিল্লি! প্যাঁচা মিয়াঁ?' ছেলেরা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে রোলারের মতো গড়াতে লাগল! 'হয়! রুস্তম্যা জোর কইছে রে! তালবিল্লি! — উরে বাপপুরে! ইল্লারে বিল্লা! তালবিল্লি — হি হি হি হা হা হা!" বলে আর হেসে লুটিয়ে পড়ে। কস্তা-পেড়ে হাসি!

বেচারা সবুর ততক্ষণে মউলবি সাহেবের সেবা-টেবা ফেলে তার কামরায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছে। রুস্তম সঙ্গো সঙ্গো গান বেঁধে গাইতে লাগল --

প্যাঁচা অইল তালবিল্লি,
দেওবন্দ যাইয়া যাইব দিল্লি।
আইয়া করব চিল্লাচিল্লি —
কুত্তার ছাও আর ইল্লিবিল্লি!

---

১. ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশ।

মউলবি সাহেব আর থাকতে পারলেন না। আস্তিন গুটিয়ে ছেলেদের তাড়া করে এলেন। ছেলেরা তাঁর বিশিষ্টরূপে শালের মতো বিশাল দেহ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু যেতে যেতে গেয়ে গেল —

উলু আয়া লাহোর সে
আজ পড়েগা আলেফ বে !

মউলবি সাহেব বিশুদ্ধ উর্দু ছেড়ে দিয়ে ঠেট হিন্দিতে ছেলেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলেন।

আলি নসিব মিয়াঁ সব শুনে ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। আজ মউলবি সাহেবের সামনে তাদের বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবেন। কিন্তু ছেলেদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ছেলেরা ততক্ষণে তিন চার মাইল দূরে এক বিলের ধারে ব্যাং সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মউলবি সাহেব তাদের তাড়া করায়, তারা বেজায় চটে গিয়ে ঠিক করেছে — আজ মউলবি সাহেবের ওয়াজ পণ্ড করতে হবে। স্থির হয়েছে ; যখন বেশ জমে আসবে ওয়াজ, তখন একজন ছেলে একটা ব্যাং-এর পেট এমন করে টিপবে যে ব্যাংটা ঠিক সাপে ধরা ব্যাং-এর মতো করে চ্যাঁচাবে ; ততক্ষণ আর একজন একটা ব্যাং মজলিশের মাঝখানে ছেড়ে দেবে, সেটা যখন লাফাতে থাকবে — তখন অন্য একজন ছেলে চিৎকার করে উঠবে — সাপ ! সাপ !

ব্যাস ! তাইলেই ওয়াজের দফা ওইখানেই ইতি !

বহু চেষ্টার পর গোটাকতক ব্যাং ধরে নিয়ে যে-যার বাড়ি ফিরল।

আলি নসিব মিয়াঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বারি বলে উঠল, 'রুস্তম্যা রে, হালার তালবিল্লি পায়খানায় গিয়াছে। বদনাটা উডাইয়া লইয়া আইমু ?'

রুস্তম খুশি হয়ে তখনই হুকুম দিল। বারি আস্তে আস্তে বদনাটি উঠিয়ে এনে পুকুরঘাটে রেখে দিয়ে এল।

একঘন্টা গেল, দু-ঘন্টা গেল, সবুর যেমন অবস্থায় গিয়ে বসেছিল তেমনই অবস্থায় বসে রইল পায়খানায় ! বেরও হয় না, কাউকে দিয়ে বদনাও চায় না ! দূরে আলি নসিব মিয়াঁকে দেখে ছেলের দল যেদিকে পারল পালিয়ে গেল !

আলি নসিব মিয়াঁ ভাবলেন, নিশ্চয় সবুরের কিছু একটা করছে পাজি ছেলের দল। কিন্তু এসে সবুরকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তারাও কিছু জানে না বললে। ছেলের দল হল্লা করছিল 'তালবিল্লি' বলে — এইটুকুই তারা জানে।

আর দুই ঘন্টা অনুসন্ধানের পর সবুরের সন্ধান পাওয়া গেল। সবুর সব বললে। কিন্তু তাতে উলটো ফল হল। আলি নসিব মিয়াঁ তাকেই বকতে লাগলেন — সে কেন বেরিয়ে এসে কারুর কাছে বদনা চাইলে না — এ ব্যাপারে শুনে নূরজাহান রাগ করার চেয়ে হাসলেই বেশি ! এমনও সোজা মানুষ হয় !

আর একদিন সে হেসেছিল সবুরের দুর্দশায়। সবুর একদিন চুল কাটাচ্ছিল। রুস্তম তা দেখতে পেয়ে পিছন থেকে নাপিতকে ইশারায় একটা টাকার লোভ দেখিয়ে মাঝখানে টিকি রেখে দিতে বলে। সুশীল নাপিতও তা পালন করে। চুল কেটে স্নান করে সবুর যখন বাড়িতে খেতে গেছে, তখন নূরজাহানের চোখে পড়ে প্রথম সে দৃশ্য।

নূরজাহানের হাসিতে যে ব্যথা পেয়েছিল সবুর, তা সেদিন নূরজাহানের চোখ এড়ায়নি।

আজ আবার হেসে ফেলেই নূরজাহানের মন ব্যথিত হয়ে উঠল সবুরের সেই দিনের মুখ স্মরণ করে। কী জানি কেন, তার চোখ জলে ভরে উঠল।...

সন্ধ্যায় যখন মউলবি সাহেব ওয়াজ করছেন, এবং ভক্ত শ্রোতাবৃন্দ তাঁর কথা যত বুঝতে না পারছে, তত ভক্তিতে গদ্গদ হয়ে উঠছে — তখন সহসা মজলিশের এক কোনায় অসহায় ভেকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল! শ্রোতাবৃন্দ চকিত হয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল, রক্তাক্ত কলেবর বুঝিবা সেই ভেক-প্রবরই উপবিষ্ট ভক্তবৃন্দের মাথার উপর দিয়ে হাউন্ড বেস আরম্ভ করে দিল! সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল — "সাপ! সাপ!'

আর বলতে হল না। নিমেষে যে যেখানে পারল পালিয়ে গেল। মউলবি সাহেব তক্তাপোশে উঠে পড়ে তাঁর জাব্বা জোব্বা ঝাড়তে লাগলেন। আর ওয়াজ হল না সেদিন...।

মউলবি সাহেব যখন খেতে বসেছেন, তখন অদূরে গান শোনা গেল—

'উলু! বোলো' কহে সাপ
উলু বোলে — 'বাপরে রে বাপ!'
'কাল নসিহত হোগা ফের?'
উলু বোলে — কের কের কের!
লে উঠা লোটা কম্বল
উলু! আপনা ওতন চল!

সহসা মউলবি সাহেবের গলায় মুরগির ঠ্যাং আটকে গেল। আলি নসিব মিয়াঁ নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলেন।

৩

সেদিন রাস্তা দিয়ে গফরগাঁও-এর জমিদারদের হাতি যাচ্ছিল। নূরজাহান বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারা সবুরও হাতি দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অদূরে সদলবলে রুস্তম দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাতিটার দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'এরিও তালবিল্লি মিয়াঁ গো! হুই তোমাগ বাছুরডা আইতেছে, ধইরা লইয়াও!' রাস্তার সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। রাস্তার একটা মেয়ে বলে উঠল, 'বিজাত্যার পোলাডা! হাতিটা বাছুর না, বাছুর তুই!' ভাগ্যিস রুস্তম শুনতে পায়নি।

নূরজাহান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সে যত না রাগল ছেলেগুলোর উপর, তার অধিক রেগে উঠল সবুরের উপর। সে প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে, আজ তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে। এই কী পুরুষ! মেয়েছেলেরও অধম যে!

সেদিন সন্ধ্যায় যখন পড়াতে গেল সবুর, তখন কোনো ভূমিকা না করে নূরজাহান বলে উঠল, 'আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি হুইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না?'

সবুর আজ যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটি নূরজাহানের মুখের উপর তুলে ধরল! কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে, তাতে তার ব্যথা লজ্জা অপমান সব

ভুলে গেল সে! দুই চোখে তার অসীম বিস্ময় অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। এই তুমি! সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল — 'নূরজাহান!'

নূরজাহান বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোন বনের ভীরু হরিণ? অমন হরিণ-চোখ যার, সে কি ভীরু না হয়ে পারে? নূরজাহান কখনও সবুরকে চোখ তুলে চাইতে দেখেনি। সে রাস্তা চলতে কথা কইত — সব সময় চোখ নিচু করে। মানুষের চোখ যে মানুষকে এত সুন্দর করে তুলতে পারে — তা আজ সে প্রথম দেখল।

সবুরের কণ্ঠে তার নাম শুনে লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বর্ষারাতের চাঁদকে যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ঘিরে ফেলল।

আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি।

সবুরের চোখে মুখে পৌরুষের প্রখর দীপ্তি ফুটে উঠল। সে নূরজাহানের দিকে দীপ্ত চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'ওই পোলাপানেরে যদি জওয়াব দিই, তুমি খুশি হও?' নূরজাহানও চকচকে চোখ তুলে বলে উঠল, 'কে জওয়াব দিব? আপনি?'

এ মৃদু বিদ্রুপের উত্তর না দিয়ে সবুর তার দীর্ঘায়ত চোখ দুটির জ্বলন্ত ছাপ নূরজাহানের বুকে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। নূরজাহান আত্মবিস্মৃতের মতো সেইখানে বসে রইল। তার দুটি সুন্দর চোখ আর ততোধিক সুন্দর চাউনি ছাড়া আর কোনো কিছু মনে রইল না! যে সবুরকে কেউ কখনও চোখ তুলে চাইতে দেখেনি, আজ সে উজ্জ্বল চোখে, দৃপ্তপদে রাস্তায় পায়চারি করছে দেখে সকলে অবাক হয়ে উঠল।

বুস্তমিদল গাঙের পার থেকে বেড়িয়ে সেই পথে ফিরছিল। হঠাৎ ফজল চিৎকার করে উঠল — 'উইরে তালবিল্লি!'

সবুর ভালো করে আস্তিন গুটিয়ে নিল।

বারি পিছু দিক থেকে সবুরের মাথায় ঠোকর দিয়ে বলে উঠল, 'প্যাঁচারে, তুমি ডাহো!'

সবুর কিছু না বলে এমন জোরে বারির এক গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিলে যে, সে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেল। সবুরের এ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে দলের সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সবুর কথাটি না বলে গম্ভীরভাবে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। বারি ততক্ষণে উঠে বসেছে। উঠেই সে চিৎকার করে উঠল — 'সে হালায় গেল কোই?'

বলতেই সকলের যেন হুঁশ ফিরে এল। মার মার করে সকলে গিয়ে সবুরকে আক্রমণ করলে। সবুরও অসম সাহসে তাদের প্রতি-আক্রমণ করলে। সবুরের গায়ে যে এত শক্তি, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সে বুস্তমি দলের এক এক জনের টুঁটি ধরে পাশের পুকুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

আলি নসিব মিয়াঁর এই পুকুরটা নতুন কাটানো হয়েছিল, আর তার মাটিও ছিল অত্যন্ত পিছল। কাজেই যারা পুকুরে পড়তে লাগল গড়িয়ে — তারা বহু চেষ্টাতেও পুকুরের অত্যুচ্চ পাড় বেয়ে সহজে উঠতে পারল না। পা পিছলে বারে বারে জলে

পড়তে লাগল গিয়ে। এইরূপে যখন দলের পাঁচ ছয় জন, মায় রুস্তম সর্দার জলে গিয়ে পড়েছে — তখন রুস্তমিদলের আমির তার পকেট থেকে দু-ফলা ছুরিটা বের করে সবুরকে আক্রমণ করল। ভাগ্যক্রমে প্রথম ছুরির আঘাত সবুরের বুকে না লেগে হাতে গিয়ে লাগল। সবুর প্রাণপণে আমিরের হাত মুচড়ে ধরতেই সে ছুরি সমেত উলটে পড়ে গেল এবং আমিরের হাতের ছুরি আমিরেরই বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। আমির একবার মাত্র "উঃ" বলেই অচৈতন্য হয়ে গেল! বাকি যারা যুদ্ধ করছিল — তারা পাড়ায় গিয়ে খবর দিতেই পাড়ার লোক ছুটে এল। আলি নসিব মিয়াঁও এলেন।

সবুর ততক্ষণে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত ক্লান্ত শরীর নিয়েই আমিরকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকের ছুরিটা তুলে ফেলে সেই ক্ষতমুখে হাত চেপে ধরেছে। আর তার হাত বেয়ে ফিনিক দিয়ে রক্ত-ধারা ছুটে চলেছে!

আলি নসিব মিয়াঁ তাঁর চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দুই হাত দিয়ে তাঁর চক্ষু ঢেকে ফেললেন।

একটু পরে ডাক্তার এবং পুলিশ দু-ই এল। আমিরকে নিয়ে ডাক্তারখানায়, সবুরকে নিয়ে গেল থানায়।

সবুরকে থানায় নিয়ে যাবার আগে দারোগাবাবু আলি নসিব মিয়াঁর অনুরোধে তাকে একবার তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে দারোগাবাবুর কাছে একটুও অতিরঞ্জিত না করে সমস্ত কথা খুলে বললে। তার কথা অবিশ্বাস করতে কারুরই প্রবৃত্তি হল না। দারোগাবাবু বললেন, 'কেস খুব সিরিয়স নয়, ছেলেটা বেঁচে যাবে। এ কেস আপনারা আপসে মিটিয়ে ফেলুন সাহেব।'

আলি নসিব মিয়াঁ বললেন, 'আমার কোনো আপত্তি নাই দারোগা সাহেব, আমিরের বাপে কি কেস মিটাইব? তারে তো আপনি জানেন। যারে কয় এক্কেরে বাঙাল!'

দারোগাবাবু বললেন 'দেখা যাক, এখন তো ওকে থানায় নিয়ে যাই। কী করি, আমাদের কর্তব্য করতেই হবে।'

ততক্ষণে আলি নসিব মিয়াঁর বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এই খবর শুনেই নূরজাহান মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিল। আলি নসিব মিয়াঁ সবুরকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন নূরজাহান একেবারে প্রায় সবুরের পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনডা করবার কইছিল? কেন এমনডা করলে?'

নূরজাহানের মা সবুরকে তার গুণের জন্য ছেলের মতোই মনে করতেন। তা ছাড়া, তাঁর পুত্র না হওয়ায় পুত্রের প্রতি সঞ্চিত সমস্ত স্নেহ গোপনে সবুরকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি সবুরের মাথাটা বুকের উপর চেপে ধরে কেঁদে আলি নসিব মিয়াঁকে বললেন, 'আমার পোলা এ, আমি দশ হাজার ট্যাহা দিবাম, দারোগাব্যাডারে কন, হে এরে ছ্যাইরা দিয়া যাক।'

সবুর তার রক্তমাখা হাত দিয়ে নূরজাহানকে তুলে বলে উঠল, 'আমি যাইতেছি ভাই! যাইবার আগে দেহাইয়া গেলাম — আমিও মানষের পোলা। এ যদি না দেহাইতাম, তুমি আমায় ঘৃণা করতা। খোদায় তোমায় সুখে রাখুন!' বলেই তার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললে 'আম্মাগো এই তিনডা বছরে আপনি আমায় আমার মায়ের

শোক ভুলাইছিলেন।' আর সে বলতে পারল না — কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।'

আলি নসিব মিয়াঁর পদধূলি নিয়ে সে নির্বিকারচিত্তে থানায় চলে গেল। দারোগাবাবু কিছুতেই জামিন দিতে রাজি হলেন না। দশ হাজার টাকার বিনিময়েও না, খুনি আসামিকে ছেড়ে দিলে তাঁর চাকরি যাবে।

নূরজাহানের কানে কেবল ধ্বনিত হতে লাগল, 'তুমি আমায় ঘৃণা করতে।' তার ঘৃণায় সবুরের কী আসত যেত ? কেন সে তাকে খুশি করবার জন্য এমন করে 'মরিয়া হইয়া' উঠল ? সে যদি আজ এমন করে না বলত সবুরকে, তা হলে কখনই সে এমন কাজ করত না। এমন নির্যাতন তো সে তিন বছর ধরে সয়ে আসছে। তারই জন্য আজ সে থানায় গেল। দু-দিন পরে হয়তো তার জেল, দ্বীপান্তর — হয়তো বা তার চেয়ে বেশি — ফাঁসি হয়ে যাবে! 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল।

আলি নসিব মিয়াঁ যেন আজ এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। আজ সবুর তার দুঃখ দিয়ে তাঁর সুখের বাকি দিনগুলোকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল! একবার মনে হল, বুঝি বা দুধ-কলা দিয়ে তিনি সাপ পুষেছিলেন! পরক্ষণেই মনে হল সে সাপ নয়, সাপ নয়! ও নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক! আর — যদি সাপই হয় — তা হলেও ওর মাথায় মণি আছে! ও জাত-সাপ।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, তাঁর অনুকম্পায় প্রতিপালিত হলেও বংশ-মর্যাদায় সবুর তাঁদের চেয়েও অনেক উচ্চে। আজ সে দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় — কিন্তু একদিন এদেরই বাড়িতে আলি নসিব মিয়াঁর পূর্বপুরুষেরা নওকরি' করেছেন। তা ছাড়া এই তিন বছর তিনি সবুরকে যে অন্ন বস্ত্র দিয়েছেন তার বিনিময়ে সে তাঁর কন্যাকে উর্দু ও ফার্সিতে যে কোনো মাদ্রাসার ছেলের চেয়েও পারদর্শিনী করে দিয়ে গেছে। আলি নসিব মিয়াঁ নিজে মাদ্রাসা-পাশ হলেও মেয়ের কাছে তাঁর উর্দু ফারসি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভয় হয়। সে তো এতটুকু ঋণ রাখিয়া যায় নাই। শ্রদ্ধায় প্রীতিতে পুত্রস্নেহে তাঁর বুক ভরে উঠল!... যেমন করে হোক, ওকে বাঁচাতেই হবে!

নিজের জন্য নয়, নিজের চেয়েও প্রিয় ওই কন্যার জন্য! আজ তো আর তাঁর মেয়ের মন বুঝতে আর বাকি নেই। অন্যের ঘরে পাঠাবার ভয়ে মেয়ের বিয়ের নামে শিউরে উঠেছেন এতদিন, আজ যদি এই ছেলের হাতে মেয়েকে দেওয়া যায় — মেয়ে সুখী হবে, তাকে পাঠাতেও হবে না অন্য ঘরে। সে-ই তো ঘরের ছেলে হয়ে থাকবে। উচ্চশিক্ষা ? মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা তো সে দিয়েইছে — পাশও করবে সে হয়তো সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তার পর কলেজে ভর্তি করে দিলেই হবে।

এই ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করে — আলি নসিব মিয়াঁ অনেকটা শান্ত হলেন এবং মেয়েকেও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সে রাত্রে নূরজাহানের আর মূর্ছা হল না, সে ঘুমাতেও পারল না। সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে তার চোখে ফুটে উঠতে লাগল — সেই দুটি চোখ, দুটি তারার মতো! প্রভাতি তারা আর সন্ধ্যাতারা।

৪

আমিরকে বাঁচানো গেল না মৃত্যুর হাত থেকে — সবুরকে বাঁচানো গেল না জেলের হাত থেকে।

ময়মনসিংহের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই তার মৃত্যু হল। আমিরের পিতা কিছুতেই মিটমাট করতে রাজি হলেন না। তিনি এই বলে নালিশ করলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল নূরজাহানের সাথে আমিরের বিয়ে দেন, আর তা জানতে পেরেই সবুর তাকে হত্যা করেছে। তার কারণ, সবুরের সাথে নূরজাহানের গুপ্ত প্রণয় আছে। প্রমাণ-স্বরূপ তিনি বহু সাক্ষী নিয়ে এলেন — যারা ওই দুর্ঘটনার দিন নূরজাহানকে সবুরের পা ধরে কাঁদতে দেখেছে! তা ছাড়া সবুর পড়াবার নাম করে নূরজাহানের সাথে মিলবার যথেষ্ট সুযোগ পেত!

নূরজাহান আর আলি নসিব মিয়াঁ একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। দেশময় ঢি ঢি পড়ে গেল। অধিকাংশ লোকেই এ কথা বিশ্বাস করল।

আলি নসিব মিয়াঁ শত চেষ্টা করেও সবুরকে উকিল দেওয়ার জন্য রাজি করাতে পারলেন না। সে কোর্টে বললে, সে নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে — উকিল বা সাক্ষী কিছুই নিতে চায় না সে। আলি নসিব মিয়াঁর টাকার লোভে বহু উকিল সাধ্যসাধনা করেও সবুরকে টলাতে পারল না। আলি নসিব মিয়াঁ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তাকে জেলে দেখা করে শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাতেও সফলকাম হননি। নরূজাহানের অনুরোধে সে বলেছিল, অনেক ক্ষতিই তোমাদের করে গেলাম — তার উপরে তোমাদের আরও আর্থিক ক্ষতি করে আমার বোঝা ভারী করে তুলতে চাইনে। আমায় ক্ষমা কোরো নূরজাহান, আমি তোমাদেরে আমার কথা ভুলতে দিতে চাইনে বলেই এই দয়াটুকু চাই!

সে সেশনে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক অকপটে বলে গেল। জজ সব কথা বিশ্বাস করলেন। জুরিরা বিশ্বাস করলেন না। সবুর সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। আপিল করল না। সকলে বললে, আপিল করলে সে মুক্তি পাবেই। তার উত্তরে সবুর হেসে বলেছিল যে, সে মুক্তি চায় না — আমিরের যে-টুকু রক্ত তার হাতে লেগেছিল— তা ধুয়ে ফেলতে সাতটা বছরেও যদি সে পারে— সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

জজ তার রায়ে লিখেছিলেন, আর কাউকে দণ্ড দিতে এত ব্যথা তিনি পাননি জীবনে।

যেদিন বিচার শেষ হয়ে গেল, সেদিন সপরিবারে আলি নসিব মিয়াঁ ময়মনসিংহে ছিলেন।

নূরজাহান তার বাবাকে সেই দিনই ধরে বসলে, — তারা সকলে মক্কা যাবে। আলি নসিব মিয়াঁ বহুদিন থেকে হজ করতে যাবেন বলে মনে করে রেখেছিলেন, মাঝে মাঝে বলতেনও সে কথা। নানান কাজে যাওয়া আর হয়ে উঠেনি, মেয়ের কথায় তিনি যেন আশমানের চাঁদ হাতে পেলেন। অত্যন্ত খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক কইছস বেডি, চল আমরা মক্কায় গিয়াই এ সাতটা বছর কাটাইয়া দিই। এ পাপ-পুরীতে আর থাকবাম না! আর আল্লায় যদি বাঁচাইয়া রাহে, ব্যাডা তালবিল্লিরে কইয়া যাইবাম, হে যেন একডিবার আমাদের দেখা দিয়া আইয়ে।' 'ব্যাডা তালবিল্লি' বলেই হো হো করে পাগলের মতো হেসে উঠেই আলি নসিব মিয়াঁ পরক্ষণে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

নূরজাহানের মা প্রতিবাদ করলেন না। তিনি জানতেন, মেয়ের যা কলঙ্ক রটেছে,

তাতে তার বিয়ে আর এ দেশে দেওয়া চলবে না। আর, এ মিথ্যা বদনামের ভাগী হয়ে এ দেশে থাকাও চলে না।

ঠিক হল একেবারে সব ঠিকঠাক করে জমি-জায়গা বিক্রি করে শুধু নগদ টাকা নিয়ে চলে যাবেন। আলি নসিব মিয়াঁ সেইদিন স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সাথে দেখা করে সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এলেন। কথা হল ব্যাঙ্কই এখন টাকা দেবে, পরে তারা সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা তুলে নেবে।

তার পরদিন সকলে জেলে গিয়ে সবুরের সাথে দেখা করলেন। সবুর সব শুনল। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। জেলের জামার হাতায় তা মুছে বললে, 'আব্বা, আম্মা, আমি সাত বছরে পরে যাইবাম আপনাদের কাছে— কথা দিতাছি।'

তার পর নূরজাহানের দিকে ফিরে বললে, 'আল্লায় যদি এই দুনিয়ার দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতেই তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।' অশ্রুতে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল, আর সে বলতে পারলে না। নূরজাহান কাঁদতে কাঁদতে সবুরের পায়ের ধুলা নিতে গিয়ে তার দু-ফোঁটা অশ্রু সবুরের পায়ে গড়িয়ে পড়ল! বলল, 'তাই দোওয়া করো।'

কারাগারের দুয়ার ভীষণ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে নূরজাহানের মনে হল — তার সকল সুখের স্বর্গের দ্বার বুঝিবা চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হয়ে গেল!

শিউলিমালা

মিস্টার আজহার কলকাতার নাম-করা তরুণ ব্যারিস্টার।

বাটলার, খানসামা, বয়, দারোয়ান, মালি, চাকর-চাকরানিতে বাড়ি তার হরদম সরগরম।

কিন্তু বাড়ির আসল শোভাই নাই। মিস্টার আজহার অবিবাহিত।

নাম-করা ব্যারিস্টার হলেও আজহার সহজে বেশি কেস নিতে চায় না। হাজার পীড়াপীড়িতেও না। লোকে বলে, পসার জমাবার এও একরকম চাল।

কিন্তু কলকাতার দাবাড়েরা জানে যে, মিস্টার আজহারের চাল যদি থাকে — তা সে দাবার চাল।

দাবা-খেলায় তাকে আজও কেউ হারাতে পারেনি। তার দাবার আড্ডার বন্ধুরা জানে, এই দাবাতে মিস্টার আজহারকে বড়ো ব্যারিস্টার হতে দেয়নি, কিন্তু বড়ো মানুষ করে রেখেছে।

বড়ো ব্যারিস্টার যখন 'উইকলি নোটস' পড়েন আজহার তখন অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা কিংবা রুবিনস্টাইন, রেটি, মরফির খেলা নিয়ে ভাবে, কিংবা চেস-ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে, আর চোখ বুজে তাদের চালের কথা ভাবে।

সকালে তার হয় না, বিকেলের দিকে রোজ দাবার আড্ডা বসে। কলকাতার অধিকাংশ বিখ্যাত দাবাড়েই সেখানে এসে আড্ডা দেয়, খেলে, খেলা নিয়ে আলোচনা করে।

আজহারের সবচেয়ে দুঃখ, ক্যাপাব্লাঙ্কার মতো খেলোয়াড় কিনা অ্যালেখিনের কাছে হেরে গেল। অথচ অ্যালেখিনই বোগোল-জুবোর মতো খেলোয়াড়ের কাছে অন্তত পাঁচ পাঁচবার হেরে যায়!

মিস্টার মুখার্জি অ্যালেখিনের একরোখা ভক্ত। আজও মিস্টার আজহার নিত্যকার মতো একবার ওই কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে, মিস্টার মুখার্জি বলে উঠল — 'কিন্তু তুমি যাই বল আজহার, অ্যালেখিনের ডিফেন্স — ওর বুঝি জগতে তুলনা নেই। আর বোগোল-জুবো? ও যে অ্যালেখিনের কাছ তিন-পাঁচে পনেরোবার হেরে ভূত হয়ে গেছে! ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় অমন দু চার বাজি সমস্ত ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ানই হেরে থাকেন। চব্বিশ দান খেলায় পাঁচ দান জিতেছে। তা ছাড়া, বোগোল-জুবোও তো যে সে খেলোয়াড় নয়!'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'আরে রাখো তোমার অ্যালেখিন। এইবার ক্যাপাব্লাঙ্কার সাথে আবার খেলা হচ্ছে তার, তখন দেখো একবার অ্যালেখিনের দুর্দশা! আর বোগোল-জুবোকে তো সেদিনও ইটালিয়ান মন্টেসেলি বগলা-দাবা করে নিলে! হাঁ, খেলে বটে গ্রানফেল্ড!'

বন্ধুদের মধ্যে একজন চটে গিয়ে বললে, 'তোমাদের কি ছাই আর কোনো কম্ম

নেই? কোথাকার বগলঝুপো না ছাইমুণ্ডু, অ্যালেখিন না ঘোড়ার ডিম — জ্বালালে বাবা।'

মুখার্জি হেসে বলল, 'তুমি তো বেশ গ্রাবু খেলতে পার অজিত, এমন মাহ ভাদর, চলে যাওনা স্ত্রীর বোনেদের বাড়িতে! এ দাবার চাল তোমার মাথায় ঢুকবে না!'

তরুণ উকিল নাজিম হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলে উঠলে, 'ও জিনিস মাথায় না ঢোকাতে বেঁচে গেছি বাবা! তার চেয়ে আজহার সাহেব দুটো গান শোনান, আমরা শুনে যে যার ঘরে চলে যাই। তার পর তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে বোসো।'

দাবাড়ে দলের আপত্তি টিকল না। আজহারকে গাইতে হল। আজহার চমৎকার ঠুংরি গায়। বিশুদ্ধ লখনউ ঢং-এর ঠুংরি গান তার জানা ছিল। এবং তা এমন দরদ দিয়ে গাইত সে, যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ কিন্তু সে কেবলই গজল গাইতে লাগল।

আজহার অন্য সময় সহজে গজল গাইতে চাইত না।

মুখার্জি হেসে বলে উঠল, — 'আজ তোমার প্রাণে বিরহ উথলে উঠল নাকি হে? কেবলই গজল গাচ্ছ, মানে কী? রংটং ধরেছে নাকি কোথাও!'

আজহারও হেসে বলল, 'বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো।'

এতক্ষণে যেন সকলে বাইরের দিকে নজর পড়ল। একটু আগের বর্ষা-ধোয়া ছলছলে আকাশ। যেন একটি বিরাট নীল পদ্ম। তারই মাঝে শরতের চাঁদ যেন পদ্মমণি। চারপাশে তারা যেন আলোক-ভ্রমর।

লেক-রোডের পাশে ছবির মতো বাড়িটি।

শিউলির সাথে রজনিগন্ধার গন্ধ-মেশা হাওয়া মাঝে মাঝে হলঘরটাকে উদাস-মদির করে তুলছিল!

সকলেরই চোখ মন দু-ই যেন জুড়িয়ে গেল!

নাজিম সোজা হয়ে বসে বলল, 'ওই দাবার গুটি নিয়ে বসলে কি আর এসব চোখে পড়ত?'

আজহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'সত্যিই তাই।'

মুখার্জি বলে উঠল 'না; এ শালার শিউলির ফুল আজ দাবা খেলতে দেবে না দেখছি!'

আজহার বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'তোমারও শিউলি! ফুলের সঙ্গে কোনো কিছু জড়িত আছে নাকি হে?'

তারা কিছু বলবার আগেই অজিত বলে উঠল, 'আরে ছোঃ! দাবাড়ের আবার রোমান্স! বেচারার জীবনে একমাত্র লাভ-অ্যাফেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে! নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়া! রাম বলো! তাও — সে স্ত্রী চলে গেছেন বাপের বাড়ি — ওই দাবার জ্বালায়! ওর আবার শিউলি ফুল!'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। মুখার্জি চটে গিয়ে বলে উঠল, 'তুই থাম অজিত! পাগলের মতো যা তা বকলেই তাকে রসিকতা বলে না!'

অজিত মুখ চুন করার ভান করে বলে উঠল, 'আমি তো রসিকতা করিনি দাদা। তুমি সত্যসত্যই তোমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছ — দশ জনে বদনাম দেয়, তাই আমিও

বললাম। ওঁরা যদি তা শুনে হাসেন, তাতে আমার কী দোষ হল?'

আজহার হেসে বলে উঠল, 'এ কী তোমার অন্যায় অপবাদ অজিত? স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে দাবাড়ের কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না, এ তুমি কী করে জানলে?'

অজিত বললে, 'প্রথম মিস্টার মুখার্জি, তার পর তোমাকে দেখে!'

আজহার বলে উঠল, 'আরে, আমি যে বিয়েই করিনি।'

অজিত বলে উঠল, 'তার মানে, তোমার অবস্থা আরও শোচনীয়! ও বেচারা তবু অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে লভে পড়ল, তোমার আবার স্ত্রীই জুটল না!'

নাজিম টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ব্রাভো! বেঁচে থাকুন অজিতবাবু। এইবার জোর বলেছেন!'

এমন সময় মালি শিউলিফুলের একজোড়া চমৎকার গোড়ে মালা টেবিলের উপরে রেখে চলে গেল। অজিত গম্ভীরভাবে মালা দুটি ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতেই সকলে হেসে উঠল। অজিত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিনয় করার সুরে বলে উঠল, 'হে ব্র্যাকেট-সুন্দরী! আজি এই শুক্লা শারদীয়া নিশীথে এই সেঁউতি মালার—'

আজহার ম্লান হাসি হেসে বাধা দিয়ে বলল 'দোহাই অজিত। ও-মালা নিয়ে বিদ্রুপ করিসনে ভাই! ও-মালা আমার নয়!'

অজিত নাছোড়বান্দা! তার বিস্ময়কে চাপা দিয়ে সে বলে উঠল, 'তবে এ-মালা কার বধূ? থুড়ি — কার উদ্দেশে বধূ?'

নাজিম বলে উঠল, 'দেখো, দাবাড়ের নাকি রোমান্স নেই?'

আজহার বলে উঠল, 'আমি প্রতি বছর এমনি পয়লা আশ্বিন শিউলিফুলের মালা জলে ভাসিয়ে দেই। এ-মালা জলের—অন্য কারুর নয়।' মুখে বিষাদমাখা হাসি।

মায় দাবাড়ের দল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠে বসল। অজিত বয়কে হাঁক দিয়ে চা আনতে বলে ভালো করে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসে আজহারের দিকে চেয়ারটা ফিরিয়ে বলে উঠল, 'তারপর বলো তো বন্ধু, ব্যাপারটা কী! সঙিন নিশ্চয়ই! পয়লা আশ্বিন — প্রতি বছর শিউলিমালা জলে ভাসিয়ে দেওয়া! চমৎকার গল্প হবে! বলে ফেলো। নইলে, এইখানে সকলে মিলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে দেব!'

সকলে হেসে উঠল, কিন্তু সায় দিল সকলে অজিতের প্রস্তাবে।

অনেক পীড়াপীড়ির পর আজহার হেসে বলে উঠল, 'কিন্তু তারও আরম্ভ যে দাবা খেলা দিয়ে!'

অজিত লাফিয়ে বলে উঠল, 'তা হোক! ও পলতার সুক্তো খেয়ে ফেলা যাবে কোনো রকমে, শেষের দিকে দই-সন্দেশ পাব।'

মুখার্জি বলে উঠল, 'এ দাবা খেলায় নৌকোর কিস্তিই বেশি থাকবে হে! গজ ঘোড়া কাটাকাটি হয়ে যাবে! ভয় নেই!'

২

সকলের আর এক প্রস্থ চা খাওয়া হলে পর সিগার ধরিয়ে মিনিটখানিক ধূম্র উদ্গীরণ করে আজহার বলতে লাগল—

তখন সবেমাত্র ব্যারিস্টারি পাশ করে এসেই শিলং বেড়াতে গেছি। ভাদ্র মাস। তখনও পূজার ছুটিওয়ালার দল এসে ভিড় জমায়নি। তবে আগে থেকেই দু-একজন করে আসতে শুরু করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার দাবাখেলার ওপর বড্ডো বেশি ঝোঁক ছিল। ও ঝোঁক বিলেতে গিয়ে আরও বেশি করে চাপল। সেখানে ইয়েটস, মিচেল, উইন্টার, টমাস প্রভৃতি সকল নাম-করা খেলোয়াড়ের সঙ্গো খেলেছি এবং কেম্ব্রিজের হয়ে অনেকগুলো খেলা জিতেওছি। শিলং গিয়ে খুঁজতেই দু-একজন দাবা-খেলোয়াড়ের সঙ্গো পরিচয়ও হয়ে গেল। তবে তারা কেউ বড়ো খেলোয়াড় নয়। তারা আমার কাছে ক্রমাগত হারত। একদিন ওরই মধ্যে একজন বলে উঠল, 'একজন বুড়ো রিটায়ার্ড প্রফেসর আছেন এখানে, তিনি মস্ত বড়ো দাবাড়ে, শোনা যায় — তাঁকে কেউ হারাতে পারে না — যাবেন খেলতে তাঁর, সাথে?'

আমি তখনই উঠে পড়ে বললাম, 'এখনই যাব, চলুন কোথায় তিনি?'

সে ভদ্রলোকটি বললেন, 'চলুন না, নিয়ে যাচ্ছি! আপনার মতো খেলোয়াড় পেলে তিনি বড়ো খুশি হবেন। তাঁরও আপনার মতোই দাবা-খেলার নেশা! অদ্ভুত খেলোয়াড় বুড়ো, চোখ বেঁধে খেলে মশাই!'

আমি ইউরোপে অনেকেরই 'ব্লাইন্ড ফোল্ডেড' খেলা দেখেছি, নিজেও অনেকবার খেলেছি। কাজেই এতে বিশেষ বিস্মিত হলাম না।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে এক ফালি চাঁদ, বোধ হয় শুক্লাপঞ্চমীর। যেন নতুন আশার ইঙ্গিত। সারা আকাশে যেন সাদা মেঘের তরণির বাইচ খেলা শুরু হয়েছে। চাঁদ আর তারা তার মাঝে যেন হাবুডুবু খেয়ে একবার ভাসছে একবার উঠছে।

ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু তরুঘেরা একটি রঙিন বাংলোয় গিয়ে আমরা উঠতেই দেখি, প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস এক শান্ত সৌম্যামূর্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি তরুণীর সঙ্গো দাবা খেলছেন।

আমাদের দেশের মেয়েরাও দাবা খেলেন, এই প্রথম দেখলাম।

বিস্ময়-শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তরুণীর দিকে তাকাতেই তরুণীটি উঠে পড়ে বললে, 'বাবা, দ্যাখো কারা এসেছেন!'

খেলাটা শেষ না হতেই মেয়ে উঠে পড়াতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমাদের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই হাসিমুখে উঠে বললেন 'আরে, বিনয়বাবু যে! এঁরা, কারা?' এসো, বোসো। এঁদের পরিচয়—

বিনয়বাবু — যিনি আমায় নিয়ে গেছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই বৃদ্ধ লাফিয়ে উঠে আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি — এই তুমিই আজহার? আরে, তোমার নাম যে চেস-ম্যাগাজিনে, কাগজে অনেক দেখেছি। তুমি যে মস্ত বড়ো খেলোয়াড়! ইয়েটসের সঙ্গো বাজি চটিয়েছ, একী কম কথা! এই তো তোমার বয়েস! — বড়ো খুশি হলুম — বড়ো খুশি হলুম!... ওমা শিউলি, একজন মস্ত দাবাড়ে এসেছেন! দেখে যাও! বাঃ, বড়ো আনন্দে কাটিবে তাহলে। এই বুড়ো বয়সেও আমার বড্ডো দাবা-খেলার ঝোঁক, কী করি, কাউকে না পেয়ে মেয়ের সাথেই খেলছিলুম!' বলেই হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে শান্ত সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুললেন।

শিউলি নমস্কার করে নীরবে তার বাবার পাশে এসে বসল। তাকে দেখে আমার মনে হল এ যেন সত্যই শরতের শিউলি।

গায়ে গোধূলি রং-এর শাড়ির মাঝে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুখখানি — হলুদ রং বোঁটায় শুভ্র শিউলিফুলের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার চেয়ে থাকার মাত্রা হয়তো একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধের উক্তিতে আমার চমক ভাঙল।

বৃদ্ধ যেন খেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিলেন। চাকর চায়ের সমগ্ৰাম এনে দিতেই শিউলি চা তৈরি করতে করতে হেসে বলে উঠল, 'বাবার বুঝি আর দেরি সইছে না?' বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না! বাবা বড্ড দাবা খেলতে ভালোবাসেন! দাবা খেলতে না পেলেই ওঁর অসুখ হয়!' বলেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার চা খেতে খেতে খেলা আরম্ভ করুন, আমরা দেখি।'

বিনয় হেসে বলল, 'হাঁ, এইবার সমানে সমানে লড়াই। বুঝলে মিস চৌধুরি, আমাদের রোজ উনি হারিয়ে ভূত করে দেন।'

খেলা আরম্ভ হল। সকলে উৎসুক হয়ে দেখতে লাগল, কেউ কেউ উপরচালও দিতে লাগল। মিস চৌধুরি ওরফে শিউলি তার বাবার যা দু একটি ত্রুটি ধরিয়ে দিলে, তাতে বুঝলাম — এও এর বাবার মতোই ভালো খেলোয়াড়।

কিছুক্ষণ খেলার পর বুঝলাম, আমি ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে খেলেছি— তাঁদের অনেকের চেয়েই বড়ো খেলোয়াড় প্রফেসর চৌধুরি। আমি প্রফেসর চৌধুরিকে জানতাম বড়ো কেমিস্ট বলে, কিন্তু তিনি যে এমন অদ্ভুত ভালো দাবা খেলতে পারেন, এ আমি জানতাম না।

আমি একটা বেশি বল কেটে নিতেই বৃদ্ধ আমার পিঠ চাপড়ে তারিফ করে ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে লাগলেন। তিনি আমার গজের খেলার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। শিউলি বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টি দিয়ে বারেবারে আমার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু একটা বল কম নিয়েও বৃদ্ধ এমন ভালো খেলতে লাগলেন যে, আমি পাছে হেরে যাই এই ভয়ে খেলাটা ড্র করে দিলাম। বৃদ্ধ বারংবার আমার প্রশংসা করতে করতে বললেন, 'দেখলি মা শিউলি, আমাদের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস, গজ ঘোড়ার মতো খেলে না। দেখলি জোড়া গজে কী খেললে! বড়ো ভালো খেল বাবা তুমি! আমি হারি কিংবা হারাই, ড্র সহজে হয় না!'

শিউলি হেসে বললে, 'কিন্তু তুমি হারনি কত বৎসর বলো তো বাবা!'

প্রফেসর চৌধুরি হেসে বললেন, 'না মা, হেরেছি। সে আজ প্রায় পনেরো বছর হল, একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক — আধুনিক শিক্ষিত নন — আমায় হারিয়ে দিয়ে গেছিলেন। ওঃ, ওরকম খেলোয়াড় আর দেখিনি!'

আবার খেলা আরম্ভ হতেই বিনয় হেসে বলে উঠল, 'এইবার মিস চৌধুরি খেলুন না মিস্টার আজহারের সাথে!'

বৃদ্ধ খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ তো! তুই-ই খেল মা, আমি একবার দেখি।'

শিউলি লজ্জিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি ওঁর সঙ্গে খেলতে পারি?'

কিন্তু সকলের অনুরোধে সে খেলতে বসল। মাঝে চেসবোর্ড একধারে চেয়ারে শিউলি— একধারে আমি! তার কেশের গন্ধ আমার মস্তিষ্ককে মদির করে তুলছিল।

আমার দেখে মনে যেন নেশা ধরে আসছিল। আমি দু-একটা ভুল চাল দিতেই শিউলি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে ফেললে। মনে হল, তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে হাসি যেন অর্থপূর্ণ।

আবার ভুল করতেই আমি চাপায় পড়ে আমার একটা নৌকা হারালাম। বৃদ্ধ যেন একটু বিস্মিত হলেন। বিনয়বাবুর দল হেসে বলে উঠলেন — "এইবার মিস্টার আজহার মাত হবেন।' মনে হল, এ হাসিতে বিদ্রুপ লুকোনো আছে।

আমি এইবার সংযত হয়ে মন দিয়ে খেলতে লাগলাম। দুই গজ ও মন্ত্রী দিয়ে এবং নিজের কোটের বোড়ে এগিয়ে এমন অফেন্সিভ খেলা খেলতে শুরু করে দিলাম যে, প্রফেসর চৌধুরিও আর এ-খেলা বাঁচাতে পারলেন না। শিউলি হেরে গেল! সে হেরে গেলেও এত ভালো খেলেছিল যে, আমি তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আমি বললাম — 'দেখুন, মেয়েদের ওয়ার্লড-চ্যাম্পিয়ান মিস মেনচিকের সাথেও খেলেছি, কিন্তু এত বেশি বেগ পেতে হয়নি আমাকে, আমি তো প্রায় হেরেই গেছিলাম।'

দেখলাম, আনন্দে লজ্জায় শিউলি কমলফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে! আমি বেঁচে গেলাম। সে যে হেরে গিয়ে আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়নি — এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করলাম।

প্রফেসর চৌধুরির সঙ্গো আবার খেলা হল, এবারও ড্র হয়ে গেল।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে! বললেন, 'হাঁ, এতদিন পরে একজন খেলোয়াড় পেলুম, যার সঙ্গো খেলতে হলে অন্তত আট চাল ভেবে খেলতে হয়!'

কথা হল, এরপর রোজ প্রফেসর চৌধুরির বাসায় দাবার আড্ডা বসবে।

উঠবার সময় হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'মা শিউলি, এতক্ষণ খেলে মিস্টার আজহারের নিশ্চয়ই বড্ড কষ্ট হয়েছে, ওঁকে একটু গান শোনাও না!' আমি তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে বললাম, 'বাঃ এ খবর তো জানতাম না।'

শিউলি কুণ্ঠিতস্বরে বলে উঠল, 'এই শিখছি কিছুদিন থেকে, এখনও ভালো গাইতে জানিনে!'

শিউলির আপত্তি আমাদের প্রতিবাদে টিকল না। সে গান করতে লাগল।

সে গান যারই লেখা হোক — আমার মনে হতে লাগল — এর ভাষা যেন শিউলিরই প্রাণের ভাষা — তার বেদনা নিবেদন।

এক একজনের কণ্ঠ আছে — যা শুনে এ কণ্ঠ ভালো কি মন্দ বুঝবার ক্ষমতা লোপ করে দেয়! সে কণ্ঠ এমন দরদে ভরা — এমন অকৃত্রিম যে, তা শ্রোতাকে প্রশংসা করতে ভুলিয়ে দেয়। ভালোমন্দ বিচারের বহু উর্ধ্বে সে কণ্ঠ, কোনো কর্তব নেই, সুর নিয়ে কোনো কৃচ্ছ্রসাধনা নেই, অথচ হৃদয়কে স্পর্শ করে। এ প্রশংসাবাণী উথলে উঠে মুখে নয়— চোখে!

এ সেই কণ্ঠ! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে একবার মাত্র বলতে গেলাম, 'অপূর্ব!' গলার স্বর বেরুল না। শিউলির চোখে পড়ল — আমার চোখের জল। সে তার দীর্ঘায়ত চোখের পরিপূর্ণ বিস্ময় নিয়ে যেন সেই জলের অর্থ খুঁজতে লাগল।

হায়, সে যদি জানত — কালির লেখা মুছে যায়, জলের লেখা মোছে না!

সেদিন আমায় নিয়ে কে কী ভেবেছিল — তা নিয়ে সেদিনও ভাবিনি, আজও ভাবি না। ভাবি — শিউলিফুল যদি গান গাইতে পারত, সে বুঝি এমনি করেই গান গাইত। গলায় তার দরদ, সুরে তার এমনি আবেগ!

সুরের যেটুকু কাজ সে দেখাল, তা ঠুংরি ও টপ্পা মেশানো। কিন্তু বুঝলাম, এ তার ঠিক শেখা নয় — গলার ও-কাজটুকু স্বতঃস্ফূর্ত! কমল যেমন না জেনেই তার গন্ধ-পরাগ ঘিরে শতদলের সুচারু সমাবেশ করে — এও যেন তেমনই।

গানের শেষে বলে উঠলাম, 'আপনি যদি ঠুংরি শেখেন, আপনি দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী হতে পারেন! কী অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর।'

শিউলিফুলের শাখায় চাঁদের আলো পড়লে তা যেমন শোভা ধারণ করে, আনন্দ ও লজ্জা মিশে শিউলিকে তেমনই সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শিউলি তার লজ্জাকে অতিক্রম করে বলে উঠল, 'না, না, আমার গলা একটু ভাঙা। সে যাক, আমার মনে হচ্ছে আপনি গান জানেন। জানেন যদি, গান না একটা গান।'

আমি একটু মুশকিল পড়লাম! ভাবলাম, 'না বলি। আবার গান শুনে গলাটাও গাইবার জন্য সুড়সুড় করছে! বললাম, 'আমি ঠিক গাইয়ে নই, সমঝদার মাত্র! আর, যা গান জানি, তাও হিন্দি।'

প্রফেসর চৌধুরি খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'আহা হা হা। বলতে হয় আগে থেকে। তা হলে যে গানটাই আগে শুনতাম তোমার। আর গান হিন্দি ভাষায় না হলে জমেই না ছাই। ও ভাষাটাই যেন গানের ভাষা। দেখো, ক্লাসিকাল মিউজিকের ভাষা বাংলা হতেই পারে না। কীর্তন বাউল আর রামপ্রসাদি ছাড়া এ ভাষায় অন্য ঢং-এর গান চলে না।' আমি বললাম, 'আমি যদিও বাংলা গান জানিনে, তবু বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতটা নিরাশাও পোষণ করি না।'

গান করলাম। প্রফেসর চৌধুরি তো ধরে বসলেন, তাঁকে গান শেখাতে হবে কাল থেকে। শিউলির দুই চোখে প্রশংসার দীপ্তি ঝলমল করছিল।

বিনয়বাবুর দলও ওস্তাদি গানেরই পক্ষপাতী দেখলাম। তাদের অনুরোধে দু চারখানা খেয়াল ও টপ্পা গাইলাম। প্রফেসর চৌধুরির সাধুবাদের আতিশয্যে আমার গানের অর্ধেক শোনাই গেল না। শেষের দিকে ঠুংরিই গাইলাম বেশি।

গানের শেষে দেখি আমাদের পিছন দিকে আরও কয়েকজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। শিউলি পরিচয় করে দিল — 'ইনি আমার মা— ইনি মামিমা — এরা আমার ছোটো বোন।'

তার পরের দিন দুপুরে প্রফেসর চৌধুরির বাড়িতে নিমন্ত্রিত হলাম। ফিরবার সময় নমস্কারান্তে চোখে পড়ল শিউলির চোখ। চোখ জ্বালা করে উঠল। মনে হল, চোখে এক কণা বালি পড়লেই যদি চোখ এত জ্বালা করে — চোখে যার চোখ পড়ে তার যন্ত্রণা বুঝি অনুভূতির বাইরে!

৩

দেড় মাস ছিলাম শিলং-এ। হপ্তাখানেকের পরেই আমাকে হোটেল ছেড়ে প্রফেসর চৌধুরির বাড়ি থাকতে হয়েছিল গিয়ে। সেখানে আমার দিন-রাত্রি নদীর জলের মতো বয়ে যেতে লাগল। কাজের মধ্যে দাবাখেলা আর গান।

মুশকিলে পড়লাম — প্রফেসার চৌধুরিকে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে দাবাখেলা তো আছেই — তাঁকে গান শেখানোই হয়ে উঠল আমার পক্ষে সব চেয়ে দুষ্কর কার্য।

শিউলিও আমার কাছে গান শিখতে লাগল। কিছুদিন পরেই আমার গান ও গানের পুঁজি প্রায় শেষ হয়ে গেল।

মনে হল আমার গান শেখা সার্থক হয়ে গেল। আমার কণ্ঠের সকল সঞ্চয় রিক্ত করে তার কণ্ঠে ঢেলে দিলাম।

আমাদের মালা বিনিময় হল না— হবেও না এ জীবনে কোনোদিন — কিন্তু কণ্ঠ বদল হয়ে গেল! আর মনের কথা — সে শুধু মনই জানে!

অজিত বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'কণ্ঠ না কণ্ঠী বদল বাবা? শেষটা নেড়ানেড়ির প্রেম! ছোঃ!'

আজহার কিছু না বলে আবার সিগার ধরিয়ে বলে যেতে লাগল—

একদিন ভোরে শিউলির কণ্ঠে ঘুম ভেঙে গেল। সে গাচ্ছিল—

'এখন আমার সময় হল
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।'

গান শুনতে শুনতে মনে হল — আমার বুকের সকল পাঁজর জুড়ে ব্যথা। চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। চোখে জল ভরে এল।

আশাবরি সুরের কোমল গান্ধারে আর ধৈবতে যেন তার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা গড়িয়ে পড়ছিল! আজ প্রথম শিউলির কণ্ঠস্বরে অশ্রুর আভাস পেলাম।

ঠুং করে কীসের শব্দ হতেই ফিরে দেখি, শিউলি তার দুটি করপল্লব ভরে শিউলি-ফুলের অঞ্জলি নিয়ে পূজারিনির মতো আমার টেবিলের উপর রাখছে। চোখে তার জল।

আমার চোখে চোখ পড়তেই সে তার অশ্রু লুকাবার কোনো ছলনা না করে জিজ্ঞাসা করল — আপনি কি কালই যাচ্ছেন?

উত্তর দিতে গিয়ে কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে হৃদয়াবেগ সংযত করে আস্তে বললাম — হাঁ ভাই!' আরও যেন কী বলতে চাইলাম। কিন্তু কী বলতে চাই ভুলে গেলাম।

শিউলি শিউলি ফুলগুলিকে মুঠোয় তুলে অন্যমনস্কভাবে অধরে কপোলে ছুঁইয়ে বলল, 'আবার কবে আসবেন।'

আমি ম্লান হাসি হেসে বললাম, 'তাও জানিনে ভাই! হয়তো আসব!'

শিউলিফুলগুলি রেখে চলে গেল। আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না।

আমার সমস্ত মন যেন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল — ওরে মূঢ়, জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ তোর এই এক মুহূর্তের জন্যই এসেছিল, তুই তা হেলায় হারালি! জীবনে তোর দ্বিতীয়বার এ শুভ মুহূর্ত আর আসবে না, আসবে না।

এক মাস ওদের বাড়িতে ছিলাম। কত স্নেহ কত যত্ন, কত আদর। অবাধ মেলামেশা — সেখানো কোনো নিষেধ, কোনো গ্লানি, কোনো বাধাবিঘ্ন কোনো সন্দেহ ছিল না। আর এ সব ছিল না বললেই বুঝি এতদিন ধরে এত কাছে থেকেও কারুর করে কর-স্পর্শটুকুও লাগেনি কোনোদিন। এই মুক্তিই ছিল বুঝি আমাদের সবচেয়ে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কেউ কারুর মন যাচাই করিনি। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কথাও উদয় হয়নি মনে। একজন অসীম আকাশ — একজন অতল সাগর। কোনো কথা নেই — প্রশ্ন নেই, শুধু এ ওর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে।

কেউ নিষেধ করলে না, কেউ এসে পথ আগলে দাঁড়াল না! সেও যেন জানে — আমাকে চলে আসতেই হবে, আমিও যেন জানি — আমাকে যেতেই হবে।

নদীর স্রোতই যেন সত্য — অসহায় দুই কূল এ ওর পানে তাকিয়ে আছে। অভিলাষ নাই — আছে শুধু অসহায় অশ্রু-চোখে চেয়ে থাকা।

সে চলে গেলে টেবিলের শিউলিফুলের অঞ্জলি দুই হাতে তুলে মুখে ঠেকাতে গেলাম। বুঝি বা আমারও অজানিতে আমি সে ফুল ললাটে ঠেকিয়ে আবার টেবিলে রাখলাম। মনে হল, এ ফুল পূজারিনির — প্রিয়ার নয়! ভাবতেই বুক যেন অব্যক্ত বেদনায় ভেঙে যেতে লাগল।

চোখ তুলেই দেখি, নিত্যকার মতোই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শিউলি বলছে — 'আজ আমায় গান শেখাবেন না?'

আমি বললাম — 'চলো, আজই তো শেষ নয়।'

শিউলি তার হরিণ-চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইল। ভয় হল বলে তার মানে বুঝবার চেষ্টা করলাম না।

ও যেন স্পর্শাতুর কামিনী ফুল, আমি যেন ভীরু ভোরের হাওয়া — যত ভালোবাসা, তত ভয়! ও বুঝি ছুঁলেই ধুলায় ঝরে পড়বে।

এ যেন পরির দেশের স্বপ্নমায়া, চোখ চাইলেই স্বপ্ন টুটে যাবে!

এ যেন মায়া-মৃগ — ধরতে গেলেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাবে!

গান শেখালাম— বিদায়ের গান নয়। বিদায়ের ছাড়া আর সব কিছুর গান। বিদায় বেলা তো আসবেই — তবে আর কথা বলে ওর সব বেদনা সব মাধুর্যটুকু নষ্ট করি কেন?

সেদিনকার সন্ধ্যা ছিল নিষ্কলঙ্ক — নির্মেঘ — নিরাভরণ। আমি প্রফেসর চৌধুরিকে বললাম — আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য ভালোমানুষ সেজেছে তো! কোনো বেশভূষা নেই।

বলতেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরি বলে উঠলেন, — 'সন্ধ্যা আজ বিধবা হয়েছে!'

এই একটি কথায় ওঁর মনের কথা বুঝতে পারলাম। এই শান্ত সৌম্য মানুষটির বুকেও কী ঝড় উঠেছে বুঝলাম। মনে মনে বললাম — তুমি অটল পাহাড়, তোমার পায়ের তলায় বসে শুধু ধ্যান করতে হয়! তোমাকে তো ঝড় স্পর্শ করতে পারে না!

বৃদ্ধ বুদ্ধি মন দিয়ে আমার মনের কথা শুনেছিলেন। ম্লান হাসি হেসে বললেন — 'আমি অতি ক্ষুদ্র, বাবা! পাহাড় নয়, বল্মীকস্তূপ! তবু তোমাদের শ্রদ্ধা দেখে গিরিরাজ হতেই ইচ্ছা করে!'

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শিউলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল — 'এই যে সন্ধ্যা দেবী!' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

শিউলির সোনার তনু ঘিরে ছিল সেদিন টকটকে লাল রং-এর শাড়ি। ওকে লাল শাড়ি পরতে আর কোনোদিন দেখিনি। মনে হল, সারা আকাশকে বঞ্চিত করে সন্ধ্যা আজ মূর্তি ধরে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তার দেহে রক্ত-ধারা রং-এর শাড়ি, তার মনে রক্ত-ধারা, মুখে অনাগত নিশীথের ম্লান ছায়া! চোখ যেমন পুড়িয়ে গেল, তেমনই পুরবির বাঁশি বেজে উঠল।

শিউলির কাছে দু-একটা বাংলা গান শিখেছিলাম। আমি বললাম— 'একটা গান গাইব?' শিউলি আমার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল — 'গান!'

আমি গাইলাম—

'বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে এল
সোনার গগন রে!'

প্রফেসর চৌধুরি উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'বাবাজি, আজ একবার শেষবার দাবা খেলতে হবে!'

চৌধুরি সাহেব উঠে যেতে আমি বললাম — 'আচ্ছা ভাই শিউলি আবার যখন এমনই আশ্বিন মাস — এমনই সন্ধ্যা আসবে — তখন কী করব, বলতে পারো?'

শিউলি তার দু-চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, — 'শিউলিফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ো!'

আমি নীরবে সায় দিলাম — তাই হবে! জিজ্ঞাসা করলাম — 'তুমি কী করবে!' সে হেসে বললে, 'আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে!'

আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল।

রাত্রে দাবা-খেলার আড্ডা বসল! প্রফেসর চৌধুরি আমার কাছে হেরে গেলেন। আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম! জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার! আর সেই হারই আমার গলার হার হয়ে রইল!

সকালে যখন বিদায় নিলাম — তখন তাদের বাংলোর চারপাশে উইলো-তরু তুষারে ঢাকা পড়েছে!

আর তার সাথে দেখা হয়নি— হবেও না! একটু হাত বাড়ালে হয়তো তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল — বড়ো মৃদু, বড়ো ভীরু, গলায় পরলে দু-দণ্ডে আঁউরে[১] যায়! তাই শিউলিফুলের আশ্বিন যখন আসে — তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই!

১ আড়ালে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া।

লঘু রচনা

হক সাহেবের হাসির গল্প

বাংলার প্রধানমন্ত্রী 'অনারেবল' হক সাহেব যে সুন্দর গল্প বলতে পারেন, তা আগে জানতাম না। তবে তাঁর কথায় কথায় চমৎকার ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছি। সকল শ্রোতাই হাসিতে ঘর পূর্ণ করে তা উপভোগ করেছেন। হক সাহেব সর্বদাই হাসি-মুখ। ভীষণ ক্রোধের পরক্ষণেই মুখে বালকের মতো সরল হাসির ফুল ফোটে।

দিন-দশেক আগে তাঁর দুটি গল্প শুনেছি। 'নবযুগ'-এর' পাঠক-পাঠিকাদের সেই গল্প দুটি উপহার দিচ্ছি। এর পরেও মাঝে মাঝে তাঁর হাসির গল্প উপহার দেব। তিনি বহু সভায় এবং বাড়িতে লোকজনের সামনে বহু হাসির গল্প সৃষ্টি করে বলেছেন। তাঁর শুধু হাসির গল্প বলা নয়, সভার অবস্থা বুঝে সুন্দর অন্য ধরনের গল্প বলারও বড়ো অসাধারণ ক্ষমতা আছে। হক সাহেবের সভার বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা এর সাক্ষ্য দেবেন। প্রথম গল্পটি বলছি শুনুন। গল্পটির নাম :

মরা কাউয়া

[মরা কাক]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরূপে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য হক সাহেবকে আমন্ত্রণ করেন। হক সাহেব দিল্লি গিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সাথে আলোচনা করার পর যখন বেরিয়ে আসেন, তখন দলে দলে খবরের কাগজের প্রতিনিধি ও লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'স্ট্যাফোর্ড সাহেবের সাথে আপনার কী কথা হল?' হক সাহেব হেসে একটি হাসির গল্প বললেন। গল্পটির মর্ম এইরূপ :— এক ছিলেন পণ্ডিত। তিনি অনেক দিন সংসার করে বৃদ্ধ বয়সে দিন-রাত বই-পত্তর নিয়ে নাক টিপে চোখ বুজে

যোগ অভ্যাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী দেখলেন, এই অবস্থায় আর কিছুদিন চললে সংসার চলবে না ; উপোস করে মরতেও হবে। ব্রাহ্মণী ধ্যানস্থ পণ্ডিতের সামনে শূন্য চালের হাঁড়ি ভেঙে বলতে লাগলেন— 'এই চোখ বুজে টিকি উঁচিয়ে বসে থাকলে ছেলে মেয়েরা খাবে কি ? বাড়িতে সাত দিনের চাল আছে। এই সাত দিনের মধ্যে চাল-ডালের টাকা না পেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এই সব ভণ্ডামি করে কী টাকা পাওয়া যায় ? ব্রাহ্মণ তেরিয়া হয়ে বললেন, 'কী ? এ সব ভণ্ডামি ? তুমি আমার যোগের শক্তি দেখবে ? আমি সাত দিনের মধ্যে সাত হাজার টাকা এনে দেব।' ব্রাহ্মণী বললেন, 'ভীমরতি হয়েছে! চল্লিশ বছরে এক সাথে এক হাজার টাকা পারলেন না, সাত দিনে সাত হাজার টাকা দিবেন!' ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখে নিয়ো।' পণ্ডিতের গোটা বিশেক লুকানো টাকা ছিল, তাই আর গাড়ু গামছা নিয়ে পণ্ডিত বেড়িয়ে পড়লেন। শহরে গিয়ে দু-এক জন ধূর্ত লোক জোগাড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন, এক মহাযোগী ব্রাহ্মণ এসেছেন হিমালয় থেকে, তাঁর কাছে একটা মরা-মানুষের মাথার খুলি আছে, সেই মাথার খুলিকে যে যা জিজ্ঞাসা করে, সে তার সঠিক উত্তর দেয়। শহরে হই-চই পড়ে গেল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, বেশি কথা, কম কথা অনুসারে এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে দিতে হবে। সন্ধ্যা হতে না হতেই দলে দলে লোক এসে হাজির হল। ব্রাহ্মণ একসঙ্গে সব লোককে আসতে দিলেন না। একটা পর্দা টাঙিয়ে একটি একটি করে লোক আসতে দিলেন। প্রথমে যে লোকটি এল সে দশটি প্রশ্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ পাঁচ টাকা চার্জ করলেন। ব্রাহ্মণের হাতে টাকা দিয়ে সে বলল, 'মরা মানুষের মাথায় খুলি কই ?' ব্রাহ্মণ একটা ঝুড়ি তুলে বললেন, 'এই'। সে রেগে উঠে বললে, 'এ যে মরা কাউয়া, খুলি কই।' ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেলে বললেন, 'খুলি টুলি মিথ্যা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ছেলেপিলে খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে— তুমি এ কথা কাউকে বোলো না, বললে তোমাকে সবাই হাঁদা বোকা আরও কত কী বলবে। মনে করো দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করলে। তোমার মঙ্গল হবে বাবা, মঙ্গল হবে।' সে লোকটি আর একবার মরা কাকের দিকে করুণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে বেরিয়েই হেসে ফেলল। লোকটি ছিল কায়স্থ। যত লোক তাকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করতে লাগল 'খুলি কি সত্যিই কথা কয় ?' সে উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল, তখন লোকে ভাবল, ও নিশ্চয় কেল্লা ফতে করেছে। ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করে কে আগে যাবে, তার চেষ্টা করতে লাগল। যে যায় ব্রাহ্মণ তাকে ওই এক কথাই বলে — আগে টাকা নিয়ে। কেউ কথা বলল না, পাছে অন্য লোকে তাকে বোকা বলে। এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের সাত হাজার টাকা হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে সগর্বে বলল, 'এই নে সাত হাজার টাকা। আর আমায় কিছু বলিসনে। আমি লঙ্কা বিজয় করে এসেছি।' ব্রাহ্মণী বদন-ব্যাদান করে এক হাত জিভ বের করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

দ্বিতীয় গল্প

পাড়াগাঁয়ের গরিব মুসলমানদের মধ্যে একজন মোড়ল ছিলেন। তাঁকে সকলে ফকিরজি বলে ডাকত। তিনি দিনরাত আল্লা নাম জিকির[১] করতেন। তাঁর গায়ে সর্বদা থাকত একটি চাদর। সেই চাদরে লেখা ছিল কোরান শরিফের অনেকগুলি বিখ্যাত সুরা (শ্লোক)। সেটিকে তিনি সযত্নে রক্ষা করতেন। সেই চাদর গায়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের অনেক মাজেজা (বিভূতি) দেখাতেন, রোগ ভালো করতেন, তাদের মাঠে বেশি ফলন ফলাতেন ইত্যাদি। আর এক গ্রামের মোড়ল তাই দেখে মনে করল — ওই মোড়লের যা কিছু শক্তি, ওই চাদরের গুণে। ওকে যে গ্রামের — এবং পাশের অনেক গ্রামের লোকেরা শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, দাওত (নিমন্ত্রণ) করে খাওয়ায় তার কারণ ওই চাদরের শক্তি। ওই চাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিলেই আমাকেও সকলে সম্মান দেবে, শ্রদ্ধা করবে, পির বলে মানবে। এই ভেবে একদিন সে হাত জোড় করে সেই ফকিরকে নিমন্ত্রণ করে এল রাত্রে খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় সেই ফকির এসে হাজির হলেন অন্য গ্রামের মোড়লের বাড়িতে। তখন সে তার দলবল নিয়ে রামদা দেখিয়ে বলল, 'তুমি যদি তোমার গায়ের ওই চাদর আমাকে না দাও, তা হলে তোমাকে কোতল করব।' বেচারা ফকির ওর রক্ত-চক্ষু আর রাম-দা দেখে গায়ের চাদর দিয়ে পালিয়ে এল।

ও-গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে সগর্বে পাড়া বেড়িয়ে এল। আড়-চোখে দেখতে লাগল, কেউ চেয়ে দেখে কিনা। কেউ এসে সালাম করে কি না। কেউ জিজ্ঞাসাও করল না, 'মোড়ল! খবর সব ভালো তো?' মোড়ল হতাশ হল না। মনে করল, দু চারদিন গায়ে দিতে দিতে এর শক্তি বেরিয়ে পড়বে। দিন পনেরো ক্রমে ক্রমে একমাস গায়ে দিয়েও কোনো শক্তি পেয়েছে বলে মনে হল না। গ্রামের লোক হাসে আর বলে, মোড়লের মাথা খারাপ হয়েছে।

এদিকে ফকির চাদর হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। চাদরের শোকে কাঁদতে লাগলেন। এই চাদর তিনি মক্কা-মদিনা-ফেরত এক হাজির কাছে পেয়েছিলেন। একদিন ফকিরজি আর থাকতে না পেরে নদীর ধারে সারা রাত্রি জেগে জিকির করেন আর কাঁদেন! ভোরের সময় একজন ফেরেশতা (দেবদূত) এসে বলল

'তোমার কোনো ভয় নাই, তোমার চাদর তুমি ফিরে পাবে। ও গাঁয়ের মোড়ল চাদর গায়ে দিয়ে কোনো শক্তি পায়নি। সে-তো আল্লাকে ডাকে না। ধৈর্য্য ধরো, আর কিছুদিন গায়ে দিয়ে ও তোমার চাদর আবার তোমার ফিরিয়ে দেবে।'

ফকির আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

এক সাহেব বালকের মতো হাসি হেসে বললেন, 'ওই ফকিরের চাদরের মতো মুসলিম লিগ ওরা কেড়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম কষ্ট হয়েছিল, এখন আমি জানতে পেরেছি, আমার চাদর অর্থাৎ আমার মুসলিম লিগ আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।'

সকলে সোল্লাসে হেসে উঠলেন।

নাটক, নাটিকা, নাট্যপালা

পণ্ডিতমশায়ের ব্যাঘ্র শিকার
শ্রীমন্ত
প্ল্যানচেট
ঈদল ফেতর
জন্মাষ্টমী
মধুমালা
ভূতের ভয়
একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা

পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৪০
ডিসেম্বর ১৯৩৩

(বিখ্যাত শিকারি জমিদার ললিতবাবুর বৈঠকখানা)

পণ্ডিতমশায় : বলি ও ললিত বলি, বোকেন্দ্র-গন্ধ আসতিছে যেন ?

ললিত : বোকেন্দ্র-গন্ধ কী পণ্ডিতমশায় ?

পণ্ডিত : আরে, তাও আর বুজতি পারতিছ না ?
বোকেন্দ্র-গন্ধ মানে বোকা পাঁঠার খোশবাই, বুঝল্যানি ?

ললিত : (হাসিয়া) বুঝেছি, পণ্ডিতমশায় ! আজ বাঘ শিকারে যাব কিনা, তাই ওটা কিনে রেখেছি।

পণ্ডিত : তোমার সাথে কি এ বোকেন্দ্র-নন্দনও ব্যাঘ্র শিকারে যাবেন ?

: হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায় ! উনি জঙ্গালের খুঁটায় বাঁধা থাকবেন আর ওঁর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাঘ্র মশায় যেই এসে উপস্থিত হবেন, অমনি মাচান থেকে তাঁকে গুলি করব।

পণ্ডিত : আ-হা-হা, অমন পুরুষ্টু পাঁঠা কিনা ব্যাঘ্রের উদরে যাবে ? তা ললিত, এক কাজ করতি পার ? আমারে বাঘ মনে করে দুটো চণ্ডু কী চরসের গুলি ছুঁড়ে মারো না — আমি ওটাকে খাইয়া ফেলি ; তা হলেই অমন পুরুষ্টু পাঁঠাটা বাঘের পেটে না যেয়ে বামুনের পেটেই যায় ; ওটারও একটা সদ্গতি হয়।

ললিত : ওর না হয় সদ্গতি হল, কিন্তু আপনাকে বাঘ মনে করি কী করে, পণ্ডিতমশায় ? আপনার গায়ে অবশ্যি বাঘের মতো লোমও আছে, গন্ধও আছে ; কিন্তু ন্যাজ ? সে যাক, আপনি বরং আমাদের সঙ্গো শিকারে চলুন না। সেখানে পাঁঠাও খেতে পাবেন, আর আপনার কুটুম্ব ব্যাঘ্রাচার্যের সঙ্গোও দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যাবে।

পণ্ডিত : দেখাসাক্ষাৎ না হয় হল, কিন্তু ও সুমুন্দি ফিরে আসতি দেবে তো ? বামুন পণ্ডিত বলি রেয়াত করবে ?

ললিত : তা আমরা পাঁচজন তো আছি, টেনে হেঁচড়ে অন্তত আপনার খানিকটা আনতে পারব, আর পইতে গাছটি বের করে সোজা নাকের সামনে ধরবেন।

পণ্ডিত : ললিত, কী যে কও ! আচ্ছা ললিত, বাঘের কাছে কি পাঁঠার মাংসের চাতি মানুষের মাংস অধিক সুস্বাদু ?

ললিত : তা তো বাঘকে কখনও জিজ্ঞেস করিনি পণ্ডিতমশায়। তবে আপনি বামুনপণ্ডিত, আপনার কথা আলাদা।

পণ্ডিত : ললিত কতি পার বাঘেরে মামা কইলে ছাড়ি দেয় ?

ললিত : পণ্ডিতমশায় ! বাবা বললে ছাড়ে না, তা মামা !
(সকলে মিলে পণ্ডিতমশায়কে ধরে বেঁধে টেনে নিয়ে মাচানে তুলেছে। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে — দূর থেকে নানা প্রকার বন্যজন্তুর ডাক শুনা যাচ্ছে। একটু দূরেই বাঘের গর্জন শুনা গেল।)

পণ্ডিত : ললিত, বাঘ আসবার দেরি কত ?

ললিত : তা তো বলতে পারি না, পণ্ডিতমশায় ! বাঘ তো আর আমায় টাইম দেয় নি।

পণ্ডিত : ললিত, বলি, মাঁচায় গামছা গাড়ু আছে?

ললিত : গামছা গাড়ু কেন পণ্ডিতমশায় — হাত মুখ ধোবেন?

পণ্ডিত : তা আর বুঝতে পারতিছ না? আমার পেটের মধ্যি কেমন যেন হাঁচড়-পাঁচড় করতিছে। বাঘটা কি আমার পেটেই আসি সান্ধাইল!

ললিত : (অন্যমনস্কভাবে) ডাক তো অনেকক্ষণ থেকে শুনতে পাচ্ছি। এইবার বাঘ এল বলে।

(হঠাৎ বাঘের ডাক)

পণ্ডিত : অ ললিত, ওটা কী ডাকি উঠল? ওর ডাক তো সুশ্রাব্য নয়।

ললিত : উনি তো আর কীর্তন গাইতে আসছেন না, পণ্ডিতমশায়, যে ওঁর গলাটা সুশ্রাব্য হবে।

পণ্ডিত : অ ললিত, ওই উৎকট গন্ধটা আসতিছে কোনখ্যান থাকি? পাঁঠার গায়ের খোশবাইটা যে নষ্ট করি দিলে!

ললিত : (অসহিষ্ণুভাবে) চুপ করুন পণ্ডিতমশায়! এবার বাঘ কাছিয়ে এসেছে। ওটা বাঘের গায়ের গন্ধ।

পণ্ডিত : কী যে কও ললিত, ব্যাঘ্রের দেহে কখনও অমন বদ্‌গন্ধ হতে পারে? ব্যাঘ্ররে যে একটি ভদ্র জানোয়ার বলেই জানি; মা জগাদম্বার কি নাক নাই? সে বেটি বদ্‌গন্ধ জানোয়ারের পিঠে চড়ি ঘুরে বেড়ায়? তুমি তোমার টর্চো লাইট দিয়ে দ্যাখো — নিশ্চয়ই কোনো কাবুলিওয়ালা পাঁঠা চুরি করতে আসতিছে। ও কাবলিওয়ালার গায়ের গন্ধ। আর ও যদি ব্যাঘ্রই হয়, তবে কাবুলি বাঘ, ও গন্ধ বাংলাদেশের জানোয়ারের গায়ে হয় না।

ললিত : এ তো ভালো বিপদ হল দেখছি। পণ্ডিতমশায়, এবার যদি চুপ না করেন তবে কাপড় দিয়ে আপনার মুখ বাঁধতে হবে।

(অতি নিকটে মাচানের কাছে দু-তিনটে বাঘের ডাক শুনা গেল)

পণ্ডিত : (কাঁপিতে কাঁপিতে) অ-ন-লিত-অ—অ-অ-অ-নলিত, আমারে বাঁধি ফ্যাল—বাঁধি ফ্যালো আমারে—আমারে মা বসুমতী টানতিছে — আমি অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি অনুভব করত্যাছি।

(ইত্যবসরে একটি বাঘ ভীষণ শব্দ করে ছাগলের উপর লাফিয়ে পড়ল। ছাগলটি আর্তনাদ করে উঠল; পণ্ডিতমশায় আর্তনাদ করে মাচান থেকে পড়ে গেলেন। টর্চলাইট, বন্দুকের শব্দ ও মাচান থেকে একজন মানুষ লাফিয়ে পড়তে দেখে বাঘ তো দিলেন চম্পট। সকলে তাড়াতাড়ি মাচান থেকে নেমে এসে দেখলে পণ্ডিতমশায় পাঁঠার গলা জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অনেক কষ্টে পণ্ডিতমশায়ের জ্ঞান ফিলে এল।)

পণ্ডিত : অ— ললিত, বাঘ চলে গেল? বাঘে আমায় খাইয়া ফ্যালায়নি তো? আর, পাইছি-পাইছি, শ্রীমান বোকেন্দ্র-নন্দনেরে পাইছি। বাঘ নিয়ে যাতি পারেনি — দেখলে ললিত, আমার ভয়ে বাঘ তো বাঘ, কাবুলি বাঘও ছুটি পলাইল। এখন কও দি, পাঁঠাটা কার?

ললিত : আজ্ঞে, বামুন পণ্ডিতের নজর লেগেছিল, ও কি আর বাঘে খেতে পারে?

পণ্ডিত : (মাথায় হাত বুলাইয়া) ললিত — আমার টিকি গেল কনে? গুলি করে আমার টিকি উড়াইয়া দিলে? দুর্গা, শ্রীহরি, এ আর কী ব্যাঘ্র শিকার করা! এরে কয় কষ্ট স্বীকার।

শ্রীমন্ত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৩৫

চরিত্র

পুরুষ : শ্রীমন্ত, ধনপতি (শ্রীমন্তের পিতা), সিংহল-সম্রাট, মাঝিগণ ও ক্রীড়াসঙ্গী বালকগণ।

স্ত্রী : ফুল্লরা (শ্রীমন্তের মাতা), দীপালি (সম্রাট-কন্যা), পদ্মা, জগদীশ্বরী ও বড়ো মা

প্রথম দৃশ্য

এই পথটা কাটব
পাথর ছুঁড়ে মারব
এই পথটা কাটব
বঁটি ফেলে মারব
এই কাটলাম, চু—
বউ পালাল বউ পালাল
বিয়ের হাঁড়ি নিয়ে
সে বউকে আনতে যাব
মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে।

[নেপথ্যে সংগীত]

: একী রে, তুই যে আমাদের সাথে খেলছিসনে বড়ো? আমরা কানামাছি খেলছি, আয় তোকে কানামাছি করি।

শ্রীমন্ত : আমি এখন খেলতে পারব না, ভাই, মা পুজো করছেন। আমিও পুজো দেব, তাই স্নান করতে যাচ্ছি।

: ইস! ইয়ের ছেলের আবার পুজো! দেখিস, দেখিস্, ভট্চাজ বামুন না হয়ে যাস।

: ওরে, ও যে সত্যি সত্যি বামুন-ঠাকুরের ছেলে। ওর বাবা বাণিজ্য করতে যাবার এক বছর পরে ও হয়েছে, তা বুঝি জানিস্নে?

: সত্যি?

: মাইরি?

: হ্যাঁ, সেদিন পণ্ডিতমশাই বলছিলেন।

শ্রীমন্ত : আমি এখুনি মাকে বড়োমাকে বলছি গিয়ে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঠাকুরঘরে পূজা করিতেছেন]

ফুল্লরা : সর্বমঙ্গলামঙ্গাল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে॥
মা সর্বমঙ্গালা, আমার জীবনের সর্বস্ব, আমার স্বামীকে ফিরিযে এনে দে মা। [অঞ্জলি]
একী! মায়ের পায়ের ফুল মাটিতে পড়ে পড়ে যায় কেন? আমার দেওয়া পূজাঞ্জলি কেন বারে বারে পায়ে ঠেলে দিচ্ছিস মা? কী অপরাধ করেছি মা ও-রাঙা পায়ে? মা! মা!—

শ্রীমন্ত : মা! মা!

ফুল্লরা : কে? শ্রীমন্ত? তুই স্নান করিসনি এখনও? একী, তুই কাঁদছিস? কী হয়েছে তোর?

শ্রীমন্ত : মা, তুমি পুজো সেরে নাও, তারপর বলছি।

ফুল্লরা : বাবা, মা অম্বিকা আমার পূজা নিলেন না আজ। ওই দেখো, অঞ্জলির ফুল ধুলায় পড়ে। যতবার অঞ্জলি দিয়েছি, ততবারই গেছে পড়ে।

শ্রীমন্ত : মা, আমি অঞ্জলি দিই?

ফুল্লরা : তুই যে এখনও স্নান করিসনি খোকা, তুই পূজার ফুল ছুঁবি?

শ্রীমন্ত : তোমার কোলে উঠতে হলে কি স্নান করতে হয় মা? ছেলের হাতের পুজো মা যে সব সময়ই নেন। তুমি সরো, আমি মায়ের পায়ে পুজো দিই।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

ফুল্লরা : একী! একী তোর মায়া, মহামায়া! এবার তো পূজার ফুল পড়ে গেল না— ছেলের পূজা পেয়ে মা যেন হাসছেন। — বাবা শ্রীমন্ত, মা ভবানীর বরে ওরই দোর ধরে তোকে পেয়েছি, তুই যে মা ভবানীরই ছেলে। তুই কাঁদছিলি, তাই মা বুঝি আমার পূজা নেননি।

শ্রীমন্ত : মা —

ফুল্লরা : বলো বাবা, বলো, কেন কাঁদছিলে? মা-ই তোমার দুঃখ দূর করবেন।

শ্রীমন্ত : মা, আমার বাবা কোথায়? বাবা কেন আসেন না?

ফুল্লরা : তোমাকে সবই বলেছি, সোনামানিক আমার! তিনি বাণিজ্যে গেছেন সিংহলে, তখন তুমি পেটে — সে আজ এক যুগের কথা। তারপর আর কোনো খবর নেই। মা ভবানীই জানেন, উনি এখন কোথায়, কীভাবে আছেন।

শ্রীমন্ত : মা, বাবাকে আমি খুঁজতে যাব, যার তার ছেলে আমায় মন্দ বলে, বলে আমার বাবা নেই। আমার কান্না পায়, আমি সইতে পারিনে। আমি যাবই যাব— আমি বাবাকে ফিরিয়ে আনব, না হয় আমিও আর ফিরব না।

[ছুটিতে ছুটিতে বাহিরে প্রস্থান]

ফুল্লরা : শ্রীমন্ত! শ্রীমন্ত! ওরে শোন—শোন!

[শ্রীমন্তর পিছু পিছু প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[শ্রীমন্ত, ফুল্লরা ও বড়ো মা]

শ্রীমন্ত : মা, বড়োমা, তোমরা দুজনে শোনো — না, না, শোনো নয়, দেখবে এসো, আমার সাথে এসো। গঙ্গার জলে আমার সাতটা ডিঙে—জাহাজের মতো বড়ো! ওকে কী বলে মা, ডিঙে তো?

ফুল্লরা : ওমা! কী হবে গো! ছেলে আমার পাগল হযে গেল নাকি? ছেলে সেই যে কাল সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল, সারাদিনটা তাব দেখা নেই। সকালে এসে বলে কিনা, ভোমরার জলে সপ্তডিঙা ভাসছে! ও মাগো, ছেলেকে কে কী খাওয়ালে গো?

বড়োমা : তুই কী দেখেছিস খোকা? ডিঙে কোথা থেকে এল? — আচ্ছা দেখব এখন গিয়ে, এখন খেযে নে তো কিছু। — ষাট ষাট একদিন একবাত বাছা আমার কোথায না জানি ছিল।

শ্রীমন্ত : মা মা, তোমরা শোনো। আমি সেই যে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলাম, ছুটতে—ছুটতে—ঢুকলাম গিয়ে বনের মধ্যে। সেই বনের তিনজন বুড়ো এসে বললে, বাপু, তুমি কাঁদতে কাঁদতে কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি—সিংহলে। ওর মধ্যে যেটা থুরথুরে নুননুড়ো বুড়ো, সেইটা আমাকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে বললে, আরে বাপরে! সিংহল কি এখানে? সে যে অনেক দূর, নৌকো করে যেতে হয়। তা আমরা তো কারিগর আছি, আমরা তোমায় নৌকো তৈরি করে দেব, তুমি তাইতে চড়ে যেয়ো। তারপর—বুড়োটা কী করলে শুনবে, বড়োমা? বললে, ওর নাকি আমার মতো একটি ছেলে আছে, তার নাম চামচিকে। এ রাম, কী নাম! হ্যাঁ মা, আমি কি চামচিকের মতো দেখতে?

ফুল্লরা : চামচিকে? শুনেছি বিশ্বকর্মার ছেলে চামচিকে। তবে কি বিশ্বকর্মা এসেছিলেন তোর সপ্তডিঙা গড়ে দিতে? নইলে মানুষ কি রাতারাতি সাতটা ডিঙি তৈরি করে দিতে পারে? এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না।

বড়োমা : মা ইচ্ছাময়ী করলে সব হতে পারে, দিদি। তুমি খোকাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও দেখি, আমি মাকে প্রণাম করে আসি।

শ্রীমন্ত : না মা, আমার একটুও খিদে নেই। সেই তিন বুড়োর আর একটা বুড়ো, তার আবার পা পর্যন্ত দাড়ি। আমাকে তার কমণ্ডলুর মতো একটা পাত্র থেকে নিয়ে কী খাওয়ালে। কী যে সুন্দর তার স্বাদ! তা তোমরা কেউ কক্ষনো খাওনি।

ফুল্লরা : ওমা! কী হবে গো! কোন হাড়-হাভাতে বুড়ো-হাবড়া কী যেন খাইয়ে আমার ছেলেকে পাগল করে দিয়েছে গো। ও ঝি! দুব্বলা বলি দুব্বলা, দৌড়ে দেখে আয় তো, ভোমরার জলে নাকি সাতটা ডিঙি ভাসছে?

(গান)

ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
দুখ-পাপ-তাপ-হারিণী ভবানী ॥
কলুষ-রিপু-দানব-জয়ী
জগৎ-মাতা করুণাময়ী
জয় পরমাশক্তি মাতা
ত্রিলোকধারিণী।

চতুর্থ দৃশ্য

[শ্রীমন্ত ও মাঝিরা]

(মাঝির গান)

সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিলেম
গহিন সাগর-জলে
দূরে বসে কাঁদে কে রে—
(কাঁদে) আয়, ফিরে আয় বলে ॥
কার আঁচলের মানিক ওরে
অকূল স্রোতে পড়লি ঝরে রে,
কোন মায়ের কোল খালি করে
এলি রে তুই চলে ॥
দূরে বসে কাঁদে কে রে —
(ঘরে) আয়, ফিরে আয় বলে ॥

১ম মাঝি : মাইয়া আর পোলাপানটা মিল্যা কী কান্দনটাই কান্দল। ওদের চকের পানিতে দরিয়ার পানি যেন দ্বিগুণ হইয়া গেল গিয়া, দেখছনি, মামু?

২য় মাঝি : দেখছিরে বাবা দেখছি। মাঝি-মাল্লার বুক বড়ো শক্ত, এই জাহাজের তক্তার নাগাল শক্ত। নইলে ফাইট্টা চৌচির হইয়া যাইত। মানুষের চক্ষে এত পানি, হায়! — আর কাঁদুম না, ওই একটা পোলাপান, হেও ভাইস্যা চলল দরিয়ার মাঝে! — আমার পোলাপানটারে —, পোলাপানটারে যখন কবর দিতে লইয়া যাই তখন উয়ার মা এই রকম কইরাই কাঁদছিল রে, এই রকম কইরাই কাঁদছিল।

শ্রীমন্ত : মাঝি, সিংহল আর কত দূর? আর যে পারি না, শুধু জল আর জল! কত যুগ যেন আমার মাটির মায়ের পরশ পাইনে! তরি কবে কূলে ভিড়বে?

মাঝি : আইজ্ঞা, দুই-চারদিন সবুর করেন, আমরা এইবার সিংহলের কাছেই চইল্যা আসছি। ওই যে স্যাহের লাহান কালাপানি দেখা যাইছে, হ্যারে কয় কালীদহ — ওইডারে পারাইতে পারলেই কাম সাইর‍্যা ফেলামু। —

(শ্রীমন্তর গান)

মাকে আমার এলাম ছেড়ে
মা অভয়া, মাকে দেখো।
মোর তবে মা কাঁদে যদি
তুমি তাকে ভুলিয়ে রেখো।
মা অভয়া, মাকে দেখো॥
মায়ের যে বুক শূন্য করে
এলাম আমি দেশান্তরে,
শূন্য করে সেই খালি বুক
মহামায়া, তুমি থেকো।
মা অভয়া, মাকে দেখো॥

শ্রীমন্ত : একী! হঠাৎ করে আকাশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে ছেয়ে আসছে কেন? যেন দলে দলে কৃষ্ণ-ঐরাবত মত্ত-মাতঙ্গসম সমুদ্রগর্ভ থেকে এগিয়ে আসছে। তবে কি ঝড় উঠবে?

(ঝড়ের শব্দ)

মাঝি : ওরে, ও পোলা—সামাল! সামাল! হাল চাইপ্‌প্যা ধরবি রে। আরে তুফান উঠছে রে, তুফান উঠছে।—

শ্রীমন্ত : একী ঘোর তাণ্ডব নর্তন। এ কী ঘোর জল-কল্লোল! আমি— (বজ্রপাত)। মেঘ-গর্জনের ঘন ঘন নিনাদে শ্রবণ যেন বধির হয়ে যায়। মধ্যাহ্নে ঘনিয়ে এল অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও ঘন অন্ধকার!

মাঝি : আরে, গেল গেল গেল রে! আর বুঝি নাও রাখন গেল না। পির দয়ালেরে স্মরণ করো, আরে তরি ডুবল রে, তরি ডুবল —।

শ্রীমন্ত : মাগো করুণাময়ী, সর্বমঙ্গলা, তবে আমি আমার পিতার দর্শন পাব না, আমি যে তোরই প্রতীক্ষা করে ছিলাম বাবাকে ফিরিয়ে আনব বলে। মা ইচ্ছাময়ী, তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক — তোর নাম-মাখা কালীদহে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিই —। মা — মা —।

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মা : মা জগদীশ্বরী! তোমার চোখে জল কেন, মা? খেলার পুতুলের মতো খেলা করছ তুমি নির্বিকার তুচ্ছ লোক নিয়ে! তবে তোমার চোখে জল কেন, শঙ্করী?

জগদীশ্বরী : ওরে পদ্মা, দুঃখ দেওয়ার কী যে দুঃখ, তা তো তোরা বুঝলিনে! যে মা শাসন করার জন্য বুকের ছেলেকে আঘাত করে, সেই মা-ই জানে যে, যে আঘাত সে ছেলের বুকে হানে, সেই আঘাত শতগুণ তীব্র হয়ে এসে বাজে মায়েরই বুকে। ছেলেকে নির্মল করার জন্য মা যখন তাকে ঘসে, মাজে, ছেলে তখন কাঁদতে থাকে, — মনে করে এ মায়ের উৎপাত। সেই ছেলেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মা যখন কোলে নিয়ে চুমু দেন, তখন

তার শোভা দেখেছিস ? ওই শোন ভক্ত শ্রীমন্ত আমায় ডাকছে। ও যখন মা মা বলে ডাকে, তখন চোখের জল আর রাখা যায় না। চল — ওকে কালীদহে 'কমলে-কামিনী' রূপে দেখা দিই।

ষষ্ঠ দৃশ্য

শ্রীমন্ত : একী, মা মহামায়া! এ কী তোর মায়া? পায়ের নীচে মাটি এল কোত্থেকে ? এ যে বালুচর! কোথায় গেল সেই ঝড় — কোথায় গেল সেই আকাশ-অন্ধকরা মেঘ ? — নির্মল আকাশে সূর্য হাসছে মায়ের কোলে হাসিমুখ ছেলের মতো —। একী অপরূপ। — একী স্বপ্ন ? কোটি কোটি প্রস্ফুটিত কমলের দলে কে ও অপরূপা বামা কমলবাহিনী ? কমল-আসন, কমল-নয়ন, কমল-বরনা! চরণে কোটি রক্ত-কমলের শোভা! — এ কী ভীষণ খেলা — এক হস্তে হস্তী ধরে গ্রাস করে বামা, আর হস্তে — আহা! রূপ হেরে নয়ন ভরেছে দ্যাখো! —

সপ্তম দৃশ্য

(সিংহলে — অন্ধকার কারাগৃহ)

ধনপতি : মাগো! মা সর্বমঙ্গলা, মা সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী চণ্ডীকে, — আর কতকাল এই অন্ধকূপে ফেলে রাখবি মা ? তোকে নিশিদিন ডেকেও তো আমার মুক্তি হল না। কোথায় আমার ফুল্লরা, কোথায় ললনা ? ফুল্লরার ছিল সন্তান-সম্ভাবনা। তার কোল আলো করে কে এসেছে ? ছেলে না মেয়ে ? — আহা! যদি ছেলে হয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই ফুল্লরার মতোই সুন্দর হয়েছে। সে এখন কত বড়ো হয়েছে ? সে কি তার বাবাকে স্মরণ করে ? আমি এই বহুদূর কারাগারে থেকেও শুনতে পাই, কে যেন নিশিদিন ডাকছে, বাবা — বাবা — আমি আসছি তোমার বন্ধন মোচন করতে। না না না — ও আমার আত্মার আহ্বান নয়, ও বুঝি আমার আত্মার ক্রন্দন! তবু, কেন যেন আমার ধমনীতে, আমার হৃৎপিণ্ডের মাঝে শুনতে পাই সেই দুরন্ত শিশুর পায়ের ধ্বনি। — হ্যাঁ আসছে, আসছে ওই যে আসছে।

দীপালি : বাবা!

ধনপতি : কে! কে! কে তুই, ওরে তুই কে, বাবা বলে ডাকছিস ?

দীপালি : আমি দীপালি। সিংহলের মেয়ে আমি, তোমায় রোজ লুকিয়ে দেখতে আসি।

ধনপতি : হুঁ! মা তুমি ? আঃ, তুমি এখানে রোজ আস ? কারাধ্যক্ষ যদি দেখে, তোমার কী শাস্তি হবে জানো ?

দীপালি : জানি, তাকে আমি ভয় করি না — আসুক সে।

ধনপতি : হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, মা। ভয় কোরো না, আঁধারের প্রহরীকে ভয় কোরো না। তুমি দীপালি, আলোর মেয়ে, অন্ধকারের রক্ষীরাই করবে তোমাকে ভয়।— দীপালি-দীপালি — আলোর উৎস — মায়ের পূজায় আমরা করি দীপালি-উৎসব। দীপালি এল, কিন্তু মা কই?

দীপালি : তোমায আমি বাবা বলে ডাকব। আজ থেকে তুমি আমার ছেলে হলে।— আজকে কী হয়েছে জান, বাবা? আমার কেবলই কান্না পাচ্ছে সেকথা মনে করে।

ধনপতি : কেন মা লক্ষ্মী? কী হযেছে বলো তো?

দীপালি : চমৎকার সুন্দর রাজপুত্রের মতো চেহারার এক কিশোরকুমার সপ্তডিঙা নিয়ে আমাদের সিংহলে এসেছিল বাণিজ্য করতে, সে রাজাকে এসে বলে, কালীদহে সে কমলে-কামিনী দেখেছে —। সম্রাটকে সে তা দেখাতে না পারায় সম্রাট তাকে বধ করার আদেশ দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় তাকে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।

ধনপতি : হায়! কার হতভাগ্য কুমার। কী সর্বনাশা ওই কালীদহ!

দীপালি : আচ্ছা বাবা,— এক একটা লোক দেখতে এমন অপরূপ যে, তাদের দেখবার পর থেকেই মন যেন কান্নায় ভরে ওঠে। তাকে মনে করে কেবলই কাঁদতে ইচ্ছা করে। কেন এমন হয়?

(কারাগৃহের বাইরে হঠাৎ বহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে এবং বহুলোক আনন্দ-ধ্বনি করিতে করিতে ক্রমশ কারাগৃহের দ্বারপ্রান্তের নিকট আসিতেছে।)

শ্রীমন্ত : মুক্তি, মুক্তি! সমস্ত বন্দি আজ মুক্ত। সম্রাটের আদেশে সকল বন্দী আজ মুক্ত।

দীপালি : ওই আসছেন বাবা, না না সম্রাট! সম্রাটের সাথে সেই কিশোরকুমার — আমি এখন কোথায় লুকাই?

ধনপতি : মুক্তি! মুক্তি! জয় মা দুর্গে, জয় মা চণ্ডিকে, সর্ব-বিপত্তারিণী নারায়ণী, মুক্তি দাও — আলো দাও।

সম্রাট : তাই দিতে এসেছি, ধনপতি! শুধু মুক্তি নয়, বন্ধু! তার সাথে এনেছি বন্ধন — তোমার সারাজীবনের বন্ধন। — এই কুমারকে চেনো, বন্ধু?—একি! একপাশে কে এমন করে দাঁড়িয়ে? — দীপালি? — তুমি এখানে কেমন করে এলে মা? — ধনপতি, এই তোমার দেবাশ্রিত পুত্র শ্রীমন্ত, আর এই আমার কন্যা, সিংহলের রাজলক্ষ্মী দীপালি। এই দুইজনকে দক্ষিণা দিয়ে তোমায় দিলাম মুক্তি।

শ্রীমন্ত : বাবা, বাবা, তুমি বাইরে এসো, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না এই অন্ধকারে। বেরিয়ে এসো এই অন্ধ-কারার বাইরে!

ধনপতি : আলো, আলো, আলো! কই মা, দীপালি? আয় মা, আয় — চাইনে — ওরে চাইনে আর আলো— আমার দুই চক্ষের দুই মানিক ফিরে পেয়েছি। এই আমার দীপালি — দীপালি।

সম্রাট : শোনো ধনপতি, তোমার দেবাশ্রিত পুত্র শ্রীমন্তকে বধ করবার আদেশ দিয়েছিলাম তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে, সে কমলে-কামিনী দেখাতে পারেনি বলে। ওকে মঞ্চের যূপকাষ্ঠে রাখা মাত্র এল ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পৃথিবী টলতে লাগল, আমার কোটাল সৈন্যসামন্ত সকলেরই হল মৃত্যু। তোমার নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয় কুমার কেবলই ডাকছিল মা মা বলে। — সহসা দেখলাম অন্তরীক্ষে কালীদহ। সেই আকাশ-গাঙে কোটি কোটি বিকশিত কমলের দলে দেখলাম, শতদল-বিহারিণী অপরূপ কামিনী-মূর্তি — গণেশ-জননী। পরমেশ্বরীকে, যোগমায়াকে চর্মচক্ষে দেখতে পেয়ে ধন্য হলাম, মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেলাম তোমার এই ভক্তপুত্রের প্রসাদে। — আমার মুক্তির সাথে সাথে দিলাম সকলকে মুক্তি! — আজই তোমরা যাত্রা করো তোমাদের সজল-শ্যামল বাংলাদেশে— আর সাথে নিয়ে যাও আমার আত্মসমা কন্যা দীপালিকে। — মুক্তি! মুক্তি — জয় শ্রীদুর্গা, সর্বমুক্তিদায়িনী, জয় জয় শ্রীদুর্গা।

(মুক্ত বন্দিগণ ও অন্যান্য সকলের সমবেত সংগীত)

জয় দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী!
ভব-বন্ধন পাপ-তাপ-হরা
সব শোক দুঃখ ব্যথা শীতল-করা
জয় অভয়া, শুভদা, শিব-স্বয়ংবরা॥
জয় জননীরূপা চির-সুমঙ্গলা
জয় দুর্গা, জয় দুর্গা, জয় দুর্গা॥

প্ল্যানচেট

প্রথম প্রচার
আগাস্ট ১৯৩৬

কলেজের ছাত্র প্রমথনাথ পরলোকতত্ত্বের গবেষণা করেন। রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে এই গবেষণার বৈঠক বসে।

প্রমথনাথের মেজবউদি : কী গো শ্রীমান, একলা একলা যে? প্রমথনাথের আর সব প্রমথগুলি কোথায় আজ? আচ্ছা ঠাকুরপো, রোজ সন্ধের সময় তোমরা তিন-চারটি বন্ধু মিলে চিলেঘরটাতে চিৎকার করে ঘন্টার পর ঘন্টা কী কর বলো তো?

প্রমথনাথ : ও তুমি বুঝি প্ল্যানচেটের কথা বলছ বউদি?

মেজবউদি : প্ল্যানচিট : ও-তো ইংরেজি কথা। প্ল্যান মানে মতলব আর চিট মানে ঠকানো। ও! তোমরা লোক-ঠকানোর মতলব করেছ?

প্রমথনাথ : (ঈষৎ হাসিয়া) না গো না, তা নয়। প্ল্যানচিট নয়, প্ল্যানচেট। সেটা কী জান? একখানা তেপায়া টেবিল সামনে নিয়ে তিন-চারজনে মিলে অন্ধকার ঘরে বসে কোনো মৃত আত্মাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে হয়। বেশ একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে পারলে সেই মৃত আত্মার আবির্ভাব দিব্য অনুভব করা যায়। তাঁদের আবাহন করে তাঁদের সঙ্গো আমরা কথা কই। এইভাবে বহু মৃত মহাত্মা এসে আমাদের সঙ্গো কথা কয়ে যান।

মেজবউদি : তোমাদের কল্যাণে মহাত্মারা বর্তমানেই তাহলে ভূত হয়েছেন? তা এই মহাত্মাদের কি আমরা একদিন দেখতে পাই না ঠাকুরপো? হায় হায়, ঠাকুরপো — কলেজে পড়ে তোমাদের বিদ্যে শেষ পর্যন্ত ভূতেদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তা বেশ হয়েছে। আমাদের একদিন দেখাবে না ভাই?

প্রমথনাথ : বেশ তো! কালই দেখাতে পারি। কাল অমাবস্যা আছে; ভূত-পেতনিদের অভিসার রাত্রি। তুমি তাহলে আর সব বউদিদের বলে ঠিক করে রেখো। আগামীকাল অমাবস্যার রাত্রে — কেমন, মনে থাকবে তো?

মেজবউদি : হুঁ।

প্রমথনাথ : হা, হা। কাল রাত্রি আসবার আগেই হয়তো তোমরা যে যার বাবার বাড়ি গিয়ে উঠবে।

মেজবউদি : না গো না! সে ভয় তোমার করতে হবে না। তোমাদের ভূতের দলই না উধাও হয় তাদের প্ল্যান কি চিটের রহস্য ধরা পড়ার ভয়ে! দ্যাখো ঠাকুরপো, এক কাজ করি।

প্রমথনাথ : বলো?

মেজবউদি : তোমার বোনেদেরও খবর দিয়ে রাখি। তারাও এসে তাদের ভাইয়ের সাহস দেখে যাবে।

প্রমথনাথ : লক্ষ্মীটি বউদি! ওইটি কোরো না ভাই। তারা মাটির মানুষ; মানুষের মতো এইভাবে ভূতের ঝগড়াঝাঁটি—হুঁঃ পেতনিরা নাকি তাদের স্বজাতি মানুষ —

মেজবউদি : আচ্ছা গো আচ্ছা! তোমার বোনেদের না হয় রেহাই দিলাম। তুমি কিন্তু তোমার সঙ্গী ভূতদের Information করে রেখো। তারা যেন আসতে ভুল না করে।

প্রমথনাথ : আচ্ছা গো আচ্ছা! আমি এখন থেকেই প্রমথনাথের সাধনায় প্রবৃত্ত হই —

(গান)

জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ংকর;
ভৈরব শ্মশানচারী শিব প্রমথনাথ শংকর।
ভয়াল করাল দানব এসো পরিহারো মানব
ধূর্জটি রুদ্র মহেশ, জয় জয় শিব শংকর॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বিতীয় দিন; অমাবস্যার রাত্রি। চিলের ছাদে নির্জন অন্ধকার কক্ষে তিন বউদি তিনটি চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছোটো তেপায়া টেবিল। পুরুষ-প্রকৃতির অসীম সাহসিকা মেজবউদি তাদের লিডার॥

প্রমথনাথ : আচ্ছা বউদিরা, তোমরা এবার চোখ বুজে সামনের টেবিলে বেশ করে হাত ঘষতে থাকো। হ্যাঁ, আর আমি যে যে ভূতদের ডাকব তাদের কথা মনে মনে ভাবতে থাকো, কেমন? প্রস্তুত?

মেজবউদি : হ্যাঁ, প্রস্তুত।

ছোটোবউদি : ছোটোদি, আমার কিন্তু ভয় করছে। সত্যি সত্যি ভূত আছে তাহলে?

মেজবউদি : তুই চুপ কর ছোটোবউ। ভয় পেয়ে তুই আমাদের নাম ডোবাবি দেখছি। আমার আঁচল ধরে থাক।

বড়বউদি : তা যাই বল মেজবউ! আমারও কিন্তু গা ছমছম করছে।

প্রমথনাথ : এবার তাহলে আমি ভূতেদের ডাকি। সব প্রস্তুত হও আর হাত ঘষো। ঘষো বেশ করে ঘষো। আমি ডাকছি —

(ছড়ায়)

কই বাবা ভূত পেতনি এসো
চোখে দেখা দাও হে;
শুটকো, মুটকো, বিকট, ভীষণ
নানান মূর্তি লয়ে।
নাকি সুরে কও কথা যে

থাক শ্যাওড়া গাছে ;
সেই পেতনির রূপ ঘেঁষে সব
বসো বউদিদের কাছে।
শাল বৃক্ষে একানর — নর বঙ্গো এসো
বেল বৃক্ষের ব্রহ্মদৈত্য— একানরের মেসো
তুমিও সাথে এসো।
ডাকিনী যোগিনী এসো — উড়ে শ্মশান থেকে
দাও তোমাদের রং বউদিদের
ওই চাঁদ বদনে মেখে!
ভূত পেতনি সবাই মিলে বউদিদের ধরো
বেশি নয় তোমরা এসো গোটা বারো তেরো॥

ছোটোবউদি : দ্যাখো দ্যাখো, আমার ভয় করছে বড়দি।

বড়োবউদি : মেজোবউ! আমারও ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে।

মেজোবউদি : কই ঠাকুরপো! তুমি ছাড়া তোমার কোনো ভূতই তো দেখলাম না। হ্যাঁ, তবে বাইরে তোমার জনকয়েক ভূত-বন্ধুদের নাকি সুরে Chorus শুনছি বটে।

প্রমথনাথ : ব্যাস, আমার মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। এবার ভূত দেখবে। তোমরা সবাই হাত ঘষেছিলে তো টেবিলে?

বড়োবউদি : ঘষে ঘষে ফোস্কা পড়ে গেল ঠাকুরপো।

প্রমথনাথ : আচ্ছা, আর ঘষতে হবে না। এবার শোনো। দু-হাতে বেশ করে যে যার মুখ চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গো। এসো — আচ্ছা এইবার আয়নার সামনে দাঁড়াও। আচ্ছা, আমি ওয়ান, টু, থ্রি — বললে একসঙ্গো চোখ চাইবে। ওয়ান-টু-থ্রি।

ছোটোবউদি : ও মাগো! ওই আয়নার ভেতরে কে গো?

বড়োবউদি : ও মেজোবউ!

মেজোবউদি : হুঁ, ঠাকুরপো আমাদের চোখেই দেখিয়েছে। তবে এসব ভূত আর কেউ নয়, আমরাই তিন জন।

বড়োবউদি : তার মানে?

মেজোবউদি : ঘরের আলোটা জ্বালো — তাহলেই বুঝতে পারবে। ওগো, যে টেবিলে আমরা হাত ঘষছিলাম সে টেবিলে শ্রীমান বেশ করে ভুসো মাখিয়ে রেখেছিল। আমরা অন্ধকারে তাতেই হাত ঘষে যে যার মুখে বেশ করে মেখে বেরিয়েছি।

বড়োবউদি : ওমা! ঠাকুরপো আমাদের মুখে কালি দিলে!

প্রমথনাথ : শুধু কালি নয় বউদি — চুন-কালি। দ্যাখো না মেজোবউদির কালি মাখা মুখ কী রকম চুন করে আছে।

মেজোবউদি : আচ্ছা — দ্যাখো, মজা টের পাবে এখন।

ঈদল ফেতর

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৩৬

(গান)

ফকির : ফুরিয়ে এল রমজানেরই মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস।
রোজা রেখেছিলি হে পরহেজগার[১] মোমিন
ভুলেছিলি দুনিয়াদারি রোজার তিরিশ দিন।
তরক্[২] করেছিলি তোরা কে কে ভোগ বিলাস।
সারা বছর গোনাহ্[৩] যত ছিল রে জমা
রোজা রেখে খোদার কাছে পেলি কে ক্ষমা।
ফেরেশতা সব সালাম করে কহিছে সাবাশ॥

জমিদার : ইমতাজ! ইমতাজ রে!

ইমতাজ : হুজু-হুজু-হুজুর!

জমিদার : কোন বেতমিজ[৪] এসে দলিজের[৫] সামনে গোলমাল করছে রে? রোজা রেখে ভুখ-পিয়াসে একে আমার জান ফেটে যাচ্ছে, তার উপর কানের গোড়ায় এই চিৎকার!

ইমতাজ : হ্যাঁ, হুজুর, মোস-মোস-মোস-মুসাফির হুজুর! কান ধইর‍্যা খ্যাদ-খ্যাদ-খ্যাদাইয়া দিমু।

ফকির . হুজুর তো প্রাণ ধরে কিছুই দিলেন না। তুমি আবার তার উপর কান ধরতে এলে বাবা!

ইমতাজ : হুজু-হুজু-হুজুর! বলাদর সেই ফকিরটা আইছে।

জমিদার : আরে, ও কী চায় জিজ্ঞাস কর না বেটা তোতলার ডিম।

ফকির : বাবা! আসছে কাল ঈদ; তাই আমি আগাম আরজি পেশ করে গেলাম। তুমি গরিব পারোয়ার[৬] জমিদার, কাল ঈদের দিনে যে ফেতরা[৭] দেবে — তাতে যেন এই ফকিরের কিছুটা থাকে।

জমিদার : শা সাহেব, তুমি এ দেশে নতুন এসেছ। তাই তুমি জান না যে আমি ফেতরা, সাদকা[৮] বা জাকাত[৯] দিই না। নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, ব্যাস।

ফকির : সে কী বাবা! তুমি ফিতরা দাও না? এ যে নামাজ পড়া রোজা রাখার মতোই খোদার হুকুম, নবিজির আদেশ বাবা! ঈদের দিনে দান না করলে যে রোজাই কবুল হয় না।

জমিদার : শা সাহেব! আমি জুনিয়র মাদ্রাসায় তিন বছর পড়লুম — আর তুমি পথের ভিখিরি এসেছ আমায় হাদিস[১০] বাতলাতে? খোদার আর নবির

১ সংযমী ধার্মিক। ২ পরিত্যাগ। ৩ পাপ। ৪ অশিষ্ট। ৫ বৈঠকখানা। ৬ পালনকারী। ৭,৮ খুশির দান। ৯ সঞ্চিত সম্পদের দাতব্য অংশ। ১০ হজরত-নির্দেশিকা।

সব হুকুম পালন করতে হলে আমাকে আর জমিদারি চালাতে হত না। তোমাদের সাথে ভিখ মাঙ্গা ফকির হয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হত — জান? ইমতাজ!

ইমতাজ : হুজু-হুজু-হুজুর।

জমিদার : শা সাহেবকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দে।

ফকির : আমি যাচ্ছি — আমি যাচ্ছি — আমি যাচ্ছি বাবা। কিন্তু খোদার পাওনা খোদা আদায় করে নেবেনই এ জেনে রেখ।

জমিদার : আচ্ছা, তা খোদার পাওনা খোদাই নেবেন — তুমি কেন তা আদায় করতে এসেছ বাবা? তুমি কি খোদার গোমস্তা?

ফকির : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাঁর হুকুমেই বলছি বাবা। তা তুমি তাহলে গরিবদের জাকাত দেবে না?

জমিদার : যেদিন আমার ধন দৌলত জমা হয়ে এত উঁচু হবে যে তার উপর দাঁড়িয়ে আমি মক্কা মদিনা দেখতে পাব, সেইদিনই দেব দান্‌খয়রাত — তার আগে না, বুঝেছ?

ফকির : আচ্ছা বাবা, তা এক কাজ করো না — আমি আমার এই ঝুলি থেকে এক মুষ্টি চাল তোমায় দিচ্ছি, তুমি তাই হাতে করে কাল কোনো গরিবকে দিয়ো।

জমিদার : তাতে কী হবে?

ফকির : তাতে এই হবে, যে তোমার কঞ্জুষ হাত দরাজ হবে, এই ভিক্ষা দিয়ে তুমি নেবে খয়রাত দেওয়ার প্রথম সোবদ।

জমিদার : আচ্ছা বাবা, আচ্ছা যাও। তুমি এখন ভাগো, ভাগো, ভাগো।

ফকির : আচ্ছা বাবা আচ্ছা; আমি ভাগছি, আমি ভাগছি। কিন্তু দীনদরিদ্রকে তোমার দৌলতের ভাগ দিতেই হবে — এ যে খোদার হুকুম। (প্রস্থান)

জমিদার : ব্যাটা ধড়িবাজ! তুমি এমনি করে আমায় খয়রাতের অভ্যেস করিয়ে দিতে চাও? বাঁধা হাত ছাড়া পেলে কি আর কিছু থাকবে? মোল্লার দাড়ি তাবিজ বাঁধতেই ফুরিয়ে যাবে। ওরে ইমতাজ! ইমতাজ!

ইমতাজ : হু-হুজু-হুজুর!

জমিদার : ব্যাটা গেছে? একে রোজার আখরি ওয়াক্তে[১] আধমরা হয়ে আছি ভুখে পিয়াসে — তার উপর ব্যাটা আধঘণ্টা ধরে বকিয়ে গেল। হে-আল্লা! কী রোদ — ইমতাজ, রোজার এই শেষ দিনটা যে আর যেতে চায় না রে! দেখে আয় না, সুরজটা আর ডুবতে কত বাকি?

ইমতাজ : হু-হু-হুজুর, এই তো আষ্টবার দেইখ্যা আইলাম। সূরজটা হই-ই-ই-ইম্‌লি গাছের ডগায় রইছে।

জমিদার : ব্যাটা কুঁড়ের বাদ্‌শা। ঘর থেকেই বলছেন ইমলি গাছের ডগায় রইছে। যা — আর একবার দেখে আয়, সুরজটা কি তোর মতো কুঁড়ে যে এক

১ শেষ বেলায়।

জায়গায় বসে থাকবে?

ইমতাজ : আ-আচ্ছা, যা-যাই-যাইতাছি।

জমিদার : হে আল্লা। সুরজটাকে তাড়াতাড়ি ডোবাও।

ইমতাজ : হু-হুজুর, সুরজটা অহনও ইমলি গাছের ড-ডগায় ঠেই-ঠেই-ঠেইক্যা রইছে।

জমিদার : বলিস কী রে? আজ সুরজটার হল কী? যা যা, গাছে উঠে দ্যাখ দিকিনি। গাছের ডালে আটকে-মাটকে যায়নি তো?

ইম্‌তাজ : হু-হুজুর! মুহ ল্যাং-ল্যাং-ল্যাংড়া; গাছে উঠুম কেমন ক-ক-কইর‍্যা?

জমিদার : আরে ব্যাটা, একটা বাঁশ নিয়ে খুঁচিয়ে দ্যাখ না।

ইমতাজ : অ ব-বদ-বদনার মাইয়ো — ও বদনার মাইয়ো আরে একটা বঁ-বাঁশ লইয়া আয় তো। আজ সুরজটারে খোঁচ-খোঁচ-খোঁচাইমু।

(দৃশ্যান্তর)

পথচারীরা : ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক।

(সমবেত কণ্ঠে গান)

ঈদের খুশির তুফানে আজ ডাকল কোটাল বান।
এই তুফানে ডুবুডুবু জমিন ও আশমান।
ঈদের চাঁদের পানসি ছেড়ে বেহেস্ত হতে
কে পাঠাল এত খুশি দুখের জগাতে
(শোন) ঈদগাহ হতে ভেসে আসে তাহারই আজান॥

ইমতাজ ওই ওই পোলাপান! তোরা আমাগোর হুজুরের পোলা — ওই যে শাহাজাদারে দেখছস?

একটি বালক শাহাজাদা? হুজুরের ছেলে? তাকে ওই পিরপুকুরে গোসল[১] করতে দেখেছি। আমরা উঠে এলাম — তারপর আর জানিনে।

ইম্‌তাজ অ্যাঁ! স-স-সর্বনাশ হইছে। হায়, হায় হায়, হায়, আমি কীসের লাইগ্যা তারে ওইখানে রাইখ্যা চইল্যা আসলাম? আমি কীসের লাইগ্যা চইল্যা আসলাম? এখন আমি কী কইমু? হুজুরেরে কী কইমু? এ-এই যে বদনার মাইয়ো, বদনার মাইয়ো — ওই শাহাজাদা বাড়িতে ফিরছে? দেখছস তারে?

বদনার মা শাহাজাদা বাড়ি ফিরবে কী করে রে মুখপোড়া? তুই যে তাকে গোসল করাতে নিয়ে এলি — তোদের ফিরতে দেরি দেখে বেগম সাহেব পাঠিয়ে দিলেন দেখতে।

ইমতাজ অ্যাঁ! ব-বদনার মাইয়ো, কী হইব? আরে তারে যে আমি পা-পা

---
১ স্নান।

পাইতেছি না। আরে তারে আমি পুকুরঘাটে বসাইয়া বাড়িতে গেছিলাম। আ-আ-আইসা দেখি সে আর নাই।

বদনার মা : হায় আল্লা! এ কী হল? আমি দৌড়ে গিয়ে হুজুরকে খবর দি। ওই যে হুজুর আসছেন। হুজুর! হুজুর! শাহাজাদা পুকুরে গোসল করতে গিয়ে ডুবে গ্যাছে।

জমিদার : অ্যাঁ! কী-কী-কী বললি? খোকা ডুবে গ্যাছে? ওরে, ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! ওরে ঝাঁপিয়ে পড় পুকুরের পানিতে, ওরে জেলেদের খবর দে জাল আনতে ; হে আল্লা। ঈদের দিনে তুমি এ কী করলে? খোকা! খোকা! একবার উঠে আয়। ওই শোন ঈদের তকবির[১]!

(ফকিরের গান)

প্রাণের প্রিয়তম যাহা কিছু তোমার
খোদার রাহে ফিতরা দে
আজি ঈদের চাঁদে॥

জমিদার : শা সাহেব! শা সাহেব! তোমারই বরদোয়ায়[২] বুঝি আমার মানিক হারিয়েছি এই পুকুরের পানিতে। ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার শাহাজাদাকে, আমার খোকাকে, আমার খানদানের ওই একটিমাত্র চেরাগ[৩], আমার একমাত্র সন্তান —

ফকির : আহা-হা-হা! কী কর, কী কর। পা ছাড়ো বাবা পা ছাড়ো। খোদার কাছে চাও, তিনি ছাড়া কেউ কিছুই তো দিতে পারে না বাবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ — কাল দেখছিলাম বটে— তোমারই দেয়ালদির সামনে গোলাপ ফুলের মতো টুকটুকে একটি ছেলে। সেইটিই কী —

জমিদার : হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা, সেই ; শা সাহেব, আমি খোদাকে কোনোদিন ডাকিনি, শুধু ডাকবার ভান করেছি মাত্র, তবু খোদা আমায় সকল নিয়ামত[৪] দিয়েছেন। আমি পাপী, তাই বুঝি তিনি সব ফিরিয়ে নিলেন। তুমি আউলিয়া, সত্যকার খোদার বান্দা — তুমি দোয়া করো, তাহলেই আমি আমার হারানো মানিক ফিরে পাব।

ফকির : বাবা তুমি খোদার দানের মর্যাদা রাখতে পারনি। শুধু গ্রহণই করেছ, তাঁর নামে রাহেলিল্লাহ্[৫] কখনও একটা কানাকড়িও দাওনি! তাই খোদা তাঁর পাওনা তিনি আদায় করে নিলেন। তোমার ধনদৌলত যা তুমি জিনের মতো দিনরাত আগলে পড়ে আছ — তার তো এক কণাও খোকা সাথে নিয়ে যায়নি। এখন বরং তোমার খরচ অনেক কমে গেল। ধন, দৌলত তোমার আরও বেড়ে যাবে। আর হয়তো তার উপর দাঁড়িয়ে তুমি মক্কা-মদিনাও দেখতে পাবে।

জমিদার : ফকির, রক্ষা করো! রক্ষা করো! রক্ষা করো! আজ ঈদের দিনে

১ আল্লাহু আকবর ধ্বনি। ২ অভিশাপ। ৩ প্রদীপ। ৪ সৌভাগ্য। ৫ আল্লার উদ্দেশে।

আমার বাড়িতে কারবালার মাতম উঠেছে — আমি মাপ চাচ্ছি খোদার কাছে, তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি। আমি আল্লাতালার পাক[১] নাম নিয়ে আজ এই ঈদের দিনে কসম করে বলছি, আমার সমস্ত জামিদারি রাহেলিল্লা গরিবদের জন্য ওয়াকফ[২] করে গেলাম। আমার শাহাজাদাকে ফিরিয়ে দাও, আমি তাকে নিয়ে ভিক্ষে করে খাব।

ফকির : আচ্ছা বাবা যাও; বাড়িতে গিয়ে দেখবে তোমার খোকা ফিরে এসেছে। কিন্তু বাবা, আর কোনোদিন খোদাকে ফাঁকি দিতে চেয়ো না — তাহলে এর চেয়েও ভীষণ শাস্তি পেতে হবে।

জমিদার : শাহজাদা! খোকা! খোকা! ফিরে আয়, ফিরে আয়।

বদনার মা : হুজুর! হুজুর! দৌড়ে আসুন — শাহজাদা ফিরে এসেছে। এক ফকির তাকে বাড়ি দিয়ে গেল।

জমিদার : ওরে না, না, বাড়িতে নয়, বাড়িতে নয় — ঈদগাহে! ওই শোন ওই শোন তকবিরের আওয়াজ; ওরে খোকাকে নিয়ে আয় ঈদগাহে, খোদার রাহে ওকে আমি সাদকা দেব, সাদকা দেব।

১ পবিত্র। ২ ধর্ম বা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান।

Radharani

ঠুংরী – দাদ্‌রা:

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই . এত কাছে পাই তবু এ হিয়া
কি যেন অভাব কহে॥
বারেবারে মোরা ও সে ভুবনে আসি'
পেয়িয়া নিমেষে দুই বাহে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
কেন চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥
আমরা ভুমি গো বাঁধিনা ঘর
অভিশাপ বিনিকার,
শুধু চোখে থাকি কেঁদে কেঁদে ডাকি
চাঁদ আর পারাবার।
মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটী হায়
শতবার যোগে শতবার ঝরে যায়,
আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়
মাঝে অপারে যমুনা বহে॥

'জন্মাষ্টমী' রেকর্ড নাটিকা (হিন্দি)

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৩৮

(প্রথম ভাগ)

মাযার গান

সোজা সোজা সোজা জাগ নরনারী
বাদল গ্যার‍্যজো বিজলি চ্যম্যকো
র‍্যজ্যনী হোর অঁধিয়ারী॥

দেবকী : নাথ। দেখো ক্যয়সা সুন্দর ব্যচ্চা হ্যয়।

দেবকন্যাদের গীত

আও আও স্যজনি
ম্যঙ্গাল গাও শঙ্খ বাজাও
স্যফ্যল মানো র‍্যজনি॥
অ্যম্যর লোক সে কুসুম গিরাও
তীন লোক মে ম্যর‍্যব ম্যনাও
হঁস্যতী আজ ধরণি॥

দেবদেবীগণ : ধ্যন্য হো ব্যসুদেও।
ধ্যান্য হো দেওকী।

দেবকী : সোয়ামী, ইস্ ব্যচ্চেকা জন্ম হোনে প্যর দেওয়া যাঁ গীত গা র‍্যহী হ্যঁয়, দেওতা খুশি ম্যনা র‍্যহে হ্যঁয়! ইসে ব্যচাও, ইসে ক্যন্সকে হাথ্মে ন্য দো! মাতা হোক্যর ম্যয় ইসে ম্যওৎ কো স্যঁওপ ন্য শ্যকন্ঙী।

বসুদেব : দেওকী, দেবী, ইস ব্যচ্চেকী ম্যমতা ছোড় দো, ইসকে বিনাশকে লিয়ে হী হ্যম কারাগার মে র‍্যাখ্যে গ্যায়ে হ্যয়।

দেবকী : কেয়া কোই উপায় ন্যহী হ্যয়। হে আকাশমে র‍্যহনেওয়ালে দেবী দেওতা, মেরী প্রার্থনা শুনো, মেরে ব্যচ্চে কো বাচাও, মেরী ব্যচ্চে কো রক্ষা ক্যরো।

দৈববাণী : দেওকী! ন্য ঘ্যবড়াও। বসুদেও, তুম ইস ব্যচ্চেকো লেক্যর অভি গোকুলমে চ্যলে যাও, অ্যওর নন্দকে ঘ্যরমে এক ল্যড়কিকা জন্ম হুয়া হ্যয়, উসে য়হাঁ লাক্যর র‍্যখ দো, মায়াকে প্রভাওসে সারা জাগৎ শো র‍্যহা হ্যয়, কোই বাধা তুমহারে সামনে ন্যহী আয়েগি।

দেবকী : নাথ, ভ্যগওয়ান আকাশবাণী দোয়ারা হামে রাহ্ দিখা র‍্যহে হ্যঁয়, তুম ইস্ ব্যচ্চেকো লেক্যর অভী গোকুলমে চ্যলে যাও, মেরে ব্যচ্চেকো ব্যচাও।

বসুদেব : ওফ, ক্যয়সী অঁধিয়ারী হ্যয়! ম্যয় ইয়ে ন্যদী পার হোক্যর ক্যয়সে যাঁউ, ক্যয়সে ভয়ানক বাদল গ্যার‍্যজ র‍্যহে হ্যঁয়, বিজলি চ্যম্যক র‍্যাহী

দৈববাণী : ব্যসুদেও। ন্য ঘ্যবড়াও, ইয়ে মায়া — স্যর্প, ব্যর‍্যসতে হুয়ে পানীসে তুমহে ব্যচানেকে লিয়ে আয়া হ্যয়। বিজলি চ্যম্যক র‍্যহী হায় তুমহে রাহ্ দিখানে কে কিয়ে, মায়া এক জানওর কা রূপ ধ্যর ক্যর ন্যদী পার হো র‍্যহী হ্যয়, তুম উস্কে সাথ লো, কোই বিপ্যত্তি তুমহারে সামনে ন্যহী আয়েগি।

বসুদেব : মুঝে রাহ্ দিখানেওয়ালে আকাশকে দেওতা, তিমহে অসঙ্খ প্রণাম।

(দ্বিতীয় ভাগ)

ব্রজের রাজপথ

বসন্ত ও সুন্দর

বস্যান্ত : আজি আজ ইয়ে সারি বৃজভূমি কীধ্যরকো জা র‍্যাহি হ্যয় ?

সুন্দ্যর : ক্যয়সী উলটি বাতেঁ ক্যরতে হো, বৃজভূমি ন্যহি, বৃজ গোরিয়াঁ ক্যহো।

বস্যান্ত : আচ্ছা ওহি স্যহি, আখির ইয়ে যাতি কি ধ্যরকো হ্যঁয় ?

সুন্দ্যর : তুমহে প্যতাহি ন্যহি, ওয়াহ, অজি ন্যনদকে ঘ্যরমে এক ব্যড়া হি সুন্দ্যর বালক প্যয়দা হুয়া হ্যায়, ইয়ে স্যব উসিকো দেখনে যা র‍্যহি হ্যঁয়, উও দেখো, গীতগাতা হুয়া গোরিও কা অ্যাওর এক ঝুণ্ড ইধ্যর হি, আ র‍্যহা হ্যয়।

বস্যান্ত : তো চ্যলো হ্যম ভী উনকে সাথ হোলেঁ।

ব্রজবালাগণের গীত

বৃজমে আজ স্যখী ধূম ম্যচাও
আওরী বৃজবালা ম্যঙ্গাল গাও॥
গুঁথো স্যখীরী স্যব কুসুম-মালা
দেখান কো চ্যলো নন্দকে লালা,
বৃজকে ঘ্যর ঘ্যর হর‍্যষ ম্যনাও॥

(কারাগার)

দ্বারী : মাহারাজ ক্যন্সকী জ্যয় !

বসুদেব : দেওকী দেওকী, ক্যন্স আ র‍্যহা হ্যয় অভি ইস ব্যচ্চেকা অ্যান্ত ক্যর দেগা।

ক্যন্স : কিধ্যর হ্যয় ব্যচ্চা, হাঁ, মুঝে স্যাঁওপ দো, ম্যয় আপনে হাথোঁসে ইসকী হত্যা করুঙ্গা।

দেবকী : ন্যহী ন্যহী, ম্যয় ইসে ন দুঙ্গী মেরে প্রাণ র‍্যহতে হুয়ে, ম্যয় ইয়ে না দুঙ্গী, ইসে ছোড় দো, ছোড় দো !

ক্যন্স : অচ্ছা, দেখতা হুঁ, তুম ক্যয়সে ইসে ব্যচাতি হো।

দেবকী : ওফ !

র‍্যাহা হ্যয়, ম্যয় কিধ্যর যাউঁ, কিধ্যর যাউঁ — প্যরেমর্সওয়র মেরি রক্ষা ক্যরো।

ক্যন্স : হা, হা, হা, হা, হা, হা, ইয়ে কেয়া ক্যা, অচ্চা ইয়েহী স্যহী, ইয়ে কেয়া বিজলি হো গ্যয়ী।

দৈববাণী : পূরা হুয়া হ্যয় কাল তুমহারা, ম্যহাকাল অ্যব আয়া হ্যয়। গোকুলকে আজ ঘ্যর ঘরমে উও স্যবকে ম্যনকো ভায়া হ্যয়।

দেবদেবীগণের স্তুতি

পতিত উধারণ জয় নারায়ণ
কমলাপতে জয় ভ্যও-ভ্যয়-হার‍্যণ
জয় জ্যগদীশ হ্যরে॥

মধুমালা

ন.র.-৪র্থ—৩০

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৫
জানুয়ারি ১৯৫৯

কুশীলব

পুরুষ

মদনকুমার (কাঞ্চননগরের যুবরাজ), চিত্র সেন (মগদেশের রাজা), বিচিত্রকুমার (মগদেশের রাজপুত্র), দণ্ডধর (কাঞ্চননগরের বাজা), তাম্বুল (মধুমালার পিতা, সন্দ্বীপের রাজা), রুদ্রকুমার (সেনাপতির পুত্র, কুমারের বন্ধু), অয়স্কান্ত (বয়স্য), ইন্দ্রজিত (ত্রিপুরার রাজা), ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী, কাঞ্চননগরের প্রধান মন্ত্রী, মগদেশের মন্ত্রী প্রভৃতি।

নারী

মধুমালা (সন্দ্বীপের রাজকুমারী), কাঞ্চনমালা (ত্রিপুরার রাজকুমারী), ঘুমপরি-স্বপনপরি, তিলোত্তমা (সন্দ্বীপের রানি), পাটেশ্বরী (কাঞ্চননগরের রানি), বৃশ্চিকা (মগদেশের রানি), রোহিণী (ত্রিপুরার রানি)।

প্রথম অঙ্ক

[হিমালয়ের অঙ্কদেশে বিশাল বনভূমি। চৈতালি চাঁদিনি রাতি। পশ্চাতে বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারবিমণ্ডিত শিরে অর্ধোদিত পূর্ণিমা চাঁদ শশীশেখর দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই রজতগিরিনিভ বিপুল তনুতে উহা সর্প-উপবীতের মতো শোভা পাইতেছে। আঁকাবাঁকা বিগলিত তুষারধারা। বর্ষপরে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বিরহিণী বনলক্ষ্মী আজ অপরূপ মাধুরীতে আর শ্রীতে রূপসজ্জা করিয়াছে — যেন তপস্যার শেষে উমা নববধূর বেশে চন্দ্রমৌলি মহাদেবের প্রতীক্ষায় নিশি জাগিতেছেন। বনবিহগের সংগীতে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনে, দশদিশি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কমল-দিঘির লাল নীল শ্বেত রক্তকমল কুমুদের মাঝে জোড়ায় জোড়ায় বনহংস-হংসী খেলা করিতেছে। হরিণ ময়ূর নাচিয়া ফিরিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে বনপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার জাল বুনিয়াছে। দেবদারু পলাশ শাল পিয়াল কৃষ্ণচূড়া কারুবক 'সিলভার-ওক' 'রডোডেনড্রন' প্রভৃতি তরু গুল্মলতা নানারঙের ফুলের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আলোছায়া-সরসীর তীরে নৃত্য-গীত করিতেছে বন-বালিকার দল। সরোবরে পদ্মাসনে বীণা হাতে বসিয়া ঘুমপরি এবং সূক্ষ্মমায়াময় জালে আবৃত হইয়া শ্বেতহংসবাহিনী স্বপনপরি সেই গান শুনিতেছে।]

(বন-বালিকাদের গান)

জাগো বনলক্ষ্মী! জ্যোৎস্না বিগলিত চৈতালি নিশীথে।
রাঙাও দশদিশি লজ্জা-অরুণ রূপসজ্জায় বনশ্রীতে॥
তব আলোছায়ার ডুরে শাড়ির আঁচল
লুটাক বকুল-তলে সুখ বিহ্বল,
তব লতা কবরী হেরো পুষ্পভারে।
হল অবনমিতা অয়ি অসংবৃতে॥

পরো গিরি-ঝরনার শতনরী হার হে বনলক্ষ্মী!
বিরহ-শীর্ণা দেহে জাগুক জোয়ার
নবযৌবনের জাগুক জোয়ার হে বনলক্ষ্মী!
ঝংকৃত হোক বনভূমি নিঝঝুম
পুষ্পিত মাধবীর পরো কঙ্কণ
আলতা পরো কলি পলাশ রঙ্গান
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর গীতে॥

(ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান)

হে বিজয়ী! হে না-দেখা রূপের কুমার! (এসো এসো)
তন্দ্রা-অলস এই চন্দ্রা নিশির ভাঙো ভাঙো দ্বার॥

ঘুমপরি : স্বপনকুমারী খোলো গুণ্ঠন
স্বপনপরি : ঘুম-কিশোরীর আনো জাগরণ
দস্যুসম এসে করো লুণ্ঠন
কুণ্ঠিত প্রেম— মধুনিশি গন্ধার॥

(সহসা অদূরে বিপুল সেনা-বাহিনীর উল্লাস কলরোল ও উদ্দাম সংগীতের দমকা হাওয়া ভাসিয়া আসিল! ঘুমপরি ও স্বপনপরি মুদিত কমলের অন্তরালে অন্তর্হিতা হইলেন। বন-বালিকারা বনের তরুলতাকে আশ্রয় করিয়া অদৃশ্যা হইয়া রহিলেন।

শিকারের সজ্জায় সজ্জিত বর্ম-আচ্ছাদিত যুবরাজ মদনকুমার ও তাঁহার সঙ্গী সেনাদলকে দূরে পর্বতশিখরে দেখা গেল—মুদিত কমল হইতে অর্ধ-নিষ্ক্রান্তা ঘুমপরি, স্বপনপরি ও অর্ধ-লুক্কায়িতা বনবিহারিণীর দল একসঙ্গে গাহিয়া উঠিল —)

সুন্দর! সুন্দর
অপরূপ নন্দন-আনন্দ! মনোহর॥
একহাতে মালা তার একহাতে তরবার
শুভ্রপদ্মজ্যোতি ও কি দেবসেনাপতি
ও কি রতির পতি কিশোর মুরলীধর॥

মদনকুমার : সুন্দর! সুন্দর! সখা! সেনাপতি! সৈন্যগণ! চন্দ্রদেব অযুত কুমুদিনী লয়ে এই সরোবরে বিহার করছেন। তাঁর এই লীলা-সরসীর আনন্দিত তীরে উন্মুক্ত তরবারি অবনমিত করে তাঁকে প্রণাম করো। তাঁর এই মধুর প্রশান্তির মাঝে যেন কোলাহলের আবর্ত এনে পঙ্কিল না করে তুলি।
(প্রথমে যুবরাজ ও পরে সকলে তরবারি নামাইয়া প্রণাম করিল। কেবল বয়স্য অয়স্কান্ত বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।)
এ কি! বয়স্য অয়স্কান্তের মুখে এমন বায়স-কান্তি ফুটে উঠেছে কেন? আরে, এখন তো নির্ভয় হলে এই আনন্দ-সরসীর তীরে এসে!

অয়স্কান্ত : (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) যুবরাজ! আমাকে এক্ষুনি আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন।

মদনকুমার : স্ত্রীর কাছে? এখনই?

অয়স্কান্ত : হ্যাঁ যুবরাজ, এখনই! আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি অত্যন্ত অপরাধ করে এসেছি সেই দেবীর কাছে (উদ্দেশে প্রণাম)!

মদনকুমার : কী বলছ তুমি বন্ধু? তুমি পথক্লেশে পাগল হয়ে গেলে নাকি?

অয়স্কান্ত : যুবরাজ, পা গোল নয় যুবরাজ, পেট গোল হয়ে উঠেছে। দেখছেন না রাজপ্রাসাদের গম্বুজ — মন্দিরের চুড়ো — হাতির হাওদা — কামারের হাপর হয়ে উঠল হাঁপানির বেমোয়! বাপ! এর নাম শিকার? তাও যদি কিছু শিকার পাওয়া যেত, শিকার তো হল ছাই, হল শুধু কষ্ট স্বীকার! চড়াই আর উতরাই, ওঠা আর নামা করতে করতে পেট হয়ে উঠল পটহ!

মদনকুমার : শিকার যে পেলাম না তার জন্য দায়ী তুমি। তোমার জন্য কেউ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারিনে। দু-ক্রোশ পথ এসে দেখি, তোমার ঘোড়া গদাইলশকরি চালে ঢিকুতে ঢিকুতে আসছে সবার পিছনে।

অয়স্কান্ত : যুবরাজ! যে যাই বলুন, ঘোড়া তো ঘোড়া। আমার ঘোড়া, আমাদের সব ঘোড়াকে আমার ঘোড়া খেদিয়ে নিয়ে যায়। আমার পক্ষিরাজ ঘোড়ার ভয়েই না আপনাদের ঘোড়া এমন করে ছুটতে থাকে। কত কষ্টে আমার ঘোড়াকে থামিয়ে রাখি, বলি, যাক না বাবা ওরা বড়ো ভয় পেয়েছে; ওদের যেতে দে!

রুদ্রকুমার : কিন্তু বয়স্যদা, বউ-ঠাকরুনের কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলেন, তা তো বললেন না?

অয়স্কান্ত : আরে ভাই, আমি যেদিন শিকারে আসি, তার আগের দিন বউ-এর সাধভক্ষণ উৎসব ছিল, দোতলায় উঠে আসতে তাঁর অবস্থা দেখে হেসেছিলাম, আজ তোমার বউঠান এখানে থাকলে হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁ গো, তোমার সাধভক্ষণ কবে? (সকলের হাসি)

মদনকুমার : এই তিনদিন ধরে সত্যিসত্যিই শুধু কষ্ট স্বীকারই হল, কোনো শিকার পাওয়া গেল না। যাক, জ্যোৎস্না-ধোয়া এই অপূর্ব বনশ্রী আর এই কমলদিঘি দেখে পথের সমস্ত ক্লান্তি আমার জুড়িয়ে গেছে। আজ রাত্রিটা এইখানেই তরুতলে লতা-কুঞ্জের ছায়ায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কী বল সেনাপতি? সখা অয়স্কান্তের কী মত?

অয়স্কান্ত : আজ্ঞে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ হয়ে গেছে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মতো, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুলে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজি। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি! এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে — দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেতনি। (ভয়ে

ভয়ে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন)

রুদ্রকুমার : আচ্ছা বয়স্যদা, পেতনি নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেতনির ভয় কেন ? তাছাড়া তোমার শ্বশুরালয়ও তো পেতনিতলা গ্রামে আর মামার বাড়ি শেওড়াফুলিতে। কাজেই শ্যাওড়া গাছ বা পেতনিকে তো তোমার ভয় করার কথা নয় !

অয়স্কান্ত : তুমি থামো তো হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনও বহন করেছ ? বৃষস্কন্ধ পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার-যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ ?

মদনকুমার : আঃ, এমন রাত্রিটা তোমরা কচকচিতেই কাটিয়ে দিলে ! তার চেয়ে কেউ খোঁজ করে দেখতে পার কোথাও দু-চারটে নর্তকী পাওয়া যায় কিনা — যারা তাদের নাচে ও গানে পানসে চাঁদের জ্যোৎস্নাতে ঘন সুরার নেশা ঘনিয়ে তুলবে।

অয়স্কান্ত : এই জঙ্গালে নর্তকী খুঁজতে হলে আকাশে জাল ফেলে দু-চারটে পরি ধরা ছাড়া তো আর উপায় দেখিনে যুবরাজ। এই গভীর অরণ্যের দু-দশ যোজনের মধ্যেও জন-মনিষ্যি আছে বলে তো মনে হয় না। তা অভাবে যখন সবই চলে আমাদেরই বা চলবে না কেন ?

মদনকুমার : (হাসিয়া) অর্থাৎ ?

অয়স্কান্ত : অর্থাৎ নর্তকীর বদলে নর্তকার নাচ দেখুন, যুবরাজ। সৈনিকগুলো সবই এর মধ্যে নাক ডেকে ঘুমুতে আরম্ভ করেছে — ওদের খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে নাচবার হুকুম দিন।

রুদ্রকুমার : তা মন্দ হবে না, যুবরাজ। অন্তত খানিক হুল্লোড় করা যাবে তো। অর্ধেক রাত তো এমনি কাটিয়ে দেওয়া যাক। (ঘুমন্ত সৈনিকদের) এই—এই—সব ওঠো — উঠে পড়ো সব — বাঘ বাঘ।

(সকলে শশব্যস্তে 'এঁা-এঁা-কী বাঘ ! বাড়ি কোথায় ? বয়েস কত ?' ইত্যাদি শব্দ করিয়া বিচিত্র মুখভঙ্গি করিয়া জাগিয়া উঠিল)

অয়স্কান্ত : এই আবাগের বেটা ভূত সব ! বাঘ নয় বাঘ নয় — ভয় নেই — জাগ জাগ ! তোদের নাচতে হবে !

সকলে : নাচতে হবে ?

রুদ্রকুমার : হ্যাঁ, নাচতে হবে। বাঁচতে যদি চাও সবে, আজ নাচতে হবে।

অয়স্কান্ত : গাইতে হবে, কাশতে হবে, হাঁচতে হবে, গোঁফ দাড়ি সব চাঁচতে হবে !

রুদ্রকুমার : আলবত ! নাচতে হবে ! নাচতে হবে !

অয়স্কান্ত : ওরে তোদের ভয় নেই। আমি আগে আগে নাচব, গাইব, ভাব বাতলাব, আর তোরাও তারই অনুকরণে গাইবি, নাচবি, ভাবভঙ্গি করবি, বুঝলি ?

মদনকুমার : আচ্ছা। তা হলে আর দেরি নয়, নাচ শুরু হোক।

অয়স্কান্ত : (উষ্ণীষ খুলিয়া উড়ানি করিল — অন্যান্য সকলেও তাহাই করিল —

নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া)
আমার নাম পাতলিজান, ওরা গায় ক্ষীণতনু যৌবনভার বইতে নারে, আমি গাইব পাতলি কোমর ভুঁড়ির ভার বইতে নারে! আচ্ছা, এইবার সব গান ধর!

গান

মোদের মর্দানা ঢং নাচা মোদের মর্দানা ঢং নাচা।
(ওদের) আছে শাড়ির আঁচল মোদের আছে কোঁচা কাছা॥
ওরা বাঁকায় ভুরু, মারে চোখ, নাড়ে ঘাড়,
আমরা চোমরাই গোঁফ, দেখাই বঙ্কিম হাঁটুর হাড়,
ওদের আছে বেণি মোদের আছে দাড়ি
ওরা দুলায় মাজা আর আমরা ভুঁড়ি নাড়ি
(ওদের) কণ্ঠ যেন কোকিল মোদের কণ্ঠ হাঁড়িচাঁচা॥

(হঠাৎ সকলের হাসির হুল্লোড় কমিয়া আসিল, সকলে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া যেন কোন মায়ার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। এই নিদ্রা আসিবার পূর্ব হইতেই বেণু বীণা ইত্যাদির ঘুম-আসা অলস সুর বাজিতেছিল এবং ইহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইবার সাথে সাথে কমল-দিঘিতে ঘুমপরি ও স্বপনপরি গাহিয়া উঠিল — বন-বালিকারা সাথে সাথে চাপা গলায় গাহিতে লাগিল।)

গান

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম।
আকাশ বাতাস জল থল উপবন
সব হোক নিঝঝুম॥
শান্ত হোক সব অশান্ত কলরোল
রে পথিক! জীবন-পথের ক্লান্তি ভোল
নয়নে লাগুক সুখস্বপনের কুঙ্কুম॥

স্বপনপরি : (মুদ্রিত যুবরাজকে দেখাইয়া) কী অপরূপ রূপ দেখেছিস ঘুমপরি?

গান

এরই লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি॥
সই দেখ লো চেয়ে রূপ-সায়রে জ্বলে এ কোন বাতি
লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্না হেথা কে রেখেছে পাতি?

ঘুমপরি : সত্যিই স্বপনপরি! এই পৃথিবীর পাঁকে এমন নন্দন পারিজাত কেমন করে ফুটল তাই ভাবছি। (দীর্ঘনিশ্বাস)

গান

যেন দুধ সাগরের ননি দিয়ে তৈরি লো এর গা
পৃথিবী কি শিউরে ওঠে এ রাখে যখন পা।

স্বপনপরি : তা হলে তুমিও মরেছ?

ঘুমপরি : তুমিও মরেছ মানে, 'আমি তো মরেইছি সাথে সাথে তুমিও মরেছ,' এই তো?

বন-বালিকাগণ : আমাদের কথা বন-দেবতাই জানেন।

গান

তুমি কে গো (কে কে কে)
তুমি মোদের বন-দেবতা॥
আমরা বনশ্রী — তোমার পূজারিনি ধ্যান-রতা—
হে বন-দেবতা॥

১মা আমি মালতি মুকুল

২য়া আমি ব্যাকুলা বকুল

৩য়া, ৪র্থা ৫মা : মোরা গুণহীনা অশোক পলাশ শিমুল

৬ষ্ঠা : আমি জলের কমল (আঁখি জলের কমল)

৭মা : আমি মাধবীলতা

৮মা : আমি গিরিমল্লিকা

৯মা : আমি হাসনুহানা

১০মা : আমি ছোটো ডুমো ফুল রই চির অজানা

১১শী : আমি ঝরনাধারা কেঁদে কেঁদে বয়ে যাই।

১২শী : আমি দিনের ভাদ্র-বউ চাঁদের কুমুদ

১৩শী : আমি পাখির গান বনভূমির কথা।

ঘুমপরি : ওলো বনের মেয়ে! তোরা ফুল আনতে পারবি — অনেক ফুল চাই — সেই ফুল দিয়ে এই সুন্দরকে সাজাব।

বন-বালিকাগণ : পারব — যত ফুল চাও এনে দিতে পারব — কিন্তু আমাদের সাজাতে দিতে হবে — আমরা নিজ হাতে সাজাব।

স্বপনপরি : আচ্ছা, তাই হবে। যা তোরা ফুল আন।

সকলে : (সোৎসাহে) চল ভাই ফুল আনি — চল আমাদের বন-দেবতাকে সাজাব।

(নৃত্যের ভঙ্গিতে একে একে চলিয়া গেল)

ঘুমপরি : ওদের আসার আগেই আমাদের মাঝে একটা রফা হওয়া দরকার। একে কে নেবে তুমি না আমি?

স্বপনপরি : ছি ছি ঘুমপরি, তুমি কি এই মানব-পুত্রকে ভালোবেসে পরির কুলে কলঙ্ক দেবে? আমি ওকে কক্ষনো ভালোবাসিনি — বাসব না। মানুষকে আমি ঘৃণা করি, মাটিতে ওদের জন্ম, ওদের বাইরে ভিতরে ধুলার আবর্জনা। তুই যদি চাস ওকে নিতে পারিস। কিন্তু আমি আজই গিয়ে পরির দেশে রটিয়ে দেব তোর কলঙ্কের কথা। তুই আর জীবনে

পরিদের মাঝে মুখ দেখাতে পারবিনে। ইন্দ্রসভায় নাচতে পারবি নে।

ঘুমপরী : মুখ দেখাতে পারব না কিন্তু এ মুখ তো দেখতে পাব (কতকটা স্বগতভাবে) কিন্তু পরির দেশ তো আমার কাছে হবে নিষিদ্ধ। তখন এই পৃথিবীতে — না না, একে মাটির গন্ধ তাতে দিনের আলোক সইতে পারব না। শুকিয়ে যাব, মরে যাব। আচ্ছা ভাই স্বপনপরি, এই সুন্দরের পাশে শোভা পায় এমন সুন্দরী তুই দেখেছিস ?

স্বপনপরি : কেন বলো তো ?

ঘুমপরি : আমার প্রয়োজন আছে, যদি তার দেখা পাই তার কাছে রেখে দেখি, কে বেশি সুন্দর। দেখি পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা !

গান

ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি করে বিধির পুঁজি শেষ।
এই চাঁদের পাশে চাঁদ শোভা পায় আছে সে কোন দেশ !

স্বপনপরি : আমি এমন সুন্দরী দেখেছি যাকে দেখে মনে হবে বিধাতার বিলাস-লক্ষ্মী। বিধাতা-পুরুষ তাকে তাঁর মনের সকল মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন।

গান

এ তো একা চন্দ্রমণি সে মানিকের ডালা।
এ সারা বনে একটি কুসুম, সে কুসুমের মালা॥
হাসলে কন্যা ফুটে ওঠে পৃথিবীতে ফুল
সে কাঁদলে পরে ভেঙে পড়ে সাত সাগরের কূল
ইন্দ্রলোকে দেখেনি কেউ তেমন দেব-বালা॥

ঘুমপরি : অসম্ভব ! বাতুলের কথা। তা যদি হয় আমি এর ওপর আমার সমস্ত দাবি ছেড়ে দেব।

স্বপনপরি : সত্যিই ?

ঘুমপরি : সত্যি সত্যি তিন সত্যি। এই ফুল ছুঁয়ে শপথ করছি।

স্বপনপরি : আমিও চাঁদের দিকে চেয়ে শপথ করে বলছি, সে যদি এর চেয়ে সুন্দর না হয় আমিও এর ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে দেব।

ঘুমপরি : বেশ, তা হলে চল একে উড়িয়ে নিয়ে যাই সেই দেশে কিন্তু কোথায় সে দেশ ? তার নাম কি ?

স্বপনপরি : এখন বলব না সে দেশের নাম — তারও নাম। সে দেশে পৌঁছে তার পাশে একে রেখে জাগিয়ে দিলেই সব জানতে পারবি। কিন্তু আমি যে পথে যেতে বলব কোনো প্রশ্ন না করে সেই পথে যেতে হবে। কেমন রাজি ?

ঘুমপরি : রাজি। তাহলে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো, বনের মেয়েরা দেখলে আর ছেড়ে দিতে চাইবে না।

স্বপনপরি : দাঁড়া আমার ময়ূরপঙ্খি বিমানকে স্মরণ করি, সে এলে দুজনে ওকে তাতে শুইয়ে নিয়ে যাব।

স্বপনপরির গান

আয় আয় মোর ময়ূর-বিমান আকাশ নদী বেয়ে।
ফুল ফোটানো হাওয়ায় ভেসে চাঁদের আলোয় নেয়ে॥

(ময়ূর বিমান মধুর শব্দ করিয়া আসিয়া পৌঁছিল। ফুলপরিরা কুমারকে সেই বিমানে লইয়া গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল।)

স্বপনপরির গান

সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রুপোর খাটে কেশ।
ময়ূরপঙ্খি যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ।

ঘুমপরি : কী বললি? তার নাম মধুমালা? কী মিষ্টি নাম!

স্বপনপরির গান

তার নামের চেয়ে রূপে সখী অনেক বেশি মউ
নবলক্ষের মালা পাবে সে হবে যার বউ।
তারায় তারায় ছড়িয়ে আছে তারই রূপের রেশ
ময়ূরপঙ্খি যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ॥

(পটপরিবর্তন — মধুমালার প্রাসাদ সাগরপুরীর মধ্যে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রাত্রি তৃতীয় প্রহর — চারিদিকে সমুদ্রের জল-কল্লোল — মাঝে সন্দ্বীপ — তারই কূলে মধুমালার সোনার প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিপার্শ্বে ভীমাকৃতি প্রহরী মুক্ত তরবারিহস্তে পায়চারি করিতেছে। নিশুতি রাত্রির কালো ছায়ায় ঢাকা সেই প্রাসাদ যেন জল-দেবীর বিলাসপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। উপরে পরিদের ময়ূরপঙ্খি-রথের শব্দ ভ্রমরগুঞ্জনের মতো শুনাইতেছে — নীচে জলোচ্ছ্বাস সংগীতের মধ্যে দূরাগত ঘুমহারা পাখির শ্রান্ত কণ্ঠস্বর — (এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিলে ভালো হয়)। পুরীর ছত্রিশ প্রাচীরে সাতমহলা তেরো কুঠরির পারে মধুমালার শয়নকক্ষ। শয়ন-শিয়রে তিন সারি ঘৃতপ্রদীপ। তেরো থাক পালঙ্কে মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাগর-তীরে এক নৌ-সেনা গান গাহিতে গাহিতে তরি বাহিয়া চলিয়া গেল।]

নৌসেনা বা মাঝির গান

নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি
যায় নিদ্রা যায় রূপের কেয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি ॥
ঝলমল করে কন্যার এলোকেশ
পালঙ্কে লুটায় রে তার আলুথালু বেশ
ফুল-শয্যায় ঘুমায় যে চাঁদের পিয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি ॥

(অদূরে ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান শোনা গেল)

ঘুম আয় ঘুম আয় ঘুম ঘুম ঘুম
মধুমালার দেশ ঘুমে নিশুতি নিঝঝুম।

(দেখিতে দেখিতে হাই তুলিয়া সকল প্রহরী দাস-দাসী ঘুমাইয়া পড়িল। মদনকুমারের পালঙ্ক লইয়া ঘুমপরি ও স্বপনপরি মধুমালার পালঙ্কের দক্ষিণে রাখিল — অমনি হাজারো সাপ হাজারো ফণাতে মানিক-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। অসংবৃত-কেশবেশ রাজকন্যা মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখা গেল। 'কন্যার সিঁথিতে পাটিতে ফুল, ফুল-ঢালা সারা অঙ্গা গায়'। শতদলের পাপড়ি দিয়ে বিছানো শয্যা। ঘুমপরি নিমেষহারা নয়নে সে রূপসুধা পান করিতে লাগিল। তাহার মুখে কথা নাই। স্বপনপরির গান —)

গান

ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে
পাশাপাশি শুয়ে লো দেখ এক শয্যায় কাঁদে।
রাজার কুমার গড়া যেন ভোরের আলো দিয়ে
রাজকন্যার সৃষ্টি যেন পদ্ম পাপড়ি নিয়ে
(আমি) দেখি সুন্দর বিধাতারে এই দুই রূপের ফাঁদে ॥

স্বপনপরি : (ঠেলিয়া) ঘুমপরি! ঘুমপরি! তুই ঘুমুচ্ছিস নাকি?

ঘুমপরি : (দুই হাতে চোখ কচলে) বোন স্বপনপরি, আজ নয়ন আমার সার্থক হল। আমার রূপের তৃষ্ণা মিটল। এই রূপের দুই ডালা নিঠুর বিধি কোন প্রাণে ঠাঁই করে রেখেছিল, তাই ভাবছি।

গান

কী অনল জ্বলে লো সই কী অনল জ্বলে
নয়ন ভরল জলে লো সই আমার হিয়ার তলে
কী অনল জ্বলে ॥
(আমি) উদাসী পাগল হয়ে না ত্যজিলাম কায়া
এই চাঁদের মুখে পড়ল আমার রাহুল প্রেমের ছায়া
মোর বুকের মাঝে সাত সিন্ধুর একী ঢেউ উথলে
কী অনল জ্বলে ॥

স্বপনপরি : কে জিতল ?
ঘুমপরি : তুই ! আমারই হার !

গান

আমি হেরে এবার নেব লো সই বঁধুর গলার হার।

স্বপনপরি না, তুই-ই জিতেছিস, আমারই হার।

গান

হার মেনে তুই জিতবি ওলো হবে না তা আর॥

ঘুমপরি : শুধু হার হল না লো, গলার হার হল — এই দুঃখ এই বেদনাকে গলার হার করে চল দেশে দেশে কেঁদে বেড়াই।

ঘুমপরি : কাঁদতে তো হবেই তার আগে যার কাছে আমাদের হার হল তার সঙ্গো আঁখিতে আঁখিতে রাখি বেঁধে দিয়ে যাই, তবে না বেদনার পাত্র কানায় কানায় পুরে উঠবে। ওদের জাগিয়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখি ওরা কী করে।

(ফুলের পাখা দিয়ে বাতাস দিল)

স্বপনপরি : ওরে হতভাগী ! করলি কী, এদের যে যাকে দেখবে সেই যে উদাসী হয়ে যাবে !

[বলিতে বলিতে ঘুমের ঘোরে মদনকুমারের একখানা হাত মধুমালার গায়ে আসিয়া পড়িল। মধুমালা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া পার্শ্বে নিদ্রিত রাজপুত্রকে দেখিয়াই শিয়র হইতে তরবারি লইয়া রাজকুমারের বক্ষের উপর ধরিল — ধরিয়াই নিদ্রিত কুমারের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া ঝনঝনাত শব্দে তরবারি দূরে ফেলিয়া দিল — সেই শব্দে রাজপুত্রও চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সম্মুখে সৌন্দর্যের প্রতিমা রাজকন্যাকে দেখিয়া অভিভূতের মতো নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।।]

মধুমালা : কে ? কে তুমি, চোর ? দেব হও, দানব হও কিংবা অন্য কোনো জন হও সুন্দর মুখে সত্য পরিচয় দাও !

মদনকুমার : আমি ? — আমি —

(রাজপুত্রের চোখে জল দেখা দিল)

মধুমালা : হ্যাঁ, তুমি। কোথায় তোমার দেশ, তোমার নাম কী ? তুমি সাত সাগর সাতশো প্রহরীর পাহারা এড়িয়ে কেমন করে এখানে এলে ? তুমি মায়াবী, তুমি জাদুকর, তুমি চোর ! এর প্রতিফল মৃত্যু।

(মধুমালা দুষ্ট হাসিয়া লুকাইয়া অন্যদিকে চাহিল)

মদনকুমার : আমি সত্য বলছি — আমায় বিশ্বাস করো দেবী, আমি চোর নই — দেব নই মায়াবী নই — আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ — আমার নাম মদনকুমার। আমার পিতার নাম রাজাধিরাজ দণ্ডধর। আর তুমি — তুমি কে ? আমি কি স্বপ্নে চাঁদের দেশে এসেছি ? তুমি চাঁদের দেশের রাজকন্যা ?

মধুমালা : (বালিকার মতো চঞ্চল হাসি হাসিয়া ফুলের পর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে বলিতে লাগিলেন)
আমার নাম মধুমালা — আমি সন্দ্বীপের রাজকন্যা — আমার পিতার নাম মহা-রাজাধিরাজ তাম্বুল।

(রাজপুত্রও এইবার নির্ভয়ে হাসিয়া উঠিলেন)

মদনকুমার : কিন্তু, আমি এখানে এতদূর তোমার দেশে এই সাগর-ঘেরা দ্বীপে এলুম কী করে? আমরা বোধ হয় স্বপ্ন দেখছি, না?

মধুমালা : স্বপ্নই যদি হয় — তবে এ মধুর স্বপ্নকে মধুরতর করে নিতে বাধা কী বন্ধু? একটু পরেই তো স্বপ্ন যাবে টুটে — দিনের ফুল উঠবে ফুটে — তুমি চলে যাবে তোমার দেশে আর — আমি কাঁদব ওই সাগরের সাথে চিরদিন চিররাত্রি।

মদনকুমার : না, না, ও কথা বোলো না! (হাত ধরিতে গিয়ে পিছাইয়া আসিল) আমাদের এ রাত্রির আর শেষ হবে না, স্বপ্ন আর টুটবে না — সেই আশার কথা বলো।

মধুমালা : তুমি কাছে এসে চলে গেলে কেন? ধরো, আমার, হাত ধরো, আমার বুক কাঁপছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গাঙ-চিল সিন্ধুকপোত ডেকে উঠছে, আর আমার মনে হচ্ছে এখনই বুঝি প্রভাত হয়ে যাবে। (বাতায়নে গিয়া) ওই দেখো, এখনও শুকতারা ওঠেনি — ধরো, আমার হাত ধরো।

(রাজপুত্র হাত ধরিলেন। অশ্রুমুখী মধুমালা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।)

মদনকুমার : তুমি এত কাঁপছ কেন? এই যে আমি তোমার হাতের কাছে — আমায় হাত দিয়ে ধরো।

গান

(তোমার) চন্দন রং উত্তরীয় মেঘডম্বুর শাড়ি
কাজল-বরন কেশ কন্যা চলো আমার বাড়ি॥
চির হয়ে কি নেমে এল চঞ্চল বিজলি
ফুটল কি আজ তোমার দেহে পূর্ণ চাঁদের কলি।
রতি কি আজ নেমে এল পতিরে তার ছাড়ি
কন্যা চলো আমার বাড়ি॥

মধুমালার গান

সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ?
তাই কান্নার জোয়ারে তার ভাঙল কূলের বাঁধ।
দূর আকাশের লক্ষ তারা চেয়ে আছে তন্দ্রাহারা
তারা তোমার রূপ নিয়ে কি করে কাড়াকাড়ি
কুমার! থাকো আমার বাড়ি।

মধুমালা : দেখো কুমার! সাত সমুদ্র সাতশো প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সাত-ছত্রিশ তেরো কুঠরি পার হয়ে তুমি যখন বিধাতার বর হয়ে এসেছ — তখন —

(রাজকন্যা লজ্জায় চুপ করিলেন)

মদনকুমার : থামলে কেন? বলো বলো কি বলছিলে, বলো। বলো।

মধুমালা : (লজ্জা-বিজড়িত স্বরে) এ সেই লীলারসিক বিধাতা-পুরুষেরই ইঙ্গিত যে তুমি আমার বর হও।

মদনকুমার : আমি? আমি — তোমার বর হব?

মধুমালা : (ব্যাকুল স্বরে) কেন? কেন তা হয় না?

মদনকুমার : তোমার এই অপরূপ রূপের মালা যার গলায় শোভা পাবে — তাকে বোধহয় বিধাতা আজও সৃষ্টি করে উঠতে পারেন নি।

মধুমালা : তুমি কি তোমার নিজেকে কোনোদিন দেখেছ? দেখলে এ কথা বলতে না। এই নাও আমার অঙ্গুরি — তুমি নাও, তোমার অঙ্গুরি আমায় পরিয়ে দাও। এই নাও আমার নবলক্ষের রত্নহার — তুমি দাও তোমার ওই পদ্মমণির মালা।

(মালা বদল। অপর কক্ষে উলুধ্বনির শব্দ)

মদনকুমার : ওকী, উলু দেয় কে?

মধুমালা : (হাসিয়া) আমার শুকশারি। কিছুদিন দিন আগে আমার দিদির বিয়েতে উলুধ্বনি শুনে ওরা পুরুষ নারীকে কাছাকাছি দেখলেই উলুধ্বনি করে ওঠে।

মদনকুমার : মালা! প্রিয়া! অঙ্গুরি যদি নিলে, মালা যদি দিলে, তোমার গায়ের চন্দন-রং চাদর আমায় দাও, আমার ধানি রঙের চাদর তুমি নাও। (গুনগুন সুরে গান)

গান

আহা! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ
নীহারে ঢাকিল শশী।

মধুমালার গান

চন্দন মেখে শুকতারা হাসে
মোর বাতায়নে বসি।

মধুমালা : একী! এ কী! ওই দেখো, শুকতারা উঠেছে পূর্ব-তোরণে! আমায় জড়িয়ে ধরো, একেবারে প্রাণের কাছে লুকিয়ে রাখো, তুমি চলে যেয়ো না — তুমি যেয়ো না!

(বলিতে বলিতে মধুমালা পালঙ্কে ঘুমে অভিভূত হইয়া লুটাইয়া পড়িল — মদনকুমারও তাহারই পার্শ্বে ঘুমবিজড়িত নয়নে লুটাইয়া পড়িল)

ঘুমপরি : আমি ওদের চোখে ঘুম দিয়েছি — আর দেরি নয় — মালা কেঁদে বলছিল 'তুমি যেয়ো না', কিন্তু ওদের যেতেই হবে!

গান

পুব সাগরে ডুব দিয়ে ওই সোনার রবি উঠল রে।
রাতের চোখের অশ্রু ঝরে কুসুম হয়ে ফুটল রে॥
যাত্রী ওরে যেতে হবে
গভীর ব্যথা পেতে হবে
তাই মিলন রাতের বালুর মালা জাগরণে টুটল রে॥

স্বপনপরি : না, না, ওদের মাঝে এই বিরহের যবনিকা ফেলে দিসনে ঘুমপরি। আমি এখনও যেন শুনছি মধুমালার করুণ মিনতি —

গান

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না
মিলনের সাধ না মিটিতে চাঁদ বিদায় চেয়ো না চেয়ো না॥
শোনো গো আমার বক্ষের মাঝে
সাত সাগরের ক্রন্দন বাজে,
জোয়ারের তরি এখনই বন্ধু ভাঁটার স্রোতে বেয়ো না॥

ঘুমপরি : বিরহের আগুনে পুড়ে ওদের প্রেমের সোনা খাঁটি হবে সই, চল আর দেরি করিসনে। দাঁড়া তার আগে ওদের পালঙ্ক বদল করে নিই।

পালঙ্ক বদল করিতে করিতে গান

ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা — স্বপন যাবে টুটে
সুখ স্বপন যাবে টুটে।
ফুল-শয্যার ফুটবে কাঁটা প্রভাত বেলা উঠে।

(পালঙ্ক ময়ূরপঙ্খিতে লইয়া উঠিয়া গেল — পটপরিবর্তন — আবার সেই হিমালয়ের সানুদেশ দেখা গেল। তখন রক্ত-আঁখি তরুণ অরুণ জাগিয়াছে — তারই রঙে হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় রঙের আবির খেলা চলিয়াছে। পরি দুইজন রাজপুত্রের পালঙ্ক যেখানে ছিল সেইখানে রাখিয়া দিল।)

স্বপনপরি : ঘুমপরি! তুই কি আর ইন্দ্রসভায় স্বর্গপুরীতে ফিরতে পারবি? যে তরুণ অরুণকে তাঁবুতে রেখে এলি, তারই মায়া পূর্ব তোরণে চুপ করে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

(হইহই শব্দে রাজার প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল — তাঁবুতে প্রভাতি সানাই — কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল।)

রুদ্রকুমার : কুমার! বন্ধু! বহুক্ষণ হল প্রভাত হয়েছে, ওঠো।

মদনকুমার : (জাগিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে চাহিয়া) এ কোথায়? এ আমি কোথায় এসেছি? আমার মধুমালা — মধুমালা কই?

রুদ্রকুমার : (হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) তোমার বুঝি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটেনি! কোথাকার কে মধুমালা? (আবার হাসিয়া উঠিল)

মদনকুমার : হ্যাঁ, আমার মধুমালা! সন্দ্বীপের রাজকুমারী, কাঞ্চননগরের বধূরানি,

আমার প্রিয় মধুমালা! কে-কে আমায় এখানে আনলে? কোথায় সেই সাগর-ঘেরা দ্বীপ? কোথায় তার সেই সাগর তীরের সোনার পুরী? তুমি — তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনিনে। মধুমালা! মধুমালা!

(রাজপুত্র উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন।)

রুদ্রকুমার : (রাজকুমারকে ধরিয়া ফেলিয়া) বন্ধু! রাজপুত্র! আমি — আমি তোমার সখা রুদ্রকুমার — তোমাদের সেনাপতির পুত্র — আমায় চিনতে পারছ না?

মদনকুমার : (ক্ষণিক উন্মাদের মতো শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া) তুমি? সখা তুমি? তুমি এখানে কী করে এলে? এর চারিধারে মহাসিন্ধু গভীর গর্জনে নৃত্য করছে — দ্বারে দ্বারে যমদূতের মতো প্রহরী। চুপ — আস্তে — শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না — হয় হত্যা করবে — না হয় পাষাণ কারাগারে নিক্ষেপ করবে। রাজকন্যার এ ঘরে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু মধুমালা কোথায় গেল! আমার মধুমালা!

রুদ্রকুমার : তুমি কী বলছ সখা? কোথায় মধুমালা! কাল শিকার করতে এসে এইখানে রাত্রে শুয়েছিলে, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে না?

মদনকুমার : শুয়েছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু তারপর যে গেলাম আমার মধুমালার দেশে — সেইখানে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে আমাদের মালা বদল হল — এই দেখো — এই দেখো তার গলার নবলক্ষের রত্নমালা — এই দেখো তার অঙ্গুরি — এই দেখো তার চন্দন রং চাদর — দেখেছ — দেখেছ। কোথায় গেল আমার মধুমালা — আমার মধুমালা!

রুদ্রকুমার : তাইতো! এ কী! এ কোন মায়াধরের খেলা? মায়াপুরীতে আমরা শুয়েছিলাম — শুনেছি হিমালয়ের সানুদেশে অভিশপ্ত এক অরণ্য আছে — সেখানে গেলেই লোকে নানারূপ মায়া দেখে — একী তবে সেই রম্য কানন? হে দেবাদিদেব শংকর, আশুতোষ, ভোলানাথ, রক্ষা করো — আমরা অজ্ঞ নিরপরাধ — না জেনে যদি পাপ করে থাকি, সর্ব-পাপ-হর, তুমি ছাড়া কে তা ক্ষমা করবে? — এ কী! এ সোনার পালঙ্ক কার? এ পালঙ্ক তো এখানে ছিল না। অয়স্কান্ত! অয়স্কান্ত!

অয়স্কান্ত : সব দেখছি বন্ধু, সব শুনছি আড়ালে দাঁড়িয়ে। অয়স্কান্ত পয়স্বিনী কামধেনু নয় যে দুইয়ে যা চাইবে তাই পাবে। ব্রজে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীমদনমোহনের বসন বদলের কথা শুনেছিলাম, খাট বদলের কথা তো শুনিনি। আমাদের মদনকুমার তার চেয়ে তিন কাঠি উপরে উঠে গেলেন দেখছি — আংটি বদল, মালা বদল (আর চাদর বদল যখন হয়েছে, তখন আদর বদল না হয়েছে তাই বা কে বলবে?) কিন্তু সব বদলকে হার মানিয়েছে পালঙ্ক বদল। এখন অঙ্ক বদল কলঙ্ক-বদল কত কী বদল দেখবে দাদা! চলো, এখানকার ডেরা যত শিগগির পার ওঠাও। দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ হবে না। কাল রাত্রে এখানে এসেই আমার গা কেমন ছমছম করছিল — এ পরির আখড়া না হয়ে

যায় না — নইলে বন এমন সাজানো-গোছানো হয়, দেখেছ? বন তো নয় যেন অভিনয়ের রঙ্গামঞ্চ! ওঠাও ডেরা — তারপর বাপ-মার নয়নমণি বাপ-মার কোলে ফেলে দাও! গিয়ে পাত্রী খোঁজো, চোখে যৌবনের রং লেগেছে — এখন যে কোনো বধূর মালাকে মধুমালা মনে হবে, চলো।

রুদ্রকুমার প্রহরী! (প্রণত প্রহরীর প্রবেশ) সৈন্যগণকে আদেশ দাও আমরা এখনই কাঞ্চননগর যাত্রা করব। (প্রহরীর প্রস্থান)

অয়স্কান্ত হায় হায়, শিকার করতে এসে বিড়ম্বনার আর অন্ত রইল না। রাজকুমারের হাতের শিকার হতে পশুপক্ষী তো অস্বীকার করলই — তারও বাড়া রাজকুমার নিজেই শিকার হয়ে বসলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

[কাঞ্চননগরের রাজপ্রাসাদ। ধূলিধূসবিত মলিনকান্তি উন্মাদ মদনকুমার বসিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া আছেন। আর রাজমহিষী পাটেশ্বরী তাহার গায়ে মাথায় নিবিড় স্নেহে হাত বুলাইতেছেন। পার্শ্বে পরিচালকবৃন্দ দাঁড়াইয়া — দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী!]

পাটেশ্বরী : বাবা লক্ষ্মী সোনা মানিক আমার! পালঙ্কে উঠে বোসো — রাতদিন ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে তো মধুমালাকে পাওয়া যাবে না।

মদনকুমার : হ্যাঁ! মধুমালা! মধুমালা! তুমি তাকে দেখেছ? কিন্তু তুমি কে? তোমাকে দেখে আমার এত কান্না পাচ্ছে কেন? তোমাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি — কোথায় কোন বনে!

পাটেশ্বরী : (কাঁদিয়া ফেলিলেন) হায় আমার পোড়া কপাল! তোর মুখে একথা শোনার আগে কেন আমার মরণ হল না? কে সে রাক্ষুসি মধুমালা — যে আমার ছেলেকে এমন গিলে খেয়েছে — যার মায়ায় তুই তোর মাকে চিনতে পারছিসনে। উঃ! ভগবান!

মদনকুমার : কে! মা? তুমি আমার মা? (ক্ষণিক একদৃষ্টে তাকাইয়া সরোদনে মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল) মা! মা! একী হল আমার? কেন এমন হল? সত্যি সত্যি মা, সে মায়াবিনী, নইলে বারো বৎসর ধরে পাষাণপুরীর কারাগারে যে মা আমার বক্ষে ধরে আমায় লালন-পালন করেছেন — এই পাঁচ বৎসর বাইরের আলোকে এসে তাকে আর চিনতে পারিনে! সে সত্যই মায়াবিনী — তার চোখে মায়া — তার রূপে মায়া, তার হাসিতে মধু, তার কান্নায় মধু, তার কেশে বেশে কথায় গানে মধু — তার মালায় মধু — সে মধুমালা! মধুমালা! আমার মধুমালা!

পাটেশ্বরী : (পরিচারিকাদের প্রতি) ছেলে আমার দিশাহারা! তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কী হাঁ করে? আমার ছেলে বুঝি সং, না? দে, গোলাপ জলের ছিটে দে, মহারাজাকে খবর দে। এখনও রাজবৈদ্য এলেন না কেন?

মদনকুমার : (পরিচারিকাদের প্রতি) তোরা কে? মধুমালার সখী? মধুমালার দেশের গান জানিস?

জনৈক পরিচারিকা : মা! কাল যুবরাজ সারারাত্রি সারাদিন 'মধুমালার দেশ' বলে যে গানটি গেয়েছিলেন আমরা তা শিখে নিয়েছি — আমরা গাইব সে গান?

পাটেশ্বরী : আহা! গা না বাছা! তোদের গান শুনে যদি বাছার আমার একটু জ্ঞান ফিরে আসে।

পরিচারিকাদের গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ?

(রাজকুমার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

মদনকুমার : গাও, গাও, আবার গাও কোথায় মধুমালার দেশ —

গান

কেউ বলতে পারো কোথায় আমার মধুমালার দেশ?
যার সাগর-মাঝে স্বপনপরি মেঘ-বরন বেশ মধুমালার দেশ॥
কোন্ মধু বাসরে এসে
(তারে) দেখেছিলাম রাতের শেষে
(আমি) স্বপ্নে আজও দেখি তারই চন্দন-রং বেশ, মধুমালার দেশ॥
প্রথম শিকারে গিয়ে বিঁধল বিষের তির —
সেই কন্যার কাজল মাখা ডাগর আঁখির।
তার নবলক্ষের মালা দোলে দোলেরে মোর প্রাণের তলে
আমি জেগে দেখি স্বপ্নে-দেখা সেই চোখের আবেশ, মধুমালার দেশ॥

রাজা দণ্ডধর : (ব্যাকুল হয়ে অভিভূতের মতো) রানি! পাটেশ্বরী! আমি আমার উপাস্য দেবতা মহাকালের প্রত্যাদেশ পেয়েছি। কাল থেকে সারাদিন সারারাত্রি তাঁর মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম — আমার একমাত্র বংশ-প্রদীপের কেন এ অবস্থা হল জানবার জন্য। আজ সকালে স্বপ্ন দেখলাম যেন মহাকাল বলছেন, 'ওকে আজই সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে সাগর জলে ভাসিয়ে দে। মধুমালাকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসবে।' রানি! আজই — আজই ওকে পাঠিয়ে দেব সাগরপারের দেশে — সাথে যাবে আমার সমস্ত নৌ-সেনা পদ্মার বুকের সমস্ত তরণি — সকল মাঝিমাল্লা। ও যে আমার দেবতার দেওয়া নির্মাল্য — তাঁরই নাম নিয়ে ওকে স্রোতের পথে ভাসিয়ে দাও — দেবতার নির্মাল্য আবার দেবতার শ্রীচরণে এসে ঠেকবে।

(বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠস্বর ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। রাজা পালঙ্কের উপাধানে মুখ লুকাইলেন।)

মদনকুমার : (রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া — বুকের কাছে মুখ রাখিয়া)
বাবা! বাবামণি! দেবে? দেবে আমায় যেতে আমার মধুমালার কাছে — বাবা কীরকম লক্ষ্মীছেলে — দেখেছ মামণি? তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু —

কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাও না। (মায়ের আঁচল লইয়া চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে) মা! মা! চেয়ে দেখো, তোমার আঁচল দিয়ে আমার মাথা মুখ মুছছি — এতেই আমার সব আলাই-বালাই দূর হয়ে গেল — এই আঁচলের প্রসাদে আমার বাধা বিঘ্ন উড়ে গেল। ও কী মা! লক্ষ্মীমেয়ে, কেঁদো না — আমি আবার ফিরে আসব তোমার শ্রীচরণ সেবার দাসী নিয়ে। (বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাবা! আমি রাজসভায় যাব তোমার সাথে। মা-মণি তুমিও চলো না — আমি তোমার কোলের কাছটিতে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো — রাজ্যসুদ্ধ লোক দেখুক যে, আমি ভালো হয়ে গেছি।

পাটেশ্বরী : ওরে, ওরে মায়াবী! বলিসনে, বলিসনে, কী করে এই সোনার চাঁদকে আমি সাগরজলে ভাসিয়ে দেব? ভাসিয়ে দিয়ে কী করে একলা ঘরে থাকব? (রাজাকে) ওগো! তুমি যাও না সৈন্য নিয়ে সেই সাগর-পুরী থেকে জয় করে আনো সেই কন্যাকে — আমি দেখি সেই রাক্ষসের মেয়েকে — তার কত রূপ, কত গুণ, যে আমার কুমারকে এমন পাগল করে!

মদনকুমার : মা! তুমি বড্ড হিংসুটে! একলা বাপের একলা মেয়ে কি না! চলো না মা রাজসভায়, আমার আর ঘরে থাকতে ভালো লাগছে না!

রাজা : (চোখ টিপিয়া) তাই চলোনা রানি। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আর দেখো বাবা মদন-মণি! সেই সে সেকেন্দর শা ফকির, যার জারি গান শুনতে তুমি এত ভালোবাসতে, যে তার দলবল নিয়ে এসেছে তুমি অসুস্থ শুনে। আজ রাজসভাতেই তার গান হবে — কেমন শুনবে তো?

মদনকুমার : সেই সেকেন্দর শা, যার দাড়ি নিয়ে আমি বেণি বাঁধতাম! নিশ্চয়ই যাব বাবা তার গান শুনতে। বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু, বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু (বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল)।

[রাজসভা — সমস্ত সভাসদ বসিয়া আছেন — সেকেন্দর শা তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল]

সেকেন্দর শা : আমাগো রাজকুমার কই — রাজকুমার? বুড়া অইয়্যা গেছি, চক্ষে আর দেখবার পাই না —

(মদনকুমার ছুটিয়া আসিয়া সেকেন্দর শা-র গলা জড়াইয়া ধরিল)

মদনকুমার : দাদু! দাদু! এই যে আমি—

সেকেন্দর শা : (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) দাদুমণি! দাদুমণি আমার! কোন হালায় কইছেরে আমার সোনার দাদু পাগল হইয়া গেছে? হেই কথা শুইন্যা এই তিনডা দিন কাইন্দা কাইন্দা পথ চলছি না তো দৌড় পাইরা আসতেছি — এহন আমার সোনার চাঁদ দাদুরে দেখলাম, দেইখ্যা পরানডা জুরাইলাম।

মদনকুমার : (লুকাইয়া চোখ মুছিয়া) কিন্তু দাদু! এবার তোমার দাড়ি এত ছোটো হয়ে গেল কেন? (মাড়িয়া) হাঁ, চারডা আঙুল ছোটো হইয়া গেছে গ্যা! হ!

হ! পাতলা তো হইয়া গেছে। এ্যা, হে হে হে হে! দাদুর আমার দাড়িতে পাক ধরেছে — না না টাক পড়েছে!

সেকেন্দর শা : আর দাদু! তোমার লাহান যত হালায় টাইন্যা টাইন্যা আমার দাড়ির দফা সাইর্যা দিছে। হালায় ছাগলের পালে যেন শাকের খেত দেখছে!

মদনকুমার : দাদু, আমি এখন মার কাছে বসি গিয়ে। তুমি এখন গান শোনাও, কতদিন তোমার গান শুনিনি!

সেকেন্দর শা : হ! হ! গাইমুই তো, তোমারে গান হুনাইমু না তো আর কোন হালারে হুনামু? হালার যত ছাগলের পাল কয় কিনা দাদু আমার পাগল হইছে! হঃ! কই রে ইস্তাজ! মোস্তাজ বিছুত্যা সব আসছস তো?

দলের সকলে : হয় হয় — হক্কলে আইছি আইগ্গ্যা!

সেকেন্দর শা : এইবার মহারাজের আইগ্যা লইয়া গান ধরি। সভার সক্কলে মন দিয়া শোনেন। আমি যে গান গাইমু তা আমাদের এই রাজপুত্রেরই গান। কত দুখ্য দিয়ে আল্লায় এই রাজপুত্তুর দিয়েছেন তারই কাহিনি কইমু — আপনারা দয়া কইর্যা একটু চুপ কইর্যা শুনবেন — গোল করবেন না। আপনারা গোল করলে আমার গানে গোলমাল হইয়া যাইব গিয়া। আপনারা রঙ্গমঞ্চে দরবারে আসরে ভালো ভালো গান শোনেন। আমি মুখ্যু সুখ্যু সেবক, আমার গান আপনাদের ভালো লাগব না, তবু দয়া কইর্যা শোনেন যদি তাহলে গরিব দুইটা পয়সা পায়। যদি কেউ দয়া কইর্যা কিচু দ্যান, এইখানে ছুইর্যা দিবেন। দোহাই, এই বুইর্যারে হাতে মারুন সইব, কিন্তু ভাতে মাইরবেন না।

জারির সং ও গান

এই কাঞ্চননগরের বাদ্‌শা নাম দণ্ডধর,
একচ্ছত্র রাজপাট যাঁর লাখ লাখ নফর।
রাজার বাড়িতে হলুদ বাঁটে হিরার শিল নোড়াতে —
সোনারূপায় ধরেছে ছাতা শুকায় লইয়া ছাতে।
এত থেকেও সুখ নাইরে রাজার একী হইল।
সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল।
রাজ্যসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়্যা বুড়া।
রাজার এ ধন কে খাইব, রাজা যে আঁটকুড়া।
ভোরে উইঠ্যা দেখে যদি কেউ আঁটকুড়ার মুখ —
সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক।
তাই না শুইনা রাজা দিলেন মন্দিরেতে খিল
আঁটকুড়া মুখ দেখাইবেন না আর তেনায় এক তিল।
পানের বাটায় পান রইল আপনার ঠাঁয় পইর্যা,
সোনার গাড়ুর তীর্থের জল কাঁদে ঝইর্যা ঝইর্যা।
তাই না দেইখ্যা দেবতার মনে হইল কিঞ্চিৎ দয়া

বলেন রাজা ওঠো ওঠো — পুত্র হইব পয়া।
বলেন কী বলেন
তপ্ত সোনার কুমার তোমার ভরবে বাজপুরী
কিন্তু রাজা তাকে পরি করবে বুঝি চুরি।
আঁধার ঘরে রেখো তারে বারোটি বৎসর
পাতালপুরীর মধ্যে রাজা বানাইয়া এক ঘর।
চাঁদ সুরুজ দেখে না যেন তোমার চাঁদের মুখ
বারো বৎসর থাকলে সেথায় কাটবে সকল দুখ।
বারো বৎসর আগে রাজা না খুলিয়ো দ্বার
খুলিলে উদাসী হয়ে ঘুরিবে সংসার।
মদনকুমার নাম রাখিয়ো এই না কবচ লও
(এই) কবচ রানির গলায় বাইন্দ্যা পুত্রের আশায় রও।
কইব কী সে দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া
পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া।
বারো বছর পূর্ণ হইবার তিনদিন যবে বাকি —
রাজপুত্র তো কাইন্দা কাইন্দা ফুলাইল তার আঁখি।
বলে, মাগো চন্দ্র সূর্য জন্মে দেখলাম নাকো
একটিবার মা দেখবার দাও গো মোর মিনতি রাখো।
কাইন্দা কাইন্দা রাজপুত্রের যায় বুঝি দম ছাইড়্যা
মনের দুয়ার খুইল্যা দিল হায়রে মায়ার হাইর‍্যা।
সেই নারে রাজপুত্র একদিন শিকারেতে যায়
সৈন্য লস্কর লইয়া রে ভাই কাঁদাইয়া বাপ মায়।
লোকের মুখে শুনলাম হইল শিকারে এক জ্বালা
স্বপ্নেতে রাজকুমার দেখল কন্যা মধুমালা।

মদনকুমার : মধুমালা! মধুমালা! আমার মধুমালা (বলিতে বলিতে উন্মাদের মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাজকুমার সভা ছাড়িয়ে চলিয়া গেলেন)

রাজা : ওরে ধর, ধর — ওকে ধরো — মন্ত্রী! সেনাপতি! ওকে ধরে রাখো— যেতে দিয়ো না। তুমি কেন মধুমালার কথা বললে শা সাহেব?

সেকেন্দর শা : তুমি ভয় কোরো না রাজা। ওর উপরে আল্লার রহম হইছে, ও জীবনের বড়োপাতায় প্রেমকে পাইছে — মজনুর মতো লায়লিকে পাইছে — ফরহাদের মতো শিঁরিকে পাইছে — এই লায়লিকে যে পায়, লা এলাকে পাইতে তার দেরি হয় না।

[পদ্মা নদীর তীর — সপ্তডিঙা মধুকর যাত্রা প্রস্তুত হইয়া আছে — জাহাজ-ভরতি নৌসেনা ও মাঝি-মাল্লা — কূলে পুরনারীরা বরণের ডালা হাতে লইয়া চক্ষু মুছিতেছে।]

মদনকুমার : (পিতামাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া)
বাবা! মা! তাহলে আমি আসি। তোমরা কিচ্ছু ভেবো না — আমি দেবতার কৃপায় আবার ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি



অমন করে কেঁদো না — তোমার চোখের জল দেখে গেলে আমার নদী-পথের জল দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

রাজা : জানি পুত্র, স্বয়ং মহাকাল যখন বলেছেন, তুমি ফিরে আসবেই — তবু — তবু — (আর বলিতে পারিলেন না — কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।)

রানি : বাবা রুদ্রকুমার! অয়স্কান্ত! তোমরা তবে চোখে চোখে রেখো — ছায়ার মতো ওর সাথে সাথে থেকো — আমার ঘরের বাতি — অঞ্চলের নিধি তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম — শোনো নাবিকগণ, মাঝি-মাল্লা সকলে শোনো — তোমরা সকলে আমার পুত্র। আমার মদনকুমার রাজপুত্র নয় — যুবরাজ নয় — ওকে মনে করবে তোমাদেরই আর-এক ছোট ভাই।

সকলে : মাগো। তোমার পায়ের ধুলো দাও আমাদের মাথায়। ওই চরণধূলির প্রসাদে ওকে আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে এনে দেব। (তরি চলিয়া যাইতে লাগিল)

রাজা : রানি! রানি! তুমি একি করলে? ও যে দেবতার নির্মাল্য — দেবতার পায়ে সঁপে না দিয়ে ওকে দুর্বল মানুষের হাতে সঁপে দিলে? মহাকাল আমার উপাস্য দেবতা! রক্ষা করো, রক্ষা করো ওকে। আমাদের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা করো!

রানি : আমার মদন-মণি! আমার কুমার! আমার খোকা! ফিরে আয়, ফিরে আয়! (মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন)

[দূর হইতে সপ্তডিঙার মাঝিদের গান শোনা গেল]

কেউ কইতে পারে, কোথায় আমার মধুমালার দেশ?

[নীল আকাশে সাদা মেঘের মাঝে ফুলপরি শুক্লা একাদশী তিথির চাঁদের গায়ে হেলান দিয়ে গাহিতেছিল]

গান

ঘুমপরি : আমারে ভাসালে অসীম আকাশে তোমারে ভাসানু জলে,
স্বপনপরি : মাটির মানুষ বোঝে না বেদনা বুঝিত দেবতা হলে॥
ঘুমপরি : ওগো সুন্দর তুমি তো জান না ভালোবাসার কী নিবিড় বেদনা।
স্বপনপরি : জান না তো আমি কাঁদি কত তোমারে কাঁদাই বলে॥

ঘুমপরী : চল দিদি, রাজপুত্রের অবস্থা তো দেখলি — একবার রাজকন্যার অবস্থাটা দেখে আসি — সেই যে বেচারিকে ফেলে এসেছি, একবার ভুলে দেখতে গেলুম না।

স্বপনপরি : তা সত্যি, সতিনের বুক-চাপড়ানি দেখতে পেলে আমাদের বুকের ব্যথা অনেকটা কমবে — চল।

(মধুমালার সোনার পুরী)

মধুমালা : (পাগলিনির বেশে) কুমার! কুমার! এই যে সে আমার কাছে ছিল। আমার স্বামী আমার প্রিয়, কোথায় — কোথায় গেল সে?

চন্দনা : স্থির হও। তোমার কুমার? স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? কাঞ্চননগর বলে

কোনো কালে কোনো দেশের নাম শুনিনি। তার আবার রাজপুত্র — নাম কিনা মদনকুমার !

মধুমালা : এ স্বপ্ন নয় চন্দনা, সাক্ষী আছে ভোরের শুকতারা, পিঞ্জরের শুকশারি আর এই — এই ধানি রঙের উত্তরীয়। তার এই অঙ্গুরি, এই পদ্মমণির মালা এবং সবাই জানে সে এসেছিল — পূর্ণিমার চাঁদ সাগর সিনানে এসেছিল — তারপর চলে গেল ওই দূর আকাশে।

চন্দনা : সই, এ সব সত্যি, তাই এ নিয়ে রাজ্যময় হুলস্থুল পড়ে গেছে। কিন্তু সাগর-ঘেরা দ্বীপে এত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে বিদ্যাধর ছাড়া মানুষ কখনও আসতে পারে না। সই, এখন একটু ঘুমোও, আর কত রাতের পর রাত এমনি জেগে থাকবে ?

মধুমালা : সে তো মানুষ নয় চন্দনা, সে যে আকাশের চাঁদ, আমার অন্তর-দেবতা। আমি দিবানিশি সে সুন্দরের ধ্যান করেছি এই সাগর-ঘেরা দ্বীপের সোনার পুরীতে। সেদিন রাতে সেই সুন্দর এসেছিল রূপ নিয়ে। রাতের তারার মতো সে দিনের আলো সইতে পারে না। (বাতি কমিয়া আসিতে লাগিল) একী ! আমার চোখে চারিদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন ? কে — কে আমার বাতি নেভালে ? কে — কে তুমি, আমার নিশীথিনীকে এমন অন্ধকারে ঢেকে দিলে ? ও ! কুমার ! তোমার রূপের আলোতে ঘর আলো হবে বলে বুঝি সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছ ? লজ্জা ? কাকে লজ্জা ? ও আমার সই — চন্দনা। ওকে আবার লজ্জা কীসের ? ওগো শুনছ ? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আমার নাম ধরে ডাকোনা ? কই, কোথায় গেলে ? ওগো শুনছ ? (বলিতে বলিতে আবেগে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।)

চন্দনা : সই — সই মধুমালা — হায় হায়, কোন দিকে যাই আমি ? ওদিকে মহারাজ মহারানি উপোস দিয়ে কাঁদছেন, এদিকে সই মূর্ছিতা ! সই — ও সই — (উঠিয়া গিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে জলের পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিল। মধুমালার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়া) কথা বলো — কথা বলো সই ! স্বপ্নে যাকে দেখেছ সে বিদ্যাধর ছাড়া কেউ নয়। কুমার কী করে আসবেন এই সাগর-ঘেরা সোনার পুরীতে ?

মধুমালা : (চক্ষু উন্মিলিত করিয়া) কী বললে সই, কুমার এসেছেন ? কোথায় তিনি — কোথায় আমার জনম জনমের স্বামী ? কোথায় —

চন্দনা : একটু শান্ত হও সই — মহারাজ মহারানির দিকে ফিরে তাকাও। তোমার এ হাল দেখে তাঁরা উপোস করে পাশের ঘরে কাঁদছেন। তাঁরা এসে তোমাকে কত বোঝালেন। তুমি একটিবার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলে না — তাঁদের চিনতে পারলে না। একি তাঁদের কম দুঃখ।

মধুমালা : বাবা ? মা ? কোথায় — কোথায় তাঁরা ? বাবা ! বাবা !

রাজা . মা মধুমালা ! এই যে — এই যে আমি। চন্দনা, রানিকে খবর দে, মধুমালার জ্ঞান ফিরেছে। মা মধুমালা ! আমি মদনকুমারের খোঁজে দেশে

দেশে লোক পাঠিয়েছি। যে তার খোঁজ এনে দিতে পারবে তাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দেব। তোমার সোনার পুরীর সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। কোথাও আর কোনো প্রহরী নেই। সে যদি আসে কেউ তাকে বারণ করবে না। একটু চুপ করে ঘুমোও মা লক্ষ্মী আমার।

মধুমালা : বুঝলে বাবা সে ভারী দুষ্টু — ভারী চঞ্চল, এবার সে এলে আবার সোনার পুরীর সকল দুয়ার বন্ধ করে দিয়ো। যাওয়ার জায়গায় সাত হাজার প্রহরী বসিয়ো। লোকের পাহারা নয় বাবা, চোখের পাহারা।

রাজা : মা। দিনের মাঝে একবার করে এমনি দুটো কথা বললে যে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তোর মুখের হাসি না দেখলে যে এই সন্দ্বীপের একটি ফুলও ফোটে না মালা।

মধুমালা : ফুল আর ফুটবে কী করে, বাবা! ফুলের দেবতা যে এসে চলে গেছেন, সেই অভিমানে ওরা ফুটছে না। আমার মতোই সবাই চোখ বুজে আছে। সে এলে দেখবে সন্দ্বীপ হয়ে উঠেছে ফুলের রাজ্য।

চন্দনা : (রাজাকে) রানিমা পূজায় বসেছেন — পূজা সেরে এখনই আসছেন। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) তোর লজ্জা করে না বাবার কাছে বরের কথা বলতে ?

মধুমালা : (বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) বা — রে। বাবার কথা বলতে মা তো লজ্জা করে না। আচ্ছা বাবা, তুমিই বলো তো, বরের কথা যদি বাবা- মাকেই না বলব তবে কি অন্য গাঁয়ের লোক ডেকে বলব ? আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি বাবা, সে এলে আমি এতটুকু লজ্জা করব না। তোমার সামনেই কথা বলব — রাগ করব, ঝগড়া করব — আচ্ছা বাবা, বর জিনিসটে কি খুব লজ্জার ?

রাজা : হ্যাঁ, মা, বর যদি বর্বর হয় তবে তার চেয়ে নারীর লজ্জার আর কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে লজ্জা করতে হবে না মা, সে এলে আর যে যায় যাবে — আমি পালিয়ে যাব না।

মধুমালা : (সলজ্জভাবে) বাবা! এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কোন দেশ বলতে পার ?

রাজা : (হাসিয়া) কাঞ্চননগর, না ? কিন্তু আমি বলব মা, যে দেশে আমার মা মধুমালা থাকে, তার চেয়ে সুন্দর দেশ ত্রিভুবনে নেই।

মধুমালা : বাবা! কতদূর — কোথায় সেই কাঞ্চননগর ? তার পথের ধূলিতে বুঝি সোনার রেণু ছড়ানো ? তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বুঝি লজ্জা পায় তার কুমারের রূপে ? কোথায় আমার সেই কাঞ্চননগর ? কোথায় সেই কাঞ্চননগরের কুমার ?

রাজা : বহু সন্ধান করে সে দেশের খোঁজ পেয়েছি, মা। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের গারো পর্বতের কাছে সে দেশ! মহারাজাধিরাজ দণ্ডধর সে দেশের অধিপতি। আমি তাঁর কাছে দূত পাঠিয়েছি মা। মদনকুমার নামে যদি তাঁর কোনো পুত্র থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে এখানে আসবেন।

তিনি বাঙালি — আমিও বাঙালি, আমার মধুমালাকে নিশ্চযই বধূত্বে বরণ করবেন।

[বাবা বলিয়া মধুবালা অশ্রুপূর্ণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া সানন্দে বাবাকে জড়াইযা ধরিল। পিতা সস্নেহে সাশ্রুনয়নে কন্যার পৃষ্ঠে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

মধুবাড়া : (সহসা চমকিয়া উঠিয়া) বাবা! বাবা! সে আসছে — আমার বুকের মাঝে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি — তার আগমনীর বাঁশি বেজে উঠছে আমার প্রাণে।

রাজা : লক্ষ্মী মা আমার, অত উতলা হযো না।

মধুমালা : চাঁদ ওঠে সে কোন্ দূর আকাশে, তবু পৃথিবীর সাগরের বুকে জাগে আনন্দ-জোয়ার, সে আর তখন কূলের বন্ধন মানে না। তরঙ্গের পাখা মেলে সে উড়ে যেতে চায় আকাশে। চাঁদ ওঠার খবর সাগর কী করে পায়? কোন আঁধার বনে ফোটে ফুল — ভ্রমর কেমন করে জানতে পারে? আমার চাঁদ উঠেছে দূর-দিগন্তে, তাই ঝিলের জলের কুমুদিনীর মতো আমার সারা অঙ্গে জেগেছে না-জানা আনন্দের আবেশ। গোপিনীরা কী করে শুনতে পেত কানুর বাঁশি? আমি শুনেছি — শুনেছি আমার সুন্দরের বাঁশি। নদী যেমন শুনতে পায় সাগরের ডাক, তেমনই তার প্রতি পদক্ষেপে দুলে উঠছে আমার অন্তর। দেবতা জেগেছেন, তাই আমার অন্তর-দেউলের দুয়ার গেছে খুলে, বেদি উঠেছে দুলে। অরুণোদয় হয়েছে — তাই আমার ঘুমন্ত-ভাষা-প্রভাতের পাখির মতো মেতে উঠেছে কল-কণ্ঠে। ওগো আমার অনাগত শুভদিনের তরুণ-অরুণ, তোমায় নমস্কার — নমস্কার। (বলিতে বলিতে মূর্ছা)

রাজা : চন্দনা, শিগগির রানিকে খবর দে, মা বুঝি আবার জ্ঞান হারাল। (ব্যস্তসমস্ত হয়ে মধুমালাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

[মেঘনার ও পদ্মার মুকে মদনকুমারের সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে চলেছে — মাঝিদের গান]

(ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস কোথায় মধুমালা?
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী কাঁদে রাজ-বালা
কোথায় মধুমালা?
(তার) গলায় দোলে রাজপুত্রের গলার পদ্মমণি,
চাঁদের মুখে একটুখানি তাহার লাবনি
পাথার-জলে পা ডুবিয়ে কাঁদে সে নিরালা
কোথায় মধুমালা॥

অয়স্কান্ত : একে মনসা তাতে আবার তোরা ধুনোর গন্ধ দিসনে বাবা। তার চেয়ে গা না —

গান

বোন রে বোন এ কোন্ রূপ দেখালি,
যেন হাঁড়ি মাথায় বেরাণী হোগলা বনের শেয়ালী॥
তাম্বুরা-প্রায় পেটরে তাহার জাম্বুরা-প্রায় গাল
(তার) চিকন গায়ের ছাল যেন খাজা কাঁঠাল॥
গাঁদালপাতার মালা গলায় দাঁড়িয়েছিল শ্যাওড়াতলায়
অঙ্গা দেখি ঘেঁটু ফুল ভরালি॥

একজন মাঝি : কর্তা! আপনার কথা শুইন্যা শুইন্যা প্যাটের বাঁধন ছিইর‍্যা গেল গিয়া, আপনি এ্যাহন ক্ষেমা দেন, এত হাসলে দাঁড় টানার জোর পাইমু না।

মদনকুমার : ওই — ওই — কালো মেঘের এলোকেশ দুলিয়ে সে আসছে। ওই — ওই — তার ধূলায় ধূসর চন্দন-রঙ উত্তরীয়। আকাশে ঝড় উঠিয়ে সে আসে। আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

মাঝি : হয় হয় হাচাই তো। ওরে ঈশান কোণে মেঘ উঠছে রে, নৌকা তীরে লও — তীরে লও। আর যদি তীরে যাওনের আগে তুফান আইস্যা পড়ে — তাইলে সাবধান। হাল খুব শক্ত কইর‍্যা ধইর‍্যা বইস্যা রইবি — খবরদার হুঁশিয়ার।

অয়স্কান্ত : (ছুটোছুটি করিতেছে) আর খবরদার। ততক্ষণে ঝড় যে এসে পড়ল।

রুদ্রকুমার : সেনা-সামন্ত মাঝি-মাল্লা সব হুঁশিয়ার! প্রাণপণে হাল ধরে থাকবে। নৌকা তীরে নেবার চেষ্টা করো না। তুফান এসে পড়েছে। (ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি তুফান সাইক্লোন — মাঝি-মাল্লার সেনা-সামন্তের কলরোল। সাইক্লোনের বেগে বিপুল আর্ত কোলাহলের মধ্যে সপ্তডিঙা ডুবিয়া যাইতে লাগিল)

মদনকুমার্য : (উদভ্রান্তের মতো) আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে। ওই বিজলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি-গৈরিক গগন-কোণে দোলে তার চন্দন-রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার। ঝঞ্ঝার রাতে অসীম বিরহের আর্ত রোদন-ধ্বনি আমি শুনছি। মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি মধুমালা — মধুমালা। (জলে ঝম্প প্রদান)।

[পার্বত্য চট্টগ্রাম বা মগ রাজ্যের প্রমোদভবন! সপারিষদ মগরাজ সুরা পানে রত]

মগরাজ : (সুরাপান করিতে করিতে) আমার এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালি মগের মুল্লুক নাম দিয়েছে না, মন্ত্রী? তার চরম প্রতিশোধ আমি কী করে নেব জান?

মন্ত্রী : বাংলার জলে-স্থলে আমরা যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছি তারও অধিক শাস্তি আমি তো কল্পনা করতে পারি না মহারাজ।

মগরাজ : পারবে কেমন করে? তা হলে তুমিই রাজা হতে, আমি হতাম তোমার আদেশ পালনের মন্ত্রী।

মন্ত্রী : মহারাজ, আমার কর্তব্য মন্ত্রণা দেওয়া, আদেশ পালনের কর্তব্য সেনাপতির।

মগরাজ : ওই — যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। যাক, কী শাস্তির কথা বলছিলাম জান ? আমার ওই কুৎসিত কুব্জপৃষ্ঠ আকাট-মূর্খ পুত্রের সঙ্গো বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজকন্যার বিবাহ দেব।

মন্ত্রী : ওই ছেলেকে দেখে স্বেচ্ছায় কোনো রাজা কেন, প্রজাও কন্যা দান করবে না। তবে যদি জোর করে কেড়ে আনেন সে কথা স্বতন্ত্র।

মগরাজ : জোর করে নয় মন্ত্রী। বলে নয় ছলে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেব। আমি ক্ষত্রিয় — কাজেই বাঙালি ক্ষত্রিয় কোনো রাজার আমার পুত্রকে কন্যা দিতে বাধবে না।

মন্ত্রী : তা জানি মহারাজ। বাধবে শুধু আপনার পুত্রের কুঁজে।

মগরাজ : আমি খুঁজে খুঁজে সে কুঁজের ওষুধ বার করেছি। সেনাপতি !

সেনাপতি : মহারাজের আদেশ।

মগরাজ : কাল যাকে নদী তীরের বালুচরে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে তাকে এখানে আনো।

[বন্দি অবস্থায় মদনকুমারের প্রবেশ]

মন্ত্রী : এ কী ! এ সোনার চাঁদকে কোন আকাশে জাল পেতে ধরলেন মহারাজ ?

মগরাজ : বুদ্ধির জাল পাততে জানলে চন্দ্র কেন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলকেই ধরা যায় মন্ত্রী — এ তো দুধের ছেলে। সেনাপতি ! ওর বন্ধন মুক্ত করে দাও। যুবক ! তুমি ওই আসন গ্রহণ করো। তুমি পথ-শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, খনিক নৃত্য-গীতের বাতাস লাগিয়ে চিত্তকে সুস্থ করো। সেনাপতি ! ডাকো মণিপুরী নর্তকীদের। তোমার পান-টান চলে তো হে ছোকরা ? দেখে তো রাজার পুত্র — অন্তত সওদাগরের পুত্র বলেই মনে হয়।

মদনকুমার : মহারাজ আমায় মার্জনা করুন। আমি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান, এসব কখনও খাইনি।

মগরাজ : বল কী হে ? যেদিন তোমায় সমুদ্র থেকে তুলেছিল সৈনিকবৃন্দ, সেদিন নাকি তোমার পেট থেকে আধ-সমুদ্দুর জল বের করেছিল। আচ্ছা বাবা, সত্যি বলো তো, অগস্ত্য মুনি কি তোমার মামা-টামা কেউ হতেন ?

[নর্তকীদল লইয়া সেনাপতির প্রবেশ]

আচ্ছা, তোমার ঠিকুজি কুষ্ঠি পরে দেখব, এখন গান শোনো। কিন্তু সাদা চোখে কি নাচ গান ভালো লাগে বাবা ? অঃ ! ভুলে গেছি — তোমার মুখে যে এখনও মাতৃস্তনের গন্ধ লেগে রয়েছে — তুমি এ রসের স্বাদ গ্রহণ করবে কী করে ? নাচো বাছা — তোমরা নাচো।

(মণিপুরি নৃত্য ও গান)

আমরা বনের পাখি বনের দেশে থাকি।
ফিরি পাহাড়ি ফুলের রাঙা পরাগ মাখি॥

মোরা ঝরনা ধারে ওই নীল পাহাড়ে —
দেবদারুর শাখায় বাঁধি লতানো রাখি॥
শুনি বন-উদাসী মিঠে পাহাড়ি বাঁশি
মোরা শিস দিয়ে রাখাল ছেলেরে ডাকি॥

মগরাজ : চমৎকার! সুন্দর! সেনাপতি! তোমার আর মন্ত্রীর সাথে আমার কিছু গুপ্ত মন্ত্রণা আছে — আমি চাই এখানে আমরা তিনজন আর ওই যুবক ছাড়া আর কেউ না থাকে।

[সেনাপতির ইঙ্গিতে মন্ত্রী ছাড়া আর সকলে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া গেল]

মগরাজ : শোনো মন্ত্রী। আমি গৌড়েশ্বরের লোককে এই ছেলেটিকে দেখিয়ে আমার ছেলে বলে পরিচয় দেব। ওরা আমার আমন্ত্রণে পাত্র দেখতে এসেছে। (মদনকুমার চমকিয়া উঠিল) কী হে যুবক! তুমি অমন করে চমকে উঠলে যে! তোমায় মারবও না ধরবও না। দিব্যি বঙ্গেশ্বরের জামাই বাবাজি হবে ঘণ্টা কয়েকের জন্য। তারপর ব্যাস ছুটি! ওরা তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবে — আমার পিতা রাজাধিরাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধীশ্বর শ্রীল শ্রীচক্র সেন, বুঝলে?

মদনকুমার : যদি না বলি!

মগরাজ : 'না' বললে কারাগারে পাঠিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। কিন্তু কেন 'না' বলবে হে নির্বোধ যুবক? তোমার মতো পথের ভিখারির এক মুহূর্তের জন্যও রাজপুত্র হওয়া কি কম কথা? ব্যাস, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাবে। তুমি বর সেজে বাসর ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে পড়বে। তারপর যা করার আমি করব।

মন্ত্রী : মহারাজ! কিন্তু বাসরঘরে আপনার কুৎসিত কুব্জ পুত্রকে দেখে যখন রাজকন্যা চিৎকার করে উঠবে, তখন?

মগরাজ : তারও উপায় ঠিক করে রেখেছি — কি বল সেনাপতি?

মদনকুমার : কিন্তু মহারাজ আমার মধুমালা — মধুমালার কী হবে?

মগরাজ : আরে মধুমালা নয়, মধুমালা নয়, কন্যার নাম কাঞ্চনমালা।

[চিত্রসেন রাজার পুত্র বিচিত্রকুমারের প্রবেশ। কুব্জপৃষ্ঠ নাক মোটা — তোতলা — হাবা — অতি কুৎসিত।]

বিচিত্রকুমার : বাবা! আমার নাকি ইয়ে ইয়ে বিয়ে! আমি বউ বউ বউ দেখব, বউ-এর কোলে মেনি বেরালটির মতো চুপটি করে শুয়ে থাকব। এ সু সু সু সুন্দরি কে? (মদনকুমারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল)

মগরাজ : বেরো — বেরো আমার সামনে থেকে বলছি — ব্যাটা হাবার ডিম, অকালকুষ্মাণ্ড, কুমড়ো পটল! আরাকান কুলের কলঙ্ক — ব্যাটার চেহারায় আমার রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে গেল! খবরদার! এ দুদিনের মধ্যে যদি বাড়ির বের হয়েছিস তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

বিচিত্রকুমার : (ক্রন্দনের সুরে) ওমা — মাগো — আমায় মেরে ফেললে গো তোমার

বি-বি-বিচিত্র কুমড়োকে বাবা কেটে ফেললে গো! মা বললে তোর বিয়ে—টুক-টুক-টুকটুকে-বউ-বউ-বউ আসবে! বাং-বাং-বাংলার রাজার লোক এসেছে — আমি তাদের বলে এলুম — আমি তোদের কনের বর। তারা শুনে বোঁচকা প্যাঁটরা বেঁধে রওয়ানা দিচ্ছে তাই বলতে এলুম — আর আমায় কিনা ধমক দেওয়া! (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

মগরাজ : এই হয়েছে! সেনাপতি! তুমি এখনই যাও — তাঁদের ফেরাও — বলো গিয়ে ও রাজবাড়ির চাকরের ছেলে — হাবা নির্বোধ। ও নিজেকে রাজার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। আর মন্ত্রী—মন্ত্রী তুমি তাড়াতাড়ি এই ছেলেটিকে রাজবেশ পরিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও! যাও — যাও দেরি কোরো না, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

রানি বৃশ্চিকা : বলি, কে চাকরের ছেলে? (রানির পশ্চাতে বিচিত্রকুমার কাঁদিতেছিল আঁখি ধরিয়া) লজ্জা করে না নিজের ছেলেকে চাকরের ছেলে বলে পরিচয় দিতে? অঃ! পেটপুরে গেলা হয়েছে বুঝি? তা নইলে এমন জ্ঞানের কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! (ততক্ষণে মগরাজের নেশা প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে)

বিচিত্রকুমার : ওগো মা গো! আমি — আমি চাকরের ছেলে হব না গো — আমি বাবার ছেলে মা গো।

রানি বৃশ্চিকা : হ্যাঁ, তুই যদি চাকরেরই ছেলে হস, তাহলে তোর মার ওই পা-টেপা চাকরের ছেলে। (রাজাকে দেখাইল) বলি, নিজের চেহারাখানা একবার আয়না দিয়ে দেখেছ? আয়না ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করবে যে! ওই চেহারায় শুয়োর না হয়ে এই ছেলে যে হয়েছে, এই আমার বাবার ভাগ্যি!

মগরাজ : আঃ! রানি কর কী? কর কী? ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে — দেখলে কী বলবে বলো তো? আমি তো তোমার ছেলের ভালোর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছি — দেখো তো ওই কোণের ছেলেটিকে — ওটিকে তোমার ছেলে বলে কোলে নিতে ইচ্ছা করে না? এখন ওকেই দেখাই। তারপর বিয়ে চুকে গেলে ও চলে যাবে।

রানি বৃশ্চিকা : আহা! আহা! এ কার ঘরের মানিক গো? কার ঘর আঁধার করে ওকে চুরি করে এনেছ?

মগরাজ : চুরি করে আনিনি — ও সাগরের জলে ভেসে এসেছে। সমুদ্রের বালুচরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমার সৈন্যেরা দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

রানি বৃশ্চিকা : (কাছে গিয়া) তোমার দেশ কোথায় বাবা? তোমার নাম কী? তোমার মা নিশ্চয়ই রাজরানি — নইলে এমন ছেলে পেটে ধরে?

মদনকুমার : (প্রণাম করিয়া) কে তুমি মা এমন করে ডাকলে? তোমার কণ্ঠস্বরে আমার মা-র কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কতদিন হল তাঁকে হারিয়েছি। আমার মা রাজরানি নয় মা, পথের কাঙালিনি। দারিদ্র্যের তাড়নায় এক বণিকের দাস হয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিলাম। পথে তুফানে আমাদের

জাহাজডুবি হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমি এই রাজপুরীতে বন্দি। কিন্তু মা — আমার মধুমালার পথ যে হারিয়ে গেল।

মগরাজ : ওই-ওই দেখো আবার পাগলামি আরম্ভ হল। বেশ থাকে, হঠাৎ মাঝে মাঝে 'মধুমালা' করে কেঁদে ওঠে। মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।

রানি বৃশ্চিকা : তুমি থামো! জাহাজডুবির সময় তক্তায়-টক্তায় বাছার মাথায় হয়তো লেগেছে। বাবা! চলো, তুমি আমার ঘরে শোবে চলো! খেয়ে খানিক ঘুমুলে সব ভুলে যাবে দেখে নিয়ো।

বিচিত্রকুমার : ওগো মা গো! ওই সুমুন্দিকে নিয়ে এই চাঁদপানা ছেলেকে ফেলে শুয়ো না গো। মাগো! আমি তোমার কাছে ঘুমুব গো। আমার — আমার বউকে কি তাহলে ওই সুমুন্দি বিয়ে করবে নাকি? মা গো — আমার মা—মা—মা—মালঞ্চমালা গো!

রানি বৃশ্চিকা : আঃ! কাঁদিসনে খোকা! এ তোর ছোটো ভাই, ভাইকে কি ওসব গালমন্দ দিতে আছে? এক মায়ের কি দুই ছেলে থাকে না? (মদনকুমারের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া চুমু খাইলেন)

বিচিত্রকুমার : ভাই না ছাই — ওই সুমুন্দিকে ভাই বলতে যাব কোন দুঃখে? আমি যে এতদিন একলা মায়ের একলা পুত ছিলাম। এ শালা ঢোকলা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল রে — ওরে আমার মালঞ্চমালা—মা—মা মালারে— (প্রস্থান)

[বঙ্গেশ্বরের রাজভবনে বাসরঘরে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালা পাশাপাশি বসিয়া। পুরনারীদল ঘিরিয়া বসিয়াছে। বাহিরে রোশনচৌকি ও সানাই ইত্যাদি মধুর বাদ্য শোনা যাইতেছে।]

একজন পুরমহিলা : আহা! কী রূপ, এক চাঁদ যেন দু-খণ্ড হয়ে এসেছে।

অন্য একজন মহিলা : কিন্তু যাই বল দিদি, বরের পাশে কনে যেন চাঁদের পাশে তারার মতো মিটমিট করছে। সত্যি কথা বলব তার আবার ভয় কী? (কাঞ্চনমালা হাসিয়া বরের আঙুল মটকাইয়া দিল)

মদনকুমার : (বিরস বদনে বসিয়াছিল — তাহার মন চোখ যেন কোন দূরে চলিয়া গিয়াছে। আঙুল মটকাইতে কনের দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল) উঃ! (আঙুলে হাত বুলাইতে লাগিল।)

জনৈক সখী : কী লো, এখন থেকেই শাসন করছিস? একটু দেখি না ভাই, তারপর তো থাকবিই দুজনে সারা রাত — এত উতলা হসনে — তোর বরকে কেউ কেড়ে নেবে না।

অন্য একজন : (মুখ ফিরাইয়া) ওই যে বলে, যে ধনী ধন পায়, দিনে দেখে তারা—

আর একজন পুরমহিলা : ওলো, মহারাজকে বল যে এই নাচুনিদের আনলি, — তা দু-একটা গান শুনবি, নাচ দেখবি না বরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ওকে গিলে খাবি? মা গো মা, দেখছে না তো যেন চোখ দিয়ে গিলছে! গাও গো বাছারা — বরকনেকে ঘিরে দুটো গান গাও, শুনে চলে যাই। আমাদের উনি আবার হা পিত্যেশ করে পথ চেয়ে বসে আছেন।

(নর্তকীদের গান ও নাচ)

মধুর মধুর! আজি সকলই মধুর
মধুর মালা গলে মধুর বঁধুর॥

মদনকুমার : ও নাম তোমরা কার কাছে শুনলে? মধুমালা — মধুমালা, ও নাম তোমাদের কে শেখাল?

[নর্তকীরা হাসিয়া নাচিতে লাগিল]

জনৈক মহিলা : ওমা জামাই-এর মাথায় ছিট আছে নাকি লা?

জনৈক কিশোরী : মাসি! পালাও পালাও — কামড়ে দেবে।

জনৈক মহিলা : আমরা তোদের চক্ষুশূল হয়েছি, না লা? বলি তোতে আমাতে বয়সের তফাত কত যে, ওকথা বলছিস?

অন্য একজন পুরস্ত্রী : আঃ! তোমরা গান শুনতে দেবে — না এমনি কচকচি করবে?

[নর্তকীদের গান]

মধুর চাঁদের পাশে মধুর রোহিণী হাসে
মধুর ফুলের মুখে মধু ভরপুর।
মধুর মিলন রাতি মধুর জাগায় সাথি
মধুরতর হল মধুরতর ওলো
কাছে এসে বিধুর সুদূর।

জনৈক মহিলা : ওলো, বরের চোখমুখ যেন ক্রমেই কেমন হয়ে উঠছে। তোমরা কিছু মনে কোরো না বাছারা, ওদের একটু একলা থাকতে দাও। (উলু দিতে দিতে সকলে প্রস্থান। দু-একটি ফাজিল মেয়ে উলুধ্বনির সাথে চিৎকার করিয়া উঠিল 'ভল্লু ভল্লু ভল্লু!')

একটি মেয়ে : (কান ধরিয়া) ওর নাম মধুমালা নয় কাঞ্চনমালা — মনে রেখো, — বুঝলে? এই কান ধরে ভালো করে কানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম! (সকলের হাস্য)

মদনকুমার : (কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ওটি বোধ হয় তোমার কোনো সম্পর্কের বোন — ওর হাতের চেটো তো নয় কেটো! রাজবাড়ির মেয়ের হাত এমন হাতার মতো হয় — এ আমার জানা ছিল না।

কাঞ্চনমালা : দাঁড়াও আমি আগে প্রণাম সেরে নিই (মদনকুমারকে হাত ধরিয়া উঠাইল। বাহির হইতে একজন মেয়ে বলিয়া উঠিল — 'ওলো দোরে ভালো করে খিল দে, পালঙ্কের নীচে কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখে নিস। জানালাগুলি বন্ধ করে দে — সব দেখতে পাচ্ছি যে!')

কাঞ্চনমালা : একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মদনকুমার : বলো।

কাঞ্চনমালা : মধুমালা কে?

মদনকুমার : তোমায় সব বলছি শোনো। আমি আরাকানের রাজকুমার নই — আমার নামও বিচিত্রকুমার নয়।

কাঞ্চনমালা : (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তাহলে তুমি কে?

মদনকুমার : বোসো স্থির হয়ে শোনো — আমার বেশি সময় নেই — আমাকে এখনই চলে যেতে হবে — হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে সেই মধুমালার সন্ধানে, হয়তো আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। আমি — আমি তোমার স্বামী নই — তোমার স্বামী যে সে এখনই আসবে — অতি কুৎসিত তার চেহারা — তবু সেই তোমার স্বামী।

কাঞ্চনমালা : ওগো! তুমি অমন কথা বোলো না। আমার বুক কাঁপছে। আমাকে ধরো — আমার মাথা কেমন করছে (মদনকুমার তাড়াতাড়ি বুকে ধরিলেন) আঃ। স্বামী। আমি যে নারায়ণ শিলা স্পর্শ করে তোমাকেই স্বামী বলে বরণ করেছি — শুভদৃষ্টির ক্ষণে তোমারই ওই সুন্দর মুখ দেখেছি। কুৎসিত হোক সুন্দর হোক — এই ত্রিভুবনে আমার স্বামী আর কেউ নেই, হবে না, হতে পারে না।

মদনকুমার : শোনো তবে আমার সত্য পরিচয়। আমার নাম মদনকুমার। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ।

কাঞ্চনমালা : তুমি! তুমি সেই সুন্দর — তোমার রূপের খ্যাতি যে আজ বাংলার ঘরে ঘরে — মুখে মুখে! তোমার বাবা যে আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। আমি যাই, বাবা মাকে বলে আসি।

মদনকুমার : (হাত ধরিয়া) না, তা হতে পারে না। শোনো, তুমি হয়তো আমার সব কথাই শুনেছ। আমি মধুমালার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজডুবি হয়ে আমার সেনাসামন্ত সকলে মারা যায়। আমার যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম আমি মগরাজের রাজপুরীতে বন্দি। মগ-রাজপুত্র অতি কুৎসিত বলে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তাঁর পুত্রের সম্বন্ধ ঠিক করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই শর্ত যে বাসরঘরে ঢুকেই আমি বেরিয়ে পড়ব — তিনি তাঁর সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক করে নিয়ো। ভগবান তোমাকে কুৎসিতের হাত থেকে রক্ষা করুন।

[সহসা দ্বার খুলিয়া প্রস্থান। কাঞ্চনমালা অতি করুণ স্বরে আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনি সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বিচিত্রকুমার প্রবেশ করিল]

বিচিত্রকুমার : (উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া — চুল ছিঁড়িয়া) ওরে বাপরে, আমি কোথায় বাপরে। রূপ দেখে যে মাথা ঘুরে যায় রে বাবা। বাবা মামা! একটু হুঁশ রেখো বাবা! এ যে রূপের পাহাড় রে বাবা! কা—কা—কা—কাঞ্চনমালা—মা—মা—লা। আমি এসেছি — আমি তোমার বরটি — তোমার সোয়ামী — তোমার কোলের মেনি বেরালটি।

কাঞ্চনমালা : (জাগিয়া উঠিয়া) কে? কে তুমি কুৎসিত! যাও, দূর হও এখনি আমার সামনে থেকে নইলে (তরবারি লইয়া) তোমায় — তোমায় আমি হত্যা — হত্যা করব — যাও—পালাও — পালাও।

[বাহিরে বহু স্ত্রীকণ্ঠের শব্দ, ওগো, বানিমাগো শীগগির ছুটে এসো - কাঞ্চনমালা তার বরকে কেটে ফেললে গো]

[দোর খুলিয়া রানির প্রবেশ]

রানি : কাঞ্চন! কাঞ্চন! (তরবারি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন)

[বিচিত্রকুমার ততক্ষণে পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া পড়িয়া পালাইবার দাঁও খুঁজিতেছে]

রানি : ছিঃ ছিঃ। তুই আমাদের কুলে কলঙ্ক দিলি। কলঙ্কিনী! কী করে তুই বাসরঘরে বিয়ের রাতে অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কাটতে গেলি! পোড়ারমুখি, অমন কার্তিকের মতো ছেলেকে দেখেও তোর মন উঠল না? আমি কী করে এ পোড়ার মুখ লোককে দেখাব? কই, আমার সোনার চাঁদ কোথায় গেল?

কাঞ্চনমালা : (কাঁদিয়া ফেলিয়া) মা! সে চলে গেল — চলে গেল! আমি যাকে কাটতে গিয়েছিলাম সে তোমার জামাই নয়।

রানি : কে — কে তবে এল এ ঘরে?

কাঞ্চনমালা : (পালঙ্কের নীচে বিচিত্রকুমারকে দেখাইয়া) ওই দ্যাখো, ওই নির্বোধ কুৎসিতকে কাটতে গিয়েছিলাম। মগরাজের প্রতারণার কথা তোমাকে সব বলছি — কিন্তু তার আগে ওকে বের করে দাও এখান থেকে।

রানি : উঃ! মাগো! এ হনুমান কোত্থেকে এখানে এল? পাঁড়ে! চৌবে! দৌবারিক!

[সকলে আসিয়া হাজির হইল]

রানি : এই হনুমানের কান ধরে মারতে মারতে রাজার কাছে নিয়ে যাও — তাঁকে বলো, দিদিমণির ঘরে এই চোর চুরি করতে ঢুকেছিল।

[পাড়েঁজি চৌবেজি ইত্যাদির বিচিত্রকুমারকে প্রহার ও গালিবর্ষণ — চল রে শালা চোট্টা, চল চল]

বিচিত্রকুমার : আমি চোর না, চোর — তোমাদের রাজকন্যার মনোচোর — তোমাদের রাজার জামাই — জা-জা-জা-মাই! ওগো, মাগো, মেরে ফেললে গো!

চৌবেজি : জামাই-জামাই! তব চল না সবেরসে ঘানি টানবে — চল চল।

[গৌড়েশ্বরের রাজপুরী — রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী ইত্যাদি]

রাজা : শঠ! প্রতারক! মগের মুল্লুকের রাজা কিনা পাজির পা ঝাড়া। বলে যুদ্ধ করব — ওই হনুমানের হাতে আমার মেয়েকে দিতে হবে?

সেনাপতি : মহারাজ! ওরা রাজপুরীর তোরণ-দ্বার আক্রমণ করেছে। আদেশ দিন, ওদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি — সাগরপারের হনুমানকে সাগরপারে রেখে আসি।

মন্ত্রী : কিন্তু এত বিপুল সৈন্য এল কোত্থেকে? গঙ্গার বক্ষ তার সহস্র রণ-তরি ছেয়ে ফেলেছে।

রাজা : দুর্দণ্ড কি এর জন্য প্রস্তুত না হয়ে এসেছে মনে কর মন্ত্রী? এতদিন বাংলার ভাণ্ডার লুটে যে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শাস্তি দেব — সমুচিত শাস্তি দেব। যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো — আমিও আসছি।

মন্ত্রী, তুমি কুল-ললনাদের রক্ষা করো — যদি মগ জয়ী হয় — ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়ো। আমি চললাম।

[বাহিরে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ]

[রক্তাক্ত কলেবরে রাজার প্রবেশ]

পালিয়েছে। ভীরু পালিয়েছে গঙ্গার পথে। সাগরপারের হনুমান সাগরপারে পালিয়েছে। (বসিয়া পড়িয়া) মা-মা কাঞ্চনমালা, কই, আমার কাঞ্চনমালা কই — আমার সোনার চাঁদ মদনকুমার কই? (মূর্ছা)

[পার্বত্য অরণ্য পথ -- বীর বেশধারী রাজার পুত্র মদনকুমার পথ চলিয়াছে]

গান

ও বন-পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ?
সেই শেষে কি আছে আমার মধুমালার দেশ রে,
মধুমালার দেশ॥
পাহাড় রে তোর কাল কোলে
সাগর ঢেউ-এর মালা দোলে
সেই সাগরের তীরে বসে শুকায় কি তার কেশ
সে শুকায় কি তার কেশ॥
ওরে আকাশ তুই কি নুয়ে
মধুমালায় আসছিস ছুঁয়ে
(দেখি) রঙিন সাঁঝে তোরই মাঝে (তার) পা-র আলতার রেশ রে
মধুমালার দেশ॥

[গাহিতে গাহিতে মদনকুমার দূরে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ময়ূর-বিমানে চড়িয়া ঘুমপরি ও স্বপনপরি নামিয়া আসিল।]

ঘুমপরি : স্বপ্ন দি। আর ওর এ আর্তি দেখতে পারিনে — ওর কান্না শুনে পাষাণ গলে আকাশ টলে সাগর দুলে ওঠে। ফুল ঝরে যায়, বনের পাখি গান ভুলে যায়। চল, ওকে মধুমালার দেশে রেখে আসি।

স্বপনপরি : কী লো, বুক যে টনটন করে উঠল। কিন্তু তুই তো হেরে আছিস। ও এখন আমার।

ঘুমপরি : কক্ষনো না, মধুমালার চেয়েও অনেক সুন্দর।

স্বপনপরী : তা তো এখন বলবিই। আচ্ছা, ঝগড়া করবার সময় পরে পাব — ওই দ্যাখ, বেচারা পাহাড়ি-পথ থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। যা, ছুটে গিয়ে বুকে ধর —

[ঘুমপরি ছুটিয়া গিয়া রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে অচেতন রাজকুমারকে ময়ূর-বিমানে লইয়া আসিল। দুই পরি আকাশে গান গাহিতে গাহিতে উধাও হইয়া গেল]

(ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান)

ফুলের হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ।
যোগিনীরে পরতে বলিস নববধূর বেশ॥
সোনার ঘটে রাখতে বলিস আকুল চোখের জল

সেই জলের ধোযাবে সে বঁধুর পদতল
বলিস তারে পা মুছিয়ে বাঁধে যেন কেশ
যেন বাঁধে আকুল কেশ॥

[গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ — সন্ধ্যা। কাঞ্চনমালা তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। তারপর দূরে সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিল]

গান

তুমি হেসে চলে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে।
কাঁদতে আমায় রেখে গেলে একলা ফুলের রথে॥
ও পথের বন্ধু! তোমার পথে যদি নিয়ে যেতে
পথের কাঁটা ঢেকে দিতাম আমার এ বুক পেতে
আজ সুখের রথে কাঁদি বন্ধু দুখের সাথি হতে
তোমার দুখের সাথি হতে॥

কাঞ্চনমালার মাতা : তুলসীতলায় ভর-সন্ধ্যায় কে কাঁদে রে?

কাঞ্চনমালা : কাঁদছি কোথায় মা! আমি তো গুনগুন করে গান করছি।
[বলিতে বলিতে কান্নায় ভাঙিয়া তুলসীতলায় লুটাইয়া পড়িল]

কাঞ্চনমালার মাতা : (কাঞ্চনের মাথা কোলে লইয়া তাহার এলোচুলে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। আত্মসংবরণ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন) তোর চোখ দিয়ে যে দিন রাত গঙ্গা-যমুনার ধারা বয়ে যাচ্ছে মা। দিন রাত কেঁদে কেঁদে কি চেহারা হয়েছে একবার আরশির কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিস? লক্ষ্মী মা আমার, ওঠ, ভর সন্ধ্যায় কাঁদলে বাছার অমঙ্গল হবে। দেশে দেশে লোক ছুটেছে তাকে খুঁজতে। তোর বাবার লোক তন্নতন্ন করে তাকে খুঁজছে। বন-জঙ্গল পাহাড় জলপথ স্থলপথ চারিদিকে সজাগ পাহারা। সে পালাবে কোথায় — এই সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় বসে বলছি — তাকে তুই আবার পাবি।

কাঞ্চনমালা : আচ্ছা মা, বিয়ের রাতে বরকে হারিয়েছে — এমন আর-এক অভাগিনি তুমি এই বাংলাদেশে দেখেছ? আমি যদি তার মধুমালার মতো সুন্দর হতাম সে কক্ষনো এমন করে ফেলে যেতে পারে না। মাগো, এবার যদি মরি, আশীর্বাদ করো আর জন্মে যেন তার মনের মতো হই।

কাঞ্চনমালার মাতা : তুইও খেপলি নাকি কাঞ্চন? কোথায় মধুমালা? ও নামের কোনো মেয়ে কোথাও আছে নাকি? স্বপ্নের কথা কখনও সত্যি হয়? যেমন পাগল জামাই তেমনই পাগল মেয়ে।

কাঞ্চনমালা : পাগল জামাই, পাগল মেয়ে। কিন্তু পাগল শিব তো কোনোদিন গৌরীকে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেননি। শিব ভিক্ষা মেগেছেন পার্বতী তাঁর ভিক্ষের ঝুলি বয়ে নিয়ে গেছেন। আমায় কেন উনি তেমনই পথের

কাঙালিনি করে সাথে ডেকে নিলেন না? আমি চাইনে — চাইনে এ রাজভোগ। কে চায় এ রাজপ্রাসাদে থাকতে? সীতার মতো কেন তাঁর সাথে যেতে পারলাম না।

[মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগল]

গৌড়েশ্বর : (কান্না ও আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) রানি! রানি! কোথায় তুমি, আমার মা কাঞ্চন কোথায়? শিগগির ছুটে এস, আমার বেয়াই বেয়ান এসেছেন — আমার বেয়াই-বেয়ান কাঞ্চননগরের রাজা-রানি — কাঞ্চনের শ্বশুর-শাশুড়ি।

[মাতা ও কন্যা তীরবেগে উঠিয়া পড়িলেন। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল]

গৌড়েশ্বর : এই যে বেয়াই! বেয়ান ঠাকরুন! এদিকে — এদিকে — ওই তুলসীতলায় মা আমার দাঁড়িয়ে। ওই — ওই আমার মা কাঞ্চনমালা।

দণ্ডধর ও পাটেশ্বরী : কই, কই আমাদের বউমা, বউমা — বউমা!

[কাঞ্চন শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করিল]

পাটেশ্বরী : মা গো, পা ছুঁসনে! তুই যে আমার মদনমণির গলার — দেবতার নির্মাল্য। আয় আয় বুকে আয়। বুক আমার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে মা! (বক্ষে ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া) মা-মা! আঃ!

[কাঞ্চন পাটেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা দণ্ডধর দুই হাতে পাগলের মতো কাঞ্চনমালার চুলে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে ইঙ্গিতে কী যেন বলিল]

দণ্ডধর : বুঝেছি মা লক্ষ্মী, আসনের দরকার হবে না। দেব দেউলের এই অঙ্গনের চেয়ে কোন পবিত্র আসন তোর বাবা দেবে রে বেটি? (কাঞ্চন তাহার প্রায় অচৈতন্য শাশুড়ির কোলের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পাটেশ্বরী বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। মুখে কোনো কথা নাই) আহা! মা যেন আমার, মূর্তিমতী সন্ধ্যা! সন্ধ্যার মতোই করুণ, স্নিগ্ধ, আনন্দমাখা। ও বেয়ান ঠাকরুণ, ওখানে গোরুচোরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমি যে দেখতেই পাইনি। নমস্কার! নমস্কার! বেয়াইও এখানে এসে বোসো না হে! কাঁদবার অনেক সময় আছে। হ্যাঁ, বুঝলেন বেয়ান ঠাকরুণ! আপনাদের একটু চমকে দেবার জন্যই না বলে কয়ে এসেছি এই সাধারণ নাগরিকের বেশে। আর এখন কি রাজসমারোহ দেখাবার সময়? সোনার চাঁদ কুমার আমার কোথায় পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরছে আর আমরা তার বাপ-মা আসব চতুর্দোলায় চড়ে? কী বলো বেয়াই?

গৌড়েশ্বর : আহা! মাকে আমার আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে! সেই যে বিয়ের দিনে মা ঘোমটা দিয়েছিল তারপর মাথায় আর ঘোমটা ওঠেনি — দেখেছ বেয়াই?

পাটেশ্বরী : পদসেবা করছে? আমার সোনার চাঁদ কুমারের বউ আমার পদসেবা করছে? সে কী? ওরে-ওরে, তুই যে আমার বুকের মানিক, গলার হার। আয় আয় আমার বুকে আয়! তুই যে আমার গোপালের গলার মালা। হ্যাঁ, আমার গোপাল তো, পুত্র হয়ে, মদনকুমার হয়ে আমার পেটে এসেছিল। তুই যে সেই গোপালের — আমার সেই নবীন গোরার নিবেদিতা মালা। কী বলছিলাম মা? গোপাল আমার এসেছিল। আমার ঘর ভরেছিল, — বুক ভরেছিল, তারপর সব শূন্য করে চলে গেল।

গৌড়ের রানি : বেয়ান! চলুন আমার শোবার ঘরে শোবেন। কাঞ্চন! দেখছিস নে, তোর শাশুড়ি কেমন করছেন। নিয়ে চলো মা ওঁকে উপরে।

কাঞ্চনমালা : (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) মা! (কিন্তু ইহার বেশি সে বলিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

পাটেশ্বরী : ওরে ডাক — ডাক, আবার ডাক! সেই দস্যু কি তোর গলায় তার মা ডাকখানি রেখে গেছে; ডাক, আবার মা বলে ডাক — আমার মন জুড়াক! প্রাণ জুড়াক কান জুড়াক ঠিক ঠিক এমনি করে সে আমায় ডাকত — ঠিক তোর মতোটি করে আমার গলা জড়িয়ে। বেয়ান — দিদি। বউমার চাঁদ মুখখানি যে ভালো করে দেখতে পারছিনে। দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপ উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে দাও। আমি দেখি কেমন করে সেই নিষ্ঠুর এমন সোনার কমলকে চোখের জলে ভাসিয়ে গেল। (দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপের শান্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে দেব-উলের অঙ্গান ভরিয়া গেল। সেই আলোকে দেখা গেল শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ যেন রানি পাটেশ্বরী দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতেছে।) মন্দিরে ও কে। ও কে কাঁদে আমার পানে চেয়ে চেয়ে। ওই ওই আমার গোপাল — আমার মদনকুমার — আমার দস্যু — চোর ধর-ধর ওকে — ও আবার পালিয়ে যাবে — আবার পালিয়ে যাবে। (পাটেশ্বরী শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বক্ষে জড়াইয়া দেব-দেউলের অঙ্গানে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন) ধরেছি। ধরেছি! তোরা সবাই ধর, ও পালিয়ে যেতে চায় — আবার পালিয়ে যেতে চায় দস্যু। চোর। গোপাল। আমার গোপাল।

[কাঞ্চনমালার শয়নকক্ষ। নিশুতি রাত্রি]

[গান করিতে করিতে -- কিন্তু সে গান নয়। ক্রন্দনও বুঝি অত করুণ হয় না। কাঞ্চনমালা তাহার রাজবেশ আভরণ খুলিতে লাগিল। স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সে যখন গৈরিক বসন পরিল তখন সহসা রাজভবনের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিল। তাহার সখি অতসী দ্বারে তাহার এই বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কাঞ্চন অভিভূতের মতো গাহিতে লাগিল]

গান

তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু)

তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম
ত্রিভুবনে যত কিছু আমার প্রিয় আছে।
(ওগো বন্ধু পরান বন্ধু)॥
আমার বসন আমার ভূষণ আমার কুল মান
আমার প্রেমের অহংকার গো আমার অভিমান
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম বন্ধু
(আজ) সকল দিয়ে বিনিময়ে তোমায় শুধু যাচে
দাসী তোমার তোমায় শুধু যাচে
ওগো বন্ধু পরম বন্ধু॥

অতসী : (হাত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে) এই অন্ধকার নিশীথে এই যোগিনীর বেশ পরে কোথায় যাবি?

কাঞ্চনমালা : এ তো যোগিনীর বেশ নয় অতসী, এ বিয়োগিনীর সাজ। তাঁর সাথে যোগ আমার কখন হল যে যোগিনীর সাজ পরব?

অতসী : যোগ বিয়োগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চনমালা : (চমকিয়া উঠিয়া) ঠিক এমনই করুণ কণ্ঠে সে বিয়ের রাতে আমায় ডেকেছিল। নিজের চিরদিনের শোনা নামও যে নিজের কানে এমন মিষ্টি শোনায় সেইদিন প্রথম বুঝলুম।

অতসী : তুই তারই অভিসারে চলেছিস নাকি?

কাঞ্চনমালা : একে অভিসারই বা বলি কি করে সই? শ্রীরাধাকে তাঁর সুন্দর দেবতা অভিসারে ইঙ্গিত করেছিলেন— আমি তো আমার দেবতার কোনো ইঙ্গিত পাইনি।

অতসী : তাহলে তুই কোন আশায় কোথায় যাবি?

কাঞ্চনমালা : আশা নেই বলেই তো যাচ্ছি। আশা থাকলে বসে থাকতুম পথের দিকে চেয়ে। আশা থাকলে পথই তাঁকে বয়ে এনে দিত আমার বুকে। যে ফুলের আশা আছে সে দেবতার পূজোয় লাগবে, সেই ফুলই বনের ডালায় ফুটে থাকে — কিন্তু স্রোতের ফুলের আশা কোথায়? স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া তার তো আর কোনো গতি নেই সই!

অতসী : এ সব হেঁয়ালি রাখ দেখি। তুই তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াবি এই তো?

কাঞ্চনমালা : আর আমি তাঁকে খুঁজব না। আগে খুঁজব তাঁর পথ। পথ যদি পাই — পথের শেষে তাঁকেও পাব। শোন অতসী, ওই দেখ আমার ফুল-সাজ সব খুলে রেখেছি। আমার শাশুড়ি জোর করে কাল এসব পরিয়েছিলেন। বিয়ের রাতে এমনই ফুলের সাজে সেজেছিলুম। কালও পরেছিলুম, ওই আমার শেষ পরা। পরতে কি ইচ্ছে করছিল। মন্দিরে বিগ্রহ নেই অথচ নিবেদনের থালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যেমন অকারণ তেমনি করুণ।

অতসী : আমি কিন্তু এখনই কেঁদে চেঁচিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেব।

কাঞ্চনমালা : (হাসিয়া) কাউকে জাগাতে পারবিনে — আমাকে ফেরাতে পারবিনে।

সীতা যেদিন বনে গেছিলেন তাঁকে কি তাঁর বাপ-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি ফেরাতে পেরেছিলেন ?

অতসী : কিন্তু সেদিন তো শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে ছিলেন। তোর সাথি কে ?

কাঞ্চনমালা : (হাতের নোয়া দেখাইয়া) আমার শ্রীরামচন্দ্রও আমার সাথে আছেন। (কপালে নোয়া ঠেকাইয়া) এই এয়োতির নোয়া যদি আমার হাতে থাকে অতসী — আমার কোনো পথকে — কোনো বনকে কোনো বারণকে ভয় নেই !

[বলিয়া অন্ধকারে পথের মাঝে হারাইয়া গেল]

অতসী : কাঞ্চন ! কাঞ্চনমালা ! এই অন্ধকারে কে তোকে পথ দেখাবে ? (দূর হতে প্রবল কণ্ঠের আওয়াজ আসিল) 'আমার প্রেম !'

[সন্দ্বীপ – নিশুতি রাত্রি। আকাশের চাঁদ সাগরের জলে খেলা করিতেছে। মধুমালা-নিদ্রা-নিমগ্না]

[দূরাগত ঘুমপরি ও স্বপনপরির গান]

সাগরজলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ।
এবার যেন পালিয়ে না যায় বাঁধল ওরে বাঁধ ॥
ঘুমাসনে লো ঘুমাসনে আর
চোর এল ওই ভাঙল দুয়ার
(এখন) চোরকে বেঁধে বাহুর ডোরে পরান ভরে কাঁদ ॥

মধুমালা : (জাগিয়া উঠিয়া) কে ? তোমরা কে ?

ঘুমপরি : তোমার সতিন।

স্বপনপরি : একজন নয় এক জোড়া।

মধুমালা : এ তোমরা কী বলছ ? তোমরা কে, তোমাদের তো এখানে কখনও দেখিনি। (চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া হাসিয়া) ও। আমি স্বপ্ন দেখছি, না আমি কী বোকা ! (চোখ মেলিয়া) তা, তোমাদের সতিন করতে রাজি আছি— যদি আমার পতিকে ফিরে পাই। (চোখ বুজিয়া) যাক, মিথ্যে হোক, তবুও স্বপ্নে তাকে একবার দেখতে পাব।

ঘুমপরি : কী ভাবছ চোখ বুজে ? চোখ মেলে দেখো তোমার পাশে কে ! (চমকিয়া উঠিয়া) এ্যাঁ, তুমি ? কুমার ? তুমি ? চিৎকার করে বাবাকে মাকে ডাকব নাকি ? না না, চেঁচালেই ঘুম ভেঙে যাবে, স্বপ্ন যাবে টুটে, আর তুমি যাবে চলে। ওগো, তুমি জাগো, আমি কাউকে ডাকব না। (ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে) আমি কাঁদব না — জেগে একটিবার একটি শুধু কথা বলে ঘুমোও — আমি আর কিছু বলব না। কিচ্ছু চাইব না। শুধু চেয়ে দেখব ! (ঘুমপরি ও স্বপনপরির দিকে চাহিয়া) তোমরা কে জানি না। তোমরা যেই হও একটু বোসো না আমার বিছানায়। না না, তোমরা যে সতিন, আমার বিছানায় বসবে কেন ? না হয় ওঁর বিছানাতেই বোসো। তোমরাই ওঁকে ঘিরে বোসো। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

স্বপনপরি : তোমার স্বামী যদি সত্যই জাগেন, তাহলে কি আমাদের এখানে থাকতে

দেবে? সত্যি করে বলো।

মধুমালা : সত্যি করে বলছি — এই তোমাদের গা ছুঁয়ে বলছি — একী! তোমাদের গায়ে হাত দিতে মনে হল যেন তোমরা ছায়া — তোমাদের দেহ নেই — শুধু রূপ — তোমরা যেন চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

স্বপনপরি : এইবার রাজপুত্র জাগবে আমরা যাই। এই শিকারিকে আর ছেড়ো না কিন্তু। এতদিন আমরা আগলে রেখেছিলুম। এবার তোমার গলার হার তোমাকে দিলুম। আমার নাম স্বপনপরি — ওর নাম ঘুমপরি। (বলিতে বলিতে যেন হাওয়ায় তাহারা মিলিয়া গেল। তাহাদের অশরীরী গান মধুমালার স্বর্ণপুরীকে কাঁপাইয়া তুলিল)

গান

বন্ধু বিদায় — !
যাই চলে যাই — তোমার মালা পরাযে তোমায॥
ফুল ঝরে যে পথে হারায —
অশ্রু ঝরে যে পথে লুকায়
যাই যাই -
যে আধাঁর পথে আশার বাতি নিভে যায।
বন্ধু বিদায়॥

[সহসা বাহিরে প্রহরীদের কোলাহল শুনা গেল। পিঞ্জরের শুকশারি — বনের পাখি ডাকিয়া উঠিল সচকিত স্বরে। 'কে গো' বলিয়া ভাব-শিখী ডাকিয়া উঠিল।]

মদনকুমার : আবার, আবার শুনি সেই সাগরের ক্রন্দন। (চক্ষু মুছিয়া) কে? মধুমালা! মধুমালা!

[মধুমালা 'কুমার' 'কুমার' বলিয়া রাজপুত্রের বুকে লুটাইয়া পড়িল]

[মধুমালার গান]

আমার পায়ের বেড়ি
এই সোনার পুরী ভেঙে
যাওগো নিয়ে তোমার দেশে
পাব সেথায় জেগে
তোমায় পাব সেথায় জেগে!
এই যে সাগর এই যে কুমার
এই যে তোমার আমি,
এই যে তুমি স্বপ্নে-পাওয়া মধুমালার স্বামী,
(এবার) তোমার হাসির রঙে আঁধার পুরী উঠুক রেঙে।

রানী তিলোত্তমা : কী হয়েছে মা মধুমালা? আজ সকালে এত আনন্দের গান কেন? (মদনকুমারকে দেখিয়া) কে, কে ওই সুন্দর চাঁদ? ওরে পূর্ণিমার চাঁদ কি আজ সাগর-জলে নেয়ে মালার ঘরে এসে উঠল? দাস-দাসী, প্রহরী কে কোথায় আছিস ছুটে যা — মহারাজকে খবর দে! সারা রাজ্যে খবর দে। মধুমালার বর ফিরে এসেছে।! ওলো, তোরা উলু দে, শঙ্খধ্বনি কর —

বরণ-ডালা আন। (দাসদাসী সব উলুধ্বনি দিতে দিতে — শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া ছুটিয়া আসিল।)

[সকলের গান]

নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর
ধরতে গিয়ে দেখি ওলো চোর নয় সে বর।
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥
এ পালিয়েছিল চুরি করে মোদের সখীর নিদ্,
(এই) হৃদয়-বনের শিকারিকে নয়ন দিয়ে বিঁধ!
এ যে, ফুলের মালায় বন্দি করে পরাল টোপব॥
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥

[মদনকুমার ও মধুমালাকে ঘিরিয়া উদ্দাম নৃত্যগীতের উৎসব চলিযাছে। সোনার সিংহাসনে বসিযা বরবধূব বেশে মধুমালা ও মদনকুমার]

[নর্তকীদের গান]

অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শাস্তি পাবে কালা।
বেঁধেছি তাই গলায তোমার জড়িয়ে মধুমালা॥
আজ গাযে পড়ে সাধতে হবে
পায়ে ধরে কাঁদতে হবে
শাপলা মধু পানের আগে
দেখবে বঁধু কেমন লাগে বাবলা কাঁটার জ্বালা॥

রানি তিলোত্তমা : ওরে! তোরা আর ওদের বেশি রাত জাগাসনে। এবার ওদের শুতে দে। দেখছিস না আমার সোনার চাঁদের মুখখানি যেন রোদের তাতে থল কমলের মতো রাঙিয়ে গেছে। লক্ষ্মী মেয়েরা আমার, এবার ওদের শুতে দে।

মেয়েরা : বেশ রানিমা, আমরা যাচ্ছি কিন্তু রাত্রে সুদে-আসলে সব আদায় করব বলে দিচ্ছি। (যাইতে যাইতে) চোরের শাস্তি কিন্তু হল না মধুমালা। ভালো করে আগলাস আবার যেন না পালায়। পায়ে টেকো বেঁধে দিস — চোর গরুকে বিশ্বাস নেই।

(সাগরতীরে কাঞ্চনমালার করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। মধুমালা ও মদনকুমার উৎকর্ণ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল)

[কাঞ্চনমালার গান]

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কী পথের শেষ!
এই কী তোমার স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশ!

মধুমালা : ওগো! কে এমন কেঁদে কেঁদে আমার নাম ধরে গান করছে? ওকী, তুমি অমন উতলা হচ্ছে কেন? চলো, চলো আমার সাথে। ওই খিড়কির দুয়ার দিয়ে সাগরতীরে গিয়ে দেখি ওকে! তোমার পায়ে পড়ি,

চল না ওব গান শুনে আমার বুকে এমন কান্নার জোযার এল কেন? চল চল।

(মদনকুমাব ও মধুমালা নীববে দাসদাসী প্রভৃতিব চোখ এড়াইয়া খিড়কি-দ্বাব দিযা সাগবতীবে আসিযা দাঁড়াইল। দেখিল, এক বুক সাগব-জলে দাঁড়াইযা গৈবিক বেশধাবিণী এক সন্ন্যাসিনী। তাহাব বূপেব জ্যোতিতে আর গৈবিক বসনেব আভায চাবপাশেব সাগব জল গেবুযা রাঙা হইযা উঠিযাছে। সে ইহাদেব পানে চাহিযাও দেখিল না। নযন মুদিযা সে যেন মহাসাগবেব গান শুনিতেছে। মদনকুমাব ও মধুমালা ছাযামূর্তির মতো দাঁড়াইযা সেই গান শুনিতে লাগিল।)

গান

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথেব শেষ?
এই কি তোমার স্বপ্নে-দেখা মধুমালাব দেশ?
মহাসাগব! সাক্ষী থেকো! আমাব কথা বলো
তাব বিবাহেব লগ্নে আমাব যাবাব সময হল।
সে তাব পথ পেল যখন পথ হাবালাম আমি তখন
যে আমায আনল পথে সে আজ নিবুদ্দেশ॥
তোমাব শীতল জলে তোমাব অতল তলে
জুড়াও ওগো জুড়াও আমার সকল ক্লেশ॥

মধুমালা : কে? কে তুমি যোগিনী? মহাসাগরের বুকে এমন বোদনেব জোযার আনলে? (সন্ন্যাসিনী যেন ধ্যান-রতা)

মদনকুমার : ডেকো না মধুমালা, ওকে ডেকো না। মহাসাগর যাকে ডাক দিযেছে, তীরের ক্ষুদ্র মানুষ তাকে ডেকে সাড়া পাব না মধুমালা।

মধুমালা : তুমি অমন উতলা হযে উঠছ কেন? তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি তাহলে ওকে চেন। তবে কি — তবে কি — ইনিই সেই দেবী যাঁর আসার কথা ঘুমপরী বলেছেন? যাঁব সাথে তোমার অপরূপ বিবাহের কথা বলেছিলে। উনিই — ওই দেবীই কি তাহলে আমার দিদি। (চিৎকার করিযা জলে নামিতে নামিতে) দিদি! দিদি! আমি-আমি মধুমালা, তোমার ছোটো বোন — তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার সাগর জলের চাঁদ ওই — ওই কূলে দাঁড়িয়ে তোমার স্তব শুনেছেন। যেযো না — যেয়ো না — আমায় প্রণাম করার অবকাশ দাও। (কাঞ্চনমালা উঠিযা আসিযা মধুমালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন)।

কাঞ্চনমালা : চলো তীবে উঠি। যে তীর্থ দেবতার দর্শনের আশায এই পথের শেষে এসে পৌঁছলুম, তাঁকে প্রণাম না করে গেলে যে আমার জলে স্নান করার আনন্দ হবে না। সত্যি, কি সুন্দর তুই মধুমালা। আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে — ও তো পুরুষমানুষ। তোকে দেখে আমার আজ আর কোনো দুঃখ রইল না মধু (কাঞ্চনমালা মধুমালার মুখচুম্বন করিলেন)।

মধুমালা : (হেসে) আমি সন্তুষ্ট হলাম, তুমি আমার মুখচুম্বন করলে। আর কি ভাবনার আছে। আজ থেকে তোমায় দিদি বলে ডাকব।

কাঞ্চনমালা : ও কথা তুই কেন মনে করলি মধুমালা। অর্জুনের মতো স্বামী পেয়েছিলেন বলেই দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মতো পতি পেয়েছিলেন বলেই রুক্মিণী তাঁর পতিকে পরিপূর্ণ চিত্তে সত্যভামার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মধুমালা : তাহলে তেমনই করে — তেমনই করে তুমি আমায় বরণ করে তুলে তোমার পায়ের দাসি করে রাখো না দিদি।

কাঞ্চনমালা : যদি ঘর আমাকে আশ্রয় দিত তাহলে তাই করতাম মধুমালা। আর ভালো হয়তো তোর স্বামীর চেয়েও বাসতাম।

মধুমালা : এখনও তোমার ওঁর উপরে অভিমান যায়নি দিদি। নইলে 'আমার স্বামী' না বলে 'তোর স্বামী' বললে কেন।

কাঞ্চনমালা : কার উপরে অভিমান করব মালা! আমি কী ওকে একটু কালের দেখা ছাড়া কখনও দেখেছি যে অভিমান করব। উনি কি আমায় কোনোদিন সে অধিকার দিয়েছেন! তবু সে কী আকর্ষণ, মধু, তা তুই হয়তো বুঝবি নে। সাগর কত জোরে টানলে সে নদী পাহাড় জঙ্গল ভেঙে তার বুকে ছুটে আসে তা নদী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

মধুমালা : দিদি একটু কূলে ওঠো না, আমি যে তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারছি নে।

কাঞ্চনমালা : কূলেই তো বসেছিলুম বহুদিন বহুবর্ষ। সেখানে যখন তাকে দেখলাম না তখনই তো অকূলের পথে পাড়ি দিলুম বোন। বাঙালির মেয়ে যত সাধু উদ্দেশ্যেই বুকে করে একবার কূলের বাইরে পা বাড়াক না আর কি সে কূলে ফিরে যেতে পারে?

মধুমালা : কিন্তু কূলে তো তোমায় উঠতেই হবে — তাঁকে প্রণাম করতে, তখন যদি আমি ছেড়ে না দিই?

কাঞ্চনমালা : যে নদী সকল পথের বাধা ডিঙিয়ে সাগরে মিলতে এল তাকে মিলন মোহনার মুখে আটকাবি মনে করিস? তুই বড্ডো ছেলেমানুষ। আহা মুখখানা কি কাঁচা!

মধুমালা : আর তোমার মুখ বুঝি কাঁচা নয়? তোমার কথাগুলোই যা পাকা আর সব কাঁচা! দিদি! তোমাকে এই অবস্থায় চাঁদের আলোতে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র মন্থনের শেষে লক্ষ্মীদেবী সাগর সিনান ক'রে উঠছেন!

কাঞ্চনমালা : কিন্তু তিনি উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে আর আমি উঠেছি বেদনার সিন্ধু মন্থনের শেষ অশ্রু লক্ষ্মীরূপে। তাই ত তোদের অমৃতের সংসারকে লবণাক্ত করতে চাইনে! দেরি হয়ে গেল মালা। ওঁকে একবার এই জলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে বলবি!

মদনকুমার : কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর! আমি আর সইতে পারছি নে। আমি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি তুমি এই সুদূর পথ এমন করে একা অতিক্রম করতে পারবে।

কাঞ্চনমালা : তুমি মুধমালাকে স্বপ্নে দেখে যদি এই দূর পথ অতিক্রম করতে পার আর আমি আমার স্বামীকে বরণ-ডালার পঞ্চপ্রদীপের আলোক শিখায় দেখে সেই পথ পার হতে পারব না?

মদনকুমার : কিন্তু আমি — আমি তোমার কে কাঞ্চন? আমি — আমি তো স্বামীত্বের অভিনয় করেছিলুম — বরবেশে এসেছিলুম!

কাঞ্চনমালা : স্ত্রীর স্বামী বর সেজেই আসেন। তুমি আমার কে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে না? শোন, এই মহাসাগরে শুয়ে থাকেন যে পাষাণের নারায়ণ — সেই নারায়ণ শিলাকে সাক্ষী ক'রে বিবাহের দিন যা বলেছিলাম আজও আবার তাই বলছি। তুমিই আমার স্বামী, আমার ইহলোক পরলোক জনম জনমের পতি — পরম পতি — আমার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা, তোমাকেই ধ্রুবতারা ক'রে এই মহাসাগরের মিলন মোহনায় বিনা বাধায় এসে পৌঁছেছি। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) লক্ষ্মী-নারায়ণকে একসঙ্গে দেখলাম। সত্যি মালা, তোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগর মন্থনের শেষের লক্ষ্মীশ্রী।

মধুমালা : (তাহার চোখে মুখে অদ্ভুত পরিবতন দেখা যাইতেছিল) লক্ষ্মী উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে, বেদনার সিন্ধু-মন্থনের শেষে আমি উঠেছি অশ্রুলক্ষ্মী রূপে। দিদি, তোমাদের অমৃতের সংসারকে আমি লবণাক্ত করতে চাইনে। (মধুমালা সাগর জলে ঝাঁপ দিল)

কাঞ্চনমালা : মালা! এ কি করলি তুই?

মধুমালা : (আর্তকণ্ঠে) হে আমার চির জনমের স্বামী — প্রণাম! প্রণাম!!

কাঞ্চনমালা : মালা — মালা — মধুমালা —

যবনিকা

ভূতের ভয়

প্রথম দৃশ্য

[স্থান — দেবলোক। দেবাধিপতি, দেবকুমারগণ ও দেব-কন্যাগণের আহূত সভা-মণ্ডপ]

(দেবকুমার ও দেবকন্যাগণের গান)

জাগো জাগো দেবলোক।
এল স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক॥
সাত সাগরের গড়খাই পার হয়ে ওই
এসে পিশাচ প্রেতের দল নাচে থই থই,
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈঃ মাভৈঃ
নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক॥

ওরা আনিযাছে পাতালের ভীতি মারিভয়,
মোরা ভযে শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়।
ওঠো ওঠো বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি কুয়াশা মাযার,
আনো আশার আলোক॥

দেবাধিপতি : মাভৈঃ! মাভৈঃ!! বন্ধুগণ, আমরা এতদিনে আমাদের মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে মারণ-মন্ত্র নয় — মরণ-মন্ত্র। আমরা — দেবলোকবাসী এতদিন নিজেদের অমর মনে করে জীবনকে অবহেলা করেছি। অমৃতকে পচিয়ে মদ করে তারই নেশায় যখন বুঁদ হয়ে গেছি, তখনই এসেছে সাগর-পারের নির্বাসিত অভিশপ্ত প্রেত-পিশাচের দল। তারা আমাদের প্রমত্ততার — জড়তার অবকাশে আমাদের অমৃত, কবচ, শক্তি সব কিছু অপহরণ করেছে। আজ বিশ্ববাঞ্ছিত দেবলোক নিরামৃত, নির্জীব, নিষ্প্রাণ, শক্তিহীন। আমাদেরই পাপে আজ তারা মৃত্যুঞ্জয়ের বর লাভ করে দেব-লোক জয় করেছে। আমরা আজ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসাদ হতে বঞ্চিত সত্য— আজ আমাদের তপস্যার শক্তি অপরহণ করে প্রেতের দল শক্তিমান সত্য— তবু আজ একমাত্র আশা আমরা আমাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। আমাদের হস্তপদের অশেষ বন্ধনের দারুণ পীড়া অনুভব করবার চেতনা ফিরে পেয়েছি।

সমবেত কণ্ঠে : সাধু! সাধু!

দেবাধিপতি : আমার পরম স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা-স্থানীয় দেবকুমার ও দেবকন্যাগণ! তোমাদের এক শতাব্দী পূর্বে আমার জন্ম, আর আমাদেরই পাপে তোমরা আজ প্রেতের মায়ায় বদ্ধ — কারারুদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করছি — দেবলোকে জরা-মৃত্যুর, দুঃখ-তাপের বলি হয়ে। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদের পিতৃ-পিতামহের পাপে তোমরা আজ প্রেতাধীন। আমরা ভূতাধীন — অতীতের দাস, তোমরা বর্তমান শতাব্দীর

নবজাত শিশু। তোমরা অতীতের দাসকে — ভূতের অধীনকে মুক্ত করো। পদাঘাতে পতিত করো ভূতকে — অতীতকে, দক্ষিণ করে কর মিলিয়ে টেনে তোলো ভবিষ্যৎকে!

সমবেত কণ্ঠে : সাধু! সাধু! জয় দেবাধিপতির জয়!! অমর দেবলোকের জয়!!

দেবাধিপতি : দেবলোকের জয়ধ্বনি করো, দেবাধিপতির নয়। আমি অতীতের লজ্জা, ভূতের লাঞ্ছনা আমায় অপবিত্র করেছে!

দেব-সংঘের একজন : না। না। আপনি তার ব্যতিক্রম। সত্য, আপনি জরায় ন্যুব্জ কিন্তু ওই ন্যুব্জ দেহই অতীত হতে বর্তমানে আসার সেতু।

সমবেত জয়ধ্বনি : সাধু! সাধু!! বেশ বলেছ ভাই! বেঁচে থাকো!

দেবাধিপতি : তোমাদের এই শ্রদ্ধাই আমার সকল কলঙ্ক, সকল লজ্জাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। তাই আজ আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়াবার দুঃসাহস অর্জন করেছি। আমি বলছিলাম — আমরা আমাদের ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। যে অস্ত্র ধাতু দিয়ে তৈরি নয়, সে অস্ত্র বাণীর। সে অস্ত্রের নাম 'মাভৈঃ!'

সকলে : মাভৈঃ! মাভৈঃ!

দেবাধিপতি : হাঁ, ওই মন্ত্র উচ্চারণ করো সকলে। মাভৈঃ! মাভৈঃ! ভয় নাই! শুধু এই বাণীর আশ্বাসে — এই মন্ত্রের জোরেই আমরা অভিশপ্ত-আত্মা ভূতের দলকে আবার সাগর-পারে তাড়িয়ে রেখে আসব।

সকলে : মাভৈঃ! জয় দেবলোকের জয়!

জনৈক দেবযুবা : শুধু বাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাসী নই, দেবাধিপতি। আমরা বলি, 'এহ বাহ্য!'

সমবেত দেবসংঘ : বসে পড়ো! বসিয়ে দাও!

দেবাধিপতি : (দক্ষিণ কর উত্তোলন করিয়া সকলকে শান্ত হইবার ইঙ্গিত করিলেন। দেবসংঘ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিল) কে তুমি উদ্ধত যুবক? তোমাকে এই নিপীড়িত দেবপুরীর কোনো যজ্ঞে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

দেবযুবা : আমরা থাকি আপনাদের যজ্ঞের গোপনতম অন্তরালে, দেবাধিপতি! আমরা আপনার যজ্ঞের মন্ত্র-উপাসক নই — আমরা যজ্ঞের অগ্নি-পূজারি! আমরা যজ্ঞের আহুতি হয়ে আত্মবলি দিই, আর সেই আহুতিই হয়ে ওঠে লেলিহান অগ্নিশিখা। আমরা নিপীড়িত দেব-আত্মার দাহিকা-শক্তি।

দেবাধিপতি : চিনেছি তোমায়। তুমি বিপ্লবকুমার! বীর! আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করো। তোমাদের প্রাণকে — তোমাদের দুর্দৈব বিলাসিতাকে আমি শতবার প্রণাম করেছি — কিন্তু তোমাদের এই পথকে মুক্তির শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে গ্রহণ করতে পারিনি। আমি ভূতগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, — জানি। তবু বলি — সৈনিকের দুর্ধর্ষতাই একমাত্র গুণ নয়। দুর্ধর্ষতা সৈনিককে করে শুধু সৈনিক, ধৈর্যই করে তাকে মহান।

বিপ্লবকুমার : আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন দেবাধিপতি! আপনাকে আমরা পূজা করি দেবতার অন্তরের রাজাধিরাজ বলে, কিন্তু আপনাকে কিছুতেই মনে করতে

পারিনে — আপনি আমাদের যুযুৎসু সেনাদলের অধিনায়ক।

দেব-সংঘ : বসিয়ে দাও! বসিয়ে দাও! উন্মাদ! উন্মাদ!

বিপ্লবকুমার : হাঁ বন্ধু, আমরা সত্যসত্যই উন্মাদ। আমাদের উন্মাদনার গান শুনবে?

দেব-সংঘের কয়েকজন : এই রে! সর্বনাশ করলে এই পাগলাচণ্ডী! এইবার ধরলে বুঝি ভূতে!

[বিপ্লবকুমারের গান]

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না সয়॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারি ঢাক
যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মারের পিঠে
পড়ুক না এবার!
তোরা নবীন মন্ত্র শোন আমাদের—
'প্রহারো ধনঞ্জয়!!'

দেব-সংঘ : সাধু! সাধু! 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'! জোর বলেছে দাদা! বেঁচে থাক!

আছে তোদের গায়ে ভূতের লেখা
হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে মার
এসেছে আজ দিন।
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু
বনের পশু জয়।
ওরে দৈন্যেরে তোর সৈন্য করে
রণের করিস ভান,
খর -স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয় —
'সাগর-অভিযান!'
তোরা যজ্ঞ করিস, অযোগ্য সব
প্রাণে মৃত্যুভয়!
তোদের হাড্ডি গেছে মাংস গেছে
চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস তোরা
যজ্ঞ-অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার
আগুন জ্বালাময়॥

দেব-যুবাগণ : জয় বিপ্লবকুমারের জয়! সকলের গান—

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।

দেবাধিপতি : আমি কি তা হলে বুঝব — এই তোমাদের ঈপ্সিত পথ? বন্ধুগণ! তা

হলে আমায় বিদায় দাও। আমি জানি — ও-পথ মৃত্যুর পথ, জীবন জয়ের পথ নয়। মৃত্যু তো আমরা ভূতের হাত দিয়েই নিত্য-নিয়ত পাচ্ছি, ওর জন্য নতুন আয়োজনের তো কোনো দরকার নেই। আমরা চাই জীবন। এবং জীবন লাভ করতে হলে চাই — তপস্যা। যুদ্ধ নয়। তা ছাড়া, যুদ্ধ করবে কার সাথে? এ মায়াবী ভূতের দল তো সামনে থেকে দিনের আলোকে যুদ্ধ করে না। এরা যুদ্ধ করে অন্ধকারের আড়ালে থেকে — অন্তরীক্ষে থেকে — পাতালতলে থেকে। শূন্যের সাথে যুদ্ধ করি কী দিয়ে? এরা শাসন করছে ভয় দিয়ে — অস্ত্র দিয়ে তো নয়। অস্ত্রধারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা যায় — কিন্তু ভয়-দেখানো ভূতের উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে হলে মাভৈঃ-বাণীর ভরসা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

[এমন সময় সভা মণ্ডপে ভীষণ আর্তরব উঠিল। সভার সকলে যে যেদিকে পারিল — ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। চতুর্দিকে 'ভূত — ভূত' রব উঠিতে লাগিল। ভূতেদের কাহাকেও দেখা গেল না। কেবল অন্তরীক্ষে কীসের ভীষণ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। সভার সমস্ত আলোক একসঙ্গে নিভিয়া গেল। মনে হইল, অসংখ্য কায়াহীন ছায়া বীভৎস মূর্তিতে সভা মণ্ডপ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিপ্লবকুমার ও দেবাধিপতি ব্যতীত সভামণ্ডপে আর কাহাকেও দেখা গেল না।]

বিপ্লবকুমার দেবাধিপতি। এই কাপুরুষের দল কি আপনার মন্ত্র-শিষ্য?

দেবাধিপতি (হাসিয়া) এরাই কি তোমার যুদ্ধ-সেনা? জানি বন্ধু, আমাদের দেব জাতির ক্লীবতা নির্লজ্জতার কত অতলতলে গিয়ে পড়েছে, তাই আমি বলি — এ জাতিকে দিয়ে যুদ্ধজয়ের কল্পনা একেবারে অসম্ভব।

বিপ্লবকুমার এই অসম্ভবের সম্ভাবনার আশাতেই আমি ভবিষ্যৎকালের প্রতীক — যৌবনের প্রতীক পথে বেরিয়েছি, দেবাধিপতি। আমার জীবনে তারই শেষ ফলাফল দেখতে পাই। কিন্তু — এ কী। আমিও কি ভূতের মায়ায় আবদ্ধ? আমি আর নড়তে পারছিনে কেন?

দেবাধিপতি বন্ধু। আমরা অনেক আগেই ভূতের মায়ায় বন্দি হয়েছি। আমাদের দুই জনেরই এখন এক গতি। আমাদের জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ আজ এক সাথে বন্দি হয়ে পাতালপুরীর অন্ধকার আশ্রয় করে পড়ে থাকবে।

বিপ্লবকুমার আপনার মন্ত্র হয়তো বাধাকে বাধা না দিয়ে জয় করা। কিন্তু আমি সে মন্ত্রের উপাসক নই, দেবাধিপতি। আমি এ বন্ধন ছিন্ন করব।

(বংশী বাদন ও সঙ্গে সঙ্গে সহস্র রক্ত-বেশ পরিহিত দেব-যুবার প্রবেশ। তাহারা আসিয়াই ঝড়ের বেগে বিপ্লবকুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। চতুর্দিকে ভূতের অবোধ্য ভাষায় ভীষণ কিচির-মিচির শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ রক্ত-আলোকে দেখা গেল -- বাঁদর, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, শার্দূল, হায়েনা, খটাশ প্রভৃতি নানা মুখের নানা বীভৎস ভূতের দল দেবাধিপতিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেবাধিপতি প্রসন্ন হাসিমুখে তাহাদের অনুগমন করিতেছেন। সহসা নানাপ্রকার রথে আরও নানা মুখের ভূতের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই তাহারা দিকে দিকে রথ লইয়া বিপ্লবকুমারের দলকে ধরিতে বাহির হইয়া গেল।

ভূতের মুখে নাকি সুরে শুধু এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল — বিপ্লব- কুমার! বিপ্লবকুমার!)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবলোক। ভূত-নিবারণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের নব-নির্বাচিত সভাপতি জয়ন্তের প্রাসাদে কথোপকথন করিতেছেন।]

জয়ন্ত : আমি বলি কী, আমাদের বন্দি নেতা দেবাধিপতির নির্বাচিত পথই আমাদের বর্তমান অবস্থায় প্রকৃষ্ট পথ। অবশ্য অধিকাংশ সভ্যের মতো হলে আমরা এর চেয়েও এক ধাপ উপরে উঠবার চেষ্টা করতে পারি।

জনৈক সভ্য : আমরা দেবলোকে এতদিন শুধু মাভৈঃ-বাণীর মন্ত্রই প্রচার করেছি। তাতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভূতের ভয় দেবলোক হতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত না হলেও তাদের বিরুদ্ধে যে বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে — তাতেই আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে। এই অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে শোষণ-শুষ্ক দেবলোক!

দ্বিতীয় সভ্য : আমিও বলি, আমরা তো হাতে মারতে পারব না ওদেরে। এখন ভাতে মারতে পারি কি-না তারই আয়োজন করতে হবে।

তৃতীয় সভ্য : কিন্তু এ ভূত যে আমাদের অন্নের চেয়ে রক্তই শোষণ করে বেশি। ওই রক্তখেগো ভূতকে ভাতে মেরে বিশেষ সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

দ্বিতীয় সভ্য : ভাতে মারা মানেই ওদের প্রাণ — আমাদের রক্ত শোষণে বাধা দেওয়া! তাহলেই ওদের আয়ু যাবে কমে। আমিও বলি যুদ্ধ করে ওদের কাটব কী, ওরা যে কন্দকাটা ভূত। ওদের রক্তপাত করলেই ওরা হয়ে উঠবে আরও ভীষণ, ছিন্নমস্তার মতো নিজের রক্ত নিজে পান করে উন্মাদনৃত্য শুরু করে দেবে।

জয়ন্ত : ও-কথার আলোচনায় এখন প্রয়োজন নেই। রক্তারক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই। আমাদের এ অহিংস যুদ্ধ। আমরা দলে দলে ধরা দিয়ে ওদের পাতালপুরীর সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করে দেব। যে অন্ধ-কারার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের নির্বীর্য করে রেখেছে, সেই ভয়টাকেই আগে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। মারবে কতক্ষণ? ওদের মারের মুখে যদি আমাদের দেবলোকের সব শির এগিয়ে দিই, তাহলে দু-দিনেই ওদের মারের অস্ত্র যাবে ভোঁতা হয়ে — মারের শক্তি যাবে ফুরিয়ে।

চতুর্থ সভ্য : আমাদের দলপতি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়। ওরা আমাদের অমৃত অপহরণ করে তার বদলে যে বিষমাখা খাদ্য জোর করে খাওয়াচ্ছে — আমরা শুকিয়ে মরলেও তা আর গ্রহণ করব না। আমাদের লজ্জা নিবারণ করতে হয় ভূতুড়ে কিম্ভূতকিমাকার বস্ত্র দিয়ে, আমরা আর

তা পরব না। নির্যাতন আরও বেশি চলুক, তবু ওদের দান গ্রহণ করে আমাদের পবিত্র দেব-কান্তিকে আর অপবিত্র পঙ্কিল করে তুলব না।

(হঠাৎ সম্মুখ দিয়া বিপ্লবকুমার চলিয়া গেল)

জয়ন্ত : ওকে চেনেন আপনারা? ওই বিপ্লবকুমার। কখনও গান গায় কখনও যুদ্ধ করে। কখন যে কী করে বুঝবার উপায় নেই। ভূতের চোখে ধুলো দিয়ে রাত-দিন ও এই দেব-লোকে নানা মূর্তিতে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে বেড়াচ্ছে। ভূতেদের চেষ্টার আর অন্ত নেই, ওকে বন্দি করার, কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারে না। ও কী বলে, কী করে কিছুই বোঝা যায় না।

পঞ্চম সভ্য : ওই দেবলোকের একমাত্র যুবা — যে ভূতকেও ভয় দেখাতে সমর্থ হয়েছে। (উদ্দেশে নমস্কার করিলেন)

(জলন্ত অগ্নি-বর্ণা স্বাহা দেবীর প্রবেশ। সকলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া দেবীকে অভ্যর্থনা করিলেন)

জয়ন্ত : আসুন দেবী। আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

স্বাহা : আমি কিন্তু আপনার কথা ভেবে এখানে আসিনি, জয়ন্তদেব। আমি ভাবছিলাম ওই যুবকের কথা — যে এখনই গান গেয়ে চলে গেল।

জয়ন্ত (ম্লানমুখে) : বিপ্লবকুমারের কথা? কিন্তু ওর আদর্শ তো আমাদের আদর্শ নয়, দেবী!

স্বাহা : এতদিন তাই ভেবেছি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, আগুনকে ধোঁয়া করে রাখায় কোনো লাভ নেই, ওতে চক্ষুই জ্বালা করে — দমই বন্ধ হয়ে আসে — দাহ করে না। আগুন যদি আমরা জ্বালিয়েই থাকি, তাহলে ওকে তুষ-চাপা দিয়ে ধোঁয়া করে রেখে লাভ নেই, আগুন এবার ভালো করেই জ্বলে উঠুক।

জনৈক সভ্য : মার্জনা করবেন দেবী। আপনি আমাদের দেবী-শক্তি। সমগ্র দেবী-জাতির প্রাণ-শিখা। তবু জিজ্ঞেস করি, তাহলে এ-আগুনে কি আপনিই কুলোর বাতাস করবেন?

স্বাহা : বিপ্লবকুমারকে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে আমাদের তাই করাই উচিত। পুরুষেরা যখন ভয়ে পিছিয়ে গেল, তখন নারীকেই এগিয়ে যেতে হবে বই কি! এমন পড়ে পড়ে আর কত দিন মার খাওয়া যায়? এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক!

তৃতীয় সভ্য : (হাসিয়া) আপনাদের রান্নাঘরে থেকে থেকে আগুনটা গা সওয়া হয়ে গেছে দেবী, তাই আপনারা হয়তো ওটাকে ভয় করছেন না, কিন্তু উনুনের আগুন আর বিপ্লবের আগুন এক জিনিস নয়!

স্বাহা : উনুনের আগুন আমরা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করি, কিন্তু আপনাদের মুখে আগুন উঠেও — এত ধূমপান করেও তো আগুনের ভয়কে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেন না! উনুনের আগুনেও তো আপনাদের অনেকে পুড়েছে, এবার না হয় ওর চেয়ে প্রখর আগুনেই পুড়বে। আমাদের তো পুড়ে মরতেই জন্ম।

জয়ন্ত : আমাদের কোনো সভ্যের প্রগল্ভতার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি, দেবী। আপনি আমাদের পরিত্যাগ করলে আমরা সত্যসত্যই শক্তিহীন হয়ে পড়ব।

আপনি দেবলোকের প্রাণস্বরূপা। আমাদের আছে শুধু অস্থি আর চর্ম, আপনাদের আছে প্রাণ। এই প্রাণশক্তি যেখানে যোগ দেবে— সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

স্বাহা : আমরা যদি সত্যই দেবলোকের প্রাণশক্তি হই, এবং যেখানে যোগদান করি, সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহলে আপনার দুঃখের তো কোনো কারণ দেখছিনে। দেবলোক ভূত-মুক্ত হোক এইতো আপনারা সকলে চান। সে মুক্তি আপনিই আসুক — আর বিপ্লবকুমারই আনুক — তাতে তো কিছু আসে যায় না।

জয়ন্ত : কিন্তু বিপ্লবকুমারের আন্দোলন সে শক্তি আনতে পারবে না বলেই আপনাদের শক্তি সেখানে ব্যয় করে ব্যর্থতা আনতে নিষেধ করিছ, দেবী। আমরা বলি, আমরা জয় করব সত্যের জোরে, আমরা সত্যাগ্রহী। বিপ্লবকুমার বলে, সে জয় করবে অস্ত্রের জোরে — সে বলে, সে অস্ত্রাগ্রহী। কিন্তু ভূতের অস্ত্রবলের কাছে ওর মূল্য কতটুকু!

স্বাহা : ও শুধু তাই বলে না। বলে ভূত আর পশু, দুইটা জাতই আগুনকে অতিরিক্ত ভয় করে। এ ভূতের অর্ধেকটা পশু, অর্ধেকটা ভূত। একবার ভালো করে আগুন জ্বেলে তুলতে পারলে এরা তল্পিতল্পা তুলে লম্বা দৌড় দেবে!

জয়ন্ত : আগুন তো আমরাও জ্বালাতে চাই, দেবী। সে আগুন অসন্তোষের আগুন।

স্বাহা : আগুন নয় জয়ন্তদেব, ও হচ্ছে ধোঁয়া। বড়ো বড়ো ওঝাদের দেখেছি, তারা ভূত তাড়াবার জন্য শুধু ধোঁয়া আর সর্ষে-পড়াই ব্যবহার করে না,— উত্তম-মধ্যম মারও দেয়! নমস্কার! (প্রস্থান)

জয়ন্ত · আমি বিপ্লবকুমারের খুব বেশি বিরোধী নই, কিন্তু আমার মনে হয় — সে প্রস্তুত না হয়েই নেমেছে। এতে সে দেবলোকের ক্ষতিই করবে।

সভ্যগণ : (উঠিয়া পড়িয়া) এ সব আগুনের আলোচনার স্থান এ নয়। আমরা আমাদের সত্যচ্যুত হয়ে পড়ব এখানে থাকলে। এ আলোচনা আমাদের এবং আমাদের দেশের ক্ষতি করবে। আমরা আজ উঠলাম। আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ অন্য দিন অন্য স্থানে হবে। (সকলের প্রস্থান)

(বিপ্লবকুমার ও স্বাহাদেবীর প্রবেশ)

বিপ্লবকুমার : আমি তখন এসে ফিরে গেছি, জয়ন্ত দেব। ওই ভীরু লোকগুলোকে ভয় করিনে, কিন্তু যখন ভাবি যে, দেবলোকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে ওরাই — তখন আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারিনে। তখন এলে একটা বিশ্রী কলহের সূত্রপাত হত ভেবেই চলে গেছি।

জয়ন্ত : কিন্তু এখনই বা এসেছেন কেন? আপনি তো জানেন, আপনাদের এবং আমাদের পথ একেবারে বিপরীতমুখী।

স্বাহা : সেই মুখকে ঘুরিয়ে একমুখী করবার জন্যই আমি এসেছি, জয়ন্তদেব!

জয়ন্ত : সে অধিকারের মর্যাদাকে আপনিই আগে ক্ষুণ্ন করেছেন দেবী। আপনি ক্ষমা করবেন, যদি আপনার অধিকারের সম্মান রাখতে না পারি। এ পথ এক হবার পথ নয়। আপনি মনে করেছেন, আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে সেতু হয়ে। কিন্তু তা নয়, বরং আমাদের মিলনের যে সম্ভাবনা ছিল,

আপনি তাতে আড়াল হযে দাঁড়িযেছেন এসে।

[বিপ্লবকুমার চমকিত হইযা উঠিল। সে একবার জযন্তের দিকে, একবার স্বাহার দিকে তাকাইযা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিযা অধোমুখে দাঁড়াইযা রহিল।]

স্বাহা (ব্যথা-ক্লিষ্ট কণ্ঠে) তুমি ভুল করলে জযন্ত। এই ভুলের জন্য সারা দেব-লোককে প্রাযশ্চিত্ত করতে হবে। সারা দেবলোকের যৌবনের মূর্ত প্রতীক তোমরা দু জন তোমরাই যদি দ্বিধা-বিভক্ত হও, দেবলোকের কল্যাণ তাহলে পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করবে কেমন করে ? দেবলোকের কল্যাণের জন্য যদি আমি তোমাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে কি তোমরা এক হবে ?

বিপ্লবকুমার এ সব হেঁযালির মানে তো বুঝতে পারছিনে, স্বাহা দেবী। আমি যা ভেবেছি, তাই যদি সত্য হয — তাহলে আপনাদের দুইজনকেই বলে রাখি, আমায দিযে আপনাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভালাভের ভয বা আশা নেই। আমি স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই জানিনে। জযন্তদেবকে সাথে পেলে আমার ব্রত সহজে উদ্‌যাপন হত। না পাই, ওঁকে নমস্কার করে চলে যাব। এর মাঝে মান-অভিমানের পালা আসবার তো কথা ছিল না।

জযন্ত আপনি আমার নমস্য বিপ্লবকুমার। আমার নির্লজ্জতা ক্ষমা করুন। আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার মতো সংযম আর শক্তি যদি থাকত, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার সে শক্তিই নাই। তাছাড়া, আপনার পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে গ্রহণ করবার মতো বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি আজও। আপনার মন্ত্রে অবিশ্বাসী আপনার পথে শুধু বাধারই সৃজন করবে — পথকে এগিযে দিতে পারবে না।

বিপ্লবকুমার আপনার শক্তির উপর আপনার চেযে আমার বেশি বিশ্বাস আছে, জযন্ত দেব। কিন্তু সে শক্তিকে যখন আপনি দেশের বড়ো কল্যাণের জন্য দান করতে কার্পণ্য করেছেন, তখন সেখানে আমার বলবার কিছু নেই। আমার শুধু একটি প্রশ্ন মনে রাখবেন — এবং পারেন তো পরে উত্তরও পাঠাবেন। সে প্রশ্নটি এই যে, দেবলোকের যৌবন আজও শুধু অতীতের দাসত্বই করবে, না সে তার নিজের পথ নিজে রচনা করবে ? সোজা পথ দুরূহ বিপদ-সংকুল বলেই কি তাকে ছেড়ে এক বছরের লক্ষ্যস্থলে একশো বছরে পৌঁছুতে হবে ? চললাম — স্বাহা দেবী, নমস্কার। আপনার এখন জযন্তদেবের সাহায্য করাই উচিত।

স্বাহা এখন আপনার পিছনে চলা ছাড়া তো আর আমার অন্য পথ নাই, বিপ্লব-কুমার। যিনি আমাকে বুঝতেই পারেননি, তাঁর পথের বোঝা হযে থেকে কোনো লাভ নেই।

জযন্ত নমস্কার। (উভযকে নমস্কার করিলেন)।

বিপ্লবকুমার তাহলে আমার পশ্চাতেই আসুন। শক্তিকে ফিরিযে দিতে নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[গভীর পার্বত্য অরণ্য। সেই অরণ্যে রক্ত-বাস-পরিহিত যোদ্ধৃবেশে বিপ্লবী দেবযুবাদল ও বিপ্লব-কুমার। পর্বতের সানুদেশে পর্বত ঘিরিয়া ভূতের শত শত কালো তাম্বু। পর্বত-শিখর অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণ শকুনের মতো দলে দলে ভূতের রথ উড়িয়া ফিরিতেছে।]

বিপ্লবকুমার : বীর দেব-সেনাদল! আজ আমাদের শেষ ভাগ্যপরীক্ষা। ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন, এমন দুরাশা করিনে। তবু যাবার আগে ভূতের নখর দন্তগুলো নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে চাই। দেবলোককে তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে যেতে চাই — আমাদের এই মুষ্টিমেয় দেবযুবার আত্মবলিদানে। কত বড়ো বিপুল শক্তি শুধু আত্মশক্তির অ-পরিচয়ে, আত্ম-চেতনার অভাবে নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য হয়ে দিনের পর দিন ক্লিষ্ট পিষ্ট পদদলিত হচ্ছে—শুধু সেইটুকু জানিয়ে যেতে পারলেই বুঝব — আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। বাকি কাজ দেবলোকের অনাগত যুবারা স্বল্পায়াসেই করতে পারবে।

দেব-সেনাদল : জয় শিব শংকর! জয় দেবলোকের জয়!

[গান করিতে করিতে দেবযুবাদলের অগ্রগমন]

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে
হবে নব পরিচয়!
জয় জীবনের জয়॥
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাব
শক্তির বিস্ময়।
জয় জীবনের জয়॥
ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে
দলিব মৃত্যু-ভয়।
জয় জীবনের জয়॥
মরু-অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধরি ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।
আমাদের শত শব-চিন ধরি
আসিবে শক্তি প্রলয়ংকরী,
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতারি
নবীন অভ্যুদয়
জয় জীবনের জয়॥

বিপ্লবকুমার : সাবাস জোয়ান! এইবার হানো বজ্র, হানো ত্রিশূল, হানো পরশু — ওই ভূতের বাথান লক্ষ্য করে।

[দেব-যুবাগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উর্ধ্ব, অধঃ, সম্মুখ, পশ্চাত – সকল দিক দিয়া পশু-মুখ ভূতের দল অলক্ষ অস্ত্র হানিতে লাগিল।]

দেব-যুবাগণ : সেনাপতি! আমাদের অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে।

বিপ্লবকুমার : (যুদ্ধ করিতে করিতে) শুধু হাতে-পায়ে যুদ্ধ করো। হত আহত সৈনিকের হাত ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আক্রমণ করো। মনে রেখো বন্ধু আমরা কেউ ফিরে যাবার জন্য আসিনি!

[দেব-যুবাগণ শুধু হাতে ভূতদের উপর লাফাইয়া পড়িল। হত-আহত সৈনিকদের হাত-পা ছিঁড়িয়া লইয়া আঘাত হানিতে লাগিল। ভূতের তাম্বুতে ভীষণ সন্ত্রাস। কিচিরমিচির শব্দ উত্থিত হইল। ভূতের সিংহমুখ সেনাপতির ইঙ্গিতে ভূতেরা উর্ধ্ব হইতে এক অদৃশ্য মায়াজাল নিক্ষেপ করিল। দেবযুবাগণ সেই জালের প্রভাবে শক্তিহীন হইয়া বদ্ধহস্ত-পদ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। ভূতেরা একে একে সকলকে বন্দি করিল।]

বিপ্লবকুমার : শংকরী! রাক্ষুসি! এতেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না? তোর বিজয়া দশমী কি চিরকালের জন্য হয়ে গেছে? আমার সেনাদল গেছে। আমি এখনও বেঁচে আছি। ওদের মায়াজালের বন্ধনকে অতিক্রম করে বাঁচার শক্তি আজও আমি হারাইনি। উঃ! পশ্চাৎ হতে আমায় আক্রমণ করেছে।

[কৃষ্ণবাস-পরিহিত একদল ভূত বিপ্লবকুমারকে ভীষণ আক্রমণ করিল। বিপ্লবকুমার পড়িয়া গেল।]

স্বাহা : ভয় নাই বীর, আমি এসেছি। ওই দেখো পশ্চাতে আমার নারী-সেনাদল! ও মায়াবী ভূতের মায়াজাল ছিন্ন করতে পারবে — এই মায়াবিনী নারী-সেনা! ওদের অস্ত্র ব্যর্থ করতে পারব আমরাই।

বিপ্লবকুমার : না দেবী, পারবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ দেবতায় দেবতায় যুদ্ধ নয়। দেবতায় পশুতে যুদ্ধ এ। রক্ত-খেগো পশু আর রাক্ষস পুরুষ-নারীর সমানে রক্ত শোষণ করে। ওদের শক্তিকে ভয় করি না, ভয় করি ওদের উলঙ্গ নির্লজ্জতাকে। ওরা তোমাদের — আমাদের দেবলোকের প্রাণশক্তির অবমাননা করে যদি তার খর্বতা সাধন করে — আমাদের দেবলোক কোনো দিনই ভূতের গ্রাস থেকে মুক্ত হবে না। তুমি ফিরে যাও। তোমার কাজ আমার এই হারাপথের সন্ধানী যুবকদের খুঁজে বের করা। তাদের এই মৃত্যু-পথের সন্ধান দেওয়া। আমরা আত্মদান করে ভয়-মুক্ত করে গেলাম জাতিকে, মৃত্যুঞ্জয় কবচ বেঁধে দিলাম দেবলোকের যুবশক্তির বাহুতে। এর পরে যারা আসবে এই পথে তারাই আমাদের শবের কঙ্কাল ধরে ধরে আমাদের আহতদের রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে যাবে আমাদের উদ্ধার সাধনে। ভূতের হাত থেকে অমৃতের উদ্ধার করে আমাদের বাঁচিয়ে তুলবে। সেইদিন আসব আমরা নতুন দেহেন — নতুন রূপে। ধ্বংসের পূজারী-দল আসব নব-সৃষ্টির ধেয়ানী হয়ে! স্বাহা! আমি যাই। উঃ!

স্বাহা : (বিপ্লবকুমারের উপর পড়িয়া) বন্ধু! প্রিয়! তোমার শেষ দান আমায় দিয়ে যাও।

বিপ্লবকুমার : আমার শেষ দান — আমার শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। তারপর যা চাও, সে প্রীতি সে প্রেম — পাবে যখন আবার আমি আসব। সে আজ না, স্বাহা!

স্বাহা : (উঠিয়া পদধূলি লইয়া) তুমি শান্তিতে যাও বীর, আমি তোমার ব্রত গ্রহণ করলাম।

[বিপ্লবকুমার স্বাহার দক্ষিণ কর ললাটে ঠেকাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।]

যবনিকা

একটি রূপক রচনার খসড়া পরিকল্পনা

জনক = যে শস্য ফসল উৎপাদন করে।
রাম = কৃষকদের প্রতিনিধি (জনগণ-অধিনায়ক)।
সীতা = জনক অর্থাৎ শস্য-উৎপাদকের কন্যা · শস্য।
হরধনু-ভঙ্গা = অর্থাৎ Hard Soil উর্বর করে শস্য অর্থাৎ সীতাকে পাওয়া।
লক্ষ্মণ = শ্রীমান (?)।
রাবণ = যে সেই শস্য বা সীতাকে হরণ করে। লোভের প্রতীক। যে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করে, দশ মুখ দিয়ে গ্রাস করে।
রাম = জনগণ বা কৃষকদের প্রতিনিধি, তাই দূর্বাদল-শ্যাম।
হনুমান = নৌ-যান ও আকাশ-যানের প্রতীক।
পবন = গতি (speed)
ভরত = President।
শত্রুঘ্ন = শত্রু-হন্তা।
কুশ-লব = শস্যের দুই অর্ধ।
বিভীষণ = লোভের সহোদর নির্লোভ : বিবেক।
কৌশল্যা = ডিপ্লোমেসি ; তার গর্ভেই জনগণ-অধিনায়ক জন্ম নেয়।
দশরথ = দশদিকে যার অব্যাহত গতি।
রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই কুবের। ঐশ্বর্যের দুই দিক — দেবশক্তিতে ঐশ্বর্য নিয়োজিত হলে মঙ্গাল সাধন করে ; রাক্ষস-শক্তিজাত ঐশ্বর্য অমঙ্গাল সাধন করে, লুণ্ঠন করে।
কুশ = যজ্ঞাদি কার্যে লাগে : তৃণ।
লব = কুশের নিম্নার্ধ ভাগ।
সীতার পাতাল প্রবেশ = রাম অর্থাৎ কৃষকদের প্রতিনিধি যখন শস্যকে অবহেলা করে জনগণের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত স্বর্ণকে গ্রহণ করেন, তখন শস্য পাতাল প্রবেশ করেন। অর্থাৎ শস্য-উৎপাদিকা-শক্তিকে অবহেলা করে স্বর্ণরৌপ্যকে (স্বর্ণসীতাকে), বড়ো করে ধরলে দেশের সমূহ অকল্যাণ হয়। এই ভ্রম বুঝে রামকে বা জনগণের প্রতিনিধিকে সরযূর জলে ডুবতে হয়।
কৈকেয়ী ও মন্থরা = দুর্বুদ্ধি।
কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি বনবাসে গেলে বা Departure হলে শস্য অর্থাৎ সীতাও সহগামিনী হন। কৃষক শ্রমিকের সাহায্য না পাওয়ায় রাবণ শস্য হরণ করতে সমর্থ হয়।
রাবণ = ঐশ্বর্য-পিপাসী সুমালির দৌহিত্র। কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে সুমালির ঈর্ষা হয়, — সেই ঈর্ষা বুদ্ধিপ্রসূত যে issue তারই নাম নিকষা। তার সন্তান লোভ বা রাবণ।
বিশ্রবা = ঋষি।
রাবণ = ব্রাহ্মণ-শক্তি + রাক্ষস-শক্তি।

বিবিধ ও বিচিত্র প্রবন্ধ এবং
সংবাদ-টীকা

নবযুগ-এর প্রবন্ধ : আজ চাই কী
ধর্ম ও কর্ম
আমার লিগ কংগ্রেস
নবগুগের সাধনা
বাঙালির বাংলা

বিবিধ প্রবন্ধ : মিয়া কা সারং
দুটি রাগিণী
নীলাম্বরী
হোসেনি কানাড়া
ওমরের কাব্য ও দর্শন

সংবাদ টীকা : চানাচুর
ডোমনি স্টেটাস
পুনর্মুষিকো ভব
চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা
বিবাহ-আইন বিল
চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে !
'হায় জানতে পার না'
ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার !
ধনে প্রাণে মারা যায়

নবযুগ-এর প্রবন্ধ

আজ চাই কী

আজ চাই সারা ভারতজোড়া একটা বিরাট ওলট-পালট। আজ আর এই পোড়া দেশে মড়ার শ্মশানভূমিতে 'শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা' কাব্যকুঞ্জের মধু-গুঞ্জন শোভা পায় না, সে নির্লজ্জ অভিনয় নিদারুণ উপহাসের মতো প্রাণে এসে বেঁধে। আজ চাই মহারুদ্রের ভৈরব গর্জন, প্রলয় ঝঞ্ঝার দুর্বার তর্জন, দুর্দম দুর্মদ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতের প্রমত্ত বিপুল রণ-উন্মাদ আর তাদের হ্রেষা বৃংহণের গগনবিদারী প্রচণ্ড নাদ। আজ অলক-তিলকের সুচারু বিন্যাস মুছে ফেলে ধকধক জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মতো ললাটে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক পরতে হবে। আজ কোমল কুসুমমালা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে মিথ্যাচারী অসুরের অস্থি-কপালের মালা প্রমত্ত বিক্রমে স্ফীত বক্ষে দোলাতে হবে। এ শ্মশানে আজ সবার মুখে স্তিমিত মধুর হাসি নিভে গিয়ে দেখা দিক এক বিকট মৃত্যু-করাল রক্তলোলুপ দুর্নিবার অধর্ম-বিদ্বেষ। আজ অবিচার-কদাচারে ভরা এই বিলাস-আলয়ের কেলি-কুঞ্জে যমরাজ তাঁর যত সব হিংস্র শৃগাল-কুকুর-শকুনি-গৃধিনীকে একেবারে বল্‌গা আলগা দিয়ে লেলিয়ে দিন। এই মোহ-সুপ্ত মরণ-মগ্ন জাতির বুকের উপরে প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব চলতে থাকুক। আজ মিথ্যার সকল সন্ধি, গ্রন্থি ছিন্ন বিদীর্ণ হোক। মিথ্যা-মদিরার সব পেয়ালা ভেঙে চুরমার হয়ে যাক, শয়তানের আরামের আসর হতভম্ব হোক, সারা দেশটা ভরা আজ এক বিকট উন্মাদলীলা, শুধু মতিচ্ছন্নের প্রলাপ আর ক্লীবের ক্রন্দন। যেখানে যত দোকান-পাট ঘর-সংসার সাজ-সরঞ্জাম সকলের মাঝে এর বিরাট ভণ্ডামি, ধর্মের নামে ফাঁকিবাজি। ভগবানের নাম মুখে এনে যারা শয়তানের ভাবে জীবন পূর্ণ করে কেবল কপটতার, প্রবঞ্চনার, পুণ্য লৌকিকতার বহর জাহির করে, বিধাতার বিশ্বধ্বংসী বজ্রনিষ্ঠুর আঘাতে তাদের অহংকারকে চূর্ণ, নিষ্পেষিত করে না? এ অন্যায়ের পাশবলীলা এই মানুষের জগতে, এই দেবতার ভারতে আর কতদিন চলবে? নারায়ণ তাঁর অনন্ত শয্যায় আর কতকাল নিদ্রিত থাকবেন? এ সুন্দরী ধরিত্রী যে পাপ-রাক্ষসের দুর্গন্ধ ক্লেদ বিষ্ঠায় জঘন্য নরকে পরিণত হল, ধর্মধ্বজী মায়াবীদিগকে গ্রাস করবার জন্য বিষবহ্নি উদ্গার করে বাসুকি কি তার সহস্র জিহ্বা লকলকিয়ে ছুটে আসবে না? আজ কি তার ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছায় নাই? আজ সাগর-ভূধর-সংসার-কানন-মরু দলিত-মথিত করে আসা চাই মহা-প্রলয়ের মহা আলোড়ন। ভারতের জীবনের অণু-পরমাণুর আজ পচাগালা বিষবিষ্ঠার বাসা হয়েছে; আজ পরিপূর্ণ সৃষ্টির আয়োজনের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমূল ধ্বংসের প্রয়োজন হবে। এই সত্যযজ্ঞে সকল মিথ্যা অত্যাচারকে পুড়িয়ে ভস্ম না করতে পারলে যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। অটল সাধকের বক্ষক্ষারিত যজ্ঞ-হবিতে এ দেবভূমি স্নিগ্ধ হবে না; হলে পুরাতন জীর্ণ জরা ভারত ভস্মে আচ্ছাদিত না হলে তাতে দেব-জীবনের অভিনব সৃষ্টি জেগে উঠবে না। সৃষ্টির বাঁশরির আকুল-করা প্রেরণা সেই দিনই আমাদের মর্মে মর্মে প্রবেশ করবে,

যেদিন মহেশের ডম্বরু-বিষাণের শব্দে ভীত-ত্রস্ত হয়ে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, অবিচার, অনাচারের ছায়া-মূর্তি পর্যন্ত এ দেশের জীবনভূমিতে উঁকি মারতে সাহস পাবে না।

আজ চাই, ভরাট-জমাট জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ, সতেজ গতি ও অভিব্যক্তি। কোথাও কোনো জড়তা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও আড়ষ্টতা না থাকে। আজ পথের বাধা পাষাণ-অটল হিমাচলের মতো বজ্রদৃঢ় হলেও সত্য-সাধকের পদাঘাতে চক্ষের নিমেষে চূর্ণিত হবে। অমৃতের সন্ধানী যে ভাগবৎশক্তি যার শিরায় শিরায় অমিত বীর্যের অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত করছে, তার বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত-কম্পমান হবেই হবে। তার রোষ-কটাক্ষের সম্মুখে অবিদ্যাজনিত সব ভয় বিতাড়িত হবে। সমাজধর্মের দুরহংকারে উচ্চশির ভূলুণ্ঠিত হবে, এ হতেই হবে। সত্য ও মুক্তির জয়রথের যাত্রাপথ রোধ করতে পারে এমন কোনো যক্ষদক্ষ দানবের নাই। সত্য-সাধককে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন গন্ধর্ব-কিন্নরের মায়া এ দুনিয়ায় নাই। যে সত্যের ভান এ পর্যন্ত পৃথিবীতে দুর্দিনের তরে আপন প্রভাব-মহিমা বিস্তার করে দুর্দিনেই নিজের বোনা জালে, নিজের গড়া শিকলে আবন্ধ, পঙ্গু ও অবসন্ন হয়ে পড়ত, আজ তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আজ ওই নেমে আসছে ভারতের বিশাল জীবনের পরে পরিপূর্ণ সত্যমুক্তির আলোকপ্রপাত। আর তারই স্পর্শে তাতে জ্বলে উঠবে বিচিত্র নবসৃষ্টির অফুরন্ত আশা ও আনন্দ। আজ মনকে আঁখি ঠেরে ভাবের ঘরে চুরি করে গোঁজামিল দিয়ে চলতে পারা যাবে না। আজ রাষ্ট্রে যারা অবাধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী তাদের সমাজ-ধর্ম ও মুক্তি ব্যাহত থাকলে বিধাতার অলক্ষ্য বিধানে তাদের যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, তা থেকে কোনো মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, কবচ-মাদুলি তাদের রক্ষা করতে পারবে না, মিথ্যাচারের লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হবেই হবে। সমাজ-ধর্মে যাঁরা মুক্তির কোনো ছেদ বা সীমা মানতে চান না, তাঁরা যদি এই বিরাট দেশের বুকের উপর রাষ্ট্রপরাধীনতার রাক্ষসীকে বসে বসে রক্ত শুষতে দেন, সে অপরাধে তাঁদের মার্জনা নেই। কোথাও মিথ্যা-অন্যায়ের সাথে মাঝপথে রফা হতে পারবে না, আজ সকল ভারত-মাতার বীর সন্তানকে বুক ঠুকে হেঁকে নিঃসংকোচে এই সত্য প্রচার করতে হবে। মনের কোণে বসে যদি কোনো ছিচকাঁদুনি সংস্কার-বুড়ি তোমার আঁচল ধরে পিছনে টেনে রাখতে চায়, তবে তাকে নির্মমভাবে লাথি মেরে তোমার জীবন-গৃহের চতুঃসীমা হতে বাহির করে দাও। ওগো আমার ওস্তাদ চাষি, তুমি তোমার সাধের জমিতে সোনার ফসল ফলাবার আকাঙ্ক্ষা যদি করে থাক, তাহলে তোমার সেখানে আবর্জনা, কণ্টক, দুষ্টকীটের বাসা পুষে রাখলে চলবে না। সব সাফ করতে হবে। সব জমি গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে হবে, তবে তো ফলবে তাতে পরিপূর্ণ নবজীবনের পরিপুষ্ট ফসল। সকলের শাসনের দাসত্ব যদি সত্যই হেয় বলে বুঝে থাক, যদি তার পাষাণ-চাপে ফাঁপর হয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাক, তবে তুমি কোন লজ্জায় নিজের ঘরের অত্যাচারের অধীনতা মাথা পেতে নিচ্ছ? এই পরতন্ত্রতার হীনতা হতে না এড়ালে তোমার স্বর্গ নেই, আছে বীভৎস নরক। এ তুমি স্থির জেনো, মুক্তির দিশারি যদি তুমি হয়ে থাক, হতে হবে তোমায় বৃহতের ও মহতের পূজারি। তোমার দেবতার সৌন্দর্য-শক্তি-মহিমা অনাদি অনন্ত, কোনো গুরু-পুরোহিতের মন্ত্রশাস্ত্রের নিগড়ে সে বিরাট পুরুষ বাঁধা পড়ে নেই। সত্যের স্বরূপ জানাবার মতো আলো তোমার মাঝে আছে।

সাধনার রুদ্র বহ্নি চারিদিকে জ্বালিয়ে তুলে তুমি সকল মিথ্যার অপবাদের দড়াদড়ি

পুড়িয়ে ফেলো — জগাজ্জয়ী শক্তি তোমার মধ্যে উদ্‌বুদ্ধ হবে, অনন্ত জ্ঞান ও অটল অফুরন্ত প্রেম তোমার দৃষ্টির ঝাপসা কাটিয়ে দেবে, তোমার প্রাণের শতদলকে বিকশিত করবে। ভাঙাগড়া কোনোটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারত চোখের পলকে ধসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের যাঁরা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোনো দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকি থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় ষোলো আনা ঘুণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল। আজ বুযে আসুক কালবৈশাখীর উন্মাদ ঝঞ্ঝা রক্ত-পাথারের অবারিত স্রোতে অযুত ফণা বিস্তার করে, আজ সব অগ্নিবাণ নাগনাগিনী বিপুল উল্লাসে বিচরণ করুক। এই প্রলয়-পয়োধিজলে মিথ্যার সৌধশীর্ষ ডুবে যাক। তবেই আবার অনন্ত জীবনের সহস্রদলের উপর বেদ-উদ্ধারণ নারায়ণের আবির্ভাব হবে।

ধর্ম ও কর্ম

যে স্বধর্মে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কোনো অধিকার নাই। আজ যাঁরা দেশের কর্মী বলে খ্যাত, তাঁদের অনেকেই অনধিকারী বলেই ক্ষেত্রে লাঙলই চালিয়ে গেলেন, ফসল আর ফলল না। সামান্য যা ফসল ফলল, তাকে রক্ষা করার প্রহরী, সৈন্য পেলেন না। যিনি নিজে স্বাধীন হলেন না, তিনি দেশের, জাতির স্বাধীনতা আনবেন কেমন করে? যাঁর নিজের লোভ গেল না, যিনি নিজে দিব্য সত্তা লাভ করেননি, তিনি কেমন করে লোভীকে তাড়াবেন, কোন শক্তিতে দৈত্য, অসুর, দানবকে সংহার করবেন? ধর্মভাব মানে এ নয় যে শুধু নামাজ, রোজা, পূজা, উপাসনা নিয়েই থাকবেন। কর্মকে যে ধার্মিক অস্বীকার করলেন, কর্মকে সংসারকে যিনি মায়া বলে বিচার করলেন, কর্ম, সংসার ও মায়ার স্রষ্টার তিনি বিচার করলেন। যিনি একমেবা-দ্বিতীয়ম, যাঁর কোনো শরিক নাই, যিনি একমাত্র বিচারক, তাঁর সৃষ্টির বিচার করবে কে? এই পলাতকের শাস্তি সঞ্চিত আছে। তবে মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে হয়, একেবারে পগার পার হয়ে গেলে চলবে না। সমুদ্রের জল আকাশে পালিয়ে যায় বলেই বৃষ্টিধারা হয়ে ঝরে পড়ে।

নবনীরদ পাহাড়ে পালিয়ে যায় বলেই নদী-স্রোত হয়ে ফিরে আসে। এই উপরের দিকে উড়ে যাওয়া — অর্থাৎ আমাদের পরম প্রভুর ধ্যান করা মানে সময় নষ্ট করা নয়, আমাদেরই না-জানা পূর্ণতাকে স্বীকার করা ; আমারই ঘুমন্ত অফুরন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। নির্লোভ, নিরহংকার, দ্বন্দ্বাতীত হলে — লোভ, অহংকার ও দ্বন্দ্বের মাঝে নেমে অবিচলিত শান্ত চিত্তে কর্ম করা যায়। প্রশংসা, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন তখন কর্মীকে ফানুসের মতো ফাঁপিয়ে তোলে না। নিন্দা, হিংসা, অপমান, পরাজয় তখন কর্মীকে নিরাশ করতে পারে না, তাঁর অটল ধৈর্য ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না। মন্দ-ভালো

দুয়ের মধ্যেই ইনি পূর্ণ-অভয়চিত্তে বিচরণ করতে পারেন। তসবি অর্থাৎ জপমালা ও তরবারি, দুই-ই তখন তাঁর সমান প্রিয় হয়ে ওঠে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের অতীত হয়েও ইনি ওই তিনগুণে নেমে বিপুল কর্ম করতে পারেন। এই সেনাপতি সাগরের মতো কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এঁরই আহ্বানে, এরই আকর্ষণে ছুটে আসে দেশ-দেশান্তর থেকে স্রোতস্বিনী দুর্নিবার অনিরুদ্ধপ্রবাহ নিয়ে।

ত্যাগ ও ভোগ — দুয়েরই প্রয়োজন আছে জীবনে। যে ভোগের স্বাদ পেল না, তার ত্যাগের সাধ জাগে না। ক্ষুধিত উপবাসী জনগণের মধ্যে এই সেনাপতি, অগ্রনায়ক আগে প্রবল ভোগের তৃষ্ণা জাগান। অবিশ্বাসী নিদ্রাতুর জনগণের বুকে রাজসিক শক্তি জাগিয়ে তাদের তামসিক জড়তা নৈরাশ্যকে দূর করেন। রাজসিক শক্তিকে একমাত্র সাত্ত্বিকী শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই ভগ্নতন্দ্রা বিপুল গণ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেন যে-অগ্রনায়কের কথা বলেছি — তিনি।

জনগণকে শুধু ঊর্ধ্বে কথা বললে চলবে না। তাদের বুকে ভালো খাবার, ভালো পরবার উদগ্র তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই জাগ্রত ক্ষুধিত সিংহ ও সুন্দরবনের বাঘের দল যাতে উৎপাত না করে, তার ভার নেবেন সেই মায়াবী অগ্রনায়ক। যিনি এই ভীষণ শক্তিকে জাগাবেন, তাকে সংযত করার শক্তি যেন তাঁর থাকে। নইলে জগৎ আবার পশ্চিমের রাজসিক উন্মত্ততায় রক্ত-পঙ্কিল হয়ে উঠবে। নিজেরাই হানাহানি করে মরবে।

এদের ভোগের ক্ষুধাও জাগাতে হবে, ত্যাগের আনন্দে রসের তৃষ্ণাও জাগাতে হবে।

আমি একবার 'নিউমার্কেট'-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি, এক ভদ্রলোকের নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত, আর দুই হাতের এক হাতে একগোছা রজনিগন্ধা ও আর এক হাতে দুইটি রামপাখি — মুরগি। আমার অত্যন্ত আনন্দ হল, তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম : 'ফেয়ার ও ফাউলের' এমন 'কম্বিনেশন' — সংগতি আর দেখি নাই ! ভদ্রলোকও আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন : 'নিত্য আপনার হাতে ফুল, পাতে মুরগি পড়ুক।'

মুরগির সাথে রজনিগন্ধার তৃষ্ণাও থাকবে ?

বড়ো ত্যাগ তাঁর জন্য, যিনি সকলকে বড়ো করবেন। জনগণকে তাই বলে ধর্মের আশ্রয়চ্যুত করবার অধিকার কারুর নেই। এ অধিকারচ্যুত করতে চাইবেন যিনি, তিনি মানবের নিত্য কল্যাণের, শান্তির শত্রু। মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ রাজসিক শক্তি দিতে পারে না। মানুষ পেট ভরে খেয়ে, গা-ভরা বস্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট হয় না, সে চায় প্রেম, আনন্দ, গান, ফুলের গন্ধ, চাঁদের জ্যোৎস্না। যদি শোকে সান্ত্বনা দিতে না পারেন, কলহ-বিদ্বেষ দূর করে সাম্য আনতে না পারেন, আত্মঘাতী লোভ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে তিনি অগ্রনায়ক নন। ধর্ম ও কর্মের যোগসূত্রে যদি মানুষ না বাঁধা পড়ে, তাহলে মানুষকে এমনই চিরদিন কাঁদতে হবে।

আমার লিগ কংগ্রেস

আমার স্বধর্মী কোনো কোনো ভাই বা তাঁদের কাগজ প্রচার করছেন — আমি নাকি মুসলিম লিগ বিদ্বেষী। বিদ্বেষ আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার আল্লাহ্ নিত্য-পূর্ণ-পরম-

অভেদ, নিত্য পরম-প্রেমময়, নিত্য সর্বদ্বন্দ্বাতীত। কোনো ধর্ম, কোনো জাতি বা মানবের প্রতি বিদ্বেষ আমার ধর্মে নাই, কর্মে নাই, মর্মে নাই। মানুষের বিচারকে আমি স্বীকারও করি না, ভয়ও করি না! আমি শুধু একমাত্র পরম বিচারক আল্লাহ্ ও তাঁর বিচারকেই মানি। তবু যাঁরা ভ্রান্ত বা বিদ্বেষবশত আমার এই নিন্দাবাদ করছেন তাঁদের ও আমার প্রিয় মুসলিম জনগণের অবগতির জন্য আমার সত্য অভিমত নিবেদন করছি।

আমি 'নবযুগে' যোগদান করেছি শুধু ভারতে নয়, জগতে নবযুগ আনার জন্য। এ আমার অহংকার নয়, এ আমার সাধ, এ আমার সাধনা। এই বিদ্বেষ-কলহ-কলঙ্কিত, প্রেমহীন, ক্ষমাহীন, অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে— আল্লার বান্দারূপেই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি। 'ইসলাম' ধর্ম এসেছে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে — কোরান মজিদে এই মহাবাণীই উত্থিত হয়েছে।.. এক আল্লাহ্ ছাড়া আমার কেউ প্রভু নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই আমার একমাত্র মানব-ধর্ম। আমি যদি আমার অতীত জীবনে কোনো 'কফুর' বা 'গুণাহ' কবে থাকি তার শাস্তি আমি আমার প্রভু আল্লার কাছ থেকে নেব, তার শাস্তি কোনো মানুষের দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ্ লা-শরিক, একমেবাদ্বিতীয়ম। কে সেখানে 'দ্বিতীয়' আছে যে আমার বিচার করবে? কাজেই কারও নিন্দাবাদ বা বিচারকে আমি ভয় করি না। আল্লাহ্ আমার প্রভু, রসুলের আমি উম্মত[১], আল-কোরান আমার পথ-প্রদর্শক। এ ছাড়া আমার কেহ প্রভু নাই, শাফায়ত[২]— দাতা নাই, মুর্শিদ নাই। আমার আল্লাহ আল ফাদালিল 'আজিম' — পরম দাতা। তিনিই আমাকে জাতির কাছ থেকে, কৌমের কাছ থেকে, কোনো দান নিতে দেননি। যে দক্ষিণ হাত তুলে কেবল তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেছি তাঁর দাক্ষিণ্য ছাড়া কাবুর দানে সে-হাত কলঙ্কিত হয়নি। আজ তিনিই এই পথভ্রষ্ট, অন্ধ আশ্রয় ভিক্ষুকের হাত ধরে একমাত্র তাঁর পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমার ক্ষমাসুন্দর আল্লার পূর্ণ ক্ষমা পেয়েছি, সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। তাঁর বান্দা হবার অধিকার পেয়েছি। আমার আজ আর কোনো অভাব নাই, চাওয়া নাই, পাওয়া নাই।

আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি — আমি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আমার কবিতা যাঁরা পড়ছেন, তাঁরাই সাক্ষী : আমি মুসলিমকে সংঘবন্ধ করার জন্য তাদের জড়ত্ব, আলস্য, কর্মবিমুখতা, ক্লৈব্য, অবিশ্বাস দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। বাংলার মুসলমানকে শির উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য — যে শির এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সম্রাটের কাছেও নত হয়নি — আল্লাহ্ যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই দিয়ে বলেছি লিখেছি ও নিজের জীবন দিয়েও তার সাধনা করেছি। আমার কাব্যশক্তিকে তথাকথিত 'খাটো' করেও গ্রামোফোন রেকর্ডে শত শত ইসলামি গান রেকর্ড করে নিরক্ষর তিন কোটি মুসলমানের ইমান অটুট রাখারই চেষ্টা করেছি। আমি এর প্রতিদানে সমাজের কাছে জাতির কাছে কিছু চাইনি। এ আমার আল্লার হুকুম, আমি তাঁর হুকুম পালন করেছি মাত্র। আজও আমি একমাত্র তাঁরই হুকুমবরদাররূপে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছি — আমার দীর্ঘদিনের গোপন তীর্থযাত্রার পর।

১ শিষ্য। ২ সুপারিশ বা সমর্থন।

আমি আজ জিজ্ঞাসা করি : আমি লিগের মেম্বার নই বলে কি কোনো লিগ-কর্মী বা নেতার চেয়ে কম কাজ করেছি ? আজও 'নবযুগে' এসেছি শুধু মুসলমানকে সংঘবন্ধ করতে — তাদের প্রবল করে তুলতে — তাদের আবার 'মার্টায়ার' — শহিদি সেনা করতে। বাংলার মুসলমান বাংলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গাকে প্রবল না করলে বাংলা কখনও পূর্ণাঙ্গা হবে না। বাংলার এই ছত্রভঙ্গা ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে, এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি। 'নবযুগে' এসেও সেই কথা বলেছি ও লিখেছি। এই 'নবযুগে' আসার আগে বাংলার মুসলমান নেতায় নেতায় যে ন্যাতা টানাটানির ব্যাপার চলেছিল — সেই গ্লানিকর বিদ্বেষ ও কলহকে দূর করতেই আমি লেখনী ও তলোয়ার নিয়ে, আমার অনুগত নির্ভীক, দুর্জয়, মৃত্যুঞ্জয়ী 'নৌ-জোয়ানদের' নিয়ে — ভাইয়ে ভাইয়ে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে এসেছি। আমি কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করতে আসিনি। আল্লাহ্ জানেন, আর জানেন — যাঁরা আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত তাঁরা — আমি কোনো প্রলোভন নিয়ে এই কলহের কুরুক্ষেত্রে যোগদান করিনি। 'লিগ' কেন, 'কংগ্রেস'কেও আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আমার 'ধূমকেতু' পত্রিকা তার প্রমাণ। মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে কোনোদিন লিখিনি — কিন্তু তার নেতাদের বিরুদ্ধে লিখেছি। যে কোনো আন্দোলনেরই হোক, নেতারা যদি পূর্ণ নির্লোভ, নিরহংকার ও নির্ভয় না হন, সে আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।

লিগের আন্দোলন যেমন 'গদাই লস্করি' চালে চলছিল তাতে আমি আমাব অন্তরে কোনো বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি।...

আমি 'লিগ' 'কংগ্রেস' কিছুই মানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি — কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এক খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত-হল না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওকে ঘুঁস মারে! দেখে হাসি পায়।

মুসলমানের জন্য আমার দান কোনো নেতার চেয়ে কম নয় ; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নবজীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণে সাহায্য করছে তাদের প্রায় সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা-ঝুলি থেকে।

আল্লার সৃষ্টি এই পৃথিবী আজ অসুন্দরে, নির্যাতনে, বিদ্বেষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ আল্লার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি — 'ভাইসরয়।' মানুষ আল্লার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ চেষ্টা করলে সমস্ত ফেরেশতাকেও বশ্যতা স্বীকার করাতে পারে, ত্রি-লোকের বাদশাহি পেতে পারে — এ আল্লাহ্‌র নির্দেশ। মানুষ মাত্রেই আল্লার সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে সর্ব নির্যাতন, সর্ব অশান্তি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষের জন্ম। আমি সেই কথাই আজীবন বলে যাব, লিখে যাব, গেয়ে যাব ; এই জগতের মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশকে আবার পূর্ণ শুদ্ধ পূর্ণ নির্মল করব — এই আমার সাধনা। পূর্ণ চৈতন্যময় হবে আল্লার সৃষ্টি, এই আমার সাধ। পূর্ণ আনন্দময়, পূর্ণ শান্তিময় হবে এ পৃথিবী — এ আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আল্লাতে বিশ্বাসের মতোই অটল!

'ফিরদৌসআলা'— পূর্ণ আনন্দধাম থেকে আমরা এসেছি। পৃথিবীতে সেই আনন্দধামেরই প্রতিষ্ঠা করব — এই আমাদের তপস্যা। এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর একমাত্র আল্লাহ্। যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবি করে তারা শযতান। সে শয়তানদের সংহার করে আমরা আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করব। যে মুসলমানের ক্ষাত্রশক্তি নাই, সে মুসলমান নয। যে ভীরু সে মুসলমান নয়। এই ভীরুতা, এই তামসিকতা, এই অপৌরুষকে দূর করাই আমার লিগ, আমার কংগ্রেস। এ-ছাড়া আমার অন্য লিগ-কংগ্রেস নাই।

নবযুগের সাধনা

যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইযা যায। পুকুরের জল গ্রামের কল্যাণ করে, কিন্তু সংক্রামক রোগের একটি জীবাণু পড়িলেই সে জল দূষিত ও অপেয় হইয়া যায়। কেন-না, পুকুরের জলের চারিধারে বন্ধন ; তার বিস্তৃতি নাই, গতি নাই, প্রবাহ নাই। নদীর জলেরও চারিধারে বন্ধন,— এক ধারে পাহাড়, এক ধারে সমুদ্র, দুই ধারে কূল। কিন্তু তার বিস্তৃতি আছে, তাই গতি ও প্রবাহ নিত্যসাথি। এই প্রবাহের জন্যই নদীর জলে নিত্য শত রোগের বীজাণু পড়িলেও তাহা অশুদ্ধ হয় না, অব্যবহার্য হয় না। তাই নদী পুকুরের চেযে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে, অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে, — তার বক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের ; পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইলেও আমরা কর্মচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।

বৃহৎ কর্মের অধিকারী হইতে হইলে, দেশের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করিতে হইলে, বৃহৎ শক্তির আধার হইতে হয়। নিত্য পরম ক্ষমাময় আল্লাহ্‌র তৃষ্ণা থাকিলে এই বৃহৎ কর্মের অধিকারী হওয়া যায়। নদী সমুদ্রের তৃষ্ণা নিয়ে ছোটে, তাই সমুদ্রকে পায়। সমুদ্রের তৃষ্ণা ছাড়া নদীর অন্য তৃষ্ণা নাই, তবু যাইতে যাইতে তার দুই কূলকে শস্য শ্যামল, ফুলে ফলে ফুল্ল করিয়া যায় ; দুই কূলের লোকের সমস্ত অশুদ্ধিকে নিজের দেহে নেয় ; তার দুই কূলের আবহাওয়াকে শুদ্ধ রাখে।

আত্মত্যাগী সাধকরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে মুক্ত হইয়া এই প্রবাহ-তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন — ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।

বাঙালির বাংলা

বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে — 'বাঙালির বাংলা' — সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। সেদিন একা বাঙালিই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে। বাঙালির

মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম-বিমুখতা, জড়ত্ব, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা-শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তম, এই তিমির, এই জড়ত্বই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় ; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে। যারা যত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এই অবিদ্যা তাদেরই তত বাধা দেয়, বিঘ্ন আনে। এই জড়তা মানবকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। কিছুতেই অমৃতের পানে আনন্দের পথে যেতে দেয় না। এই তমকে শাসন করতে পারে একমাত্র রজগুণ, অর্থাৎ ক্ষাত্রশক্তি। এই ক্ষাত্রশক্তিকে না জাগালে মানুষের মাঝে যে বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মশক্তি আছে তা তাকে তমগুণের নরকে টেনে এনে প্রায় সংহার করে ফেলে। বাঙালি আজন্ম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। তাদের ক্ষাত্রশক্তি জাগল না বলে দিব্যশক্তি কোনো কাজে লাগল না — বাঙালির চন্দ্রনাথের আগ্নেয়গিরি অগ্নি উদ্‌গিরণ করল না। এই ক্ষাত্রশক্তিই দিব্য তেজ। প্রত্যেক মানুষই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ, ঐশীশক্তি অর্থাৎ সৎশক্তি সর্ব অসৎ শক্তিকে পরাজিত করে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। এই সত্ত্বগুণের প্রধান শত্রু তমগুণকে প্রবল ক্ষাত্রশক্তি দমন করে। অর্থাৎ আলস্য, কর্ম-বিমুখতা, পঙ্গুত্ব আসতে দেয় না। দেহ ও মনকে কর্মসুন্দর করে। জীবনশক্তিকে চির-জাগ্রত রাখে, যৌবনকে নিত্য তেজ-প্রদীপ্ত করে রাখে। নৈরাশ্য, অবিশ্বাস, জরা, ও ক্লৈব্যকে আসতে দেয় না। বাঙালির মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়। কাজেই এই বাংলার অন্তরে-বাহিরে যে ঐশ্বর্য পরম দাতা আমাদের দিয়েছেন, আমরা তাকে অবহেলা করে ঋণে, ব্যাধিতে, অভাবে, দৈন্যে, দুর্দশায় জড়িয়ে পড়েছি। বাংলার শিয়রে প্রহরীর মতো জেগে আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গিরি হিমালয়। এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈবশক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন। এই হিমালয়ের গভীর হৃদ-গুহার অনন্ত স্নেহধারা বাংলার শত শত নদ-নদী রূপে আমাদের মাঠে-ঘাটে ঝরে পড়েছে। বাংলার সূর্য অতি তীব্র দহনে দাহন করে না। বাংলার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নিত্য প্রসন্ন, বাংলার বায়ুতে চিরবসন্ত ও শরতের নিত্য মাধুর্য ও শ্রী। বাংলার জল নিত্য প্রাচুর্যে ও শুদ্ধতায় পূর্ণ। বাংলার মাটি নিত্য উর্বর। এই মাটিতে নিত্য সোনা ফলে। এত ধান আর কোনো দেশে ফলে না। পাট শুধু একা বাংলার। পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। এত ফুল, এত পাখি, এত গান, এত সুর, এত কুঞ্জ, এত ছায়া, এত মায়া আর কোথাও নেই। এত আনন্দ, এত হুল্লোড়, আত্মীয়তাবোধ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত ধর্মবোধ — আল্লাহ্, ভগবানের উপাসনা, উপবাস-উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাংলার কয়লা অপরিমাণ, তা কখনও ফুরাবে না। বাংলার সুবর্ণরেখার বালিতে পানিতে স্বর্ণরেণু। বাংলার অভাব কোথায়? বাংলার মাঠে মাঠে ধেনু, ছাগ, মহিষ। নদীতে ঝিলে বিলে পুকুরে ডোবায় প্রয়োজনের অধিক মাছ। আমাদের মাতৃভূমি পৃথিবীর স্বর্গ, নিত্য সর্বৈশ্বর্যময়ী। আমাদের অভাব কোথায়? অতি প্রাচুর্য আমাদের বিলাসী, ভোগী করে শেষে অলস, কর্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের মাছ

ধান পাট, আমাদের ঐশ্বর্য শত বিদেশি লুটে নিয়ে যায়, আমরা তার প্রতিবাদ তো করি না, উলটো তাদের দাসত্ব করি ; এ লুণ্ঠনে তাদের সাহায্য করি!

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজও বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণলিখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশী শক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি ; সহস্র সহস্র ফকির-দরবেশ ওলিগাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

আজ আমাদের আলস্যের, কর্ম-বিমুখতার পৌরুষের অভাবেই আমরা হয়ে আছি সকলের চেয়ে দীন। যে বাঙালি সারা পৃথিবীর লোককে দিনের পর দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পারে তারাই আজ হচ্ছে সকলের দ্বারে ভিখারি। যারা ঘরের পাশে পাহাড়ের অজগর বনের বাঘ নিয়ে বাস করে, তারা আজ নিরক্ষর বিদেশির দাসত্ব করে। শুনে ভীষণ ক্রোধে হাত মুষ্টিবন্ধ হয়ে ওঠে, সারা দেহমনে আসে প্রলয়ের কম্পন, সারা বক্ষ মন্থন করে আসে অশ্রুজল। যাদের মাথায় নিত্য স্নিগ্ধ মেঘ ছায়া হয়ে সঞ্চরণ করে ফিরে, ঐশী আশীর্বাদ অজস্র বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে, শ্যামায়মান অরণ্য যাকে দেয় স্নিগ্ধ-শান্তশ্রী, বজ্রের বিদ্যুৎ দেখে যারা নেচে উঠে, — হায় তারা এই অপমান এই দাসত্ব বিদেশি দস্যুদের এই উপদ্রব নির্যাতনকে কী করে সহ্য করে? ঐশী ঐশ্বর্য — যা আমাদের পথে ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে তাকে বিসর্জন করে অর্জন করেছি এই দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব লাঞ্ছনা। বাঙালি সৈনিক হতে পারল না। ক্ষাত্রশক্তিকে অবহেলা করল বলে তার এই দুর্গতি তার অভিশপ্তের জীবন। তার মাঠের ধান পাট রবি ফসল, তার সোনা তামা লোহা কয়লা — তার সর্ব ঐশ্বর্য বিদেশি দস্যু বাটপাড়ি করে ডাকাতি করে নিয়ে যায়, সে বসে বসে দেখে। বলতে পারে না, "এ আমাদের ভগবানের দান, এ আমাদের মাতৃ-ঐশ্বর্য! খবরদার, যে-রাক্ষস একে গ্রাস করতে আসবে, যে-দস্যু এ ঐশ্বর্য স্পর্শ করবে — তাকে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দিয়ে বিনাশ করব, সংহার করব।"

বাঙালিকে, বাঙালির ছেলেমেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও :

এই পবিত্র বাংলাদেশ
বাঙালির — আমাদের।
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা, করি না ভয়
যত পরদেশি দস্যু ডাকাত
'রামা'দের 'গামা'দের।

বাংলা বাঙালির হোক! বাংলার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।

বিবিধ প্রবন্ধ

মিয়া কা সারং

'ইহা কাফি ঠাটের অন্তর্গত। ইহাকে তানসেনের ঘরের রাগিণী বলে। ইহাও এক প্রকার সারং। ইহার রেখাও স্পষ্ট। উদারার মুদারা গ্রামের এই রাগিণী অত্যন্ত সুখশ্রাব্য হয়। উদারা গ্রামে যেখানে নিখাদ ও ধৈবতের সংগত হয় সেখানে কতকটা মিয়া কি মল্লারের মত শোনায়। গুণী মাত্রেই জানেন যে, তানসেনের আয়ত্তাধীন ও প্রিয় রাগিণী ছিল কানাড়া। এই জন্য অনেকের মতে এই সারঙেও কতকটা কানাড়ার ছাড়া আসা উচিত এবং আসেও। এই সব রাগিণী মুসলমান রাজত্বের সময় গুণী ওস্তাদগণের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।'

দুটি রাগিণী

[বেণুকা ও দোলন চাঁপা]

'বেণুকা' ও 'দোলন চাঁপা' দুটি রাগিণীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ন) গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তা হচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফরমিটি'র (সমতা) অভাব। কোন রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিণীর মিশ্রণ ঘটাতে হলে সংগীত-শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগ-রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগ-রাগিণী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তা হলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাঙ্গ সংগীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতো মহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন হিন্দি ছাড়া বাংলা ভাষায় খেয়াল ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমার এই গান দুটির স্বর-সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' তাদের সে ধারণা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখেও এই শ্রেণির গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দুটিই তা প্রমাণ করবে।

সুর : বেণুকা/তেতালা

বেণুকা ও কে বাজায় মহুয়া-বনে
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে।

সুব দোলন চাঁপা/তেতালা
দোলন চাঁপা বনে দোলে
দোল-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে,
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে।

নীলাম্বরী

'নীলাম্বরী' কাফি ঠাটের খাঁড়ব — সম্পূর্ণ রাগিণী। পঞ্চমবাদী — এই রাগিণীতে ষড়জ পঞ্চমের সংগীত থাকে। গান্ধার কম্পব :— ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আরোহীতে ধৈবত বর্জিত করিয়া গাহিতে হয়। ইহার আরোহীতে বহু গুণী গায়ক তীব্র গান্ধারও লাগাইয়া থাকেন। যদি ঠিকভাবে তীব্র গান্ধার লাগানো যায়, তাহা হইলে ইহার রূপ বিকৃত হয় না। মধুমতি ও ভীমপলাশীর মিশ্রণে এই রাগিণীর উৎপত্তি। এ রাগিণী প্রায় অপ্রচলিত।

আরোহী :— সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা
অবরোহী :— র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা।

লক্ষণ গীত — তেওড়া (দ্রুত লয়)

হোসেনি কানাড়া

কাফি ঠাটের সম্পূর্ণ রাগিণী। এই রাগিণীও নূতন সৃষ্টি। কবি আমীর খসরু এই রাগিণীর স্রষ্টা বলিয়া কথিত আছে। এ রাগিণীও প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থে নাই। যেমন আড়ানা মধ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া গাহিতে হয় তেমনই হোসেনি কানাড়ারও গ্রহ সুর মধ্যম। আড়ানা হইতে ইহাতে কানাড়ার অঙ্গ বেশি। আড়ানা, মেঘ, হোসেনি, সাহানা, সুহা, সুঘরাই, সুর মল্লার — (এই সব) রাগিণীতে সারদের অঙ্গ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কিন্তু কানাড়ার অঙ্গাই প্রধান হইয়া উঠে। তারার ষড়জ — ইহার চমৎকারিত্বের অন্যতম সহায়ক। ধৈবত গান্ধারের ব্যবহারের বিশেষ প্রণালিই (অধিকন্তু বা স্বল্পত) এই রাগিণীকে কানাড়াজাতীয় অন্য রাগিণী হইতে পৃথক করে। 'রাগ-লক্ষণ' গ্রন্থে হোসেনি কানাড়ার আরোহী সম্পূর্ণ ও অবরোহীতে নিখাদ বর্জিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ওমরের কাব্যদর্শন

ওমরকে তাঁর কাব্য পড়ে যাঁরা Epicurean বলে অভিহিত করেন, তাঁরা পূর্ণ সত্য

বলেন না। ওমরের কাব্য সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত :

১। 'শিকায়াত-ই-রোজগার' অর্থাৎ গ্রহের ফের বা অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ।

২। 'হজও', অর্থাৎ ভণ্ডদের, বকধার্মিকদের প্রতি শ্লেষ-বিদ্রুপ ও তথাকথিত আলেম বা জ্ঞানীদের দাম্ভিকতা ও মূর্খদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।

৩। 'ফিরাফিয়া' ও 'ওসালিয়া', বা প্রিয়ার বিরহে ও মিলনে লিখিত কবিতা।

৪। 'বাহরিয়া' — বসন্ত, ফুল, বাগান, ফল, পাখি ইত্যাদির প্রশংসায় লিখিত কবিতা।

৫। 'কুফরিয়া' — ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ কবিতাসমূহ। এগুলি ওমরের শ্রেষ্ঠ কবিতা-রূপে কবি-সমাজে আদৃত। স্বর্গ-নরকের অলীক কল্পনা, বাহ্যিক উপাসনার অসারতা, পাপ-পুণ্যের মিথ্যা ভয় ও লাভ ইত্যাদি নিয়ে লিখিত কবিতাগুলি এর অন্তর্গত।

৬। 'মুনাজাত' বা খোদার কাছে প্রার্থনা। এ প্রার্থনা অবশ্য সাধারণের মতো প্রার্থনা নয়, সুফির প্রার্থনার মতো এ হাস্য-জড়িত।

ওমরকে Epicurean কতকটা বলা যায় শুধু তাঁর 'কুফরিয়া'-শ্রেণির কবিতার জন্য। এ ছাড়া ওমর যা, তা ওমর ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই তুলনা হয় না।

ওমরের কাব্যে শারাব-সাকির ছড়াছড়ি থাকলেও তিনি জীবনে ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংযমী। তাঁর কবিতায় যেমন ভাবের প্রগাঢ়তা, অথচ সংযমের আঁটসাঁট বাঁধুনি, তাঁর জীবনও ছিল তেমনই।

ফিটজেরাল্ডের মুখে ঝাল খেয়ে অনেকেই বলে থাকেন, ওমর যে-শারাবের কথা বলেছেন তা দ্রাক্ষাসব, তাঁর সাকিও রক্ত-মাংসের। ফিটজেরাল্ড তাঁর মতের পরিপোষকতার জন্য কোনো প্রমাণ দেননি। তাঁর মতে মত দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। ওমর তাঁর 'রুবা-ই'তে অবশ্য শারাব বলতে আঙুরের ক্বাথ-এর উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু ওটা পারস্যের সকল কবিরই অন্তত 'বলার জন্য বলা'-র বিলাস। শারাব, সাকি, গোলাপ, বুলবুলকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, তা ইরানের কবিরা যেন ভাবতেই পারেন না।

ওমর হয়তো শারাব পান করতেন কিংবা করতেনও না। এর কোনোটাই প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। ওমরের রুবাইয়াতের মতবাদের জন্য তাঁর দেশের তৎকালীন ধর্মগোঁড়াদের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল, তবু তাঁকে দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে সম্রাট থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত ভক্তির চোখে দেখত। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ওমরের ছাত্র ছিলেন ; কাজেই, মনে হয়, তিনি মদ্যপ লম্পটের জীবন (ইচ্ছা থাকলেও) যাপন করতে পারেননি। তা ছাড়া, ওভাবে জীবন যাপন করলে গোঁড়ার দল তা লিখে রাখতেও ভুলে যেতেন না। অথচ, তাঁর সবচেয়ে বড়ো শত্রুও তা লিখে যাননি। সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার শাস্তি তাঁকে পেতে হয়েছিল হয়তো এই ভাবেই যে, তিনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামতো জীবন যাপন করতে পারেননি। শারাব-সাকির স্বপ্নই দেখেছেন — তাদের ভোগ করে যেতে পারেননি। ভোগ-তৃপ্ত মনে এমন আগুন জ্বলে না। এ যে মরুভূমি-নিম্নে হয়তো বহু নিম্নে কান্নার ফল্গুধারা, ঊর্ধ্বে রৌদ্র-দগ্ধ বালুকার জ্বালা, তীব্র দাহন। ওমর যেন মরুভূমির বুকের খর্জুর-তরু, মরুভূমির খেজুর গাছকে

দেখলে যেমন অবাক হতে হয় — ওমরকে দেখেও তেমনি বিস্মিত হই। সারা দেহে কন্টকের জ্বালা, ঊর্ধ্বে রৌদ্রতপ্ত আকাশ, নিম্নে আতপ-তপ্ত বালুকা — তারই মাঝে এত রস সে পায় কেমন করে?

খেজুর গাছের মতোই ওমর এ-রস দান করেছেন নিজের হৃৎপিণ্ডকে বিদারণ করে। এ রস মিষ্ট হলেও এ তো অশ্রুজলের লবণ মেশা। খেজুর গাছের রস যেমন তার মাথা চেঁছে বের করতে হয়, ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতও তেমনই বেরিয়েছে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে। প্রায় হাজার বছর আগে এত বড়ো জ্ঞানমার্গী কবি কী করে জন্মাল, বিশেষ করে ইরানের মতো অনুভূতিপ্রবণ দেশে — তা ভেবে অবাক হতে হয়। ওমরকে দেখে মনে হয়, কোনো বিংশ শতাব্দীর কবিও বুঝি এত মডার্ন হতে পারেন না। ওমরকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, তা বুঝি তাঁর ওই হাজার বছর আগে জন্মাবার জন্যই। আজকাল পৃথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-প্রবুদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না। ওমর আজ জগতে অপরিমাণ শ্রদ্ধা পাচ্ছেন — তবু মনে হয়, আরও চার পাঁচ শতাব্দী পরে তিনি আরও বেশি শ্রদ্ধা পাবেন — যা পেয়েছেন তার বহু সহস্র গুণ।

ওমর তাঁর অসময়ে আসা সম্বন্ধে যে এত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তাঁর লেখার দুঃসাহসিকতা, পৌরুষ ও গভীর আত্মবিশ্বাস দেখেই বুঝা যায়। তিনি যেন তাঁর কাছে আর-সব মানুষকে অতি ক্ষুদ্র pigmy করে দেখতেন।

তিনি নিজেকে এই সব ক্ষুদ্র-জ্ঞান মানুষের, এমনকী সে-যুগের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণেরও — বহু বহু ঊর্ধ্বে মনে করতেন। তিনি যেন জানতেন — তাঁর জীবনে তাঁর লেখা বুঝবার মতো লোক কেউ জন্মায়নি, তিনি যা লিখেছেন তা অনাগত দিনের নূতন পৃথিবীর জন্য।

ওমর সুফি ছিলেন কিনা জানিনে। কিন্তু ওই পথের পথিক যাঁরা ওমরকে সুফি এবং খুব উঁচুদরের তাপস বলে মনে করেন, তাঁরা বলেন, সুফি জনপ্রিয়তার বা লোকের শ্রদ্ধার জুলুম এড়াবার জন্যই ঘোরতর পাপ পরিহার করেন। তাঁরা নিজেদের মদ্যপ লম্পট বলে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নিজেরা গুপ্ত সাধনায় মগ্ন থাকেন। তা ছাড়া, ইরানে কবির শারাবকে সকলে সত্যিকার মদ বলে ধরে নেন না। তাঁরা শারাব বলতে আনন্দ—ভূমানন্দকে বোঝেন — যে আনন্দ-রূপিণী সুরার নেশায় তাপস-ঋষি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে থাকেন। সাকি বলতে বোঝেন মুরশিদকে, গুরুকে, যিনি সেই আনন্দ-শারাব পরিবেশন করেন। যাক, ওসব তত্ত্বকথা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, আমরা রস-পিপাসু। ওমর কবিতা লিখেছেন, এবং তা চমৎকার কবিতা হয়েছে, আমাদের পক্ষে এই যথেষ্ট। আমরা তা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পাই, আমাদের এতেই আনন্দ।

আমাদের কাছে, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-পুষ্ট কারণ-জিজ্ঞাসু মনের কাছে ওমরের কবিতা যেন আমাদের প্রশ্ন, আমাদেরই প্রাণের কথা। আমরা জিজ্ঞাসা করি-করি করেও যেন সাহস ও প্রকাশ-ক্ষমতার দৈন্যবশত তা জিজ্ঞাসা করতে পারছিলাম না। বিগত মহাযুদ্ধের মতোই আমাদের আজকের জীবন-মহাযুদ্ধ-ক্লান্ত অবিশ্বাসী-মন জিজ্ঞাসা করে ওঠে — কেন এই জীবন, মৃত্যুই বা কেন? স্বর্গ, নরক, ভগবান বলে

সত্যই কি কিছু আছে ? আমরা মরে কোথায় যাই ? কেন এই হানাহানি ? এই অভাব, দুঃখ, শোক ? — এমনিতর অগুনতি প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ পারেনি। যে উত্তর দিয়েছে, সে তার উত্তরের প্রমাণে কিছুই দেখাতে পারেনি ; শুধু বলেছে : বিশ্বাস করো! তবু আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না, সে তর্ক করতে শিখেছে। এই চিরন্তন প্রশ্ন ওমরের জ্ঞান-প্রশান্ত মনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মতোই দোল দিয়েছিল। সেই তরঙ্গ-সংঘাতের সংগীত, বিলাপ, গর্জন শুনতে পাই তাঁর রুবাইয়াতে। ওমরকে বিংশ শতাব্দির মানুষের ভালো-লাগার কারণ এই।

ওমর বলতে চান, এই প্রশ্নের হাত এড়াবার জন্য কত অবতার পয়গম্বর এলেন, তবু যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই রয়ে গেল! মানুষের দুঃখ এক তিলও কমল না। ওমর তাই বললেন, এসব মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, পাপ-পুণ্য মিথ্যা, তুমি মিথ্যা, আমি মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা। একমাত্র সত্য — যে মুহূর্ত তোমার হাতের মুঠোয় এল তাকে চুটিয়ে ভোগ করে নাও। স্রষ্টা যদি কেউ থাকেনও, তিনি আমাদের দুঃখে-সুখে নির্বিকার — আমরা তাঁর হাতের খেলা-পুতুল। সৃষ্টি করছেন ভাঙছেন তাঁর খেয়াল-মতো, তুমি কাঁদলেও যা হবে, না কাঁদলেও তাই হবে যা হবার তা হবেই। যে মরে গেল, সে একেবারেই মরে গেল ; সে আর আসবেও না বাঁচবেও না। তাঁর পাপ-পুণ্য স্রষ্টারই আদেশ — তাঁর খেলা জমাবার জন্য। মোট কথা, স্রষ্টা একটা বিরাট খেয়ালি শিশু বা ঐন্দ্রজালিক।

আমি ওমরের রুবাইয়াত্ বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকেই কিঞ্চিদধিক দুশো রুবাই বেছে নিয়েছি ; এবং তা ফারসি ভাষার রুবাইয়াত্ থেকে। কারণ, আমার বিবেচনায় এইগুলি ছাড়া বাকি রুবাই ওমরের প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইলের সঙ্গে একেবারে মিশ খায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আমার মতো কবির কবিতায় তা একেবারে বাজে। বাকিগুলিতে ওমর খৈয়ামের ভাব নেই, ভাষা নেই, গতি ঋজুতা—এক কথায় স্টাইলের কোনো কিছু নেই। খুব সম্ভব ওগুলি অন্য-কোনো পদ্য-লিখিয়ের লেখা। আর, তা যদি ওমরেরই হয়, তবে তা অনুবাদ করে পণ্ডশ্রম করার দরকার নেই। বাগানের গোলাপ তুলব ; তাই বলে বাগানের আগাছাও তুলে আনতে হবে এর কোনো মানে নেই।

আমি আমার ওস্তাদি দেখাবার জন্য ওমর খৈয়ামের ভাব ভাষা বা স্টাইলকে বিকৃত করিনি — অবশ্য আমার সাধ্যমতো। এর জন্য আমার অজস্র পরিশ্রম করতে হয়েছে, বেগ পেতে হয়েছে। কাগজ-পেনসিলের, যাকে বলে আদ্যশ্রাদ্ধ, তা-ই করে ছেড়েছি। ওমরের রুবাইয়াতের সবচেয়ে বড়ো জিনিস ওর প্রকাশের ভঙ্গি বা ঢং। ওমর আগাগোড়া মাতালের 'পোজ' নিয়ে তাঁর রুবাইয়াত্ লিখে গেছেন — মাতালের মতোই ভাষা, ভাব, ভঙ্গি, শ্লেষ, রসিকতা, হাসি, কান্না— সব। কত বৎসর ধরে কত বিভিন্ন সময়ে তিনি এই কবিতাগুলি লিখেছেন, অথচ এর স্টাইল সম্বন্ধে কখনও এতটুকু চেতনা হারাননি। মনে হয় এক দিনে বসে লেখা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি — ওমরের সেই ঢংটির মর্যাদা রাখতে, তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে যতটা পারি কায়দায় আনতে। কতদূর সফল হয়েছি, তা ফারসি-নবিশরাই বলবেন।

ওমর খৈয়ামের ভাবে অনুপ্রাণিত ফিটজেরাল্ডের কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন,

শোনাবে না হয়তো আমার এ অনুবাদ। যদি না শোনায়, সে আমার শক্তির অভাব— সাধনার অভাব, কেননা কাব্য-লোকেব গুলিস্তান থেকে সংগীতলোকের রাগিণী-দ্বীপে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। সংগীত-লক্ষ্মী কাব্য-লক্ষ্মী দুই বোন বলেই বুঝি ওদের মধ্যেই এত রেষারেষি। একজনকে পেয়ে গেলে আরেকজন বাপের বাড়ি চলে যান। দুই জনকে খুশি করে রাখার মতো শক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই, শক্তিও নেই। কাজেই, আমার অক্ষমতার দরুন কেউ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ওমরের উপর চটে না যান।

ওমরের রুবাইয়াত্ বা চতুষ্পদী কবিতা চতুষ্পদী হলেও তার চারটি পদই ছুটেছে আরবি ঘোড়ার মতো দৃপ্ত তেজে সম-তালে — ভণ্ডামি, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেধের পথে ধূলি উড়িয়ে তাদের বুক চূর্ণ করে। সেই উচ্চৈঃশ্রবা আমার হাতে পড়ে হয়তো বা বজদ্দি মোড়লের ঘোড়া-ই হয়ে উঠেছে — আমাদের গ্রামের কাছে এক জমিদার ছিলেন, তাঁর নাম বজদ্দি মোড়ল। তাঁর এক বাগ-না-মানা ঘোড়া ছিল, সে জাতে অশ্ব হলেও গুণে অশ্বতর ছিল। তিনি যদি মনে করতেন পশ্চিম দিকে যাবেন, ঘোড়া যেত পূর্ব দিকে। ঘোড়াকে কিছুতেই বাগ মানাতে না পেরে শেষে বলতেন— 'আচ্ছা চল, এদিকেও আমার জমিদারি আছে।'

ওমরের বোররাক বা উচ্চৈঃশ্রবাকে আমার মতো আনাড়ি সওয়ার যে বাগ মানাতে পারবে, সে ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে উক্ত বজদ্দি মোড়লের মতো সে ঘোড়াকে তার ইচ্ছামতো পথেও যেতে দিইনি। লাগাম কষে প্রাণপণ বাধা দিয়েছি, যাতে সে অন্যপথে না যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে পড়ব-পড়ব অবস্থাও যে হয়েছে, তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। তবে এটুকু জোর করে বলতে পারি, তাঁর ঘোড়া আমার হাতে পড়ে চতুষ্পদী ভেড়া-ও হয়ে যায়নি — প্রাণহীন চার-পায়াও হয়নি। আমি ন্যাজ মলে মলে ওর অন্তত তেজটুকু নষ্ট করিনি। ওঁর মতো 'ছার্তক' (সার্থক ?) না হতে পারলেও অন্তত 'কদম' চালাবার কিছু চেষ্টা করেছি।

যাক অনেক বকা গেল ; এর জন্য যাঁরা আমাকে দোষ দেবেন — তাঁরা যেন আমায় দোষ দেবার আগে খৈয়ামের শারাবকে দোষ দেন। এর নামেই এত নেশা, পান করলে না জানি কী হয়, হয়তো-বা ওমর খৈয়ামই হয় ! অবশ্য আমরা খেলে এই রকম বখামি করি, ওমর খেলে রুবাইয়াত্ লেখেন।

এইবার কৃতজ্ঞতা নিবেদনের পালা। খাওয়ানোর শেষে, বিনয় প্রকাশের মতো। না করলেও হয়, তবু দেশের রেওয়াজ মেনে চলতেই হবে।

আমার বহুকালের পুরানো বন্ধু মউলবি মঈনউদ্দীন হোসয়ন সাহেব এর সমস্ত কিছু সরবরাহ না করলে হয়তো আমি কোনোদিনই এ শেষ করতে পারতাম না। তাঁর কাছে আমি এজন্য চির-ঋণী। শ্রীমান আবদুল মজিদ সাহিত্য-রত্নও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন আমার প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য। এঁদের দু-জনারই নাম আছে সাহিত্যে, কাজেই কেবল আমার বই-এ নাম থাকার জন্য এঁরা পরিচিত হবেন না। আমার সাহায্য করার মতি এঁদের অটল থাক, এই-ই প্রার্থনা।

কাজী নজরুল ইসলাম

সংবাদ প্রবন্ধ

চানাচুর

[১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় ১১নং ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিট, কলিকাতা থেকে 'সাপ্তাহিক সওগাত' প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার বিশেষ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ সংখ্যায় তাঁরই লেখা 'সওগাত ও নজরুল ইসলাম' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে 'সাপ্তাহিক সওগাত' সম্বন্ধে জনাব আবুল মনসুর আহমদের মন্তব্যের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে :—

> '... সাপ্তাহিক সওগাত' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর সুচিন্তিত লেখায় এবং নজরুল ইসলামের রস-রচনায় অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্য-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ... এতে নজরুল ইসলাম 'চানাচুর' শিরোনামায় যে একটি ফিচার লিখিতেন, সেটি পড়িবার জন্য পাঠক-মহলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত।...]

১
ডোমনি স্টেটাস

ভারতমাতা এতদিন পদদলিতা দাসী ছিলেন। শুনছি তাঁর পুত্রদের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁর প্রভু নাকি তাঁর হাত-পায়ের কতক বাঁধন খুলে দিয়ে 'ডোমনি স্টেটাস'-এর (Dominion status) তকমা পরিয়ে দেবেন।

ভারতমাতার বল-দ (বলদানকারী) পুত্রদের মধ্যে এই নিয়ে এরই মধ্যে মোচ্ছবের ধূম লেগে গেছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠছে 'মা ডোমনি হবেন রে, মা ডোমনি হবেন।'

মা-এর অবস্থা মা-ই জানেন। কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় মনে মনে বলছেন 'এদের আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মারিনি কেন?'

ডোমনির ছেলেই বুঝি বা! হাতে যা বড়ো বড়ো ধামা!

২
পুনর্মূষিকো ভব!

কাবুলের 'আঙুল-ফুলে কলাগাছ', 'বাচ্চা-ই-শাকা'[১] এখন নাদির খাঁর তরবারিতলে 'নফসি নফসি'[২] করছে।

যে ভিস্তিকে সেই ভিস্তি[৩]। কোনো 'রেকর্ড কিপার' ফেরেশ্‌তার ভুলে হয়তো ভিস্তি বেহেশ্‌তি হয়ে গিয়েছিল। তাই কাবুলের ভাগ্যে এত বিড়ম্বনা। যাক, ফেরেশতার ভুল ফেরেশতাই শুধরে নিয়েছেন। বাচ্চু মিয়াঁকে হয়তো আবার কাবুলের রাস্তায় মশক ঘাড়ে করে পানি দিতে হবে কিংবা কাবুলের শুকনো রাস্তা তার রক্তে ভিজাতে হবে।

ও নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা বেশি, তারাই ওর হেস্তনেস্ত করবে। কিন্তু যাদের এতদিন 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' হচ্ছিল বাচ্চাকে নিয়ে, তাদের উপায় হবে কী?

বেচারাদের 'গাজি'[৪] যে গাঁজিয়ে উঠল। ইসলাম রক্ষার উপযুক্ত 'গাজি' পেয়েছিল বটে। বেড়ালকে দিয়েছিল মাছ বাছবার ভার।

আরশুলো হল পাখি!

বেওকুফ আর কাকে বলে?

আশা করি বাচ্চা মরবার সময় তার মশকটা এই সব ভক্ত মিয়াঁ সায়েবদের পাঠিয়ে দেবে। ওরা ওই মশকের এক চল্লু করে পানি খাবেন আর শোকর[৫] গোজারি করবেন। অথবা ওটাকে ওদের 'বিস্তারা'[৬] বাঁধবার 'হোল্ডল" (Hold-all) করেও ব্যবহার করতে পারেন। যা অভিরুচি!

৩
চতুর্বর্গ-ফলের বোঁটা

সেদিন কোলকাতার টাউন হলে বড়ো এক মজার অভিনয় হয়ে গেছে। যত সব বুড়ো ও পণ্ডিতের দল তাদের অচৈতন্য-চৈতন চুটকিতে কাঁঠালের আঠা ও ছাই মাখিয়ে দিব্যি তাতিয়ে খাড়া করে সর্দার বিলের প্রতিবাদকল্পে জমা হয়েছিল। এ ধারে কিন্তু খবর পেয়ে যত সব টিকি-নিসূদন কালাপাহাড়ি তরুণের দল ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। যাঁহা বুড়োর দলের 'যুদ্ধং দেহি' বলে আর্কফলা উঁচিয়ে তেড়ে আসা তাঁহা 'এই লেহি' বলে তরুণ দলের ঝাঁপিয়ে পড়া।

সে এক ধূম-ধাত্তর ব্যাপার! ছোঁড়ো চেয়ার, ভাঙো টেবিল, চালাও লাঠি, ছেঁড়ো টিকি! মারো জোয়ান! হেঁইয়ো! পটাস? উ-হু-হু!!

১ তদানীন্তন আফগানিস্তানের জনৈক ভিস্তিওয়ালা, যে হঠাৎ বিদ্রোহী বনে গিয়ে আমির আমানুল্লাহ্‌র পতন ঘটিয়ে দু-দিনের জন্যে আমির হয়ে বসে। ২ ত্রাহি ত্রাহি রব। ৩ যে ব্যক্তি চামড়ার মশকে করে জল বহন ও সরবরাহ করে। ৪ সম্ভবত গাজি নামক কোনো লেখক। ৫ কৃতজ্ঞতা। ৬ বিছানা।

বাস্! পলকে পেল্লায়! বুড়োর দল, পণ্ডিতের দল বিষ্টিতে ছাগলের মতো যে যে-দিকে পারলে দিলে চোঁ চোঁ দৌড়।

ছেলেদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই সদ্য উৎপাটিত গুচ্ছ গুচ্ছ টিকি! মনে হল শত শত কালি সিংহ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই টিকি ছেঁড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন শত শত মহিলা, যাদের উদ্ধারকল্পে এই সব টিকির দল জমায়েত হয়েছিলেন।

বুড়োরা সত্যই কি এবার নি-কেশ হল? নৈষ্ঠিক নি-টিক হল?

৪

বিবাহ-আইন বিল

লাগ লাগ লাগের মাটি
যে হারে তার কান কাটি!

বড় মিয়াঁদের রাজ পরিষদে অর্থাৎ 'অ্যাসেমব্লিতে' বিবাহ আইন বিল পাশ হতে দেখে বুড়োদের দল মুক্ত-কচ্ছ হয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করে দিয়েছেন — গেল রাজ্য, গেল মান, ধর্ম কর্ম সব গেল।

বটেই তো। বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হল তা হলে! মেয়েগুলো বিয়ে হবার আগে ডাগর-ডুগর হয়ে গেলে যে সব বুঝে ফেল্‌বে। তখন কি আর ফোকলাদন্তী চুপসায়িত কপোল অষ্টাবক্রীয়-কটি বুড়োদের ওরা বিয়ে করতে চাইবে? ইয়া আল্লা! ই- কি গজব[১]!

চারিদিক দিয়ে বুড়ো আর তরুণ মনের টুঁসাটুঁসি লেগে গেছে। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে!

এর পরেও যদি বুড়োরা না মরে, তাহলে আমরা বলি, 'কর্তা! আমরা তোমার গলায় দিয়া দিমু ফাঁসি!'

৫

চারদিক থেকে পাগলা তোরে ঘিইরা ধরেছে পাপে।

ফ্যাসাদ কি শুধু সাহিত্যে, কৌন্সিলে, অ্যাসেমব্লিতেই বেধেছে? — জোয়ান বুড়োর এ লড়াই পলিটিকসে কংগ্রেস পর্যন্ত গড়িয়েছে!

সেখানেও মহাত্মা গান্ধি কংগ্রেসের সভাপতি হতে নারাজ হয়ে তরুণ দলের প্রতিনিধি জহরলাল নেহরুকে সুপারিশ করেছেন ওই গদির গদ্দিনশিন[২] করবার জন্য।

হায় ব্রুতাস্, তুমিও! বুড়োদের বদন ক্রমেই ব্যাদিত হয়ে চলেছে!

---

১ আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ২ আসনে বা পদে নিয়োগ বা অভিষেক।

বুড়োরা তো অনেকেই আফিম খান, আমরা বলি কি, ওর মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিন না ওঁরা। সব ল্যাঠা একদিনেই চুকে যাক!

ঠুঁটো জগন্নাথের দল! গাল দিই কী সাধে! যেমন উনুন-মুখো দেবতা, তেমনই ছাই পাঁশ নৈবিদ্য!

৬

'হায় জানতি পার না।'

সেদিন তুমুল তর্ক দুই নেতায়! যাকে বলে মেড় টুঁস। একজন বলছিলেন, 'আরে ইতা কিতা কন! স্বরাজ আমাদের তো ওইয়াই গেছে! সেতুবন্ধ বাইন্দ্যা ফেলছি। অ্যাহন ফাল দিয়া উৎকা মাইর্যা হালার লঙ্কায় গিযা পড়লেই অয়! সোলেমান বাদশার লাহান উ হালায় ও মইর্যা বুত ওইয়া গ্যাছে। ঠ্যালা মারছেন কী—উপপুত ওইয়্যা যাইব!

আর একজন বলছিলেন, 'দেখুন আপনার কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একজন মিসতিরি অস্ত্র তৈরি করত। সে একদিন দেশের রাজার কাছে এসে হাম্বাই তাম্বাই করতে লাগল, হজুর, আমার মতন তলওয়ার তৈরি করতে পৃথিবীতে কেউ পারে না। রাজা বললেন, 'কী করে বুঝব?' মিসতিরি বললে, 'আমি আমার তলোয়ার দিয়ে এমন সাফ সাফ গলা কেটে দিব যে, সে জানতেই পারবে না, এমন ধার।'

রাজার খেয়াল, লোক ধরে আনা হল। মিস্তিরি আস্তে গলার ওপর দিয়ে তার তলোয়ার চালিয়ে দিলে! লোকটা কিন্তু তখনও দিব্যি দাঁড়িয়ে হাসছে, যেন কিছুই হয়নি। রাজা বললেন, ওর যে গলা কাটা গেছে কি করে বুঝব? মিসতিরি অমনি তার নস্যির কৌটা থেকে এক চিমটি নস্যি নিয়ে যেমনি লোকটার নাকে দেওয়া, অমনি হ্যাঁচচো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মাথা টুপ করে পড়ে গেল... 'কি মশাই বিশ্বাস হচ্ছে না?'

আগের লোকটি বলতে বলতে উঠে গেলেন, 'আপনোগর প্যাটে মায়ের ডাকই হান্দায়নি, বুঝবোন কিদুন কইর্যা?'

৭

ফল ইন (লভ নয়) ওয়ার।

নিরস্ত্র ভারতে নখদন্তহীন ভেতো বাঙালির নিরামিষ 'সেনা-বাহিনী'র পতি ওরফে 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং' 'মারশিয়াল' সুভাষচন্দ্র বসু 'রেজিমেন্টাল' অর্ডার বের করেছেন—তাঁর 'ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাওয়া' রিজার্ভ ফোর্সের সেনাদেরে 'ফল-ইন' করতে। 'বোনাফাইড' বাঙালি ছেলেদের 'ফল-ইন-লভ'-টাই রপ্ত হয়ে গেছে, লড়ালড়ির 'ফল-ইন'টা তাদের হয়ে শতাব্দি পূর্বে পিতৃপুরুষেরাই করে গেছেন। কাজেই 'মারশিয়াল' (সেনাপতির) হুকুম তারা যে মানবে তা তো মনে হয় না। বাঙালি মেয়েরা দিব্যি পতি-

প্রাণা কিন্তু ছেলেরা রীতিমতো অ-সতী! তাদের দলের পতিকে বড়ো একটা কেয়ার করে না! তবে যারা আসবে, তারা এই ভরসাতেই আসবে যে, আপাতত যুদ্ধের মতো বদ্‌খত কোনো জিনিস তাদের মহাবেরা[১] করতে হবে না! এ সেনাদল শুধু নিরস্ত্র নয়, নি-লাঠি! আর মাঠে কুচকাওয়াজ যা হবে তা শুধু পায়েরই কসরৎ। কাওয়াজের কাজ নাই, শুধু কুচের কাজ। তা বাঙালির বিপদে আপদে ছুট দেওয়া যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন যে, ও জিনিসটে বাঙালি মায়ের পেট থেকেই শিখে আসে।

খবরটা পড়ে শুনালাম নানি বিবিকে। তিনি মুখটা সিগারেট মিক্সচারের পাউচের মতো কুঁচকে বললেন, 'নেংটির আবার বখেড়া সেলাই!'

৮

ধনে প্রাণে মারা যায়

এক যাত্রায় পৃথক ফল। ইংরেজের আইন বড়ো মজার! আঠারো বছরের কম বয়সি কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের প্রেমে বা হ্যাঁপায় পড়ে গৃহ বা কুলত্যাগিনী হয়, তাহলে সে অকূলে পড়ে না আইনের প্যাঁচে। কিন্তু পুরুষের স্ত্রী-ঘর বা শ্বশুরালয় বাস হয়ে যায়, বেশ কয়েক বছরের জন্য। 'অক্ষয়কুমার লীলাবতীর' লীলারঙ্গো লীলাময়ী যিনি, তিনি ওই আঠারো বছরের কম বলে (নিজে অক্ষয়ের বাড়ি চলে গেছিলেন ইনি!) অবলীলাক্রমে আইন পিছলে বেরিয়ে এলেন, আর চোর-দায়ে ধরা পড়ল বেচারা পুরুষ! আমরা বলি কী, এটা সাম্যবাদের যুগ! পুরুষ মেয়েতে সমান সুবিধা, সমান শাস্তি দেওয়া হোক! অর্থাৎ এইবার থেকে আইন হোক, আঠারোর কম কোনো পুরুষ ওই রকম অপরাধ করলে তার কেস ডিসমিস হয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে যদি তার বেশি বয়সি হয়, তবে শাস্তি হবে! বেচারা পুরুষ! সাধে কী কবি লিখেছিলেন :

'রমণী পিরিতি করে তেল মাখে গায়,
ধরিতে কি না ধরিতে পিছলিয়া যায়!'
কিংবা —
'তেল থাকে হাতে লেগে, রমণী পালায়!'

বেচারা অক্ষয়কে পাঁচ বছর ঠেলেছে! রায় শোনার পরই সে আফিম খেয়ে ফেলেছিল এক ড্যালা! কিন্তু মরবারও স্বাধীনতা নেই বেচারার! মেডিক্যাল কলেজে পেটে বোমা মেরে সে আফিম বের করেছে! অক্ষয় বোধ হয় এই ভেবেই আফিম খেয়েছিল যে,

কাঁঠাল যা তুমি খেলে
আমার গলায় বাধল বীচি!

ধনে প্রাণে মারা যাওয়া আর কাকে বলে?

---

১ অনুশীলন।

অভিভাষণ

মধুরম

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতি মনোনীত করে আপনারা যে গৌরব দান করেছেন, তজ্জন্য বনগ্রামবাসী সকলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আপনাদের দেওয়া এই অমূল্য শিরোপা আমি অকুণ্ঠিত শিরে ধারণ করতে পারিনি। আমার কাছে গৌরবের চেয়ে লজ্জার অনুভূতিই হয়ে উঠেছে অধিকতর।

সাহিত্যের কোনো কুঞ্জে আজ আর আমার কোনো গতিবিধি নেই ; আজ আমি যেন নীড়ভ্রষ্ট। রসকুঞ্জের পুষ্পিত পল্লবিত তরু-লতার স্নেহচ্ছায়া-বিচ্যুত আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও আমার স্মরণাতীত। সংগীত-মুখর মহফিল থেকে কোনো মহামৌনী যেন আমারও অজ্ঞাতসারে চুরি করে নিয়ে যেতেন কোনো এক না-জানা শূন্যে ; যেখানে বাণী নেই, সুর নেই — শুধু অনুভূতি, শুধু ইঙ্গিত।

বাইরের প্রয়োজন, অভাবের আহ্বান আমায় বারে বারে কেড়ে এনেছে সেই মৌনীর কোল থেকে, নিগড়ের পর নিগড় দিয়ে আমায় বেঁধেছে কর্মের কারাগারে। আমিও বারে বারে ছিন্ন করেছি সেই বন্ধন, বারে বারে পালিয়ে যেতে চেয়েছি সেই পরম একাকীর শান্ত সমাধি-তলে। এই দোটানার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আমি আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আমার প্রিয় সখা আত্মীয়াধিক বন্ধুদের দেওয়া নির্মাল্য নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করেছি। যারা দেখছিল আমার হাতে আশার আলো, তাদের সে দেখা ব্যর্থ করেছি আমার হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে — এই আলোকে অনুসরণ করেই তারা আমার সমাধির শান্তিতে বাধা সৃজন করত।

অই সমাধির মাঝে শুনতাম অনন্ত প্রকাশ যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে — 'ফিরে আয় ফিরে আয়!' কেন যেন মনে হত এই নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন আমার সাথিহীন একাকীত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহকূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম-সুন্দরের — সেইখানে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, অমৃত, রস ও বিরহের যে লীলা দেখলাম, তা প্রকাশের শক্তি যদি পরম-সুন্দর আমায় দেন তাহলে পৃথিবী এই রস-ঘন প্রিয়-ঘন পরমানন্দলোকের রূপে রূপায়িত ছন্দে গানে সুরে রসায়িত হয়ে উঠবে। আমার বাঁশিতে যে সুর বাজত — যে বাঁশি আমি অভিমানে দিয়েছিলাম ফেলে, সেই হারানো বেণু আমার ফিরে পেলাম সেই চির-সুন্দর লোকের অশ্রুমতী নদীর তীরে।

যে অপরূপ শ্রীমাখা মুখখানি আমার কল্পনায় উঠত ভেসে, যে শ্রীমুখের আভাস ফুটে উঠত আমার গানে কবিতায় ছন্দে সুরে, যার বিরহ, যার আকর্ষণ আমায় ধূলির পথ থেকে চন্দনিত নন্দনের পথে নিত্য আকর্ষণ করেছে যার অশ্রু-ছলছল রস —

ঢলঢল বিরহ-সুন্দর মুখখানি না দেখে পরম শূন্যের লয়েও শান্তি পাইনি সেই পরমা শ্রীমতী প্রেমময়ীকে সেইখানে দেখলাম। যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য হব — পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।

আমায় সাহিত্য-সম্মেলনে ডেকেছেন সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোনার জন্য— mystic তত্ত্ব শোনার জন্য নয়। কিন্তু আপনাদের দেরি হয়ে গেছে — দু-দিন আগে যেমন করে যে-ভাষায় বলতে পারতাম সে-ভাষা আজ আমি ভুলে গেছি। এই 'মিস্টিসিজম' বা মিস্ট্রির মাঝে যে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম মধুরম মধুরম'। এই মধুরমকে প্রকাশের ভাব-ভঙ্গি-ভাষা এখন আমার চির-মধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আজ দেখি, অনন্ত আকাশ বেয়ে যেন আমার সেই পরম-সুন্দরের পরমাশ্রু ঝরে পড়ছে — অনন্ত ভুবন ধরতে পারছেন না সে পরমা শ্রীকে — অনন্ত নীহারিকালোক থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ছুটে আসছে উন্মাদ বেগে সেই পরমা শ্রীপ্রসাদ লোভে।

আজ আমার মনে হয়, এই নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা শ্রীই আমার অস্তিত্ব — আমার শক্তি। নিরাকার নির্গুণ অবাঙ্-মানসগোচর ব্রহ্ম যেমন তাঁর শক্তির আশ্রয় ভিক্ষা করেন সৃষ্টির রূপে, গুণে প্রতিভাত হন বা মনের গোচর হন, এই প্রেম-শক্তির আশ্রয় পেয়ে আমিও তেমনই আবার আমার সৃষ্টিতে যেন ফিরে আসছি। এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংহারের পথে চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম — আমার eternal existence-কে পেলাম।

এ-কথা বললাম এই জন্য যে, আমার সাহিত্য-সাধনা বিলাস ছিল না। আমি আমার জন্মক্ষণ থেকে যেন আমার শক্তি বা আমার অস্তিত্বকে, existence-কে খুঁজে ফিরেছি। যখন আমি বালক, তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার কান্না আসত — বুকের মধ্যে বায়ু যেন রুদ্ধ হয়ে আসত। আমার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতাম — 'ওই আকাশটা যেন ঝুড়ি, আমি যেন পাখির বাচ্চা, আমি অই ঝুড়ি চাপা থাকব না — আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তাই ইউনিভার্সিটির দ্বার থেকে ফিরে ইউনিভার্সের দ্বারে হাত পেতে দাঁড়ালাম। জীবনে কোনো দিন কোনো বন্ধনকে স্বীকার করতে পারলাম না। কোনো স্নেহ-ভালোবাসা আমায় বুকে টেনে রাখতে পারল না। এই পরম তৃষ্ণা যে কোন পরম-সুন্দরের তা বুঝাতে পারিনি বুঝতে পারিনি বলেই অবুঝের মতো পথ থেকে পথান্তরে ঘুরেছি। অনন্ত শূন্যে অনন্ত শ্বেত শতদলের মাঝে একখানি অপরূপ সুন্দর মুখ দেখেছি — সেই মুখ যেন নিত্য আমাকে অসুন্দরের পথ থেকে ফিরিয়েছে — কেবল ঊর্ধ্বের পানে আকর্ষণ করেছে। আজ সেই মুখখানি খুঁজে পেয়েছি — আজ তাঁর দেখা পেয়ে প্রথম উপলব্ধি করেছি 'রসো বৈ সঃ' অর্থ, অনন্ত আকাশ বেয়ে মধুক্ষরণ কী করে হয়, সে মধু পান করেছি। আমার এই পরম মধুময় অস্তিত্বে প্রেম-শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।

একে খোঁজার পথেই যে ক-দিন কেঁদেছি, যে-গান গেয়েছি, যে-সুর সৃষ্টি করেছি, যে-কবিতা লিখেছি, তা যদি কবিতা হয়ে থাকে, তবে তা সেই সুন্দর মুখখানিরই কৃপা — সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। যদি তা কবিতা না হয়ে থাকে, আমার কোনো দুঃখ নেই। কেননা আমি আমার প্রকাশের ব্যাকুলতার উন্মাদনায় কী প্রলাপ বকেছি, তা যদি গোলাপ বকুল হয়ে রূপ পরিগ্রহ না করে থাকে সে আমার অক্ষমতা, অপরাধ নয়। আমি কবি যশঃপ্রার্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুঁজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে, তাঁর দেখা পেয়েছি — তাঁর পরম-সুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি — এই কথাই যেন আমার ফিরে-পাওয়া বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি। আমার জীবনের চির-একাদশীর উপবাস-তিথি শেষ হয়ে এল, পূর্ণচাঁদের উদয়ে আমার জীবন অমৃতে মধুরে আনন্দে প্রেমে রসে পূর্ণ হয়ে উঠল — শুধু এই কথাই যদি আমার বিরহ-যমুনা তীরে বসে, আমার বেণুকায় গেয়ে যেতে পারি, আমি ধন্য হব। তাতে পৃথিবীর মঙ্গল হবে, নিত্য মঙ্গলময় জানেন — সে-ভার আমার উপর তিনি দেননি।

নদী যেমন নিত্য সাগরকে পেয়েও নিত্য কাঁদে — নিত্য মিলন নিত্য বিরহের রস উপলব্ধি করে আমি তেমনি করে তাতে যুক্ত থেকেও তাঁর জন্য কাঁদব — সেই ক্রন্দন যদি সাহিত্য না হয়, কবিতা না হয়, আপনাদের ক্ষমা-সুন্দর মন যেন এই প্রেম-ভিক্ষুককে ক্ষমা করে। সে কান্না শুধু আমাদের দুজনের পরম রুদ্রকে সৃষ্টিতে ধরে রাখার জন্য পরম শক্তির।

যদি আর বাঁশি না বাজে

আপনারা এই ভিখারিকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির' জুবিলি উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু, তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী — পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায় মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহংকার। এই অহংকারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহংকার Divine নয় Demon। অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্ম-জগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বন্ধু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন,

আমার নাকি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে — শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মতো আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণা-দানের দক্ষিণ হস্তকে উর্ধ্বে, না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালোবাসেন ; তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকিত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যাম-ঘন মেঘ-রূপে আমি সহসা এসেছিলাম ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘন-ঘটায়, মুক্তজটায় দিগদিগান্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট প্রান্তরের তৃষ্ণা মিটিয়েছিলাম ; আমার রুদ্র-সুন্দর নৃত্য দেখে যারা দেখতে পাননি যে, এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায়নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সাথে আমার যোগাযোগ বহু দিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই, এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মি. মুজাফফর আহমদ, মি. আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুগণকে। আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত অ্যারিস্টোক্রাট্ বা 'আড়ষ্ট-কাক' ছিলাম না। বোমারু বারীনদা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন — হ্যাঁ, আড্ডা বটে ? আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করিনি ; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।

যাক, সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না! এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম ; এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কিনা, আমার জানা নেই।

সাহিত্য-সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে, একে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে — বিশেষভাবে অর্থ-সাহায্যপুষ্ট করে তুলতে সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। সাহিত্য-সমিতি বিত্তশালী হলে বহু তরুণ প্রতিভাকে আশ্রয় দিতে পারবে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করতে পারবে।

গ্রন্থ সমীক্ষা

পথ-হারার পথ

**লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার পরলোকগত শ্রীবরদাচরণ মজুমদার প্রণীত।
মুর্শিদাবাদ জেলার কাঞ্চনতলা থেকে ১৩৪৭ বৈশাখে প্রকাশিত।**

বহু বৎসর আগের কথা। বাংলার সাহিত্য-আকাশে আমার উদয় তখন ধূমকেতুর মতো ভীতি ও কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছে। গত মহাসমরে রক্তস্নাত রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য আমার রক্ত-ধারায় ছন্দ-হিল্লোল তুলিয়াছে। আমি তখন আবিষ্টের মতো লিখিতেছি, বলিতেছি, তাহার কোনো অর্থ হয় কি না জানিতাম না ; কিন্তু মনে হইতেছে তাহার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইতেছিল যাঁহার ইচ্ছায়, সেদিন তিনি আমায় এমনই গ্রাস করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নাই। এক সাথে যশের সিংহাসন, গালির গালিচা, ফুলের মালা, কাঁটার জ্বালা-আনন্দ আঘাত পাইতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি আমায় চালাইতেছিলেন, সেই অদৃশ্য সারথি আমায় চলিতে দিলেন না। নিজেই বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম। মনে হইত, তাঁহাকে আজও দেখি নাই, কিন্তু দেখিলে চিনিতে পারিব। এই কথা বহুবার লিখিয়াছি ও বহুসভায় বলিয়াছি।

সহসা একদিন তাঁহাকে দেখিলাম। নিমতিতা গ্রামে এক বিবাহ-সভায় সকলে বর দেখিতেছে, আর আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখিতেছে আমার প্রলয়সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহসভায় আমার বধূরূপিনী আত্মা তাহার চিরজীবনের সাথিকে বরণ করিল। অন্তপুরে মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি হইতেছে, স্রকচন্দনের শুচি-সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে, নহবতে সানাই বাজিতেছে— এমনই শুভক্ষণে আনন্দ-বাসরে আমরা সে ধ্যানের দেবতাকে পাইলাম, তিনি এই গ্রন্থগীতার উদ্গাতা-শ্রী শ্রী বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতি পথিক আজ তাঁহাকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁহাকে দেখি, তখনও তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যতীত অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেইদিন হইতে আমার বহির্মুখী চিত্ত, অন্তরে কাহার যেন অভাব বোধ করিতে লাগিল। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ংকর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটি ভঙ্গে ভয় দেখাইতেছে, আমি ধূমকেতু-রূপে সেই রুদ্র ভৈরবদের মশাল জ্বালাইয়া চলিয়াছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজিতেছি, তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখাইয়া আমার হাত পিছলাইয়া মৃত্যুর সাগরে হারাইয়া গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমায় ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ধর্মরাজ আমার হাত ধরিয়া তাঁহারই কাছে লইয়া গেলেন যাঁহাকে নিমতিতা গ্রামে বিবাহ-সভায় দেখিয়াছিলাম, ধ্যানে বসিয়া আবিষ্টের মতো তাঁহাকে বাইশ বার প্রদক্ষিণ করিলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে শেষবার দেখাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া যিনি আমার চিরকালের

ধ্যেয়, তাঁহার জ্যোতিঃরূপ দেখিলাম। তিনি আমার হাতে দিলেন যে অনির্বাণ দীপ-শিখা, সেই দীপ-শিখা হাতে লইয়া আজ বারো বৎসর ধরিয়া পথ চলিতেছি—আর অগ্রে চলিতেছেন তিনি পার্থসারথিরূপে।

আজ আমার বলিতে দ্বিধা নাই, তাঁহারই পথে চলিয়া আজ আমি আমাকে চিনিয়াছি। আমার ব্রহ্ম-ক্ষুধা আজও মিটে নাই, কিন্তু সে ক্ষুধা এই জীবনেই মিটিবে, সে বিশ্বাসে স্থিত হইতে পারিয়াছি। আমি আমার আনন্দ-রসঘন স্বরূপকে দেখিয়াছি। কী দেখিয়াছি, কী পাইয়াছি, আজও তাহা বলিবার আদেশ পাই নাই। হয়তো আজ তাহা গুছাইয়া বলিতেও পারিব না ; তবুও কেবল মনে হইতেছে—আমি ধন্য হইলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি অসত্য হইতে সত্যে আসিলাম, তিমির হইতে জ্যোতিতে আসিলাম, মৃত্যু হইতে অমৃতে আসিলাম।

যে-অমৃত পারাবারের এক কণা মাত্র পাইয়া আমি আজ প্রমত্ত হইয়াছি, সেই অমৃত আজ পাত্র পুরিয়া আমার অমৃত-অধিক সকলকে পরিবেশন করিতেছেন, অমৃত-পিয়াসী যাঁহারা তাঁহারা আমারই মতো তৃপ্ত হইবেন, তৃষ্ণা তাঁহাদের মিটিবে, তাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

তাঁহার যে-দীপশিখা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত-সাগরের তীরে জ্যোতির্লোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সেই দীপশিখার প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথহারা সাধক এই সাধনার দীপশিখার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন—আজ তাঁহারা জীবনমুক্ত হইয়া দুঃখ-শোকের অতীত স্থিত। সংসারকে 'মজার কুটির' জানিয়া তাঁহারা আজ আনন্দ-স্বরূপ হইয়া বসিয়া আছেন।

সারাজীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী ফকির দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তর জুড়াইয়া গেল, আলোক পাইল, তিনি আমাদের মতো গৃহী। এই গৃহে বসিয়াই তিনি মহাযোগী শিব-স্বরূপ হইয়াছেন। এই গৃহের বাতায়ন দিয়াই আসিয়াছে তাঁহার মাঝে ব্রহ্ম-জ্যোতি। তাঁহার সেই সাধনার ইঙ্গিত এই 'পথ-হারার পথ'-এ রহিয়াছে।

আমার যোগ-সাধনার গুরু যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। সে-সময় আজিও আসে নাই। আমার যাহা-কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে—কাব্যে, সংগীতে, অধ্যাত্ম জীবনে, তাঁহার মূল যিনি, আমি যাঁহার শক্তি প্রকাশের আধার মাত্র, তাঁহাকে জানাইবার আজ আদেশ হইয়াছে বলিয়াই জানাইলাম। লোকে শ্রীরামচন্দ্রকেই দেখে, তাঁহার পশ্চাতে যে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, যাঁহার সাধনার ফল শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার কথা কয়জন ভাবে ? এই দুর্দিনে এই বাংলাদেশেই যে সাম্যবাদী, নির্লোভ, নিরহংকার, নিরভিমান, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-যোগী আত্মগোপন করিয়া আছেন, যাঁহার শক্তিতে আজ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শত শত বিখ্যাত বাঙালি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জনগণ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করাই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। স্বয়ম্প্রকাশ সূর্যোদয়ের আগে যেমন অকারণ বিহগ-কাকলি ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আমারও এই কয়েকটি অসম্বদ্ধ কথা সেই অরুণোদয়ের আনন্দ-আকুতির ক্ষীণ আভাস মাত্র। আদেশ পাইলে এই মহাযোগীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিব ইচ্ছা রহিল।

'সুজনের গান'

'সুজনের গান' (গ্রাম্য গানের বই)-রচয়িতা ও সংগ্রাহক
গিরীন চক্রবর্তী। (হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোং লি.)

শ্রীমান গিরীন চক্রবর্তী সংগীত-শিল্পীরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই পরিচিতির ঊর্ধ্বে তাঁর যে নির্বিশেষ রূপ সেখানে তিনি কবি। পল্লি-সংগীতের প্রতি তাঁর প্রীতি—তিনি নিজে পল্লিকবি বলে। ভুঁইচাঁপার মালা-পড়া ভুঁই-মালীর মেয়ের মতো তাঁর কবিতার নিরাভরণ রূপ—'কালচারের' কালচে-পরা আভরণ-বহুল বিলাসী মনের কাছে হয়তো নিখুঁত মনে হবে না। পল্লি মেয়ের মতো এর ছন্দ ও গতি স্বচ্ছন্দ। তাতে নাগরিকার কৃষ্টি-ক্লিষ্ট নৃত্যময়ী রূপ খুঁজতে গেলে মন ও চোখ দুই-ই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। শহুরে সভ্যতার ক্লান্ত চোখ — ছুটিতে গ্রামে গিয়ে তার অর্ধ-অনাবৃত সহজ সুন্দর রূপ দেখে যেমন জুড়িয়ে যায়, আমার চোখ তেমনই জুড়িয়ে গেছে শ্রীমান গিরীনের সংগ্রহ ও স্বরচিত গানগুলির অনাড়ম্বর রূপ দেখে। এঁর গানগুলি পড়ে মনে হয়, পল্লি-সংগীত সংগ্রহ করতে করতে এঁর রসের আনন্দের ছোঁওয়া এঁর হৃদয় স্পর্শ করেছে।

সভ্যতার আওতায় মানুষ হয়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করি — যত রকমে পারি জটিল কুটিল করে। প্রকাশের জটিলতাই আধুনিক সভ্য কবিদের ভঙ্গি বা 'ডিকশন'। পল্লিকবিদের প্রকাশভঙ্গি পল্লিবাসিনীর মতোই সহজ সরল—কোথাও হয়তো অর্ধনগ্ন। কিন্তু সে নগ্নতায় বাসনার আমন্ত্রণ নাই — আছে আত্মভোলা মগ্ন মনের মাধুরী। আজকালকার কবিতার মিলের 'মিল এরিয়া' পেরিয়ে যে উদার আকাশ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নগ্ন খাল-বিলের সহজ শ্রী, তাকে দেখতে হলে আমাদের পড়তে হয় নিরক্ষর পল্লিকবিদের গান ও কবিতা। এঁরা যেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ — এবং এঁরাই প্রকৃতির অন্তরে স্থান পেয়েছেন।

সেই আন্তরিকতার প্রেম শ্রীমান গিরীন পেয়েছেন, শুধু এইটুকু বলার জন্যই আমার এই ভূমিকা। শ্রীমান গিরীনকে জানি, চিনি, তাঁর লেখাতেও তাঁর সেই সহজ সাবলীল পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তিনি নিজেকে ফাঁকি দেননি, যা নন তা হতে চাননি ; এতে তাঁর লেখা সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থপরিচয়

নজরুল রচনাসমগ্র ৫

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র'র সব কটি খণ্ডে, কাব্যনামের ক্ষেত্রে, কবিতার স্বতন্ত্র শীর্ষনামে এবং অন্যান্য শব্দ-ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান' সর্বাধুনিক সংস্করণ-সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। উক্ত অভিধানে অনুল্লিখিত কিন্তু কবি-ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-তুর্কি বা বিদেশি ইত্যাদি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল গ্রন্থপরিচয় অংশে, কাব্যগ্রন্থ বা কবিতার নামের ক্ষেত্রে অথবা উদ্ধৃত কোনো অংশে, প্রথম প্রকাশকালীন বানান রক্ষা করা হয়েছে।

পাঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে, অধিকাংশ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত পাঠ এবং প্রথম সংস্করণের পরবর্তী একাধিক সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব পরীক্ষা করে, নির্ভুল পাঠ গ্রহণের চেষ্টা হয়েছে। তবে অনেক সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সব কটি সংস্করণ সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কবির অসুস্থতার পরবর্তী সময়ে এবং জীবনাবসানের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণে পাঠশুদ্ধি রক্ষার বিশেষ প্রয়াস ঘটেনি বলেই আশঙ্কা হয়। তাই সেইজাতীয় সংস্করণ বাংলা আকাদেমির রচনাসমগ্র সম্পাদনার কাজে ততটা নির্ভরযোগ্য সহায়তা দান করেনি। প্রয়োজনমতো বর্তমান নজরুল রচনাসমগ্রের পাঠনিরূপণে বাংলা একাডেমী, ঢাকা সংস্করণের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম থেকেই কবি নজরুলের মুদ্রিত রচনায় বিস্ময়চিহ্ন, হাইফেন ও হস্‌চিহ্ন প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে হাইফেনের প্রয়োগ নজরুল-রচনায় একটি অনিবার্য প্রবণতা হিসেবে লক্ষিত হয়। বাংলাভাষার বর্তমান লিখনরীতিতে স্বাভাবিকভাবেই সমাসবদ্ধ পদে হাইফেনের পৌনঃপুনিক ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। তাই সাম্প্রতিককালে কবির বিভিন্ন রচনার নবমুদ্রণে হাইফেনের প্রয়োগও ক্রমশ অন্তর্ধান করেছে। নজরুল রচনাসমগ্রে তদনুযায়ী হাইফেনের বারংবার ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। হস্‌চিহ্নের ক্ষেত্রেও আরবি-ফারসি শব্দের উচ্চারণের অপরিহার্যতা ব্যতীত চিহ্নগুলি রক্ষিত হয়নি। বিস্ময়চিহ্নের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ। অন্যান্য শব্দগত সংস্কারের ক্ষেত্রে আদি-মুদ্রিত রূপ ও পরিবর্তিত রূপ উভয়ের পার্থক্য-নির্দেশের প্রয়োজনে গ্রন্থপরিচয় অংশে তার যথাবিহিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

নজরুল-রচনায় উদ্ধৃতিচিহ্নের জন্য ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারেও সংগতি বা সামঞ্জস্য দেখা যায় না। সম্ভবত তৎকালীন মুদ্রাকরদের অহেতুক অভ্যাস, অসতর্কতা বা অসচেতনতাই এর কারণ। নজরুলের রচনায় লুপ্তস্বর বোঝানোর জন্য (করিয়া > ক'রে, মাগিয়া > মেগে') ঊর্ধ্বকমার যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়, যা বর্তমানে মান্য বাংলা বানানে আর ব্যবহৃত হয় না। সেগুলিও এই রচনাবলিতে পরিস্রুত হয়েছে। গল্প-উপন্যাসে সংলাপের

ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখে একক ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বর্জিত হয়েছে। কেবল ছন্দের ক্ষেত্রে যেখানে অপরিহার্য মনে হয়েছে, সে-সব ক্ষেত্রে হস্‌চিহ্ন রক্ষিত হয়েছে, যেমন এই খণ্ড-ভুক্ত 'রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম' শীর্ষক রচনায়। এতদ্‌ভিন্ন তারই (তারি), আমারই (আমারি), সবই (সবি) আজও (আজো) প্রভৃতি শব্দের বানানে যথাসম্ভব স্বচ্ছতা আনা হয়েছে।

নজরুল-কবিতায়, বিশেষত ইসলাম-অনুষঙ্গজড়িত রচনায়, আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের প্রবল ব্যবহার ঘটেছে। নজরুলের রচনারীতির এই বিশেষত্ব প্রথমাবধি তাঁর কবিতাকে এবং অন্যান্য রচনাকেও পাঠকের কাছে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। তাঁর ব্যবহৃত এইজাতীয় শব্দ পাঠকের কাছে অপরিচিত ঠেকায় অনেক কবিতায় কবি অপরিচিতি আরবি-ফারসি শব্দের অর্থ পাদটীকায় যোগ করে দিয়েছিলনে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু শব্দের অর্থ দেওয়া ছিল না। এরূপ কিছু শব্দের অর্থ বর্তমান গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। শব্দার্থের জন্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা প্রকাশিত, আবুল কালাম মুস্তাফা সংকলিত ও সম্পাদিত **নজরুল শব্দকোষ** (১৯৯৩) এবং নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা প্রকাশিত, হাকিম আরিফ প্রস্তুত **নজরুল শব্দপঞ্জি** (১৯৯৭) গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনে অন্যান্য অভিধানের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

নতুন চাঁদ

'নতুন চাঁদ' নজরুল ইসলামের অষ্টাদশতম মুদ্রিত কাব্য। কাব্যটির প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্যে কিছু বিভ্রান্তি আছে। 'নতুন চাঁদ' কাব্যের কবিতাগুলিতে নজরুল-কাব্যপ্রতিভার ঔজ্জ্বল্য অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। সম্ভবত নিজের রোগ-পীড়ার যন্ত্রণা, পত্নীর দুশ্চিকিৎস ব্যাধির জন্য দুশ্চিন্তা, প্রচণ্ড অর্থাভাব ও অত্যধিক অর্থব্যয়ের কারণে ক্রমশ ঋণবৃদ্ধি, সংগীতের জগতের চাহিদা পূরণে তৎপরতার অভাব ইত্যাদি বিবিধ কারণে এই সর্বশেষ কাব্যটি কবির সুগভীর অনুরক্তি ও প্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়নি বলে আশঙ্কা হয়। দ্রুত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় কোনোমতে অগ্রন্থিভূত কিছু কবিতা সংকলন করে তিনি তৎকালীন পরিবার-সুহৃদ সুফী জুলফিকার হায়দরকে পাণ্ডুলিপির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সম্ভবত এ ঘটনা ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যে। আজাহারউদ্দীন খানের 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (১৯৯৭ সংস্করণ) গ্রন্থের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, অসুস্থতা ও বিপন্নতার চূড়ান্ত পর্যায়ে কবি দ্রুত 'নতুন চাঁদ'-এর পাণ্ডুলিপির স্বত্ব বিক্রয়ের জন্যে সেটি হস্তান্তরিত করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। যদিও দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রত্যাশাপূরণ ঘটেনি। কারণ, যে কোনো কারণেই হোক মোহাম্মদী পাবলিকেশনের মালিক আক্রম খাঁ-র পুত্র খয়রুল আনাম খাঁ প্রথম সংস্করণের ২২০০ কপির স্বত্ব মাত্র আড়াইশো টাকায় কিনে নেন। সম্ভবত, ব্যাঙ্কে পরিশোধযোগ্য ঋণের গ্রাসে এই সামান্য অর্থ তলিয়ে যেতে বেশি সময় নেয়নি। ফলে নজরুলের তৎকালীন সাংসারিক দুরবস্থার অন্ধকারে এই নব-প্রস্তুত গ্রন্থ কোনো নতুন চন্দ্রোদয় ঘটায়নি বলেই মনে হয়। ইতিমধ্যে কবির শারীরিক দুর্দশা আরও চরমে ওঠে এবং যখন তিনি জ্ঞান বোধ বুদ্ধি ইত্যাদি সর্বস্ব হারিয়ে একেবারে কৃপাপাত্রে পরিণত হয়েছেন, সেই সময়ে অর্থাৎ

১৯৪২-এর প্রায় তিন বছর পর ১৯৪৫, ২৩ মার্চে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য, আজহারউদ্দীন খানের দেওয়া তথ্যানুযায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর মহম্মদ খয়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সি, ৮৬এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। পৃ. ৩+৬৪, মূল্য দুই টাকা। ঢাকা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নতুন চাঁদ'-এর গ্রন্থপরিচয়ে প্রকাশকের নাম ছদরুল আনাম খান। তবে, উক্ত গ্রন্থপরিচয়ে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত একটি প্রকাশক-লিখিত তারিখযুক্ত মুখবন্ধ আছে।

"বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ রোগশয্যায়। প্রতিভার দীপ্তসূর্য ব্যাধির কাল-মেঘে আচ্ছন্ন। এ মেঘ কেটে যাবে, এ আশা আমাদের আছে এবং সত্বর কেটে যাক, আল্লার কাছে এই মোনাজাত করি।

কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সঞ্চয়ন। 'নতুন চাঁদ'-এর পর তাঁর আর কোনো গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায় না। তাই এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও নজরুল কাব্য-পিপাসুদের হাতে 'নতুন চাঁদ' বহু আয়াস স্বীকার করেও আনন্দের সাথে তুলে দিলাম।

'নতুন চাঁদ' বাংলার জরাগ্রস্ত জীবনে নতুন আনন্দ ও আশার বাণী ধ্বনিত করুক এই কামনা করি।"

২৩শে মার্চ, ১৯৪৫ প্রকাশক

প্রথম সংস্করণভুক্ত ১৭টি কবিতা যথাক্রমে : চির জনমের প্রিয়া ; আমার কবিতা তুমি ; নিরুক্ত ; সে যে আমি ; অভেদম্ ; অভয়-সুন্দর ; অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি ; কিশোর রবি ; কেন জাগাইলি তোরা ; দুর্বার যৌবন ; আর কতদিন ; ওঠ রে চাষী ; মোবারকবাদ ; কৃষকের গীত ; শিখা ; আজাদ।

সমকালীন সাময়িক পত্রে 'নতুন চাঁদ' প্রকাশিত হওয়া সংক্রান্ত কোনো তথ্য 'সমকালে নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। প্রথম সংস্করণের প্রায় ছ-বছর পর ১৯৫১-এ কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মঈনুদ্দীন হোসায়ন, নূর লাইব্রেরী, ১২/১ সারেঙ্গা লেন কলিকাতা। এই সংস্করণেও প্রকাশকের একটি নিবেদন আছে :

"বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নতুন কবিতা যথা : 'ঈদের চাঁদ' এবং 'চাঁদিনী রাতে' সন্নিবেশিত হইল। প্রথম কবিতাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক 'নবযুগে' (৪ঠা কার্তিক, ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। 'ঈদের চাঁদ' কবিতাটি 'নবযুগে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর জনপ্রিয় হইয়া ওঠে যে, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৫ই কার্তিক, বুধবার, ১৩৪৮ সাল, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪১) নিজের স্তম্ভে উহা মুদ্রিত করিয়া কবির প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।" ... মঈনউদ্দীন হোসায়ন, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫১।

নজরুল রচনাসমগ্র ৫ম খণ্ডে প্রথম সংস্করণভুক্ত কবিতাগুলি যথাযথ গৃহীত হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংস্করণভুক্ত পাঠই অনুসৃত হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত কবিতা দুটিও যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। চাঁদিনী রাতে কবিতাটি 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যে ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়েছে (নজরুল রচনাসমগ্র ৩য়, পৃ ৭১-৭২)। কিন্তু

উক্ত পাঠের সঙ্গে 'নতুন চাঁদ'-এর গৃহীত পাঠে ঈষৎ পরিবর্তন থাকায় 'নতুন-চাঁদ'-এ কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত কবিতা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য নজরুল রচনা সমগ্র ৩য় খণ্ড গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাবে। (পৃ ৫৫৪-৫৫)।

'নতুন চাঁদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণটি অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

'নতুন চাঁদ' কাব্যভুক্ত কয়েকটি কবিতার প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য এই পাওয়া গেছে :

অঘ্রান	১৩৪৭	রূপায়ণ	অভেদম্
পৌষ	১৩৪৭	সওগাত	সে যে আমি
পৌষ	১৩৪৭	রূপায়ণ	অভয় সুন্দর
মাঘ	১৩৪৭	মাসিক মোহাম্মদী	দুর্বার যৌবন
মাঘ	১৩৪৭	মাসিক মোহাম্মদী	আর কতদিন
ফাল্গুন	১৩৪৭	সওগাত	চিরজনমের প্রিয়া
চৈত্র	১৩৪৭	সওগাত	আমার কবিতা তুমি
২২ শ্রাবণ	১৩৪৮	দৈনিক আজাদ	মোবারক বাদ
৫ নভেম্বর	১৯৪১	দৈনিক নবযুগ	নতুন চাঁদ
ঈদ সংখ্যা	১৯৪১	সাপ্তাহিক কৃষক	কৃষকের ঈদ
ঈদ সংখ্যা	১৯৪১	আজাদ	আজাদ

'নতুন চাঁদ' — নৌ-জোয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এই শীর্ষনামটি কাব্যে পরিবর্তিত হয়েছে। 'দুর্বার যৌবন' সম্ভবত মাসিক মোহাম্মদী-তে দৈনিক আজাদ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মোবারকবাদ'ও দৈনিক আজাদেই প্রথম 'মুকুলের মহফিল' শীর্ষনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

'নতুন চাঁদ' কাব্যের আমার কবিতা তুমি ; নিরুক্ত, সে যে আমি ; অভেদম্ ; অভয় সুন্দর কবিতাগুলি ১৯৪১-এর জুনের কোনো এক সংখ্যায় নবযুগে প্রকাশিত নজরুলের সর্বশেষ গদ্যরচনা 'আমার সুন্দর'-এর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা মনে হয়।

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে (বৈশাখ ১৩৪৮) নজরুলের গুরু প্রণাম। অমিত্রচ্ছন্দে রচিত নজরুলের স্বল্পসংখ্যক কবিতার মধ্যে এটিও উল্লেখযোগ্য। কিশোর রবি কবিতাটিও রবীন্দ্র-গুরুর উদ্দেশে নজরুলের শ্রদ্ধাভিনন্দন। এই দুটি কবিতাতেও সমকালীন 'সুন্দর' তত্ত্বের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

দুর্বার যৌবন এই সমকালীন কবিতাটিতেও নজরুলের দুই দশক পূর্বের কণ্ঠস্বর পুনর্বার বেজে উঠেছে। তাঁর সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থতার অপবাদের বিরুদ্ধে এই কাব্যটি তীব্র দলিল। মোটের উপর 'নতুন চাঁদ'-এ নজরুল-প্রতিভা অস্তমিত তো নয়ই, বরং অনেকগুলি কবিতাতেই তাঁর সাম্যবাদী চিন্তা, অর্থনৈতিক সমাজবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকণ্ঠ। পুঁজিবাদী শ্রেণির প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও মুসলিম সমাজের বেতনভুক্ চাকরিজীবিতা ও ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ শেষবারের মতো গর্জে উঠেছে। অভেদম্ ও অভয় সুন্দর কবিতাদ্বয় রূপায়ণ নামক পত্রিকার ১৩৪৭ বর্ষের অঘ্রানে প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় এবং ১৩৪৭ পৌষ ১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বাংলা একাডেমী নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত হয়েছে। গীতা চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী, (১৯৩১-১৯৪৭) (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২০০১) গ্রন্থে উক্ত নামের কোনো পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মরু-ভাস্কর

'মরু-ভাস্কর' কাজী নজরুল ইসলামের ঊনবিংশতিতম মুদ্রিত কাব্য। প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৭, ইংরাজি জুলাই-আগস্ট ১৯৪২। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত মরু-ভাস্করের মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে দেখা যায়, প্রকাশক শাহ্‌জাহান, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা, কলকাতার গৌরচন্দ্র পাল, নিউ মহামায়া প্রেস ৬৫/৭ কলেজ স্ট্রিট থেকে এটি ছেপে দিয়েছেন। 'প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' এই বাক্যটি মুদ্রিত আছে। (পৃ ৮+১০০), মূল্য সাড়ে তিন টাকা, প্রচ্ছদ শিল্পী সুমুখনাথ মিত্র। প্রকাশকালের উল্লেখ আছে ১৯০০। কিন্তু 'আমাদের আরজ' শীর্ষক প্রকাশকের নিবেদন অংশে ১৯৫১ সালের উল্লেখ আছে। বাংলা একাডেমী ঢাকা প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে লেখা আছে 'মরু-ভাস্কর ১৩৫৭ সালে গ্রন্থবন্ধ হয়।' আশ্চর্য এই যে, 'বাংলাদেশে নজরুলচর্চা — নজরুল বিষয়ক রচনাসূচি' (আমিরুল মোমেনিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯) গ্রন্থে মরু-ভাস্কর গ্রন্থের ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ বলা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে যুক্ত প্রকাশকের বক্তব্যটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

আমাদের আরজ

পাক-ভারতের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিদ্রোহের সুর লইয়া যিনি সর্ব প্রথম বাংলার সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর মতই আবির্ভূত হইয়াছিলেন — আজ তাঁহার সর্ব শেষ ও শ্রেষ্ঠ দান "মরু-ভাস্কর" প্রকাশিত হইল। "মরু-ভাস্কর" বিশ্ব-নবী মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনী কাব্য। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এই অমর কাব্যের অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা নজরুল সাহিত্য রস পিপাসু, তাঁহারা ঐ সময় হইতেই এই কাব্যের সুমধুর রস ও ব্যঞ্জনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যদিও শেষ নবীর সম্পূর্ণ জীবনী ইহাতে নাই — জীবনী শেষ হইবার পূর্বেই কবির লেখনী নীরব হইয়া গিয়াছে — তবুও এখানে যতটুকু আছে, তাহাই আমি ত্রুটিহীনভাবে পাঠকদের সম্মুখে পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইলাম। আমার এই চেষ্টা কতদূর সার্থক রূপলাভ করিয়াছে,— তাহার বিচারভার আপাতত পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

কবি আজ নীরব। তাঁহার সেই কলকণ্ঠ আজ আর কাহারও কানে প্রবেশ করে না। নিত্য নূতন কবিতা ও গানের উপহার লইয়া তিনি আজ আর বাংলা সাহিত্যামোদীদের চিত্তে সুধা সিঞ্চন করেন না। কিন্তু একদা তিনি বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, উহারই মূলে আজ আমরা তাঁহাকে বিচার করিয়া থাকি। কাজেই আমি তাঁহার এই কাব্যকে সহজলভ্য করিবার জন্যই এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। যাঁহারা কবি নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবেই জানেন, এই গ্রন্থে তাঁহারা কবির আর এক নূতন রূপ দেখিবার সুযোগ লাভ করিবেন।

কত বড় সাধক — কত বড় নবী-প্রেমিক হইলে যে মহানবীর জীবনীকে এমন সরস কাব্যে রূপ দান করা সম্ভব, উহা সত্যই আজ চিন্তার বিষয়। কবি আজ অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু তাঁহার বাণী আজিও সকলের কানেই ঝংকৃত হইতেছে।

"না-জানা আনন্দে গো আজ 'আরাস্তা' আরব-ভূমি,
অ-চেনা বিহগ গাহে ফোটে কুসুম বে-মরশুমী!
আরবের তীর্থ লাগি' ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি,
এসেছে ধরার ধূলায়, বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি!"

সর্ব শেষ, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যাঁহার সৌজন্যে আমার হস্তগত হইয়াছিল, এখানে তাঁহার নামটি উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তিনি হইলেন সুগায়ক বন্ধুবর, আব্বাস উদ্‌দীন আহ্‌মদ। আর এই গ্রন্থের মুদ্রণ-পরিপাট্য ও সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের জন্য আমি যাঁহার নিকট ঋণী, তিনি হইলেন সুহৃদয় নীহার রঞ্জন ঘোষাল। এই দুইজন অকৃত্রিম হৃদয় বন্ধুর সাহায্য লাভ করিতে না পারিলে — আমার এই উদ্যম হয়ত' অংকুরেই সমাধি লাভ করিত।

আব্বাসউদ্দীন আহমদের কাছে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কীভাবে গেল, তা বলা কঠিন। তবে 'প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায় পাণ্ডুলিপির স্বত্ব প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপোর মালিক সংগ্রহ করে নিয়েছেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মরু-ভাস্করের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক জোহরা খাতুন, ৯ অ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা ৯। এই সংস্করণের প্রচ্ছদ শিল্পী খালেদ চৌধুরী। এই সংস্করণকে প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪ কেন বলা হয়েছে তাও দুর্বোধ্য। তবে এই, সংস্করণটিতে নতুন ঘোষণা আছে 'প্রমীলা নজরুল ইসলাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। এই সংস্করণে প্রমীলা নজরুল ইসলামের একটি ভূমিকা আছে। সেটিও উদ্ধৃত হল—

'অনেকদিন আগে দার্জিলিং-এ বসে কবি এই কাব্য-গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়া করে তিনি বইখানি শেষ করেন।

এই গ্রন্থখানির মুদ্রণস্বত্ব প্রথমে মনোরঞ্জন চক্রবর্তী কিনে নেন। সুদীর্ঘ দিন ধরে তাঁর কাছে গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত অবস্থাতেই পড়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সেই দরদী বন্ধু গ্রন্থখানির সর্বস্বত্ব আবার আমাদেরই ফিরিয়ে দেন।

প্রমীলা নজরুল ইসলাম
২৩.৫.১৯৫৭

এই ভূমিকায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের উল্লেখমাত্র নেই। নজরুল দার্জিলিঙে যান ১৩৩৮ আষাঢ়, ১৯৩১-এর জুনের শেষে। 'নজরুল জীবনীতে' উল্লেখ আছে যে, 'নজরুলের প্রকাশক বোধ হয় নজরুলকে দার্জিলিঙে পাঠিয়েছিলেন নিরিবিলিতে হজরত-জীবনী লেখা সম্পূর্ণ করার জন্য (নজরুল জীবনী, অরুণকুমার বসু, প.ব. বাংলা আকাদেমি, পৃ ৩৬৩)। উক্ত জীবনীকার আরও জানিয়েছেন যে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতির ভাষণে নজরুল শিক্ষিত মুসলমান সমাজের কাছে এই আবেদন প্রচার করেছিলেন :

"আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে — যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমি, যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না।"

হজরতের জীবনী রচনা, কাব্য-আমপারার অনুবাদ নজরুলের সেই ইসলামি ঐতিহ্য-মনস্কতারই পরিচায়ক মনে হয়। তবে দার্জিলিঙে নাট্যামোদী প্রবোধ গুহ ও তাঁর দলবল এবং একাধিক সাহিত্যিক-বন্ধুর অবস্থান এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কারণে

হজরত-জীবনী লেখার মনোযোগ যে একাগ্র ছিল না তা বলাই বাহুল্য। তবে দার্জিলিঙে যাওয়ার আগেই মরু-ভাস্করের সূচনা হয়েছিল। কারণ, ১৩৩৭-এর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সওগাতে মরু-ভাস্কর কবিতা অংশত বেরিয়েছিল। ১৩৩৭ আষাঢ়ের জয়তী-তে এর কিছু অংশ অভিবন্দনা নামে বেরিয়েছিল। সুতরাং দার্জিলিঙে বসে কবি এই কাব্য-গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন — প্রমীলা ইসলামের এই অভিমত সম্ভবত সত্য নয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ; জীবন ও সৃষ্টি (কে পি বাগচি অ্যান্ড কোং কলকাতা ১৯৯১) গ্রন্থে নজরুল-বিশেষজ্ঞ ড. রফিকুল-ইসলাম মরু-ভাস্কর কাব্যটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞাতব্য কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করেছেন। এই সূত্রে সেগুলি উদ্ধৃত হল :

"মূলত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত মরু-ভাস্কর কাব্য চারটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে অবতরণিকা, অনাগত, অভ্যুদয়, স্বপ্ন, আলো-আঁধারি, দাদা, পরভৃত। দ্বিতীয় সর্গে শৈশবলীলা, প্রত্যাবর্তন, 'শাক্কুস সাদ্‌র' (হৃদয়-উন্মোচন) এবং সর্বহারা। তৃতীয় সর্গে কৈশোর, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ। চতুর্থ সর্গে শাদী মোবারক, খদিজা, সম্প্রদান, নওকাবা, এবং সাম্যবাদী। হজরত মোহম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবনী তিনি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকাশিত কাব্যের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের পরম্পরায় ঘটনার ক্রমধারা রক্ষিত হয়নি, মধ্যে শাদী মোবারক, খদিজা, সম্প্রদান ও নওকাবা হয়েছে, হওয়া উচিত ছিল খদিজা, সম্প্রদান, শাদী মোবারক ও নওকাবা।" (পৃ ৪০৮-০৯)। "উল্লেখযোগ্য যে মরু-ভাস্কর কাব্যের চতুর্থ বা শেষ অংশ 'সাম্যবাদী'র মাত্র ষোলোটি চরণ কবি রচনা করেছিলেন। 'মরু-ভাস্কর' একটি অসমাপ্ত কাব্য, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাম্যবাদী রূপকে যে নজরুল তুলে ধরতে সক্ষম হলেন না, বাংলা কাব্যের জন্যে তা এক বিরাট ক্ষতি হয়ে রইল।" তদেব, পৃ. ৪১৮।

শেষ সওগাত

'শেষ সওগাত' কাজী নজরুলের বিংশতিতম মুদ্রিত কাব্য। এর প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫, যখন নজরুলের সমস্ত চেতনাই ব্যাধিপ্রকোপে অবলুপ্ত। কবিতাগুলি অবশ্য তার পূর্ববর্তী সময়ের রচনা। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, বি. এ. ; অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৭ ; মুদ্রাকর, শ্রী ত্রিদিবেশ বসু, বি. এ. ; কে পি বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলকাতা ৬। প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্ত, পৃ ১৬+১৩০ ; মূল্য চার টাকা। এই সংস্করণ-ভুক্ত কবিতাগুলির শীর্ষনাম-তালিকা : জাগো সৈনিক-আত্মা, কেন আপনারে হানি হেলা, নবাগত উৎপাত, বন্ধুরা এসো ফিরে, নারী, নিত্য প্রবল হও, আগ্নেয়গিরি, বাঙলার যৌবন, তুমি কি গিয়াছ ভুলে, চিরবিদ্রোহী, ভয় করিও না হে মানবাত্মা, সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি, হুল ও ফুল, কোথা সে পূর্ণযোগী, রবির জন্মতিথি, করুণ বেহাগ, বড়দিন, নবযুগ, শোধ করো ঋণ, মোহর্রম, আর কত দিন, বিশ্বাস ও আশা, ডুবিবে না আশাতরী, সকল পথের বন্ধু, তোমারে ভিক্ষা দাও, বকরীদ, আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও, এ কি আল্লার কৃপা নয়, মহাত্মা মোহ্‌সীন, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ, গোঁড়ামি ধর্ম নয়, জোর জমিয়াছে খেলা, বোমার ভয়, কচুরীপানা, টাকাওয়ালা, কবির মুক্তি, ছন্দিতা, পূরববঙ্গ, আরতি, পার্থ-সারথি, আত্মজাত, কাবেরী-তীরে, অমৃতের সন্তান।

শেষ সওগাত কাব্যের এই সংস্করণে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দিয়ে প্রকাশক একটি ভূমিকা লিখিয়েছিলেন। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলার কাব্যে নজরুল-আবির্ভাবকে অপ্রত্যাশিত ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর একদা-বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ কবিতার বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তর্লোকের নিরুদ্ধ বাষ্পবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।' বর্তমান সংকলন সম্পর্কেও তাঁর প্রচ্ছন্ন মতামত এই ভূমিকায় ব্যক্ত হয়েছে :

"নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য। কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের ঊর্ধ্বে তুষার-শিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পেছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতোই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্যসাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সংকলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও অত্যন্ত আনন্দিত।"

কিন্তু 'শেষ সওগাত'-এর পাণ্ডুলিপি কে সংকলন করেছেন, নামকরণ কে করেছেন, এ বিষয়ে স্বয়ং ভূমিকাকার সম্ভবত অবহিত ছিলেন না। কেবল ফরমায়েশি ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। সংকলনটি সম্পর্কে তাই কোনো তথ্য ভূমিকায় বা গ্রন্থের কোথাও পাওয়া যায় না। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশকের কাছে এই পাণ্ডুলিপি মুদ্রণার্থে আসে, যার অন্তত ষোলো বছর আগে নজরুলের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ স্থগিত হয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালে প্রমীলা নজরুল ইসলাম জীবিত ছিলেন। প্রতি বৎসর নজরুল-জন্মদিবসে তাঁদের বাসভবনে ভক্ত ও অনুরাগীদের সমাবেশ ঘটে, তাঁরা দেখে যান ফুলের জলসায় বসে থাকা বোধশক্তি-বর্জিত জড়বৎ ভাবলেশহীন এক মানুষকে। এই পাণ্ডুলিপি নিশ্চয় তার বহুপূর্বে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন তা কোথায় ছিল, কেন প্রকাশিত হয়নি সে-বিষয়ে কোনো তথ্য আমাদের গোচরে আসেনি। সংকলিত কবিতাগুলির কিছু নজরুলের অসুস্থতার অব্যবহিত পূর্বের, কিছু হয়তো এরও পূর্ববর্তী। কিন্তু রচনাকালের নির্দিষ্ট হদিশ সম্ভবত আর পাওয়া যাবে না।

'শেষ সওগাত'-এর কয়েকটি কবিতার প্রকাশ-সংক্রান্ত কোনো কোনো তথ্য ঢাকা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড-এর সাহায্যে ও অন্য সূত্র থেকে সংকলিত হল :

করুণ বেহাগ : এটি নজরুলের স্কুলজীবনের রচনা, সিয়ারসোলরাজ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মিত্রের বিদায়-উপলক্ষে লিখিত। সুতরাং এ কবিতার সম্ভাব্য রচনাকাল ১৯১৬-১৭ এর পরে নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত নজরুল রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ডে 'করুণ বেহাগ' ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়েছে, পৃ ১৮৮। তাই 'শেষ সওগাত' থেকে বর্জিত হল।

'সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি' কবিতাটি দার্জিলিঙে ২০ জুন ১৯৩১ তারিখে লিখিত এবং বর্ষবাণী সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর রূপরেখা বার্ষিকীর জন্য কবি

লিখে দিয়েছিলেন, ১৩৪৩-এর বৈশাখ বুলবুলে পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটি সম্পর্কে নজরুল জীবনীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য (নজরুল জীবনী, প.ব. বাংলা আকাদেমি, ২০০০, পৃ, ৩৬৪) দ্রষ্টব্য।

'তুমি কি গিয়াছ ভুলে' স্বদেশ পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৩৮ সংখ্যায়, প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'নির্ঝর' কাব্য-ভুক্ত হয়। নজরুল রচনাসমগ্র ৪র্থ খণ্ডের নির্ঝর-এ কবিতাটি মুদ্রিত হলেও শেষ সওগাতের পাঠে কিছু পাঠান্তর আছে। এই সংস্কার কেন অথবা কার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, নির্ঝরে মুদ্রিত পাঠের দ্বিতীয় স্তবকের ৭ম-৮ম চরণ দুটি শেষ সওগাতের পাঠে নেই :

হেরিনু, আকাশে ওঠেনি কো চাঁদ — শূন্য আকাশ কাঁদে, ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি ওইটুকু ক্ষীণ চাঁদে ?

অন্যান্য পরিবর্তন নিম্নরূপ :

নির্ঝর-এর পাঠ :	কূলে আসি একা বসি
	তব মুখমদগন্ধের ফুলবন ওঠে নিশ্বসি।
শেষ সওগাত-এর পাঠ	কূলে আমি একা বসি
	তব মুখ-মদ-গন্ধের মত ফুলবন ওঠে শ্বসি।
নির্ঝর	কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছি,
শেষ সওগাত	কতদিন সাঁঝে মনে লাগে যেন তোমারে বা দেখিয়াছি,
নির্ঝর	কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি।
শেষ সওগাত	কুড়াতে তোমার ঘোমটা খুলেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি।
নির্ঝর	ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের কতই না চেনাচেনি
শেষ সওগাত	ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের চিরদিন চেনাচেনি।
নির্ঝর	কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছে আমার আঙুল দিয়া।
শেষ সওগাত	কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছি আমার আঙুল দিয়া,
নির্ঝর	দাঁড়ায়েছ আসি, সোনা গোধূলিতে আকাশ গিয়াছে ভরে
শেষ সওগাত	তব মুখ চেয়ে সোনা-গোধূলিতে আকাশ গিয়েছে ভরে
নির্ঝর	ক্লান্ত পক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরু-শিরে
শেষ সওগাত	শীর্ণপক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরু-শিরে
নির্ঝর	দশদিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে
	তুমি নাই তাই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশে-পাশে।
শেষ সওগাত	চারিদিক হতে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে
	তুমি নাই তাই তাহারা ঘিরিয়া বসে মোর আশে-পাশে।
নির্ঝর	তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বেদনার বিষমাখা
শেষ সওগাত	তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বিষ মোর ঠোঁটে মাখা
নির্ঝর	খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি
শেষ সওগাত	খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়েছি প্রিয়া মোর হৃদয়ের পুঁজি।
নির্ঝর	আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর পুটে !
শেষ সওগাত	আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর লুটে।

নির্ঝর : তুমি যাও নাই ভুলে ?
শেষ সওগাত : তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?

সামান্য হলেও পরিবর্তন কম নয়। নির্ঝর-এ মুদ্রিত হয়েছে বলে শেষ সওগাত কাব্যে 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে' কবিতাটি দেওয়া হয়নি। কিন্তু গবেষণা সৌকর্যে দুটি পাঠের পরিবর্তনগুলি এখানে উল্লিখিত হল। 'হুল ও ফুল' এবং 'জোর জমিয়াছে খেলা' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর ও ১৭ নভেম্বর নবযুগ দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুল তখন এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঢাকা বাংলা একাডেমীর ৩য় খণ্ড গ্রন্থপরিচয়ের এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যগুলি শেষ সওগাত-এর বর্তমান সংস্করণ পাঠের জন্য যথাযথ উদ্ধৃত হচ্ছে : 'আবদুল কাদির-সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত শেষ সওগাত এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা-সংবলিত প্রথম সংস্করণ শেষ সওগাতের অনেক কবিতার মধ্যে স্তবক-বিন্যাস, ছন্দ-বিন্যাস এবং শব্দ ও বাক-বন্ধে পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে অর্থগত, ভাবগত ও ছন্দগত দিক বিবেচনা করে আবদুল কাদির এসব পরিবর্তন করেছিলেন বলে মনে হয়। আবার হয়তো তখনকার পরিবেশের বিবেচনায় হিন্দু ঐতিহ্যমূলক কিছু শব্দ ও চিত্রকল্পও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

শেষ সওগাতের কবিতাবলি রচনাকালে নজরুল ইসলাম দৈনিক নবযুগের সম্পাদক ছিলেন এবং সে-সময়েই তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখে নজরুল-রচনাসমগ্রের নতুন সংস্করণে কবিতার ভাষা ও ভঙ্গির ক্ষেত্রে আমরা শেষ সওগাতের প্রথম সংস্করণ অনুসরণ করেছি এবং স্তবক ও ছন্দবিন্যাসের ক্ষেত্রে আবদুল কাদির-কৃত পরিবর্তন রক্ষা করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত নজরুল রচনাসমগ্র ৫ম খণ্ডে মুদ্রিত শেষ সওগাতের পাঠও আবদুল কাদির সম্পাদিত পাঠানুসারী।

'জোর জমিয়াছে খেলা' নবযুগে প্রকাশিত এই কবিতায় নজরুলের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাধিয়ে-তোলা কৃত্রিম শত্রুতা সম্পর্কে তির্যক মনোভঙ্গির পরিচয় নিহিত। 'হুল ও ফুল' কবির আত্মবিশ্লেষণ। ইতিমধ্যে কবি স্বসম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকে অকথ্য কুৎসা ও নিন্দার ভাগী হয়েছেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির গোলামি না করে দলিত শোষিত নির্যাতিতের পক্ষাবলম্বন করে এসেছেন। আজও সেই আদর্শ থেকে কোনো প্রলোভন, কোনো ধর্মমোহ, ভীতি ও সাম্প্রদায়িক রক্তচক্ষু তাঁকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না, এই বলিষ্ঠ ঘোষণা এই আলোচ্য অংশ বা কবিতার ভিতর থেকে উচ্চারিত হয়েছে।

'কবির মুক্তি' ১৩৪৮ চৈত্র সওগাতে প্রকাশিত নজরুলের একমাত্র গদ্যকবিতা। সমকালীন আধুনিক কবিদের গদ্যকবিতা ছন্দভ্রষ্টতা ছন্দবর্জন ও মিল সম্পর্কে অনীহাকে নজরুল কী দৃষ্টিতে দেখতেন, এই কবিতা যেন তারই সকৌতুক সমালোচনা।

রচনা ও প্রকাশকাল সঠিক জানা না গেলেও শেষ সওগাতের অনেকগুলি কবিতা মোটের উপর কাছাকাছি সময়ে রচিত এবং ১৯৪০-৪১ সালে লিখিত কবিতার সাধারণ সুরে বাঁধা। ধর্মাচরণে নিষ্ঠা ও ঈশ্বর সম্পর্কে পরম আত্মনিবেদন। শ্রেণিগত বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আপোষহীন বিদ্রোহ এবং আপন জীবন সম্পর্কে একটি নৈরাশ্যচেতনা অনেকগুলি কবিতায় অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র স্পষ্ট করে দেয়।